প্রকাশিকা ঃ সুধা ভট্টাচার্য
১০/২/এইচ/২ শশিভূষণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০১২

পরিবেশক ঃ নাথ ব্রাদার্স ও দে বুক স্টোর, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ : ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪
দ্বিতীয় প্রকাশ ৩০শে জানুয়ারী ১৯৫৯

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রণে ঃ যোগমায়া আর্ট প্রেস
১১/এ শশিভূষণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০১২

ব্লক ঃ স্টুডিও ডি, ব্যানার্জী
৭১ শশিভূষণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০১২

মালতী মাধব নাটক।

মহাকবি ভবভূতি বিরচিত।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

কলিকাতা।

জি, পি, রায় এণ্ড কোং দ্বারা. বিদ্যোৎসাহিনী

সভার কারণ মুদ্রিত,

শকাব্দা ১৭৮০

বিনা মূল্যেতে বিতরিতব্য।

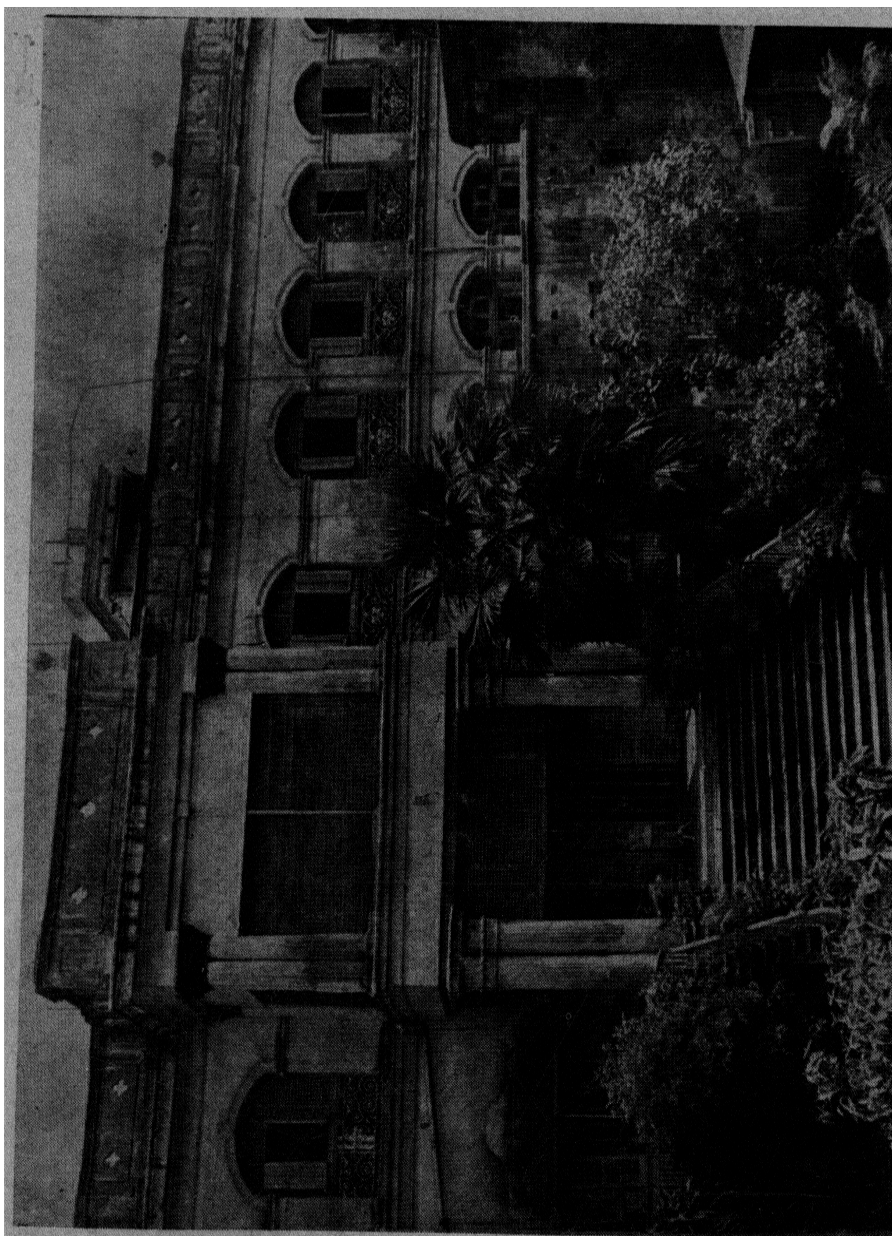
বিষয় সূচী

পরিশিষ্ট :



জোড়াসাঁকো সিংহবাটীর ঐতিহ্যময় ঠাকুর দালান (অধুনা লুপ্ত)
১৪৭ নং বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা।

চিত্র—২



জোড়াসাঁকো সিংহ পরিবারের প্রাচীন বসতবাটীর একাংশ
১৪৫/১ (বর্তমান ৩০ নং) বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা

চিত্র—৩

প্রথম অধ্যায়

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের পটভূমি।

পশ্চাদ্‌পট নির্মিতি উপেক্ষিত হলে যেমন চিত্র পরিস্ফুটন হয় না, তেমনি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের অন্যোন্য সাপেক্ষ পটভূমি বিশ্লেষিত না হলে কালীপ্রসন্নের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ও বৈচিত্র্যের সম্যক্ অনুধাবন করা যাবে না। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকেই বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে যথার্থ আধুনিকতার ক্ষেত্র রচিত হয়েছে—যদিও এই শতকের প্রথমার্দ্ধ জুড়ে চলেছে আধুনিকতার প্রস্তুতি পর্বের ইতিহাস, তবু এই শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধেই ঘটেছে আধুনিকতার অবশ্যম্ভাবী বিকাশ, যেহেতু যে অমিশ্র মানবতাবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ আধুনিক যুগ-চেতনার প্রধানতম লক্ষণ তা স্ফুটতর হতে থাকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকেই। প্রকৃতপক্ষে রামমোহন ও ডিরোজিও থেকে যে বিপ্লবের ধারা বাংলা ও বাঙালীর চেতনাভূমিতে প্রবাহিত হয়ে তাকে সরস ও উর্বর করে তুলেছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের শুরু থেকে তার ফলশ্রুতি দেখা দিল। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—"বলিতে কি, ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ [খৃষ্টাব্দ], পর্যন্ত এই কাল বঙ্গ-সমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাব, সোম-প্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্ম সমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল, প্রত্যেকটিরই ইতিবৃত্ত গভীর অভিনিবেশ সহকারে আলোচনার যোগ্য।"

সমাজের এই পটভূমিতে সাহিত্যেরও ঘটল কৈশোর-বন্ধনমুক্তি—প্রধানতঃ পাঁচটি বিভিন্ন রূপে—অনুবাদ ও মৌলিক নাট্যরচনায়, নূতন কবিতার অভ্যুদয়ে, নকশা ও ব্যঙ্গকৌতুকে, উপন্যাস রচনায় এবং প্রধান প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থের গদ্যানুবাদে।

আমরা যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনায় দেখব যে, একমাত্র কবিতা ছাড়া বাকী সবকটি ক্ষেত্রেই কালীপ্রসন্ন তাঁর প্রতিভার স্পর্শ রেখে গেছেন। এক কথায় ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে যে সব মনীষী বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে নবজাগরণের প্রবর্তক, কালীপ্রসন্ন তাঁদের অন্যতম।

'নবজাগরণ' বা নব জাগরিত' শব্দটি বাংলাদেশে কেশবচন্দ্র সেনই বোধহয় প্রথম ব্যবহার করেন।[১] তারপর থেকে ইংরেজি 'রেনেশাঁস' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ঐ শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এখানে লক্ষণীয় যে, ইংরেজি 'রেনেশাঁস' শব্দটিও ঊনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি। ফরাসী ঐতিহাসিক Michelet 'রেনেশাঁ' শব্দটি প্রথম rebirth বা পুনর্জন্ম বোঝাতে ব্যবহার করেন। এই শব্দটির মূল ইটালিয়ান rainasoita শব্দটির প্রথমে অর্থ ছিল 'revival of classical style of architecture.' পরে শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় 'rediscovery of classical culture in all its aspects'। ইটালীতে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে যে নবজাগরণ স্থরু হয়েছিল তা অবশ্য শুধু ক্লাসিক্যাল কাল্‌চারের পুনরুজ্জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি—"It was a movement, a revival of man's powers, a reawakening of the consciousness of himself and of the universe।"[২] এখানে লক্ষণীয় হল, নব জাগরণের এই প্রধান বৈশিষ্ট্য—এই মানবতাবাদ ও আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ যেমন শুধু ইটালীতেই আবদ্ধ থাকল না, দ্রুত ইউরোপের অন্যান্য দেশের মনীষীরা ইটালীর এই নবজাগরণকে আত্মসাৎ করে নিজ নিজ দেশের মধ্যে সার্থকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি বাংলা দেশের মনীষীরাও ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ইউরোপের নবজাগরণের ফলকে আত্মসাৎ করে দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞান ও শিল্প ইউরোপে প্রসারিত হবার সময় আদর্শের সঙ্গে আদর্শের তেমন কোন সংঘাত ছিল না, ছিল কুসংস্কারের সঙ্গে আদর্শের বিরোধ; অন্যদিকে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি বাংলাদেশে যে নবজাগরণ ঘটালেন তাতে শুধু কুসংস্কারের সঙ্গে সংঘাত নয়, জাতীয় ভাবধারার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সমন্বয় এবং সামঞ্জস্যেরও চেষ্টা এবং প্রয়োজন দেখা গেল। তবু ইটালী ও ইউরোপের অন্যত্র যে 'রেনেশাঁস' হয়েছিল তার সঙ্গে বাংলাদেশের নবজাগরণের এক জায়গায় এক আশ্চর্য মিল আছে। ভার্নাকুলারের প্রতি নিষ্ঠা ছিল ইটালীর রেনেশাঁসের একটি প্রধান লক্ষণ। পেত্রার্ক ও বোকাচ্চিওর লাটিন

লেখাগুলি লোকে আর মনে রাখেনি; কিন্তু পেত্রার্কের ইটালিয়ান সনেটগুলি জনসাধারণ অত্যন্ত সমাদরে বরণ করে নিয়েছিল। ইটালীয় ভাষার ক্লাসিক রীতিতে লেখা প্রথম কাব্যও প্রকাশিত হয় ১৫১৬ সালে।[৩] তেমনি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে একদিকে বাংলা গদ্যচর্চার প্রসার, বাংলা নাট্যকলার চর্চা, বাংলা উপন্যাসের সূত্রপাত, নক্শা ও ব্যঙ্গ কৌতুকের উদ্ভাস, এবং অন্যদিকে বাংলা কাব্যে ক্লাসিক রীতির প্রতিষ্ঠা, সনেটের সূত্রপাত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। ঐ সময়ের বাংলা গদ্যের বিভিন্ন শাখার কথা উল্লেখ না করলেও শুধু কবিতার দিক থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজে' এই নবজাগরণের এক আশ্চর্য সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন,—"বঙ্গ সাহিত্য আকাশে মধুসূদন যখন উদিত হইলেন, তখনও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিভার স্নিগ্ধ জ্যোতি তাহা হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কোথায় আমরা গুপ্ত কবির রসিকতা ও চিত্তরঞ্জক ভাব-সকলের মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম, আর কোথায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধক্ধক্ করিয়া কি প্রচণ্ড দীপ্তি উদিত হইল। বঙ্গসাহিত্যে সেই অপূর্ব্ব প্রদোষকালের কথা আমরা কখনই বিস্মৃত হইব না। সংস্কৃত কবি একস্থানে বলিয়াছেন ঃ—

যাত্যেকতোহস্তশিখরং প্রতিরোষধীনাং
আবিষ্কৃতারুণ পুরঃসর একতোর্কঃ।

একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন, অপরদিকে অরুণকে অগ্রসর করিয়া দিবাকর দেখা দিতেছেন।

বঙ্গসাহিত্য জগতে যেন সেই প্রকার দশা ঘটিল। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার কমনীয় কান্তির মধ্যে মধুসূদনের প্রদীপ্ত রশ্মি আসিয়া পড়িল। বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন।"[৪]

ঐ সময়ে বাংলা গদ্যের জগতেও এসেছে এক ক্রান্তিলগ্ন। ফোর্ট উইলিয়ামের পাণ্ডিতী গদ্য এবং রামমোহনের ডায়েলেকটিক গদ্যের গণ্ডী অতিক্রম করে বাংলা গদ্য সেই প্রথম প্রসারিত হতে শুরু করেছে এক বৃহত্তর এবং ব্যাপকতর ক্ষেত্রে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটির প্রতিষ্ঠা এ প্রসঙ্গে একটি স্মরণীয় ঘটনা। কারণ বাংলা গদ্যের সেই গঠমানতার যুগে বাংলা গদ্যের প্রসার অব্যাহত রাখতে এই সোসাইটির অবদান খুব কম ছিল না। আবার ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের 'এডুকেশান ডেসপ্যাচ'ও যে ভার্নাকুলারের প্রসারে সহায়তা করেছিল, সে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আচার্য কৃষ্ণকমল 'পুরাতন প্রসঙ্গে'

বলেছেন, "আমার বিশ্বাস, ১৮৫৪ সালের Education despatch-এর ফলে বাঙ্গালা রচনার দিকে অনেকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন।"

এই সময়ে 'ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি'র চেষ্টায় একদিকে যেমন বিখ্যাত ইংরেজী গ্রন্থ সমূহের অনুবাদ প্রকাশ হতে লাগল, তেমনি অন্যদিকে 'স্কুল বুক সোসাইটি,' 'এডুকেশান ডেসপ্যাচ' ইত্যাদির ফলে পাঠ্য পুস্তক জাতীয় বাংলা গ্রন্থ প্রকাশের প্রবণতাও বেড়ে গেল। এই সঙ্গে বাংলা গদ্য রচনায় সাময়িক পত্রের প্রভাবের কথাও উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু সমাচার দর্পণ, সংবাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা ইত্যাদি সাময়িক পত্রে যে গতানুগতিকতার সৃষ্টি হয়েছিল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার (১ম সংখ্যা, ১৬ আগষ্ট—১৮৪৩) দ্বারা সেই গতানুগতিকতা প্রথম ভঙ্গ হল। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের অভিমতটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের যে আদর্শ স্থাপন করিল, পরে তাহাই বিবিধার্থ সংগ্রহ, বঙ্গদর্শন, ভারতীতে অনুসৃত হইল। সেই হইতে বরাবর বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ লেখকগণ সাময়িক পত্রের করাবলম্বনেই সাহিত্যের আসরে অভ্যর্থিত হইতেন।"[৫] এখানে উল্লেখযোগ্য যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করায় কালীপ্রসন্ন সিংহই শেষ পর্যন্ত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র সম্পাদনা করেন। অবশ্য 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ছাড়াও কালীপ্রসন্ন আরও অনেকগুলি সাময়িকপত্রের সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন এবং ঐ সময়ে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের মান উন্নয়নের চেষ্টায় তাঁর অক্লান্ত সাধনা নিয়োজিত করেন।

এইভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাংলা গদ্যসাহিত্য সৃষ্টির যে পটভূমি সৃষ্টি হয় সেই পরিপ্রেক্ষিতে কালীপ্রসন্নের সাহিত্যিক কৃতিত্বও বিচার্য। এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কালীপ্রসন্নের নাটকগুলির মধ্যে একমাত্র 'বিক্রমোর্বশী নাটক' ছাড়া অন্যান্য নাটকগুলি সম্বন্ধে যদিও ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "এখন লুপ্ত বলিয়া এগুলির সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই,"[৬] তবু একমাত্র 'বাবু নাটক' ('বিক্রমোর্বশী'র ও পূর্বে রচিত) ছাড়া তাঁর অন্যান্য সব নাটকেরই সন্ধান পেয়েছি এবং 'নাটকে কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। আবার শুধু নাটক রচনা নয়, নাট্যশালা সৃষ্টির সেই আদিযুগে কালী প্রসন্ন 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' নির্মাণ করে নাট্যাভিনয়ের যে ব্যবস্থা করেন ত সমসাময়িক সংবাদপত্রে উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছে।

নাটক ও নাট্যশালা ছাড়া কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। 'হুতোম

প্যাঁচার নক্‌শা'র লেখক সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন উত্থাপিত সংশয় নিরসনের চেষ্টা এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র সামগ্রিক মূল্যায়ন 'কালী প্রসন্নের সামাজিক নক্‌শা' অধ্যায়ে করেছি। এখানে শুধু যে পটভূমিতে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল সে সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'লুপ্তরত্নোদ্ধারে'র ভূমিকায় লিখেছেন, "'আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না,—'খদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন। 'চুল' বলা হইবেনা—'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না, রম্ভা বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার" ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

......ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয় ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। ...

এই দুইটি গুরুতর বিপদ্ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন।...... তিনিই প্রথমে দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে। .. তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাংলা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।''

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাগুলি প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য, কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' সম্বন্ধেও তেমনি প্রযোজ্য। শুধু তাই নয়, আধুনিক কালের বিচারে আজ একথাই বলতে হয়, ভাষা এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে যে বিপ্লবের প্রয়োজন অপেক্ষিত ছিল 'হুতোম

প্যাঁচার নক্‌শা' 'আলালের ঘরের দুলালে'র চেয়েও তাকে অগ্রগামী করে দিল।

অতঃপর মহাত্মা কালীপ্রসন্নের অক্ষয় সাহিত্যকীর্তি হল মহাভারতের গদ্যানুবাদ। এ বিষয়ে বহু পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ করলেও কালীপ্রসন্নের নিজের অবদানও যে খুব কম ছিল না, তা সমসাময়িক বহু তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়। 'অনুবাদ সাহিত্য ও কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়ে মহাভারতের গদ্যানুবাদ এবং স্বতন্ত্র ভাবে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে শুধু মহাভারতের গদ্যানুবাদ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতটি উদ্ধৃত করি—"...in particular he is the author of a translation of the Mahabharata, which may be regarded as the greatest literary work of his age."[৭]

এছাড়া কালীপ্রসন্নের বহু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধ এবং 'বঙ্গেশ বিজয়' নামক অসমাপ্ত উপন্যাস রচনা, 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র সম্পাদনা ও পরিচালনা, 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা'র সম্পাদনা, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র পরিচালনা, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র সম্পাদনা এবং দৈনিক সংবাদপত্র 'পরিদর্শকে'র সম্পাদনা ও পরিচালনা ইত্যাদির কৃতিত্ব উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাংলা সাহিত্যের এই পটভূমির ওপরেই বিচার্য।

এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয় যে, স্বল্পায়ু কালীপ্রসন্নের (১৮৪০—১৮৭০ খৃঃ) কর্মজীবন শুধু সাহিত্যের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, সমাজের অঙ্গনেও তা প্রসারিত হয়েছিল। সুতরাং সমাজের যে পটভূমিতে কালীপ্রসন্নের সমাজ-কর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

সেকালের সামাজিক অবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে বলেছেন—

"সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেমন ছিল নীতির অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত ছিল না। তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির দ্বারা অর্থসঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। বরং কোনও সুহৃদ্‌গোষ্ঠীতে পাঁচজন লোক একত্রে বসিলে এরূপ ব্যক্তিদিগের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হইত। ধনিগণ পিতামাতার শ্রাদ্ধে, পুত্র-কন্যার বিবাহে, পূজাপার্বণে প্রভৃত ধন ব্যয় করিয়া পরস্পরের সহিত

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। ......নিজভবনে বাঈজীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়া ধনীদের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল।"৮

তৎকালীন পত্রপত্রিকাতেও সমাজের এই অবস্থার কিছু বাস্তব বর্ণনা আছে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় কলকাতার জনৈক 'বড়মানুষ' তাঁর কয়েকদিনের যে রোজনামচা প্রকাশ করেন তাতে কলকাতার উচ্চসমাজের জীবনযাত্রার একটি নিখুঁত পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

গত বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে বেলা ৯ ঘণ্টার সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল, ১০৷৷. ঘণ্টার সময়ে প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া চা-পান করিলাম, পরে দুই চারিজন বন্ধু আসিলেন, তাঁহারদিগের সহিত দুটো খোসগল্প করিয়া স্নান করিলাম, স্নান করিয়া আর কর্ম্ম কি, বেলা যখন ১১৷৷.টা তখন ভোজন করা গেল, ভোজনান্তে যেমন অভ্যাস আছে, কিঞ্চিৎকাল নিদ্রাগত হইলাম, এবং বেলা যখন দুইপ্রহর চারি ঘণ্টা তখন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দশজন বন্ধুর সহিত তাসখেলা এবং অন্য অন্য প্রকার আমোদ করা গেল তাহাতে বড়ই উল্লাস হইয়াছিল, পরন্তু সন্ধ্যার পর রাত্রি দশঘণ্টাবধি গানবাদ্য করিয়া আহারান্তে স্থানান্তরে গমন করিলাম।

শুক্রবার।......কার ঠাকুরের হৌস দেখিয়া বাটী আসিয়া বস্ত্র ত্যাগ করিয়া জলপান করিলে আমি হরিহরবাবু এবং শ্যামবাবু একত্র হইয়া বাগানে গমন করিলাম, সেদিন আর বাটী আসা হইল না, রাত্রি দশটার সময়ে বাগান হইতে অমনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম।...

কলিকাতা
৬ অগ্রহায়ণ, রবিবার

বড়মানুষ

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তেও তৎকালীন কলকাতা শহরের এই বিকৃত অবস্থার পরিচয় আছে :

"এই কলিকাতা নগরের প্রতি পল্লীতে এ প্রকার সমূহ ব্যক্তির অধিষ্ঠান আছে, যাহারা ক্রমাগত দলবদ্ধ হইয়া বিবিধ কুকর্ম্মসূচক আমোদেই লিপ্ত থাকে। ...বিশেষতঃ বালকেরা যখন শাসনকর্ত্তা পিতা-ভ্রাতা প্রভৃতিকে অহরহ দুষ্কর্ম-পঙ্কে পতিত হইতে দেখে, তখন আপনারা তৎপথ অবলম্বন করিতে কেন শঙ্কা করিবে? ইহা কি শতস্থানে প্রত্যক্ষ হয় নাই, যে

পাতার রক্ষিতা গণিকার গৃহে অতি বালকপুত্রাদি গমনাগমন করিতেছে? তথায় তাহারা পরিপাটীরূপে লম্পট ব্যবহার শিক্ষা করিয়া বয়স্ক হইলে কণ্টকস্বরূপ যে তাহাদিগের পরিবারের পীড়া-দায়ক হইবেক তাহাতে সন্দেহ কি?"

এই যখন শহরের নৈতিক অবস্থা, তখন ধর্মরক্ষার জন্য শহরের সামাজিক দল-উপদলগুলির মধ্যে দলাদলির চিত্রটিও অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। 'ধর্মসভা'র মধ্যে আশুতোষ দেবের দল ও রাধাকান্ত দেবের দলের মধ্যে আজকের দিনের রাজনৈতিক দল বদলের মত কি রকম দলত্যাগ ও দলভুক্তি চলছিল তা একজন পত্রলেখকের এই পত্রখানি থেকে বোঝা যায়—

"......শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মৎপ্রতিপালকেষু—পোষ্য শ্রীজয়চন্দ্র মিত্রস্য সবিনয় নিবেদনমিদং। আমি কিয়ৎকাল শ্রীযুত আশুতোষ দে সরকার বাবুজীর দলেতে ছিলাম (।) এক্ষণে সে দলের নানাপ্রকার গোলযোগ দেখিয়া সে-দল পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মভয়ে মহারাজার দলস্থ হইলাম। কিমধিকমিতি সন ১২৫০ সাল তারিখ ২৪ কার্ত্তিক—শ্রী জয়চন্দ্র মিত্রস্য।"

এই সব ধর্মীয় দল-উপদলে তথাকথিত ধর্মরক্ষা এবং দলরক্ষার চেষ্টা যে কি মারাত্মক ধরনের ছিল আশুতোষ দেবের কাছে লিখিত আর এক পত্রলেখকের পত্রে তার পরিচয় পাই—

"পরম পোষ্টবর শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষদেব দলপতি মহাশয় পোষ্টবরেষু। পোষ্য শ্রী মধুসূদন মিত্রস্য বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। আমি বহুকালাবধি মহাশয়ের দলস্থ থাকিয়া সামাজিকতা ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলাম, গত-বৎসর আমার অজ্ঞাতসারে শ্রীযুত ঘটক সুধাকরের চাতুরীতে শ্যামবাজার নিবাসি শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র সরকারের কন্যার সহিত আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রী শ্যামাচরণ মিত্র বাবাজীর দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হয় (।) তজ্জন্য মহাশয় আমাকে দোষী করিয়া স্বীয় দলে স্থগিত রাখিয়াছেন (।) এক্ষণে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উক্ত পুত্রবধূকে আমার অনুমতিক্রমে আমার পুত্র পরিত্যাগ করিলেন, পরে যদ্যপি ঐ পুত্র আমার আজ্ঞানুরূপ না করেন তবে তাহাকে আমি পরিত্যাগ করিব ইহা ধর্মতঃ স্বীকার করিলাম (।) এক্ষণে মহাশয় পূর্ব্ববৎ স্বীয় দলে গ্রহণ করিয়া বিহিত আজ্ঞা করিবেন।

নিবেদন ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৪৯ সাল। শ্রীমধুসূদন মিত্র। সাং সিমলিয়া।

রাজধানী কলকাতার যখন এই অবস্থা, তখন কলকাতার বাইরে সুবিস্তৃত পল্লীঅঞ্চল জুড়ে যে বৃহৎ বাংলাদেশ সেখানে সমাজপতিদের শাসন যে কিরূপ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। আবার সমাজপতিদের তথাকথিত ধর্ম-রক্ষার জন্য যখন এই বজ্র-আঁটুনি চলেছে, তখন কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির সুড়ঙ্গ পথে দুর্নীতি ও ব্যাভিচারের বন্যাস্রোত বয়ে গেছে সমাজে। ১৭৬৪ শকের ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় একজন পল্লীবাসী পত্রলেখক এবিষয়ে যে পত্রলেখেন তা হল:

"কুলীনদিগের আচরণ বিষয়, বোধ করি বঙ্গদেশের ব্যক্তিমাত্রের বিদিত আছে। যে অবধি এই ঘৃণিত কার্যের প্রচলন হইয়াছে, তদবধি ভ্রূণ হত্যা, স্ত্রী হত্যা প্রভৃতি যে সকল রাশি রাশি দুষ্কর্মের বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সংখ্যা করা অতিশয় কঠিন। আপনারা সর্ব্বদাই নগরমধ্যে বসতি করেন, পল্লীগ্রামের সকল ব্যাপার জানিতে পারেন না, গ্রাম্যসমাজে যাঁহারা কুলীন রূপে পূজ্য হইয়াছেন, তাহারদিগের অহঙ্কার দেখিলে বোধ হয় তাঁহারাই বল্লাল সেনের রাজ্যভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

দেশের যখন এই অবস্থা বিদ্যাসাগর তখন কালীপ্রসন্ন প্রভৃতির সহযোগিতায় সমাজে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

বিদ্যাসাগরের এই মানবতাবাদী প্রচেষ্টায় ক'জন বিধবার বিবাহ হয়েছিল, সেটা অবশ্য তেমন বড় কথা নয়, এর ফলে সমাজে নারীর মূল্য প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা হয়েছিল, সেইটাই বড় কথা। ইতিপূর্বে রামমোহন সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে যার সূত্রপাত করেছিলেন, ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে এসে বিদ্যাসাগর কালীপ্রসন্নের সহযোগিতায় বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ নিবর্তন, কৌলীন্যপ্রথা রহিতকরণ ইত্যাদি প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই ধারাকে অবিচ্ছিন্নভাবে ক্রিয়াশীল রেখে ধীরে ধীরে নারীর সামাজিক বন্ধনমুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন এবং এইভাবেই আমরা মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থা থেকে আধুনিক যুগে পদার্পণ করলাম। বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টায় কালীপ্রসন্ন কতখানি সহায়তা করেছিলেন তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে সমাজের অন্ধকার-অভিশাপ-জয়-করা সমাজ-প্রগতির আর একটি মূল কারণ নিহিত ছিল শুধু নগর কলকাতায় নয়, দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাচর্চার প্রেরণা সৃষ্টির মধ্যে। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর ও কালীপ্রসন্নের চিন্তা, চেষ্টা ও সহযোগিতার

কথা 'সমাজ প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে শুধু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে সেক্রেটারি অব স্টেট, চার্লস উড ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন সেকথা বলা প্রয়োজন মনে করি। কারণ এই প্রতিবেদনে প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা, মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তিদান, বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির জন্য সরকারী সাহায্য, জনগণের শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, দেশীয় ভাষাসমূহের উন্নতি সাধন, শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা এবং প্রত্যেকটি প্রেসিডেন্সী শহরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল। অবশ্য একথাও এখানে উল্লেখ্য যে, এই পরিকল্পনা যত ব্যাপক ছিল, পরিকল্পনার রূপায়ণে সরকারের আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা তত ব্যাপক ছিল না।

সমাজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল ধর্ম। একদিকে খৃষ্টান মিশনারীদের খৃষ্টধর্ম প্রচার এবং বাংলার অনেক উজ্জ্বল তরুণকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা, অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্মান্দোলন, আর একদিকে রাধাকান্তদেবের নেতৃত্বে হিন্দুধর্মরক্ষার প্রচেষ্টায় সমাজ তখন চঞ্চল। এই সময় ইয়ংবেঙ্গল দলের কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট ধর্মান্দোলন ছিল না। সামাজিক নানা কুপ্রথার জন্য হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রচন্ড বিদ্বেষ থাকলেও কোন বিশেষ ধর্মচিন্তা তাদের মনকে অধিকার করেনি। বরং যে কোন ধর্মের প্রতি তাঁদের ঘৃণা এবং প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছিল। তবু যে এই ইয়ংবেঙ্গল দলের কেউ কেউ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন তাতে আধ্যাত্মিক কারণের চেয়ে জাগতিক কারণই যে প্রবলতর ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ডাফের জীবনীকার প্যাটন ইয়ংবেঙ্গল দলের অন্যতম নেতা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখেছেন—"He and his friends were reformers, but they knew themselves to have nothing to give in place of that which they were resolved to demolish. They believed Hindooism false, but what was true they knew not."[২]

সমাজের ধর্মান্দোলনের এই ঘূর্ণাবর্তে বিদ্যাসাগর এবং কালীপ্রসন্ন কেউই ব্যক্তিগতভাবে কোন আগ্রহ দেখান নি। ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মজীবন ও ধর্মবিশ্বাস চিরকাল রহস্যময় থেকে গেছে আর কালীপ্রসন্ন তো হুতোমের ছদ্মনামে বিভিন্ন ধর্মীয় দল-উপদলের প্রতি তাঁর তীব্র বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেছেন। তাই বলে তাঁরা শূন্যতার মধ্যেও ভাসমান ছিলেন না। তাঁরা ধর্মান্দোলনের

পথ থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দিকেই সমাজের গতি ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ধর্মসংস্কারের তুলনায় সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ইয়ংবেঙ্গল দলে ও আগ্রহ ছিল ব্যাপক এবং সজীব। কিন্তু বিদ্যাসাগর বা কালীপ্রসন্নের মত তাঁদের এ বিষয়েও কোন সুপরিকল্পিত কর্মপদ্ধতি ছিল না। তবুও রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে এবং কখনো কখনো অশোভনভাবে উগ্র পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্ন আঘাত হানার চেষ্টা ছাড়াও তাঁদের মুখপত্র স্বরূপ 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় সমাজের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁরা তাঁদের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

তাছাড়া আরও উল্লেখ্য যে, সীমাবদ্ধভাবে হলেও তাঁরা কিছুটা রাজনৈতিক আন্দোলনও করেছেন। ১৮৩০-এ হিন্দু কলেজের ছাত্ররা 'পার্থেনন' নামে যে মাসিকপত্র বের করেন তাতে শুধু হিন্দুসমাজের কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা নয়, ভারতে ইংরেজ কুশাসনের দিকগুলিকেও সমান তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়। ফলে দ্বিতীয় সংখ্যা বেরোবার আগেই কলেজ কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় 'পার্থেননে'র কন্ঠরোধ হয়। আবার ১৮৩০-এর জুলাই মাসে ফরাসী বিপ্লবের ফলে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জয়ডঙ্কা বেজে ওঠার কয়েকমাস পরেই ১৮৩০-এর ২৫শে ডিসেম্বর রাত্রে হিন্দু কলেজের কয়েকজন দুঃসাহসী ছা যখন কলকাতা ময়দানে মনুমেন্টে চড়ে ব্রিটিশের ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা নামিয়ে তার জায়গায় উড়িয়ে দিলেন ফরাসী বিপ্লবের তেরঙ্গা পতাকা তখন কলেজ কর্তৃপক্ষ এইসব কিছুর মূলে ডিরোজিওকেই দায়ী করে অধ্যাপকের পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করলেন। কিন্তু কলেজের ছাত্রদের স্বাধীনতাস্পৃহা এতে আদৌ থামল না। ১৮৩৫-এ কলেজের অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডসন যখন 'এক শতাব্দী পরে তোমার স্বপ্নের ভারতবর্ষ' এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেন, তখন তাতে প্রথম পুরস্কারবিজয়ী ১৬ বছরের ছাত্র কৈলাশ চন্দ্র দত্ত '১৯৪৫-এ একটি কল্পিত ৪৮ ঘন্টার রোজনামচা'য় একজন বিদ্রোহী বীর দেশবাসীর জবানীতে তাঁর আহ্বান রেখে গেলেন,—"বন্ধুরা, দেশবাসীরা! আমার শেষ রক্তবিন্দু দেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করে গেলাম। তোমরাও এই অসমাপ্ত কাজের পথে এগিয়ে চল।"

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের বহু আগে হিন্দু কলেজের একজন

কিশোর ছাত্র স্বাধীনতার এই স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে যুগের হিন্দু কলেজের আর একজন ছাত্র কিশোরী চাঁদ মিত্র পরিণত বয়সে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই বিদ্রোহী চেতনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন—"কাঞ্চনজঙ্ঘার হিমাদ্রিশিখরে যেমন উষার প্রথম রৌদ্রকিরণ এসে পড়ে, এঁরাও তেমনই এদেশে নতুন সূর্যোদয়কে প্রথম অনুভব করেছিলেন"[১০]

আবার ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন 'সম্বাদ ভাস্করে' ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র যদুনাথ দাসের লেখা যে কবিতাটি প্রকাশিত হয় সেটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ঐ কবিতায় কিশোর কবি স্বপ্ন দেখেছেন. এক দুঃখিনী নারীর ছদ্মবেশে স্বাধীনতা একটি গাছের তলায় বসে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দুঃখের কারণ বলছেন:

শুন ওরে যাদুধন, দুঃখিনীর বিবরণ
যে কারণ অরণ্যেরোদন।
শুনিলে আমার দুঃখ বিদরে পাষাণ বুক
সরে নীর হইতে নয়ন।।
স্বাধীনতা মম নাম, এ ভারতে ছিল ধাম
পূর্বকালে যত পুত্রগণে।
যতনে সকলে মোরে শত্রু হতে রক্ষা করে
রেখেছিল বহুকাল মানে।।
একালের পুত্র যত, মোহম্মদে অনুগত,
একবার না দেখে ফিরিয়া।
কি দশা এবে হইল কুলশীল না রহিল
ম্লেচ্ছজাতি অধীনে থাকিয়া।।
কোথা ওহে রঘুপতি, দুঃখিনীর এ দুর্গতি
ত্বরা আসি কর তুমি নাশ।
কোথা গেলে রণজিত, রণে কর পরাজিত
ম্লেচ্ছে আসি করহ বিনাশ।
ফিরে আসি রাজ্য কর, সম্পদ সম্ভোগ কর
প্রজাগণে করহ পালন।
সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান অজ্ঞানে করিয়া দান
দুহে এবে করহ মিলন।।

এমন স্পষ্ট করে স্বাধীনতার আকাঙ্খা প্রকাশ করা সেকালে যে কত দুঃসাহসিক ছিল তা সহজেই অনুমেয়। কারণ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হল তার সুদীর্ঘ ইতিহাসেও দেখা যায় যে প্রথমে সুশাসনের জন্য আবেদন নিবেদন এবং পরে স্বায়ত্তশাসনের দাবী নিয়েই গোটা উনিশ শতক এবং বিংশ শতকেরও তিন দশক (১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যন্ত)—এই দীর্ঘকাল কেটে গেছে। তবু একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, রাজনৈতিক চেতনা এবং আগ্রহকে অবিচ্ছিন্নভাবে বহন করার দায়িত্ব পালন করেছে এই জাতীয় কংগ্রেস। অবশ্য জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠারও বেশ কিছুকাল পূর্বে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম নেতা জর্জ টমসন দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে ইংলণ্ড থেকে এদেশে এসে যে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপন করেছিলেন সেখানেই প্রথম একটি সংস্থার মাধ্যমে রাজনৈতিক চেতনা অঙ্কুরিত হয়েছিল যদিও তাকে ঠিক ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বলা যায় না। 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাকালে সদস্যদের সঙ্গে আলোচনাকালে জর্জ টমসন একথা পরিষ্কারভাবেই জানিয়েছিলেন যে ব্রিটিশের বিরোধিতা না করে জাতীয় জীবনে স্বাধিকার অর্জনের চেষ্টাই হল এই সোসাইটির লক্ষ্য। তবু ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এটুকু করারও যে ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল তা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এই সংস্থা প্রথমে যে আশা-আকাঙ্খা এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল, কয়েক বছরের মধ্যেই তার সে কৃতিত্ব ম্লান হয়ে যেতে থাকে। ফলে অধিকতর শক্তিশালী এবং রাজনৈতিক দিক থেকে অধিকতর উপযোগী একটি সংস্থার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ভূম্যধিকারীদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ভূম্যধিকারীদের সমিতি' এবং ১৮৪৩-এর 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি' সংযুক্ত হয়ে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে সংগঠিত হল 'ব্রিটিশ ভারত সভা' যার প্রধান উদ্দেশ্য হল ভারতবর্ষের আইন এবং শাসনব্যবস্থার ত্রুটিসমূহের প্রতিবাদ করে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা করা। এই সভার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, প্রথম থেকেই এই 'ব্রিটিশ ভারত সভা' একটি সর্বভারতীয় রূপ নিতে পেরেছিল কারণ পুণা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতেও অনুরূপ সভা গঠিত হয়েছিল এবং সমিতির বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে পত্রালাপের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে ঘনিষ্ট যোগাযোগও ছিল। এইভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকেই প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক চেতনার ধারাবাহিক বিকাশ হতে থাকে। তবে উনিশ শতকের

মধ্যেই এই রাজনৈতিক চেতনার স্পষ্টতঃ দুটি ভাগ লক্ষ্য করা যাবে। ইংরেজ শাসনের law and order, ইংরেজ সভ্যতার চাকচিক্য এবং বিশেষভাবে ইংরেজি সাহিত্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে রামমোহন থেকে রামগোপাল ঘোষ অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রায় ষাট দশক পর্যন্ত যুগটি ছিল মূলতঃ ইংরেজদের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর মুগ্ধতারই যুগ। এই মুগ্ধতার ফলেই পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে আমাদের যে মানস-সম্মিলন ঘটেছিল তার প্রভাব আমাদের জীবনে এবং সমাজে আংশিকভাবে এবং আমাদের সাহিত্যে প্রায় পরিপূর্ণভাবে অনুভূত হয়ে একটি নূতন যুগের পত্তন করেছিল। আর প্রধানতঃ এই কারণেই অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের এই law and order এর প্রতি আস্থা এবং জীবন, সমাজ ও সাহিত্যে নূতন যুগের আস্বাদ গ্রহণের আন্তরিক ব্যাকুলতার জন্যই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে শিক্ষিত বাঙালী সমাজ খোলাখুলিভাবেই ইংরেজদের সমর্থন করেছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার হরণ করার জন্য যখন একের পর এক আইন পাশ হতে লাগল বিশেষতঃ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে The Indian Whipping Act প্রবর্তিত হল, তখন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী সমাজের প্রথম টনক নড়ল। আর তার ফলে ষাটের দশকের পর থেকে ক্রমশঃ দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর ঘটতে লাগল। ইংরেজ শাসনের প্রতি মুগ্ধতা ক্রমশঃ বিরূপতায় পরিণত হতে লাগল।

অবশ্য সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করলেও তারই প্রায় সমকালে নীল বিপ্লবে নীলকর সাহেব ও বাঙালী কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষে নীলকরদের বিরুদ্ধে বাঙালী কৃষকদের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর সমর্থনের নজির তুলে অনেকে বলেন যে ষাটের দশকের পূর্বেই শিক্ষিত বাঙালীর ইংরেজ বিরোধিতা শুরু হয়েছিল। কিন্তু এ মত যে যথার্থ নয়, তা আমরা অন্ততঃ দুটি কারণ বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারব। প্রথমতঃ নীল আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়, কিছুটা মানবিক উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়তঃ এই সময়ের শিক্ষিত বাঙালীর ইংরেজ বিরোধিতা শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, কেবলমাত্র অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে; সুতরাং এই নীল বিদ্রোহে শিক্ষিত বাঙালীর যত না ছিল নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তার চাইতে অনেক বেশি ছিল ইংরেজ শাসনের law and justice-এর ওপর আস্থা, এবং হয়তো বা সেই আস্থার ওপর ভিত্তি করেই কিছুটা অভিমান। শিক্ষিত বাঙালীর এই চরিত্র লক্ষণ আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে জমিদারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে

বিভিন্ন জায়গায় প্রজা বিক্ষোভের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ মনোভাবে। প্রকৃত পক্ষে দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নীল বিপ্লবে নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের পাশে দাঁড়ালেও জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহে যে কৃষকদের সমর্থন করেননি তার একটা বড় কারণ ছিল এই যে, দেশের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্য তাঁদের কোন আগ্রহ ছিলনা ; এবং সেজন্য তাঁরা ঐ ধরণের কোন কৃষক আন্দোলনের অংশভাগী হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। ফলে ঐ উদ্দেশ্যে এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে দেশে যে গণজাগরণ দেখা দিচ্ছিল সে সম্পর্কে তাঁরা শুধু নিস্পৃহ ছিলেন বললে ভুল হবে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই স্পষ্টতই তার বিরোধী ছিলেন। দেশের বুদ্ধিজীবীদের এই সাধারণ চরিত্রের মধ্যে (এমন কি বিদ্যাসাগরও যেখানে আশ্চর্যরকমভাবে নীরব) হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন বিরল ব্যতিক্রম—(বঙ্কিম চন্দ্র কৃষক স্বার্থে কলম ধরেছেন আরও অনেক পরে, এঁদের জীবনাবসানের পর)। কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর ১০ই শ্রাবণ, ১২৭৭ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' উল্লিখিত হয়, "সাধারণের কল্যাণকর কার্যে তাঁহার বিলক্ষণ যত্ন ছিল। তিনি দয়ার সাগর ও বদান্যতার আকর ছিলেন। এই নিমিত্ত জমিদার হইয়াও প্রজার পক্ষ অবলম্বন করেন।"

এখন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতির প্রচেষ্টায় উনিশ শতকের এই নবজাগরণের (ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকেই যা বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল) মূল্যায়ণ সম্পর্কে মোটামুটি দুটো পদ্ধতি আছে। প্রথমটি শ্রদ্ধার, দ্বিতীয়টি অবজ্ঞার।

উনিশ শতকের নবজাগরণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আচার্য যদুনাথ মন্তব্য করেছেন,—"এটি ছিল প্রকৃতই এক নবজাগরণ, যা ব্যাপকতায়, গভীরতায় এবং বৈপ্লবিকতায় কনস্টান্টিনোপলের পতনের পরবর্তী ইউরোপীয় নবজাগরণকেও অতিক্রম করেছে। বৈদিক যুগে পাখীর দেশ আখ্যা দিয়ে, মহাকাব্যের যুগে পাণ্ডববর্জিত স্থান বলে বর্ণনা করে এবং মুঘল আমলে 'রুটিপূর্ণ নরক' বলে অভিহিত করে বাংলাকে অবজ্ঞার সঙ্গে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে সেই বাংলা এখন ভারতের অন্যান্য অংশের কাছে পথ প্রদর্শক ও আলোকদাতার ভূমিকা গ্রহণ করল।.........এই নূতন বাংলায় উদ্ভূত প্রতিটি শুভ ও মহৎ প্রচেষ্টা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল।.........নতুন সাহিত্য রচনা, ভাষার সংস্কার, সমাজের পুনর্গঠন, রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্মসংস্কার, এমন কি জীবনযাত্রা ও

আচার ব্যবহারের পরিবর্তন বাংলার প্রাদেশিক গণ্ডি অতিক্রম করে ঘূর্ণি হতে বার হয়ে আসা ছোট ঢেউ-এর মত ভারতের সুদূরতম প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।''[১১]

ঊনিশ শতকের এইসব বিভিন্নমুখী কীর্তিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করার একটা ধারা যেমন এখনও অব্যাহত আছে, তেমনি ইদানীং এইসব কীর্তিকে অত্যন্ত লঘুভাবে দেখাবারও একটা চেষ্টা চলেছে।

'ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ' গ্রন্থে বিনয়কৃষ্ণ দত্ত লিখেছেন, ''প্রশ্ন করা যায় বাঙালীর গৌরবময় ঊনবিংশ শতাব্দীর পর বিংশ শতাব্দীতে বাঙালী-জীবন এত ক্লেদাক্ত হয়েছে কেন?······ মনে হয়, ইংরেজি প্রবাদ, 'অ্যাজ ইউ সো, সো ইউ রীপ—যেমন বীজ বুনবে, তেমনি ফল পাবে' এক্ষেত্রে অনেক পরিমাণে কার্যকর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী, বিশেষ কলকাতার বাঙালী ইংরেজকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে। ফলে বিংশ শতাব্দীতে বাঙালী ক্রমশ অন্তঃসারশূন্য চিন্তাহীন বালকের মতো শুদ্ধ অনুকরণজীবী হয়েছে। অর্থাৎ বাঙালীর গৌরব এই অনুকরণজনিত, তার ক্লেদও এই অনুকরণের অশুফল। তার গৌরব অসার, ক্লেদও অসার।''

বলা বাহুল্য এই দুটো পদ্ধতির প্রত্যেকটিই কিছুটা যুক্তিচালিত এবং কিছুটা আবেগতাড়িত। ফলে এই দুটো পদ্ধতির প্রত্যেকটিতেই কিছুটা সত্যে উপনীত হওয়া যায়, কিন্তু কোনটিতেই পূর্ণসত্যে পৌঁছান যায় না। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে—ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ঊনিশ শতকের বাঙালী সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে মধ্যযুগীয় প্রথানুগত্য থেকে বন্ধন মুক্তি ঘটেছিল, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক জীবনে তা ঘটেনি। সুতরাং এই নবজাগরণ ''ব্যাপকতায়, গভীরতায় এবং বৈপ্লবিতার কনস্টান্টিনোপলের পতনের পরবর্তী ইউরোপীয় নবজাগরণকেও অতিক্রম করেছে'' একথা বলাও যেমন অতিশয়োক্তি, তেমনি ''তার গৌরব অসার, ক্লেদও অসার'' একথা বলে বর্তমান জীবনের ক্লেদের ভার ঊনিশ শতকের গৌরবের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টাও যেন 'নেড়ানেড়ীর দলে'র বিকৃত রূপ দেখে শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শের বিচার করার মত কিছুটা বিভ্রান্তিমূলক। তবু একথা অবশ্য সত্য যে, আমাদের জাতীয় জীবনে নবজাগরণের মহিমা এবং পাশ্চাত্ত্যের নির্বিচার অনুকরণের ক্লেদ একই সঙ্গে সঞ্চিত হয়েছে এবং তার কারণও বোধহয় এই যে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর বা কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি যুগ প্রবর্তকেরা নবজাগরণের এই

আলোকধারা নিজেরা যতটা পান করেছেন, ততটা দান করতে পারেননি এবং যতটা তাঁরা দান করেছেন তাও সামান্য কিছু সংখ্যক সংস্কৃতিবান উচ্চবিত্ত এবং প্রধানতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী সম্প্রদায়ের গণ্ডী অতিক্রম করে গণমুখী হতে পারেনি। এইখানেই ঊনিশ শতকের নবজাগরণের সীমাবদ্ধতা। এই নবজাগরণ গণজাগরণে পরিণত হয়নি—ঊনিশ শতকে হয়নি, আজও হয়নি। গণজাগরণ আজও ভবিষ্যতের জঠরে দিন গুণে চলেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার ও কালীপ্রসন্ন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের মত জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারেরও সেকালে যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল এবং সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি সব দিক থেকেই যে সিংহ পরিবারের একটি পারিবারিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল সেদিকে এখনও পর্যন্ত আমাদের যথাযোগ্য দৃষ্টি পড়েনি। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে মাত্র তের বছর বয়সে স্ফুরিত হয়ে (বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা, ১৮৫৩) ত্রিশ-বছর বয়সে যা অস্তমিত হল, কালীপ্রসন্নের (১৮৪০-১৮৭০) সেই অদ্ভুত প্রতিভার গঠন ও বিকাশে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের দান কতখানি তা আজ নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া ছ'বছর বয়সে পিতৃহীন হবার পর কালী প্রসন্নের বিদ্যালাভ ও সংস্কৃতি চর্চার মূলে তাঁর অভিভাবক বিদ্বান বিচক্ষণ হরচন্দ্র ঘোষের প্রভাবও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত না হলে কালীপ্রসন্ন সম্পর্কে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট থাকতে বাধ্য ; আর সত্যের খাতিরে বলতেই হয় যে এবিষয়ে এখনও পর্যন্ত বিশেষ কোন আলোকপাতই হয়নি। তাই প্রথমেই কালীপ্রসন্নের এই পারিবারিক পটভূমি ও হরচন্দ্র ঘোষের সুদক্ষ অভিভাবকত্বের ওপর আমাদের সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে হবে আর সেই পটভূমিতে রেখে বিচার করলেই বোঝা যাবে কালীপ্রসন্ন এক বিত্তশালী জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেও কেন তাঁর সমকালীন সমাজের বিত্তবানদের কপটতা ও কদাচারকে এমন তীব্র মর্মভেদী ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছিলেন এবং তৎকালীন নগর-কলকাতায় যখন বাইনাচ, বাচখেলা, বেশ্যা ও বুলবুলির সংখ্যার উপরেই অধিকাংশ বিত্তবান জমিদারদের গৌরব নির্ভর করত, তখন কালীপ্রসন্ন এমন একটি রুচিশীল, সংস্কৃতি-সম্পন্ন, সমাজ ও সাহিত্যের উন্নতি কামনায় তদ্গতপ্রাণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রতিভার সেই অপরিপক্ক অবস্থাতেই সমাজ ও সাহিত্যে তাঁর কৃতিত্ব বিচার ক'রে আজ অনেকেই মনে করেন যে, অল্পবয়সে তাঁর অকালমৃত্যু না হলে তিনি হয়ত বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর-মাইকেলের মতোই এক দিকপাল ব্যক্তি হতে পারতেন—সেদিকে দৃষ্টি রেখে বিস্তৃততরভাবে তাঁর সমগ্র জীবনের ও আলোচনা প্রয়োজন।

সিংহ পরিবারের আলোকচিত্র



বিজয় (কালীপ্রসন্নের দত্তক পুত্র), যোগেশ, সুবোধ, দুর্গা, ভোনা, ক্ষুদি, পূর্ণ, নলিনী, জ্যোতিষ, হাবুল, শরৎ, সুশীল, বিনোদিনী, হেম, পদ্মমণি, ত্রৈলোক্যমোহিনী (কালীপ্রসন্নের জননী), বুড়ি, ছটি, কিরণ, নরেশ, প্রভাস, আভাস, মিনু, বিভাবতী বিভাস, বিপ্রেন্দ্র।

চিত্র—৫



শান্তিরাম সিংহ



জয়কৃষ্ণ সিংহ



নন্দলাল সিংহ



কৈশোরে কালীপ্রসন্ন

চিত্র—৪

কালীপ্রসন্নের পারিবারিক পটভূমি প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধকচরিতমালায় 'কালীপ্রসন্নসিংহ' খণ্ডে, এবং মন্মথনাথ ঘোষের 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' গ্রন্থে কালীপ্রসন্নের প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ সম্বন্ধে সামান্য দু-একটি তথ্য পরিবেশিত হলেও সিংহ পরিবারের তৎপূর্ববর্তী বিষয় এবং শান্তিরাম সিংহ ও তৎপরবর্তীদের বিশদ পারিবারিক বিবরণ আমাদের এতদিন অজ্ঞাতই ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন পুস্তক সংগ্রহ বিভাগের একাংশে (এখনও পুস্তকগুলি তালিকাভুক্ত ও সংখ্যাবদ্ধ হয়নি) শ্রীবসন্তকুমার বসু প্রণীত 'কায়স্থ পরিচয়' নামে (কলিকাতা খণ্ড, ১ম ভাগ—প্রথম সংস্করণ—সন ১৩২৮ সাল, ইং ১৯২১ খৃষ্টাব্দ) একখানি গ্রন্থ অপ্রত্যাশিতভাবে চোখে পড়ল; তাতে জোড়াসাঁকো সিংহ বংশের যে বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া গেল তা থেকে প্রথমেই প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার করি। "জোড়াসাঁকোর সিংহ বংশ একটি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ। ইঁহারা কাশ্যপ গোত্রীয় আনুলিয়া সমাজভুক্ত, ইঁহাদের আদিনিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত বাক্‌সা গ্রাম। এই বংশোদ্ভব মহেন্দ্রনাথ সিংহ হইতে এই বংশের বংশক্রম আরম্ভ হয়। মহেন্দ্রনাথের এক পুত্র দেবীদাস। দেবীদাসের এক পুত্র মধুসূদন। মধুসূদনের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ রামকিশোর, কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ।

মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকিশোর দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ রামরাম, কনিষ্ঠ শান্তিরাম। রামকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামরামের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ নরনারায়ণ, মধ্যম বোধনারায়ণ, কনিষ্ঠ গঙ্গানারায়ণ ইঁহাদের বংশধরগণ বাক্‌সা গ্রামে বাস করেন।

রামকিশোরের কনিষ্ঠ পুত্র শান্তিরাম একজন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। ইনি স্যার টমাস রমবোল্ড ও মিস্টার মিডলটনের অধীনে মুকসুদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) ও পাটনার নবাবের দেওয়ান ছিলেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর, ইনি জোড়াসাঁকো পল্লীতে আসিয়া বসবাস করেন। এই শান্তিরামই জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ সিংহবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

শান্তিরাম স্বধর্মপরায়ণ ক্রিয়াবান ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। শান্তিরাম স্বকীয় ক্ষমতায় যেমন বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, সেইরূপ দান, প্রতিষ্ঠা, অতিথি সৎকার ও দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপ করিয়া তদানীন্তন সমাজে একজন প্রতিষ্ঠাবান অতিথিসৎকারশীল বদান্য ব্যক্তি ও সাধারণের প্রীতিভাজন নিষ্ঠাবান হিন্দু বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার তদাগ্রগণ্য

মহানুভব ব্যক্তিগণ ইঁহাকে বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করিতেন ও প্রতিনিয়তই ইঁহার ভবনে আসিয়া ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। শান্তিরাম যেমন স্বজাতীয় সমাজে, সেইরূপ নবশাখ সমাজেও যথেষ্ট সমাদর ও সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। নবশাখ সমাজের প্রধানগণ ইঁহাকে দলপতি বলিয়া মান্য করিতেন এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে ইঁহাকে সম্মান প্রদান ও ইঁহার অনুমতিগ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্যে ব্রতী হইতেন। এই সময় হইতেই ইঁহার বংশের কেহ কোন সামাজিক কার্য্যের সভায় উপস্থিত হইলে অগ্রে তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য ও কপালে চন্দনের ফোঁটা প্রদান করিয়া থাকে। শান্তিরাম দুইটি অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রাখিয়া শান্তিধামে গমন করেন জ্যেষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ কনিষ্ঠ জয়কৃষ্ণ।"

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সম্পাদিত পূর্ণচন্দ্র সিংহ স্মৃতিতর্পণ' গ্রন্থে (কলিকাতা, ১৩৫৭) দেখা যায় শান্তিরাম সিংহের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ মধ্যম শ্রীকৃষ্ণ এবং কনিষ্ঠ জয়কৃষ্ণ। সম্ভবতঃ তথ্যটি প্রমাদপূর্ণ। মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— 'শান্তিরামের দুই পুত্র– প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ।" শ্রীকৃষ্ণ যে শান্তিরামের পুত্র নন, শান্তিরামের পৌত্র (শান্তিরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণ কৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র)—এই তথ্য 'কায়স্থ পরিচয়' গ্রন্থেও একটু পরেই উল্লিখিত হয়েছে।

এবার দুটি কারণে (প্রথমতঃ বসন্তকুমার বসুর 'কায়স্থ পরিচয়' গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং দ্বিতীয়তঃ কালীপ্রসন্নের পূর্বপুরুষের বিস্তৃত পরিচয় এ পর্যন্ত অজ্ঞাত থাকায় শান্তিরামের পুত্র পৌত্রাদি সম্বন্ধে কায়স্থ পরিচয়' থেকে আরও কিছু তথ্য উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি। "শান্তিরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণকৃষ্ণ স্বধর্মনিষ্ঠ সহৃদয় ও ক্রিয়াশীল ব্যক্তি ছিলেন। ইনি পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক ক্রিয়াকলাপাদি করিয়া বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইনি চার পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠ রাজকৃষ্ণ মধ্যম নবকৃষ্ণ, তৃতীয় গোপালকৃষ্ণ, কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ।

প্রাণকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকৃষ্ণ দয়াদাক্ষিণ্য পরোপকার ও দানধর্ম্মের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। পরোপকার ইনি জীবনের কর্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। পরহিতার্থে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া ইনি শেষ জীবনে নিঃস্ব হইয়া পড়েন, কিন্তু তথাপি ইঁহার দানশীলতার হ্রাস হয় নাই। ইঁহার আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিলে, ইঁহার আত্মীয়গণ ইঁহাকে সাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। একদা এক দূর দেশবাসী ব্রাহ্মণ দায়গ্রস্ত হইয়া ইঁহার

নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসেন. কিন্তু ইঁহার সাক্ষাৎ না পাওয়ায়, তিনি ইঁহার ভবনের সম্মুখস্থ রাজবর্ত্মে দাঁড়াইয়া স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক আক্ষেপ করিতেছিলেন। ঐ সময়ে রাজকৃষ্ণ দ্বিতলের একটি কক্ষে আহ্নিক সমাপন করিয়া বস্ত্র পরিবর্তন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণের আক্ষেপ শ্রবণ করিয়া বাতায়ন হইতে ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া. পূজার রৌপ্যময় বাসনগুলি দিয়া বলিলেন. —'ঠাকুর এইগুলি বিক্রয় করিয়া তোমার অভাব মোচন করগে, আর আমার কিছু দিবার ক্ষমতা নাই।' ইহাই রাজকৃষ্ণের স্বভাবসিদ্ধ দানশীলতার বিশেষত্বের পরিচায়ক। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইনি দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ মহেশচন্দ্র কনিষ্ঠ হরিশচন্দ্র।

রাজকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র মহেশচন্দ্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সহৃদয় ও ক্রিয়াশীল ব্যক্তি ছিলেন। ইনি প্রথমে দর্জ্জিপাড়ার বসুবংশে বিবাহ করেন। ইঁহার প্রথমা পত্নী লোকান্তরিত হওয়ায় ইনি উলার প্রসিদ্ধ মুস্তাফী বংশের ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তাফীর কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইনি এক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইঁহার পুত্রের নাম বলাইচাঁদ।

বলাইচাঁদের তৃতীয় পুত্র বিজয়চন্দ্রকে কালীপ্রসন্নের দ্বিতীয়া সংধর্ম্মিনী দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শান্তিরামের কনিষ্ঠ পুত্র জয়কৃষ্ণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সহৃদয় ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। দেশহিতকর সকল সদনুষ্ঠানের ইনি একজন অগ্রণী ছিলেন। ইঁহার অর্থানুকূল্যে দেশের অনেক সদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের ইনি একজন উদ্যোগী এবং উহার অন্যতম ডাইরেক্টার ছিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইনি এক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইঁহার পুত্রের নাম নন্দলাল।

জয়কৃষ্ণের পুত্র নন্দলাল সাতুসিংহ নামে সুপরিচিত ছিলেন। ইনি সাহিত্যানুরাগী সঙ্গীতপ্রিয় সৌখিন ও মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। ইনি আন্দুল নিবাসী মথুরানাথ মল্লিকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইনি এক পুত্র রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন। ইঁহার পুত্রের নাম মহাত্মা কালীপ্রসন্ন।"

এখন শান্তিরাম সিংহ, জয়কৃষ্ণ সিংহ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এবং নন্দলাল সিংহ, সম্বন্ধে 'কায়স্থ পরিচয়' ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে

কালীপ্রসন্নের প্রতিভার গঠন ও বিকাশে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের দান কতখানি তা নির্ণয় করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র হওয়ার সৌভাগ্য যেমন রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশে একটি বিশেষ সূত্র যোজনা করেছিল, তেমনি সিংহ পরিবারের পারিবারিক ঐতিহ্যও কালীপ্রসন্নের প্রতিভার গঠন প্রণালীতে যে একটি অত্যন্ত মূল্যবান উপাদানরূপে কাজ করেছিল সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

আমরা পূর্বেই দেখেছি, কালীপ্রসন্নের প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ প্রিন্স দ্বারকানাথের মত স্বীয় ক্ষমতায় শুধু যে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন তাই নয়, তিনি স্বধর্মপরায়ণ, ক্রিয়াবান ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সময় থেকেই তাঁর বংশের কেহ কোন সামাজিক কাজের সভায় উপস্থিত হলে "অগ্রে তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য ও কপালে চন্দনের ফোঁটা প্রদান" করা হত। এইভাবে শান্তিরাম কলকাতার হিন্দুসমাজে অতি উচ্চস্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি নিজে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় ধর্মকর্মে নিরত থাকতেন। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, দেওয়ানি থেকে অবসর নেওয়ার পরেই তিনি জোড়াসাঁকোতে বসতি স্থাপন করেন। সুতরাং তখন তাঁর অধিকাংশ সময় ধর্মকর্মে কাটানোর জন্য বিষয়কর্ম আর বাধা হয়ে থাকেনি। ঐ সময় রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতামহ রামজয় বিদ্যাভূষণ তাঁর বাসভবনে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১] শান্তিরাম সম্পর্কে আরও একটি তথ্য আমরা জানতে পারি যে, তিনি কাশীধামে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[২] তাছাড়া শান্তিরাম যে শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্রালোচনায় ব্যস্ত থাকতেন, এমনকি মূল সংস্কৃত মহাভারতও পাঠ করতেন তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কালীপ্রসন্নের মহাভারত প্রকাশিত হওয়ার পর কৃষ্ণদাস পাল 'হিন্দুপেট্রিয়টে' যে সমালোচনা লেখেন তাতে দেখা যায়—"He (Kaliprosonno Sing) had also an old text in his house, which his great grandfather Dewan Santiram Sing had brought from Benares." শান্তিরামের এই শাস্ত্রচর্চা ও শাস্ত্রানুরাগ যে প্রপৌত্র কালীপ্রসন্নের চরিত্রেও সংক্রামিত হয়েছিল এমন অনুমান বোধহয় অসঙ্গত নয়।

শান্তিরামের কনিষ্ঠ পুত্র (কালীপ্রসন্নের পিতামহ) জয়কৃষ্ণ সিংহ একজন অকৃত্রিম শিক্ষানুরাগী ছিলেন এবং দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য

প্রভৃত অর্থ ব্যয় করেন। তিনি হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাইরেক্টর ছিলেন এবং হিন্দুকলেজের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সাহায্যও করেন। এ জন্য হিন্দুকলেজের (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজের) পুস্তকাগারে তাঁর নাম একটি প্রস্তরফলকে খোদিত হয়। আমাদের মনে হয় কালীপ্রসন্নের চরিত্রে যে অসামান্য শিল্পানুরাগ দেখা যায় তা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়; পূর্বপুরুষাগত পারিবারিক ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরসাধক রূপেই তাঁর চরিত্রে এই গুণের বিকাশ হয়েছিল।

শান্তিরামের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রাণকৃষ্ণের পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজকৃষ্ণ এবং কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন। রাজকৃষ্ণ সিংহ সতীদাহ প্রথা নিবারণ আন্দোলনে রামমোহনের সক্রিয় সংকর্মী ছিলেন। এ সম্বন্ধে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, "রামমোহন রায়ের দলের প্রধান টাকীর কালীনাথ রায়, (মুন্সী) মথুরানাথ মল্লিক, রাজকৃষ্ণ সিংহ, তেলিনী পাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি।" তাছাড়া রাজকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই দেখেছি যে দানশীলতা ও পরোপকারের জন্য শেষজীবনে যখন তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন, তখনও এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের দায়মোচনের জন্য ঠাকুরপুজোর রুপোর বাসনগুলি পর্যন্ত দান করে বলেছেন, "ঠাকুর, এইগুলি বিক্রয় করিয়া তোমার অভাব মোচন করগে, আর আমার কিছু দিবার ক্ষমতা নাই।" এখানে শুধু রাজকৃষ্ণের দানশীলতা নয়, সেকালেও তাঁর এমন একটি বলিষ্ঠ সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায় যা একালেও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। দরিদ্রের অভাব মোচনের জন্য ঠাকুরের পুজোর বাসন বিলিয়ে দেওয়া যে ধর্মের কোন হানি হয় না, ধর্মের এই প্রকৃত মর্মজ্ঞতা তাঁর চরিত্রে একটি মহনীয় উজ্জ্বলতা দান করে। সিংহ পরিবারের এই দানশীলতার ঐতিহ্য পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্নের চরিত্রেও যে কিভাবে আশ্রয় করেছিল যথাস্থানে আমরা তার আলোচনা করব।

প্রাণকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ সিংহ সম্বন্ধেও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইনি যে শুধু হিন্দুকলেজের কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন তাই নয়, ডেভিড হেয়ার এবং এইচ. এইচ. উইলসনের সঙ্গে একত্রে দেশের শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারে বিশিষ্ট সহায়তা করেছিলেন। তাছাড়া রামকমল সেনের নেতৃত্বে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যখন নবযুগের নূতন বাংলার প্রথম

স্থপতি ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বরখাস্ত করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ডিরোজিওর পক্ষাবলম্বনে তাঁর বিশেষ সহায়তা করেন। ডিরোজিও তাঁর ২১।৪।১৮৩১ তারিখের পদত্যাগ পত্রে একথার উল্লেখ করে বলেন—"I must also avail of this opportunity of recording my thanks to Mr. Wilson, Mr Hare and Babu Sree Kissen Sing for the Part which I am informed they respectively took in your Preceedings on Saturday last."৩(i) এখানে একথা স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কালীপ্রসন্নের চরিত্রেও পিতৃব্যের এই ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনচিত্ততার গুণটি বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হলে ১৭ই জুন মেডিকেল কলেজ হলে এক সভায় ডেভিড হেয়ারের স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি মর্মরমূর্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে সমিতি গঠিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তাছাড়া 'ডেভিড হেয়ার স্মৃতিসভা' বহু বৎসর ধরে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়ীতেই অনুষ্ঠিত হত। [পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন সিংহও নিজ বাড়ীতে কয়েকবার এই সাম্বৎসরিক সভার আয়োজন করেছিলেন। হেয়ারের মৃত্যুর পর প্রতিবছর জুন মাসে এই সভার অধিবেশন হত। এই সভায় কালীপ্রসন্ন নিজেও কয়েকবার প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন।৩(ii)]

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডের সমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম নেতা জর্জ টমসন দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে এদেশে এলে প্রথমে হিন্দু কলেজে ও পরে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের বাড়ীতে ও চন্দ্রশেখর দেবের বাড়ীতে সভা বসে। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ীতে এই সভা প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে আরম্ভ হয়। একথা আজ অবশ্যস্বীকার্য যে প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজবিরোধ ও ইংরেজবিদ্বেষ এই সভাগুলির লক্ষ্য না হলেও যে দেশাত্মবোধ ও আত্মচেতনা শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে ধীরে ধীরে উন্মেষিত হচ্ছিল, এই সভাগুলি সেই চেতনাকেই আরও সজাগ করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ সিংহের চরিত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নাটক ও নাট্য শালা সম্পর্কে তাঁর সবিশেষ উৎসাহ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নবজাগরণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালী শুধু ইংরেজদের থিয়েটারে ইংরেজদের অভিনয় দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেনি; তারা অভাব অনুভব করেছিল নিজস্ব নাট্য-শালার। বস্তুতঃ এই অভাববোধও অবচেতনভাবে জাতীয়তাবোধেরই কিছুটা তির্যক

প্রকাশ। যাই হোক্, এই চেতনারই ক্রমপরিণতিতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানবাড়ীতে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখেরা সম্মিলিত হয়ে হিন্দু থিয়েটার স্থাপন করেন, এই নাট্যশালাই বাঙালীর উদ্যোগে স্থাপিত প্রথম নাট্যশালা। এই নাট্যশালা স্থাপনের সংবাদে বিশেষ উৎসাহিত হয়ে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'সমাচার দর্পণে' লেখা হয়—"কিয়ৎকালাবধি কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয়দের মধ্যে এক নর্ত্তনাগার গ্রন্থন নিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে। তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে এতদ্দেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরদের গত রবিবারের এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে আনুষ্ঠানিক কর্ম্মসকল নির্ব্বাহকরণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুতবাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুতবাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুতবাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুতবাবু গঙ্গানারায়ণ সেন, শ্রীযুতবাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুতবাবু হরচন্দ্র ঘোষ। ঐ নর্ত্তনশালা ইংলণ্ডীয়েরদের রীত্যানুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইংলণ্ডীয় ভাষায়।"

শুধু ইংরেজী থিয়েটার নয়, দেশীয় যাত্রার উন্নত সংস্করণের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণ সিংহের আগ্রহ ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' লিখেছেন, "১৮৪৯ সনের মার্চ মাসে একটি নূতন ধরণের যাত্রার অভিনয় হয়। ইহার নাম নন্দবিদায় যাত্রা।"

১৮৪৯ এর ১৪ই এপ্রিল তারিখে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়ীতে এই 'নন্দবিদায়' যাত্রার তৃতীয় অভিনয় হয়। ১৭ই এপ্রিল, ১৮৪৯ এর 'সম্বাদ ভাস্করে' এ সম্বন্ধে লেখা হয় "এতদ্দেশে যে সকল যাত্রা হইয়া থাকে এ যাত্রা সেরূপ যাত্রা নহে ইহা নূতন প্রকার।" লক্ষণীয়, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এই যাত্রাভিনয়ের সময় কালীপ্রসন্নের বয়স ৯ বছর; ফলে কালীপ্রসন্নের ১৪ বছর বয়স থেকে নাটক রচনা এবং ১৭ বছর বয়স থেকে নাটক অভিনয়ের ব্যাপারে আগ্রহ দেখানোর মধ্যে পিতৃব্যের বাড়ীতে এই যাত্রাভিনয়ের একটা প্রভাব থাকার সম্ভাবনাও বোধ হয় কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

'কায়স্থ পরিচয়' থেকে কালীপ্রসন্নের পিতা নন্দলাল সিংহ বা সাতুসিংহের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়—"ইনি সাহিত্যানুরাগী সঙ্গীতপ্রিয় সৌখিন ও মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন।" বলাবাহুল্য সৌখিনতা ছাড়া পিতার সব কটি গুণই কালীপ্রসন্ন পিতৃসূত্রে লাভ করেছিলেন।

কালীপ্রসন্ন যে সৌখিনতার পক্ষপাতী ছিলেন না সে বিষয়ে ১২৭৭ সালের ১০ই শ্রাবণ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত একটি সংবাদ পাঠে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি। "তিনি কপটতা ও আড়ম্বরের অতিশয় বিপক্ষ ছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে আড়ম্বরের লেশমাত্র ছিল না।" কালীপ্রসন্নের সাহিত্যানুরাগ এবং দানশীলতার বিস্তৃত পরিচয় যথাস্থানে দেওয়া হবে। এখানে তাঁর সঙ্গীতানুরাগ সম্বন্ধে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য উদ্ধার করি। পৌষ-মাঘ সংখ্যার 'পুণ্য' পত্রিকায় সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর '৺কালীপ্রসন্ন সিংহ' প্রবন্ধে লিখেছেন—"৺কালী সিংহ মহাশয়ের তাম্বুরু নামক কলাবতী বীণার এরূপ কাগজের তুম্বী নির্মাণের চেষ্টার জন্য সমস্ত সঙ্গীতসমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।" এই প্রবন্ধটি থেকে আরও জানা যায়—"৺কালী সিংহ মহাশয়ের প্রাসাদসম বাড়ীতে সঙ্গীতের উন্নতির জন্য, সঙ্গীত চর্চার জন্য এবং তজ্জনিত আনন্দলাভের জন্য একটি সঙ্গীত সমাজ নামে বৃহতী সভা স্থাপিত হয়।"

সুতরাং কালীপ্রসন্নের প্রতিভার বিকাশ ও বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে তাঁর পারিবারিক পটভূমির এই গুরুত্বের কথা কখনোই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

কালীপ্রসন্নের জন্ম :—

এবার শুরু করি কালীপ্রসন্নের নিজের কথা। কালীপ্রসন্নের জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে মন্মথনাথ ঘোষ বলেছেন' "মহাত্মা কালীপ্রসন্নের জন্ম বা মৃত্যুদিবসও বঙ্গসাহিত্যের কোন ইতিহাসলেখক কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয় নাই, তাহা জানিবার জন্য কেহ কখনও চেষ্টা করেন নাই।" তবে 'পুরাতন প্রসঙ্গে' আচার্য কৃষ্ণকমল বলেছেন, "বোধ হয়, আমি তাঁহার সমবয়স্ক ছিলাম।" সেইসূত্রে মন্মথনাথ ঘোষ অনুমান করেছেন, কালীপ্রসন্ন ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডের সব কটি সংস্করণে (৭ম সং পৃঃ ৩২) কালীপ্রসন্নের আয়ুষ্কাল উল্লেখ করেছেন ১৮৩০—৭০। ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন—"জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ধনবান ও সংস্কৃতি পোষক সিংহ পরিবারে কালীপ্রসন্নের জন্ম হয় সম্ভবতঃ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে।" কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর

সাহিত্যসাধক চরিতমালায় উল্লেখ করেছেন, কালীপ্রসন্নের জন্ম হয় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে।

কালীপ্রসন্নের জন্ম যে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সে সম্বন্ধে আজ আর সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। কালীপ্রসন্নের জন্ম উপলক্ষ্যে তাঁর পিতা নন্দলাল সিংহ সমারোহের সঙ্গে যে উৎসবের আয়োজন করেছিলেন, 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত তার বিবরণটি ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখের ক্যালকাটা কুরীয়ার পত্রে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। " Last night a series of nautches Commenced at the residence of Baboo Nundolaul Sing, at Jorasanko, in celebration of the birth of his first child, a boy, which took place lately. There were a large assamblage of native gentlemen and professors of sanskrit present on the occasion ; The former were highly gratified with the musical performances of the nautch-girls, and the latter with the valuable presents of Cashmere shawls etc.—Prabhakar."

সুতরাং কালীপ্রসন্নের জন্মসাল, জন্মতারিখ এবং কালীপ্রসন্নের জন্মের সময় তাঁর পিতা সন্তানোৎপাদনে অক্ষম ছিলেন কিনা এসম্বন্ধে সম্প্রতি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' উপন্যাসে নবীন কুমার ছদ্মনামের আড়ালে যে রহস্যজাল সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে, তা যে কতখানি অলীক কল্পনা প্রসূত তা সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য এই যে, কালীপ্রসন্নের জন্মের সময় তাঁর পিতা সম্পূর্ণ সুস্থ জীবন যাপন করেছেন এবং তাঁর যৌন অক্ষমতার জন্য কালীপ্রসন্নের পূর্বে তিনি কোন দত্তক পুত্রও গ্রহণ করেন নি। কালীপ্রসন্নের বয়স যখন ছ'বছরের কিছু বেশি, তখন ৬ই এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে কালীপ্রসন্নের পিতা নন্দলাল সিংহের মৃত্যু হয়।"[৪]

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কৌতুককর কথা বলি। 'সেই সময় উপন্যাসে গঙ্গানারায়ণকে দেখানো হয়েছে নন্দলাল সিংহের দত্তক পুত্র অর্থাৎ কালীপ্রসন্নের (নবীনকুমারের) দাদা হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে এই গঙ্গানারায়ণ কালীপ্রসন্নের দাদা নয়, দাদু (পিতামহ)—শান্তিরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামরামের তিন পুত্র নরনারায়ণ, বোধ নারায়ণ ও গঙ্গা-

নারায়ণের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল গঙ্গানারায়ণ। সুতরাং গঙ্গানারায়ণ নন্দলাল (রামকমল) সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র বা দত্তক পুত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন নন্দলাল সিংহের পিতৃব্য এবং তিনি নন্দলাল সিংহের নিকট জোড়াসাঁকোতে প্রতিপালিত হননি, তাঁর অপর দুই ভাই নরনারায়ণ ও বোধনারায়ণের সঙ্গে হুগলী জেলার বাক্‌সা গ্রামে বাস করতেন (বসন্তকুমার বসু প্রণীত 'কায়স্থ পরিচয় কলিকাতা' খন্ড ১ম সং ১৩২৮ সাল অবলম্বনে 'পরিশিষ্ট' অংশে জোড়াসাঁকোর সিংহ বংশের আমি যে প্রামাণ্য বংশপঞ্জী সংযোজন করেছি, তা দেখলেই প্রকৃত সত্য নির্ণীত হবে।)

তাছাড়া কালীপ্রসন্নের পিতার মৃত্যুর পর তাঁর অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষের ছায়ায় যে বিধুশেখর মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র কল্পিত হয়েছে, তা যেমন অনৈতিহাসিক, তেমনি হরচন্দ্র ঘোষের চরিত্রের সঙ্গেও ঐ কল্পিত বিধুশেখর মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রগত কোন মিলও নেই। একথা ঠিক যে ঐতিহাসিক উপন্যাসে বা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে কল্পনার স্থান আছে, কিন্তু তা যে কোন সাধারণ উপন্যাসের মত অবাধ ও যথেচ্ছ-বিহারী হতে পারে না। কেবলমাত্র কোন ঐতিহাসিক সত্যকে বর্ণবহুল করার জন্য, কিংবা যেখানে কোন ঐতিহাসিক তথ্য নেই, সেখানে অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে একটি ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কিছু কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু সে কল্পনা কখনো এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যকে বিকৃত করতে পারে না। যদি তা হয়, তবে তা আর যাই হোক, ঐতিহাসিক উপন্যাস বা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস হয় না। সুতরাং দিবাকর, রাইমোহন, থাকোমনি প্রভৃতি চরিত্রে ঔপন্যাসিকের কল্পনার স্বাধীনতা থাকলেও কালীপ্রসন্নের মত ঐতিহাসিক চরিত্রে এরকম গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের বিকৃতি ঘটলে তা সাহিত্যিক অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। (অবশ্য আমার মনে হয়, এ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য না জানার ফলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ঘটেছে।)

যাই হোক্, কালীপ্রসন্নের পিতা নন্দলাল সিংহের মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্নের বয়স যখন ছ' বছর, তখন তাঁর প্রতিবেশী হরচন্দ্র ঘোষ কালীপ্রসন্নের অভিভাবক ও বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। এই হরচন্দ্র ঘোষ নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষ (জন্ম ১৮১৭, মৃত্যু ১৮৮৪) নন, বিচারক হরচন্দ্র ঘোষ (জন্ম ১৮০৮, মৃত্যু ১৮৬৮)। 'সেই সময়' উপন্যাসে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হরচন্দ্র ঘোষের ছায়াবলম্বনে বিধুশেখর মুখোপাধ্যায়ের কাল্পনিক চরিত্র আঁকতে গিয়ে তাঁকে 'দক্ষ উকিল' হিসাবে উল্লেখ করলেও তাঁকে বিচারক হিসাবে দেখাননি এবং সম্ভবতঃ ভুলক্রমে বিচারক হরচন্দ্র ঘোষের আয়ুষ্কালের স্থলে নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষের আয়ুষ্কালকেই গ্রহণ করেছেন, কারণ যদিও প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসন্নের অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর দুবছর পূর্বে লোকান্তরিত হয়েছেন, তথাপি 'সেই সময়' উপন্যাসের ২য় খণ্ডে দেখি বিধুশেখর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের মৃত্যুদৃশ্য দেখছেন। কিন্তু কালীপ্রসন্নের অভিভাবক বিচারক হরচন্দ্র ঘোষ যে কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পূর্বেই লোকান্তরিত হয়েছেন সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়; কারণ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর সময় 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত একটি নিবন্ধে জানা যায়, "মৃত জজবাবু হরচন্দ্র ঘোষ তাঁহার সম্পত্তির রক্ষক হইয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন তিনি পিতৃ-বিয়োগের কষ্ট বড় জানিতে পারেন নাই। হরচন্দ্রের যত্নে তাঁহার সম্পত্তির অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল।"

শুধু সম্পত্তি বৃদ্ধি নয়, হরচন্দ্রের সুযোগ্য তত্ত্বাবধান, বালক কালীপ্রসন্নের শিক্ষালাভ ও সেই বালক-বয়সে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশের ক্ষেত্রে যে যথেষ্ট অনুকূল হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "তেরো চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি (কালীপ্রসন্ন) স্বগৃহে Debating Club ও বিদ্যোৎসাহিনী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহার পিছনে সকলেই অলৌকিক বালকপ্রতিভা লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার যিনি অভিভাবক ছিলেন সেই বিদ্বান ও বিচক্ষণ হরচন্দ্র ঘোষের প্রভাব কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। বালক ও কিশোর কালীপ্রসন্নের বিদ্যালাভ ও সংস্কৃতিচর্চার মূলে হরচন্দ্র ঘোষের হাত অনেকখানি ছিল এই ধারণা অপরিহার্য।" কালীপ্রসন্নের জীবনী প্রসঙ্গে কোথাও এই হরচন্দ্র ঘোষ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না থাকলেও 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী হরচন্দ্র ঘোষের যে পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে কয়েকটি বিশেষ তথ্যের উপর আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যাতে সহজেই বোঝা যাবে তাঁর চরিত্রবল কিরূপ ছিল এবং কালীপ্রসন্নের জীবন গঠনে ও প্রতিভার বিকাশে তাঁর অভিভাবকত্ব কতদূর

কার্যকরী হয়েছিল ঃ—ইনি ডিরোজিও বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল এবং রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহৃদগণের মধ্যে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন। চিরদিনই তাঁর প্রকৃতিতে একপ্রকার ধীরচিত্ততা ও স্থিতিশীলতা ছিল। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধিও কার্যদক্ষতার জন্য গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। যে সময়ে লোকে উৎকোচ গ্রহণকে পাপ বলে মনে করত না, সেই সময়ে বাঁকুড়ার মুন্সেফ হয়ে হরচন্দ্র এমন ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন যে সেখানে তাঁর একশ' টাকা বেতনে কুলোতনা বলে কলকাতা থেকে তার খরচের জন্য মধ্যে মধ্যে টাকা নিতে হত। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে শিক্ষা ভিন্ন এদেশের দুর্গতি দূর হবার উপায় নেই; সেজন্য তিনি নিজ ব্যয়ে একটি ইংরাজী স্কুলও স্থাপন করেছিলেন। কলকাতায় অবস্থান কালে তিনি দেশের সর্ববিধ উন্নতির সহায়তা করতেন। মহাত্মা বেথুন যখন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি তাতে ও বিশেষভাবে সহায়তা করেন। তাছাড়া ১৮৪২ সালের ১লা জুন ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হলে ঐ সালের ১৭ই জুন ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি মর্মরমূর্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে কমিটি গঠিত হয় তাতে কালীপ্রসন্নের পিতা নন্দলাল সিংহ, পিতৃব্য শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সঙ্গে হরচন্দ্র ঘোষেরও নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। পরে তিনি ঐ কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে ঐ কাজ সমাধা করেন।

এই হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হলে (৩রা ডিসেম্বর, ১৮৬৮) ২৩শে অগ্রহায়ণ ১২৭৫ তারিখে 'সোম প্রকাশ' পত্রে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয় ঃ—

"বাবু হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু।

আমাদের দেশের গণণীয় লোকগুলি ক্রমে ক্রমে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। বঙ্গদেশ এক একটি করিয়া ভূষণহারা হইতেছেন। কলিকাতার ছোট আদালতের তৃতীয় জজবাবু হরচন্দ্র ঘোষ বৃহস্পতিবার রাত্রি দশটার সময় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে মুন্সেফ হন। তৎপরে নানা কাজ করিয়া কলিকাতায় দ্বিতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও তৎপরে ছোট আদালতে জজ হইয়াছিলেন। সকল বিষয়েই সতত তাঁহার সুখ্যাতি শুনা যাইত। কি ইউরোপীয় কি এদেশীয় সকলেই তাঁহার সদ্‌বিচারে সন্তুষ্ট হইতেন। এ পর্যন্ত তাঁহার চরিত্র দোষ আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয় নাই।

সকলের সহিত অমায়িক ব্যবহার, শিষ্টাচার, অতিথি সংকার প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটি বিশেষ গুণ ছিল। তিনি এমনি লোকপ্রিয় ছিলেন, শম্ভুনাথ পন্ডিতের মৃত্যুর পর তাঁহার উপরে অনেকের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। এ প্রকার লোকের মৃত্যু সাতিশয় শোচনীয় সন্দেহ নাই। তাঁহার স্মরণার্থে গতকল্য ছোট আদালত বন্ধ হইয়াছিল।"

হরচন্দ্র ৬০ বছর বয়সে যখন দেহত্যাগ করেন তখন কালীপ্রসন্নের বয়স ২৮ বছর। এঁর মৃত্যুর দুবছর পরেই (১৮৭০-এ) কালীপ্রসন্ন ও পরলোক গমন করেন।

কালীপ্রসন্নের জীবন গঠনে হরচন্দ্র ঘোষের মত এরূপ সুযোগ্য ব্যক্তির প্রভাবের কথা মনে রেখেই অতঃপর আমাদের কালীপ্রসন্নের বাল্যজীবন, শিক্ষালাভ এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের প্রস্তুতি বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

কালীপ্রসন্নের বাল্যজীবন ও শিক্ষালাভ :—

আমরা পূর্বেই দেখেছি কালীপ্রসন্ন মাত্র ছ'বছর বয়সেই পিতৃহীন হয়েছিলেন। সেই অবস্থায় সেই পিতৃহীন কালীপ্রসন্নের বাল্যজীবন কিভাবে কেটেছিল এবং কতদূর শিক্ষালাভ হয়েছিল সেটাই আমাদের প্রথম অনুসন্ধানের বিষয়। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খন্ডে বলেছেন—" তিনি বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিখিয়াছিলেন তাহাও স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহার শিক্ষা কোথায় এবং কতটা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কোথাও কোন উল্লেখ নাই। মনে হয় তাঁহার শিক্ষা বাড়ীতেই।"[৬] ডঃ সেনের এ অনুমান আংশিক সত্য হলেও সর্বাংশে সত্য নয়। মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন, "বাল্যকালে কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত এই তিন ভাষায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁনি যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র, তখন ইঁহার বিবাহ হয়।... ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে......কালীপ্রসন্ন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।"[৭] কালীপ্রসন্নের বিবাহ হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং অন্ততঃ তিন বছরের অধিককাল যে কালীপ্রসন্ন হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন সে কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিছুদিনের জন্য যে কালীপ্রসন্ন হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন তার আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাই ২৪শে জুলাই, ১৮৭০-এ কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর 'ইন্ডিয়ান মিরারে, প্রকাশিত একটি বিবরণে—" He left his college

studies while very young."৮ বসন্তকুমার বসু প্রনীত 'কায়স্থ পরিচয়" (কলিকাতা খণ্ড) গ্রন্থেও কালীপ্রসন্নের হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন সম্বন্ধে তথ্য পাই - "কালীপ্রসন্ন বাল্যকালে যথাবিধি পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করেন। পরে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া শিক্ষালাভ করেন।" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর সাহিত্য সাধক চরিত মালায় উল্লেখ করেছেন "শৈশবে কালীপ্রসন্ন হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতীছাত্র বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল না। তিনি গৃহে বসিয়া উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক নামে একজন সাহেবের নিকট রীতিমত ইংরেজী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত এবং মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তাঁহার আশৈশব অনুরাগ ছিল। এই দুই ভাষাও তিনি পণ্ডিত রাখিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন।"

তবে বিদ্যালয়ের নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষায় যথেষ্ট কৃতিত্ব না দেখালেও নিজ গৃহে বিভিন্ন গৃহশিক্ষকের নিকট এবং পরে স্বাধীনভাবে যে বিশেষ ভাবে বিদ্যার্জন করা সম্ভব একথা কালীপ্রসন্নের অনেককাল পরে সেই জোড়াসাঁকোতেই রবীন্দ্রনাথও আরও একবার প্রমাণ করে গেছেন। অনেক কালের ব্যবধানে বঙ্গদেশের এই দুই প্রতিভাবানের বাল্যশিক্ষার সাদৃশ্য আমাদের বিস্মিত করে। দুজনেই ধনী জমিদার বংশের সন্তান। দুজনেই শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ে একটি বিশিষ্ট পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারক। দুজনেরই প্রকৃত শিক্ষা বিদ্যালয়ে নয়, গৃহে। তবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রভাব ও পরিমাণ যেমন অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, কালীপ্রসন্নের ততটা নয়। কালীপ্রসন্নের জীবনে বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং গৃহের শিক্ষা দুয়ের মিশ্র প্রভাব পড়েছে বলে আমরা মনে করি। কারণ ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর জীবনে কিছু না কিছু প্রভাব ফেলবেই—এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। তবে তাঁরও যে প্রকৃত শিক্ষা গৃহে—ইংরেজী ভাষায় গৃহশিক্ষক মিঃটার উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিকের কাছে' বাংলা এবং সংস্কৃত বিভিন্ন পণ্ডিতদের কাছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে তাঁর বাল্যশিক্ষায় তাঁর মাতা ও পিতামহীর কথাও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। মন্মথনাথ ঘোষ যথার্থই মন্তব্য করেছেন—"কালীপ্রসন্নের এই অসামান্য বঙ্গভাষানুরাগের কারণানুসন্ধান করিতে গেলে তাঁহার বাল্যজীবনের উপর তাঁহার মাতা ও পিতামহীর প্রভাব লক্ষিত হয়।"৯

এবার 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় কালীপ্রসন্ন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ 'সরলতা ও পরিহাস-রসিকতার' সঙ্গে তাঁর বাল্যশিক্ষা প্রসঙ্গে যে কৌতুককর আভাষ দিয়েছেন তা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার করি। এখানে অবশ্য একথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে নকশার প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন (কালীপ্রসন্নই হুতোম কিনা এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন উত্থাপিত সংশয় নিরসনের চেষ্টা যথাস্থানে করেছি) স্বীকার করেছেন, "আমি......স্বয়ংও নকশার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।" 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় আছে— "পাঠক! পাঠশালা যমালয় হতেও ভয়ানক—পণ্ডিত ও মাষ্টার যেন বাগ বিবেচনা হচ্চে!"

এরপর ৫১ পৃষ্ঠায়—

"ক্রমে আমরা পাঠশালা ছাড়লেম—কালেজে ভর্ত্তি হলাম—"

এরপর ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায়—

"ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাঙ্গলা ভাষার উপর বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখবারও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না। আমরা পূর্বেই বলিছি যে, আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা আমাদের ঘুমবার পূর্ব্বে নানাপ্রকার রূপকথা কইতেন। কবিকঙ্কন, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন। আমরাও সেইগুলি মুখস্থ করে স্কুলে, বাড়ীতে ও মার কাছে আওড়াতেম—মা শুনে বড় খুসী হতেন ও কখন কখন আমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে ফি পয়ার পিছু একটি করে সন্দেশ প্রাইজ দিতেন;......সংস্কৃত শেখাবার জন্যে আমাদের একজন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে বড় পরিশ্রম কত্তেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ধবোধ পার হলেম, মাঘের দুই পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাটামোর সূত্র হলো; টিকি, ফোঁটা ও রাঙ্গা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য্য দেখলেই তর্ক কত্তে যাই, ছোঁড়া গোছের ঐ রকমের বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তর্কে হারিয়ে টিকি কেটে নিই, কাগজে প্রস্তাব লিখি—পয়ার লিখতে চেষ্টা করি ও অন্যের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরি করে আপনার বলে অহঙ্কার করি—সংস্কৃত কালেজে থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও ঠিক একজন সংস্কৃত কালেজের ছোকরা হয়ে পড়লেম; গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠলো—কখন বোধ হতে লাগলো কিছু দিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হবো (ওঃ শ্রীবিষ্ণু, কালিদাস বড় লম্পট ছিলেন), তা হওয়া হবে না, তবে

কি ব্রিটেনের বিখ্যাত পণ্ডিত জনসন? না! (তিনি বড় গরিবের ছেলে ছিলেন) সেটি বড় অসঙ্গত হয়, তবে রামমোহন রায়? হাঁ, একদিন রামমোহন রায় হওয়া যায়—কিন্তু বিলেতে মর্ত্তে পারবো না।

ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচজনে চিন্‌বে, সেই চেষ্টাই বলবতী হলো।"

এই উদ্ধৃতি থেকে কয়েকটি তথ্যের উপর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমতঃ বিদ্যালয় জীবনের অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয়তঃ মা ও ঠাকুরমার কবিকঙ্কন, কৃত্তিবাস ও কাশীদাস-প্রীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বালক কালীপ্রসন্নের বাংলা সাহিত্যানুরাগ, তৃতীয়তঃ বাড়ীতে পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষালাভ এবং চতুর্থতঃ পরিহাসের ছলে হলেও জীবনের উচ্চাকাঙ্খার প্রকাশ বেশ স্পষ্টভাবেই নক্‌শার মধ্যে ফুটে উঠেছে।

এবার সংস্কৃত-শিক্ষা প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। হুতোম ওরফে কালীপ্রসন্ন যখন বলেন, "ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ধবোধ পার হলেম" তখন একালে 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণের সঙ্গে সাধারণের অপরিচয়বশতঃ আমাদের কাছে কথাটা মনে হয় এক ক্লাসে চারবছর থাকার মত। কিন্তু আমাদের এই ভ্রম ভাঙ্গে 'পুরাতন প্রসঙ্গে' কালীপ্রসন্নের সমবয়স্ক আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের বাল্য-শিক্ষার কথা শুনে—"ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই আমার 'মুগ্ধবোধ' পড়া আরম্ভ হইল। প্রথম দুই বৎসর ৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন করিলাম। তিনি মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ পণ্ডিতের পিতৃব্য। তৃতীয় বৎসর ৺গোবিন্দ শিরোমণি মহাশয়ের ক্লাসে ও চতুর্থ বৎসর ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাছে 'মুগ্ধবোধ' অধ্যয়ন করিলাম। ......এই চারি বৎসরে মুগ্ধবোধ' পড়া শেষ হইল।"[১১] এমনকি স্বয়ং বিদ্যাসাগর পর্যন্ত যে "জলভরা চোখ মেলে মুগ্ধনেত্রে 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণের দিকে চেয়ে থাকতেন" সে তথ্য শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে দিয়েছেন।

এবার 'হুতোমে' উল্লিখিত টিকিকাটা প্রসঙ্গে যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে তার প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান প্রয়োজন। "টিকি ফোঁটা ও রাঙ্গা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য্য দেখলেই তক্ক কত্তে যাই, ছোঁড়া গোছের ঐ রকম বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তক্কে হারিয়ে টিকি-কেটে নিই"—হুতোমের এই লঘু পরিহাসরসিকতার উপর এবং পরবর্তীকালে একটি বিশেষ ঘটনার উপর ভিত্তি করে কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে নানারকম আজগুবী গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে

যে কালীপ্রসন্ন তাঁর সংক্ষিপ্ত কর্মজীবনেই বহু মান্য পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁর সম্বন্ধে টিকিকাটা ইত্যাদি অনেক অমূলক গল্প সৃষ্টি করে তাঁর স্মৃতিকেই অবমাননা করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য পাই 'অর্ঘ্য' সম্পাদক অমূল্যচরণ ঘোষের 'অর্ঘ্য' অগ্রহায়ণ ১৩১৮-এ প্রকাশিত একটি লেখায়। "একটা জনশ্রুতি আছে যে, কালীপ্রসন্ন অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টিকি কাটিয়া দিয়াছিলেন। লোকমুখে এখনও আমরা শুনিতে পাই, টাকা দিয়া কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বশীভূত করিয়া তাঁহাদিগের টিকি ক্রয় করিতেন পরে ঐগুলি কাটিয়া লইয়া আলমারিতে সাজাইয়া রাখিতেন; কাহার টিকি কত মূল্যে ক্রীত, তাহাও এক টুকরা কাগজে লিখিত হইয়া ঐ টিকির সঙ্গে সংলগ্ন থাকিত। এই ঘটনা যে মিথ্যা তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এই জনশ্রুতি এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, কলিকাতায় তিনি 'টিকি কাটা জমিদার' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক সে সময়ে 'টিকি কাটা জমিদার' বলিলে লোকে উঁহাকেই বুঝিত। যাহা হউক, এই আখ্যার মূল যে কতকটা সত্য না ছিল এমন কথাও আমরা বলিতে পারি না। ব্যাপারটা এইরূপ ঘটিয়াছিল একবার কালীপ্রসন্নের বাটীতে কোন ব্রতোপলক্ষে এক ব্রাহ্মণকে একটি গাভী দান করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ গাভী লইয়া যাইতে যাইতে পথেই উহা কসাইকে বিক্রয় করে। ঘটনা কালীপ্রসন্নের গোচরীভূত হইলে তিনি সেই ব্রাহ্মণকে বাটীতে ডাকিয়া আনেন এবং স্বহস্তে তাহার টিকি কাটিয়া লয়েন। এই ঘটনাই ক্রমশঃ অতিরঞ্জিত হইয়া এইরূপ জনশ্রুতিতে পরিণত হয় যে, কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টিকি কাটিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তিনি যে এইরূপ একজন নীচাশয় ব্রাহ্মণের শিখা কর্তন করিয়াছিলেন বলিয়াই, সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর শ্রদ্ধাহীন ছিলেন, এইরূপ কখনই সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে যে তিনি অতি ভক্তি করিতেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"[১২]

কালীপ্রসন্নের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ট সম্পর্ক তো সর্বজনবিদিত। তাছাড়া একমাত্র মহাভারত অনুবাদের সময়েই গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন, চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি

যে বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল, তাতে অমূল্যচরণ সেনের কথারই যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়।

এরপর কালীপ্রসন্নের বাল্যজীবন প্রসঙ্গে আর দুটি তথ্যের উল্লেখ করব যার একটিতে পরিহাসরসিকতার সঙ্গে সত্যবাদিতা ও উপস্থিতবুদ্ধি এবং অন্যটিতে তাঁর সরলতা, আড়ম্বরহীনতা এবং সেই বালক বয়সেই তাঁর গভীর স্বাজাত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রথমটি পুরাতন 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের ছাত্রজীবনের একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা—

"কালীপ্রসন্নের বাল্যকালাবধি অতিশয় চতুরতা ছিল। পরিহাস অতিশয় ভালবাসিতেন। যেখানে মারামারি ও তামাসা, সেইখানেই তিনি অগ্রে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার একজন শিক্ষক বলেন, এক দিবস তিনি অন্য অন্য ছাত্রের সহিত বহির্দৃশ্যমান প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষকের উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন, এমত সময়ে হঠাৎ পার্শ্বস্থিত এক বালকের মস্তকে চপেটাঘাত করিলেন। শিক্ষকের নিকটে অভিযোগ হইলে কালীপ্রসন্ন কাল্পনিক গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'মহাশয়! আমি জাতিতে সিংহ, জাতীয় স্বভাব ত্যাগ করিতে না পারিয়া একে আজ মারিয়াছি।" এই আপাত-দুর্দান্ত বালকের স্বভাবের গভীরে যে আত্মমর্যাদাবোধের খাঁটি সোনা ছিল সে সম্বন্ধে দ্বিতীয় তথ্য হল—

ধনী জমিদার সন্তান হয়েও তাঁর পোষাক পরিচ্ছদে ছিল আড়ম্বরহীনতা ও স্বাজাত্যবোধ। তাঁর সহপাঠীরা যখন হ্যাটকোট পরা এবং ইংরেজি বুলি আওড়ানকেই জীবনের পরম গৌরব বলে মনে করতেন, তখন কালীপ্রসন্ন সাহেব কার্কপ্যাট্রিকের কাছে দস্তুরমত ইংরেজি বিদ্যায় শিক্ষিত হয়েও মোটা চাদর ও চটি জুতো পরতেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মনে রাখতে হবে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের পর চরকায় কাটা মোটা খদ্দরের ধুতি-চাদর পরা সারা ভারতে যেমন একটা 'মাস সেন্টিমেন্টে' (গণ ভাবাবেগে) পরিণত হয়েছিল, কালীপ্রসন্নের সময় দেশের অবস্থা তেমন নয়। সেই সময় একজন ধনী জমিদার পুত্রের পক্ষে নিতান্ত বাল্যকালেই বিদেশীর অনুকরণকে ঘৃণা ক'রে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের মতো তেজস্বিতাপূর্ণ অথচ অনাড়ম্বর আদর্শকে গ্রহণ করা রীতিমত বিস্ময়কর।

কালীপ্রসন্নের বিবাহ :—

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে চৌদ্দ বছর বয়সে কালীপ্রসন্নের প্রথম বিবাহ হয়। মন্মথনাথ ঘোষ বলেছেন, "ইনি যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র, তখন ইঁহার বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষমাত্র ;"[১৩] মন্মথনাথ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের জন্ম অনুমান করেছেন বলে তাঁর হিসাবে যা ত্রয়োদশ বর্ষ, সঠিক হিসাবে তাই হবে চৌদ্দ, কারণ কালীপ্রসন্নের জন্ম যে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তা ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৪০ তারিখের 'ক্যালকাটা কুরীয়ার' পত্রের সংবাদ থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

কালীপ্রসন্নের এই প্রথমবারের বিবাহ সম্বন্ধে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিত হয় :—

"আগামী দিবসে মৃত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের শুভ বিবাহ বাগবাঁজার নিবাসী মিষ্টভাষী সদ্বিদ্বান শ্রীযুক্তরায় লোকনাথ বসু বাহাদুরের কন্যার সহিত নির্ব্বাহ হইবেক। এই শুভ কার্য্যোপলক্ষে সিংহবাবুদিগের ভবনে কয়েকদিন ব্যাপিয়া নাচ হইতেছে। গত বুধবার রজনীতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের ও বৃহস্পতিবার রজনীতে সাহেব ও বিবিদিগের মজলিস হইয়াছিল, তাহাতে বিলক্ষণ আমোদ প্রমোদ হইয়াছে। নন্দলালবাবুর বিষয়রক্ষক শ্রীযুক্তবাবু হরচন্দ্র ঘোষ অতি সুনিয়মে বিবাহ সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে পত্র দেওয়া হইয়াছে, সামাজিক বিদায় ঘড়া, থাল, বস্ত্র, শঙ্খ, রৌপ্য নির্ম্মিত......(?) বাহির হইয়াছে। আহা! নন্দলাল সিংহ মহাশয় জীবিত থাকিলে এই বিবাহে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। এইক্ষণে আমাদিগের সেই বিলাপ করা বিফল মাত্র, পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি কালীপ্রসন্নবাবুকে দীর্ঘায়ু ও পরম সুখে রক্ষা করুন।" কিন্তু ৪ঠা আগষ্টের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত এই সংবাদে কন্যার পিতার পরিচয় সম্বন্ধে একটি ভ্রান্তি ছিল। পরবর্তী ১৬ই আগষ্ট তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' সেই ভ্রম সংশোধিত হয়ে লিখিত হয়, "......মৃত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের সুশীল পুত্র শ্রীমান্ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের শুভ বিবাহ বাগবাজার নিবাসী মিষ্টভাষী সদ্বিদ্বান শ্রীযুক্ত রায় লোকনাথ বসু বাহাদুরের ভ্রাতৃকন্যার সহিত অতি সমারোহপূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে।" ৮ই আগষ্ট ১৮৫৪ তারিখে 'সম্বাদ ভাস্কর'ও লিখেছিলেন, "গত শনৈশ্চর বাসরীয় [৫ই আগষ্ট] যামিনীযোগে

আমারদিগের প্রিয় বন্ধু পরলোকগত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের বংশধর পুত্র শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুর উদ্বাহকার্য্য রঙ্গপুরের সদর আমীন শ্রীযুক্তবাবু বেণীমাধব বসুর কন্যার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।" কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্তী বিভিন্ন গ্রন্থে ৪ঠা আগষ্টের 'সংবাদ প্রভাকরে' পরিবেশিত কালীপ্রসন্নের প্রথমা স্ত্রীর পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে ভুল তথ্যটিই পুনরবৃত্ত হয়েছে। অবশ্য বসন্তকুমার বসু তাঁর 'কায়স্থ পরিচয়' এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্যের উল্লেখ করেছেন।

যাই হোক, বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যেই কালীপ্রসন্নের বালিকা-পত্নী (বাগবাজারের বসুবাটীর কন্যা) লোকান্তরিতা হন। তার কিছুকাল পরে কালীপ্রসন্ন রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবের দৌহিত্রী আনরপুর নিবাসী চন্দ্রনাথ বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন। কালীপ্রসন্নের এই দ্বিতীয়া পত্নী কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন।[১৪] কালীপ্রসন্নের প্রথমা পত্নীর নাম ছিল ভুবনমোহিনী দাসী ও দ্বিতীয়া পত্নীর নাম শরৎকুমারী দাসী এবং কালীপ্রসন্নের মায়ের নাম ছিল ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' উপন্যাসে এ প্রসঙ্গে দুটি গুরুতর ত্রুটি দেখা যায়। প্রথমতঃ তিনি নন্দলাল (রামকমল) সিংহের দত্তক পুত্র (যিনি আসলে নন্দলালের পিতব্য) গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে বাগবাজারের বসুবাড়ীর কন্যার বিবাহ দেখিয়েছেন (যদিও গঙ্গানারায়ণ নয়, কালীপ্রসন্নেরই প্রথম বিবাহ হয়েছে বাগবাজারের বসুবাড়ীর কন্যার সঙ্গে) এবং কালীপ্রসন্নের মা ত্রৈলোক্যমোহিনীকে (বিম্ববতীকে) নিরক্ষর হিসেবে দেখিয়েছেন যদিও ত্রৈলোক্যমোহিনী নিরক্ষর ছিলেন না এবং এ প্রসঙ্গে বলি যে কালীপ্রসন্নের মায়ের ছবি ও হস্তাক্ষর দেখার আমার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছে যার আলোকচিত্র বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হল।

কর্মজীবনের নানাদিক :—

সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, রঙ্গমঞ্চ স্থাপন, সংবাদপত্র পরিচালন, সমাজ সংস্কার, দেশাত্মবোধ, দানশীলতা ইত্যাদি নানা দিক থেকে কালীপ্রসন্নের জীবন ছিল কর্ম-মুখর। এ গুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করলেও এই অধ্যায়ে তাঁর বহুমুখী কর্মজীবনের সামগ্রিক



ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসী
(কালীপ্রসন্নের জননী)

চিত্র—৬

TO MESSRS. BEJOY KISSEN DUTT & CO.,

GENTLEMEN,—

Please lay in water supply pipe in my premises No [handwritten] at the rates submitted by you. Measurement of the pipes will be made before they are covered.

Your's faithfully,

শ্রীমতি ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসী

কালীপ্রসন্নের জননী ত্রৈলোক্যমোহিনীর স্বাক্ষর সম্বলিত পত্র।

চিত্র—৭

দিকনির্দেশ করা প্রয়োজন। তাছাড়া বিচার পতি কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধেও এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

কালীপ্রসন্ন মাত্র তেরো বছর বয়সে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু কালীপ্রসন্নের সমস্ত জীবন জুড়ে যে বিরাট কর্মকাণ্ড চলেছে, এটি তার সুমহান সূচনা মাত্র। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পনেরো বছর বয়সেই কালীপ্রসন্ন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র অধীন 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র সম্পাদক হন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা ও নাট্যাভিনয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য কালীপ্রসন্ন 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে'র প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু নাট্যশালা প্রতিষ্ঠাই নয়, বাংলা নাটকের সেই গঠমানতার যুগে কালীপ্রসন্ন নিজেও বাংলা নাটক 'বিক্রমোর্বশী' রচনা করেন। অবশ্য তার পূর্বেই ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে কালীপ্রসন্ন 'বাবুনাটক' নামে একখানি প্রহসন জাতীয় নাটক রচনা করেন। এরপর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে 'সাবিত্রী সত্যবান' নামে একখানি মৌলিক নাটক রচনা করেন; আর তার পরের বছর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ভবভূতি রচিত 'মালতী মাধব' অবলম্বনে তিনি আর একখানি অনুবাদ নাটক রচনা করেন। এই সময় তাঁর স্বপ্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' তিনি নিজে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং তাঁর 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের পুরূরবার ভূমিকার অভিনয় সমসাময়িক সংবাদ পত্রে উচ্চ প্রশংসিত হয়।

এইভাবে নাটক রচনা ও অভিনয় চলতে চলতেই তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব বেদব্যাসের মূল সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশে ব্রতী হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় এবং গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ প্রভৃতি বহু কৃতবিদ্য পণ্ডিতের সৎপরামর্শ ও সহযোগিতায় তিনি ১৮৫৮ থেকে ১৮৬৬ এই দীর্ঘ সময়ে ব্যাসদেবের আদ্যন্ত মহাভারত বাংলা গদ্যে অনুবাদ করেন এবং তা বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এছাড়া কালীপ্রসন্ন স্বতন্ত্রভাবে 'শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা'র ও বঙ্গানুবাদ করেন। এটি তাঁর মৃত্যুর পর মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

অবশ্য এখানেই তাঁর সাহিত্যকীর্তি থেমে থাকেনি। মহাভারতের বাংলা গদ্যানুবাদ যদি মহাত্মা কালীপ্রসন্নের সবচেয়ে বড় গৌরব হয়, তবে শিল্পী কালীপ্রসন্নের সবচেয়ে বড় গৌরব তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের এই বিশিষ্ট সম্পদ দীর্ঘকাল তার যথার্থ মূল্যায়ণ

থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকলেও ইদানীং কোন কোন সাহিত্যেতিহাসে প্রাসঙ্গিকভাবে সেই অবমূল্যায়নের কিছু কিছু প্রতিবাদ হয়েছে। কালীপ্রসন্নের অন্যান্য সাহিত্য কীর্তি'র সঙ্গে এবিষয়ে আমরা পৃথক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এছাড়া মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থে কালীপ্রসন্নের একটি প্রবন্ধ পুস্তিকা, 'বঙ্গেশবিজয়' নামে একটি অসমাপ্ত উপন্যাস এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে পঠিত ও পত্র-পত্রিকার জন্য রচিত অথচ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বেশ কিছু রচনা আছে। তাছাড়া The Calcutta Police Act নামে কালীপ্রসন্ন সম্পাদিত আইন বিষয়ক একখানা ইংরেজী গ্রন্থও এখানে স্মরণযোগ্য। সমসাময়িক তথ্যাদি থেকে জানা যায়, কালীপ্রসন্ন সমগ্র রামায়ণের অনুবাদ এবং নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কৃত জুলীয়াস সীজারের জীবন চরিত বাংলায় অনুবাদ করার সংকল্প করেছিলেন। অবশ্য অকাল-মৃত্যুর ফলে তাঁর সে সংকল্প কার্যে পরিণত করার সুযোগ হয়নি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আরও যে কারণে তাঁর কৃতিত্ব অবশ্য স্মরণীয় তা হল—সাময়িকপত্র ও দৈনিকপত্র সম্পাদক কালীপ্রসন্নের ভূমিকা। কালীপ্রসন্ন প্রথম স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীন 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র (প্রথম সংখ্যার প্রকাশ কাল—২০ শে এপ্রিল, ১৮৫৫) সম্পাদক ছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কালীপ্রসন্ন 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' নামে আবার একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র স্বনামধন্য সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে ঐ পত্রের স্বত্ব ক্রয় করে স্বহস্তে তার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। আবার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র সম্পাদকতা ত্যাগ করলে কালীপ্রসন্ন কিছুকাল (১৭৮৩ শকের বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ) ঐ পত্রিকারও সম্পাদকতা করেন। এছাড়া 'পরিদর্শক' নামে একখানি দৈনিক পত্র ও (প্রথম সংখ্যা ১৪ই নভেম্বর, ১৮৬২) তিনি চালান। (যথাস্থানে আমরা এইসব সাময়িকপত্র ও দৈনিকপত্র সম্পাদকরূপে কালীপ্রসন্নের ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করব। এই সব সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের সম্পাদনা এবং পরিচালনা ছাড়াও কালীপ্রসন্ন তাঁর সময়ে অন্যের দ্বারা সম্পাদিত ও পরিচালিত একাধিক বাংলা, ইংরাজী ও উর্দু সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশেও প্রভূত অর্থসাহায্য করেছেন।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র ছাড়াও সাহিত্যের উন্নতিকামনায় লেখকদের উৎসাহ দানের জন্য প্রতিযোগিতা মূলক প্রবন্ধ আহ্বান করে বিদ্যোৎসাহিনী

সভার পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন যে মাঝে মাঝে পুরস্কার ঘোষণা করতেন তৎকালীন সংবাদপত্র থেকে এ তথ্যও আমরা অবগত হই। ৪ঠা জুন ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' "জগতে সুখী কে?" এই শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনার জন্য "দুই শত টাকা" এবং ৪ঠা নভেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' "হিন্দুধর্মের উৎকৃষ্টতা" বিষয়ে "নানাপ্রকার প্রমাণাদি সহ" একটি প্রবন্ধ রচনার জন্য "তিনশত মুদ্রা পারিতোষিক" ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া এখনকার দিনে প্রতিবছর যেমন বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হয়, অনেকটা সেই ধরণে 'সংবাদ প্রভাকর' যন্ত্রালয়ে চৈত্রসংক্রান্তির দিন একটি সাহিত্য সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হত এবং এই উপলক্ষে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির উপস্থিতিতে প্রবন্ধাদি পাঠ এবং ভোজের ব্যবস্থাদিও ছিল। এই সাম্বৎসরিক সম্মিলনে কালীপ্রসন্ন লেখকদের উৎসাহদানের জন্য বহু পুরস্কার দিতেন। (দ্রঃ 'সংবাদ প্রভাকর'—১লা বৈশাখ ১২৬৮)

তাছাড়া কালীপ্রসন্নের বদান্যতা এবং আরও নানাবিধ সাহায্যের জন্য অনেক লেখক তাঁদের সাহিত্যচর্চার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করতেও সমর্থ হয়েছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থকারের পুস্তকমুদ্রণ ও প্রকাশনের ব্যাপারে কালীপ্রসন্ন যে সহায়তা করতেন তার দৃষ্টান্তরূপে ১লা আশ্বিন, ১২৬৪ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' হরিমোহন গুপ্তের 'শকুন্তলা' নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশে কালীপ্রসন্নের সাহায্য এবং ৩০শে নভেম্বর ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের 'নূতন পুস্তক।......বাঙ্গালা নাগানন্দ' প্রকাশে কালীপ্রসন্নের 'সমুদয় ব্যয়' বহনের স্বীকৃতির কথা উল্লেখ করা যায়।

সাহিত্য এবং সংবাদপত্রের উন্নতিতে সাহায্য ছাড়াও সমাজ-উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর বদান্যতা ছিল অতুলনীয়। সমাজ-সম্পর্কিত এইসব প্রচেষ্টার বিশদ আলোচনা করেছি 'সমাজ প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়ে। এখানে তাই তাঁর বহুবিধ বদান্যতার একটি তালিকামাত্র লিপিবদ্ধ করছি।

১। বহু অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনোদ্দেশ্যে দান।
২। বহু দুঃস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাহায্য দান।
৩। ছাত্রদের উৎসাহ প্রদানের জন্য পদক ও বহুবিধ পুরস্কারাদি প্রদান।
৪। অগণিত ছাত্রকে পাঠাদির নিমিত্ত অর্থ সাহায্য প্রদান।
৫। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনে দান—(ক) লেখকদের দান,

(খ) সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সাহায্য দান (গ) বিনামূল্যে লেখকদের পুস্তক প্রকাশ।

৬। দুর্ভিক্ষে দান—স্বদেশে ও বিদেশে।

৭। অন্যান্য জনহিতকর কার্যে দান– (ক) চিৎপুরে দাতব্য ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা (খ) কলকাতায় পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে বিলাত থেকে চারটি ধারাযন্ত্র আনয়ন এবং কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপন ইত্যাদি।

জাতীয়জীবনের উন্নতিকামনায় এই বহুধাব্যাপ্ত বদান্যতা ছাড়াও জাতীয় সম্মান রক্ষার ব্যাপারে কালীপ্রসন্নের আগ্রহ কিরূপ প্রবল ছিল এবারে তা আলোচনা করা যেতে পারে।

কলকাতার তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার মর্ডান্ট ওয়েলস বিচারাসন থেকে প্রায়ই বলতেন, বাঙ্গালী মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। অবশ্য বিচারকের সম্মুখে যে সব অপরাধী ও সাক্ষী উপস্থিত হত, তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সেজন্য সমগ্র জাতিকে এমনভাবে অপমানিত করা সুপ্রীম কোর্টের একজন মাননীয় বিচারকের পক্ষে কতদূর অসঙ্গত তা সহজেই অনুমেয়। নীলদর্পণ মামলাতেও যখন তিনি বাঙ্গালী সাক্ষীদের সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করেন এবং রেভারেন্ড লঙের একমাস কারাবাস ও এক সহস্র টাকা জরিমানার আদেশ দেন. তখন তিনি জনসাধারণের অত্যন্ত বিরাগভাজন হন। এই ঘটনার পর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট দেশের তৎকালীন নেতৃবর্গ এই অবিবেচক বিচারককে যথোচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাটমন্দিরে এক বিরাট সভার আয়োজন করেন। কালীপ্রসন্ন বহু সভা-সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও এ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক সভার সঙ্গে জড়িত হননি। কিন্তু যখন জাতির সম্মান রক্ষার প্রশ্ন দেখা দিল, তখন তিনি যে শুধু এই সভায় উপস্থিত হলেন তাই নয়, রাজরোষ উপেক্ষা করে বিচারপতি ওয়েলসের বিরুদ্ধে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিতেও কুণ্ঠিত হলেন না। এই সভায় রাজা রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবাব আসগর আলি খাঁ প্রভৃতি গণ্যমাণ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

অতঃপর ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৬১ তারিখে ওয়েল্‌সের বিরুদ্ধে বহু সহস্র লোকের স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদনপত্র বিলাতে সেক্রেটারী অব্‌ স্টেট স্যার চার্লস উডের নিকট পাঠানো হল। এই সভা ও আবেদনপত্র সম্বন্ধে ১৪ই এপ্রিল ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই তথ্য প্রকাশিত হয়—

"......লণ্ড সাহেবের বিচারকালে সর মর্ডাণ্ট ওয়েলস্‌ যাবতীয় বাঙালীকে গালি দিয়াছিলেন বলিয়া এতদ্দেশীয় সমুদায় প্রধান লোক একত্র হইয়া সভাবাজারের (– শোভাবাজারের ; বেশী সভা অনুষ্ঠিত হত বলে কি তখন জায়গাটির ঐ নাম ছিল ?) রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে এক সভা করিয়া সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের দুঃস্বভাবের বিষয় স্টেট সেক্রেটারীর গোচর করিলেন। প্রায় ২০,০০০ লোক ঐ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন। বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই, আবেদনপত্র গোপনে মুদ্রিত হইয়া স্বাক্ষরার্থ প্রায় একমাস চতুর্দিকে প্রেরিত হয়, ইংলিসম্যান ও হরকরা সম্পাদক এক খণ্ডের জন্য ৫০০ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, এরূপ একতা হইয়াছিল যে, তথাপি কেহ এক খণ্ড দেন নাই। সর চার্লস উড আবেদনের উত্তর দান কালে মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সকে সাবধান করিয়া দিলেন।"

২৪শে ডিসেম্বর ১৮৬১ তারিখে স্যার চার্লস উড গভর্ণর জেনারেলকে লিখিত এক পত্রে মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স সম্বন্ধে সতর্ক করে দেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' পত্রটি প্রকাশিত হয়—"Those who hold the judicial office may be sensible of how great importance it is that their denunciations of crime may not be interpreted into hasty imputations against a whole people or country."

তবে এ প্রসঙ্গে যে কথাটি আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য তা হল কালীপ্রসন্ন যদিও জাতীয়তার পুরোহিত ছিলেন, তবু তাঁর উগ্র এবং অন্ধ ইংরেজবিদ্বেষের গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা ছিল না। সংকার্যের জন্য বিদেশীকে শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা করতে তিনি কখনই কুণ্ঠিত হন নি। যে মর্ডাণ্ট ওয়েলস্‌কে তাঁর রূঢ় আচরণের জন্য একসময়ে প্রকাশ্যভাবে তিনি তিরস্কার করেছিলেন, স্যার চার্লস্‌ উডের সদুপদেশে তিনি পরে এত লোকরঞ্জক হয়েছিলেন যে, দুবছর পরে বঙ্গদেশ থেকে বিদায়গ্রহণকালে যে

নেতৃস্থানীয় দেশবাসীগণ ব্যথিতচিত্তে তাঁকে বিদায় অভিনন্দন দেন, কালীপ্রসন্ন ছিলেন তাঁদের অন্যতম।[১৫]

নীলদর্পণ মামলায় দণ্ডিত রেভারেণ্ড লঙের এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ডের টাকাটাই যে শুধু কালীপ্রসন্ন আদালতে দিয়ে দেন, তাই নয়. ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে জনদরদী রেভারেণ্ড লঙের ভারতত্যাগকালে কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে তাঁকে একখানি সুন্দর অভিনন্দনপত্রও প্রদান করেন। কালীপ্রসন্ন যে সংকীর্ণ জাত্যভিমানের ঊর্দ্ধে ছিলেন তার আরও অনেক প্রমাণ আছে। সিপাহীযুদ্ধের সময়ে এবং পরে গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং বঙ্গদেশবাসী প্রজাসাধারণের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার জন্যে বহু সংকীর্ণমনা ইংরেজের বিদ্রূপ এবং দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে 'দয়াময়ী ক্যানিং' রূপে আখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর বিদায়গ্রহণের সংকল্পের কথা প্রচারিত হলে কালীপ্রসন্ন—রাজা রাধাকান্তদেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি দেশনায়কদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে তাঁকে শুধু বিদায় অভিনন্দনই দেন নি, তাঁর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে মর্মরমূর্তি স্থাপনের জন্য তাঁর স্মৃতি-রক্ষা সমিতির একজন প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং স্মৃতিরক্ষাকল্পে এক সহস্র মুদ্রাও দান করেন।[১৬]

নীলকর-পীড়িত প্রজাগণের দুঃখমোচনকারী লেফটেনান্ট গভর্ণর স্যার জন পীটার গ্রান্ট যখন এদেশ ত্যাগ করেন তখন তাঁকে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য ২২শে এপ্রিল ১৮৬২ তারিখে বেলাভিডিয়ার হাউসে যে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয়, কালীপ্রসন্ন সেখানেও উপস্থিত ছিলেন।[১৭]

আবার হিন্দু কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসন (যাঁর সেক্সপিয়র আবৃত্তি সঙ্গে উন্নাসিক মেকলে সাহেব পর্যন্ত বলেছিলেন, 'আমি ভারতবর্ষের সবকিছু ভুলে যেতে পারি, কিন্তু আপনার সেক্সপিয়র আবৃত্তি ভোলা সম্ভব নয়,' এবং যাঁর সাহিত্যচর্চা বিশেষভাবে মধুসূদনকেও সাহিত্যানু-শীলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল,) যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন টাউন হলে (৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬১) যে সকল বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি তাঁকে অভিনন্দন পত্র এবং পাথেয় স্বরূপ পাঁচ হাজার টাকা দান করেন, কালীপ্রসন্ন ছিলেন তাঁদেরও অন্যতম।

বিচারপতি কালীপ্রসন্ন :—

এবার কালীপ্রসন্নের কর্মময় জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক—বিচারপতি হিসাবে তাঁর দক্ষতা ও কৃতিত্ব বিশেষভাবে আলোচ্য। তৎকালীন সমাজে একদিকে যেমন অধিকাংশ দেশী হাকিমের উৎকোচ গ্রহণ এবং অদক্ষ বিচারের অপবাদ ছিল, অন্যদিকে তেমনি নেটিভদের সঙ্গে সাহেব আসামীর বিচার ব্যাপারে ইউরোপীয়ান হাকিমদেরও পক্ষপাতিত্বের অপবাদ কম ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায় বিচারের আদর্শ অনুসরণে বিচারপতি কালীপ্রসন্নের বিচার-দক্ষতা. পক্ষপাতশূন্যতা ও নির্ভীকতা আজও আমাদের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৩ বছর বয়সে কালীপ্রসন্ন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও জাস্টিস্ অব্ দি পীস্ নিযুক্ত হয়েছিলেন। ৪ঠা মে ১৮৬৩ তারিখের 'সোম-প্রকাশে' প্রকাশ :—"আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।" ৬ই জুন, ১৮৬৪ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' বিচারক কালীপ্রসন্নের বিচারদক্ষতার নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়—

"টেরিটীর বাজার অপরিস্কৃত থাকাতে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বর্দ্ধমানাধিপতির ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন, যতদিন উহা পরিস্কৃত না হইতেছে প্রতিদিন তাঁহাকে ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।"

এই বর্দ্ধমানাধিপতিকেই কালীপ্রসন্ন তাঁর ব্যক্তিগত প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্বরচিত 'বিক্রমোর্বশী' নাটক উৎসর্গ করেন। বিচারের সময় ব্যক্তিগত সম্পর্ক অপেক্ষা অন্যায়ের প্রতিকারের ওপরেই যে কালীপ্রসন্ন বেশী গুরুত্ব দিতেন, এই ঘটনা তার প্রমাণ। এখনকার দিনের সংবাদপত্রে যখন হামেশাই হাওড়া এবং কলকাতার প্রধান প্রধান রাস্তার ওপরেও আবর্জনা স্তূপের ছবি ওঠে, তখন কালীপ্রসন্নের বিচার দক্ষতার এই সংবাদটি বিশেষভাবে মনে পড়ে।

অসাধু ব্যবসায়ী আজও সমাজের একটি প্রধান সমস্যা। কম ওজনের বাটখারা ব্যবহার করায় অসাধু ব্যবসায়ীদের কালীপ্রসন্ন কিরূপ বিচার করে-ছিলেন সে তথ্য পাই ২৯শে আগষ্ট, ১৮৬৪ তারিখের 'সোমপ্রকাশে'—"কলি-কাতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ আজিকালি

পুলিশের কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন। গত ১৬ই আগষ্ট তিনি যে কয়েকটি মকদ্দমার বিচার করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিলাম। ৮ জন দোকানদার কৃত্রিম বাঁটখারা ব্যবহার করাতে তাহাদিগের প্রত্যেকের ২৫ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট আক্ষেপ করিয়াছেন, ধূর্ত্ত দোকানদারেরা এক এক দ্রব্যে দুই গুণ লাভ করিয়া থাকে। লোকে যথার্থ মূল্য দিয়া এরূপ প্রবঞ্চনা ও ক্ষতি সহ্য করিবেন কেন? পুলিশের ইনস্পেকটরগণ ইহার অনুসন্ধান রাখেন না বলিয়া তিনি ক্ষুব্ধ ও আশ্চর্যান্বিত হইয়াছেন। ওজন ও মাপের জুয়াচুরি প্রায় সর্ব্বত্রই সমান, দণ্ডবিধিতেও ইহার এক বৎসর মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন বাবু বারান্তরে এরূপ অপরাধীর দণ্ড বাড়াইয়া দিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।"

মাত্র এক বছরের মধ্যেই কালীপ্রসন্ন বিচারকার্যে এত খ্যাতি লাভ করেন যে, মিঃ ডিকেন্সের মৃত্যুতে তাঁকে সাদার্ন ডিভিশানের ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করতে অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে ৩১শে অক্টোবর ১৮৬৪ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত হয়—

"Baboo Kally Prossunno Sing has been requested by the Commissioner of Police to officiate for Mr. Dickens, the Southern Division Magistrate, for two months. It is but bare justice to the Baboo to say that he has taken the shine out of all the Honoraries of Calcutta, whether European or native and the public spirit which he is exhibiting by thus employing his liesure for the benefit of the public is indeed entitled to high commendation."

আবার ৩রা জুন ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে'র সংবাদে জানা যায়, "কলিকাতা পুলিষের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ব্লান্সন সাহেব অশ্ব হইতে পতিত হইয়া আপাততঃ বিচারালয়ে আগমনে অশক্ত হওয়াতে উপযুক্ত অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার কার্য্য করিতেছেন এবং থিয়োডোর ডিকেন্সের মৃত্যুর পর ব্লান্সন সাহেবের নিয়োগের পূর্ব্বে এই বাবু কিছুদিন পুলিশের প্রধান আসনোপবিষ্ট হইয়া সদ্বিচার বিতরণ দ্বারা বিলক্ষণ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।" লক্ষনীয়, পরাধীন ভারতবর্ষে কলকাতা পুলিষের 'প্রধান আসনোপবিষ্ট' হওয়া যখন কোন নেটিভের পক্ষেই সম্ভব

হয়নি, তখন একবার ডিকেন্সের মৃত্যুতে এবং আবার একবার ব্রান্সন সাহেবের অসুস্থতার সময় সেই পদে বৃত হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ যিনি রাজরোষ উপেক্ষা করে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করেছিলেন এবং রেভারেণ্ড লঙের বিচারে লঙের জরিমানার এক হাজার টাকা প্রকাশ্য আদালতেই দান করেছিলেন। কালীপ্রসন্নের চরিত্রবল এবং ন্যায়নিষ্ঠার ওপর শুধু দেশবাসীর নয়, ইংরেজ সরকারেরও কী গভীর আস্থা ছিল এই ঘটনা থেকেই তা বোঝা যাবে।

সমসাময়িক সংবাদপত্রেও বিচারপতি কালীপ্রসন্নের যোগ্যতা ও ন্যায় নিষ্ঠার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১৬ই জানুয়ারী ১৮৬৫ তারিখের 'সোম প্রকাশে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়—

"আদর্শ বিচারপতি—৯ই জানুয়ারী হিন্দু পেট্রিয়টে দৃষ্ট হইল, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকটে একদা ডাক্তার বীটসনের কেরাণী মহেশচন্দ্র দাস ডাক্তারের পকেটবহি চুরি করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত হয়। কালীপ্রসন্নবাবু প্রমাণ প্রয়োগ লইয়া মহেশের কারাবাসের আদেশ করেন। পশ্চাৎবাবু জানিতে পারিলেন, সে বহি অন্যের নিকটে দৃষ্ট হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মহেশের মুক্তিলাভের অনুরোধ করিয়া গবর্ণমেণ্টে লিখিলেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্নবাবু যেদিন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই অবধি আমরা তাঁহার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিতেছি। কিন্তু তাঁহার উপস্থিত বিষয়ের প্রশংসা আর সমুদায় অতিক্রম করিয়া উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি অতঃপর অন্য অন্য বিচারপতির আদর্শ-স্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। বিচারপতির এইরূপ হওয়াই উচিত।...... যাঁহারা বাঙ্গালিদিগকে উচ্চ বিচারাসন দানের প্রতিবন্ধকতা করেন, তাঁহারা দেখুন বাঙ্গালিদিগের ন্যায়পরতা কতদূর গমন করিয়াছে।"

বিচারকার্যে একবার রায়দানের পর বিচারক যদি কোনক্রমে বুঝতে পারেন যে তাঁর ভুল হয়েছে, তাহলে নিজের রায় নাকচ করার জন্য তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত শুধু আমাদের দেশে নয়, যে কোন দেশের যে কোন আদালতের ইতিহাসেই কি এটি একটি স্মরণীয়

ঘটনা নয়? তাছাড়া পরাধীন ভারতবর্ষে যখন এদেশীয় বিচারকেরা ভয়ের বশবর্তী হয়ে এবং ইউরোপীয় বিচারকেরা স্বজাতি প্রীতির দ্বারা চালিত হয়ে দেশীয় ও ইউরোপীয় বাদী প্রতিবাদী ও সাক্ষীদের মধ্যে প্রায়শঃই পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিতেন তখন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক কালীপ্রসন্ন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভীকতা এবং অপক্ষপাতিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন, এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ—"ডেলি নিউসের একজন পত্রপ্রেরক বলেন. বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট একদিন মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বিচারকালে হেল্‌থ অফিসার ডাক্তার টনিয়ার সম্মুখে ছিলেন; ডাক্তার টনিয়র বলিলেন নেটিভদিগের সাক্ষ্য বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই কথায় কালীপ্রসন্নবাবু বলেন, "আমি মিউনিসিপ্যাল অফিসরের কথা শুনিয়া তাহার বিচার করিব না। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীদিগের সাক্ষ্য ও আমি অগ্রাহ্য করিব না। সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় সাক্ষিদিগের কথা যত দূর বিশ্বাস করি, সম্ভ্রান্ত দেশীয় লোকের কথা ততদূর বিশ্বাস করিব। একটুকুও ন্যূন করিব না।" সুপ্রীম কোর্টের বিচারাসন থেকে স্যার মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স বাঙ্গালী জাতিকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বলায় কালীপ্রসন্ন যে তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন এবং তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্‌ স্টেট্‌ স্যার চার্লস্‌ উডের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠানোয় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন বিচারক কালীপ্রসন্নের এই পক্ষপাতশূন্য নির্ভীক আচরণে সে কথা আবার আমাদের মনে পড়ে যায়।

আবার নিতান্ত মমতাশূণ্য হয়ে আইনের নীরস ব্যাখ্যা করাই যে ন্যায়বিচার নয়, দুঃখীর দুঃখের প্রতি সহানুভূতি যে ন্যায়বিচারের স্বার্থেই প্রয়োজন কালীপ্রসন্নের বিচারে আমরা সেই দৃষ্টান্তই পাই। ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হয়—

"A blind beggar was the other day brought up before Baboo Kaliprassonno Sing, Honorary Magistrate, on a charge of begging for alms in the streets. The appearance of the man at once exicited the sympathy of the Magistrate who far from punishing him gave him a donation of 2 Rs. out

of his own pocket and promised him a monthly relief of one rupee. A letter to the Secretary of the District Charitable Society was also directed to be written. We wish however the Magistrate had shown some sense of his displeasure to the over-zealous Police officer who hauled up a blindman for begging."

তবে প্রকৃত অপরাধী হলে সাহেবই হোক্, আর বাঙালীই হোক্ কোন অপরাধীই যে কালীপ্রসন্নের কাছে নিষ্কৃতি পেত না, সে সম্বন্ধে তথ্য পাই ২০শে আগষ্ট ১৮৬৪ তারিখের 'Indian Field' পত্রে—"News of the week Saturday, 20th August.—The 'Lahore chronicle' thus speaks of the impartial decision of a case by our energetic Honorary Magistrate Baboo Kaliprosonno Singh :— We quote the following Police Report from the 'Englishman', the Honorary Magistrate by whom it was tried is a Bengalee gentleman of independent and self reliant character, ...Baboo kali Prosonno has become since his accession to the Honorary Magistrate bench of Calcutta a terror to Bengalee villains and European rogues."

'বেঙ্গলী—ভিলেনে'র শাস্তি দেওয়া সহজ হলেও 'ইউরোপীয়ান রোগে'র শাস্তি দেওয়া কিন্তু সেকালে সহজ ব্যাপার ছিল না। এসব ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে দেশী হাকিমেরা ভয় এবং ইয়োরোপীয়ান হাকিমেরা পক্ষপাতিত্বের দ্বারা পরিচালিত হতেন। কালীপ্রসন্ন আদালতে বসে শুধু নিজেই যে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ করতেন তাই নয়, অন্য সকলেও যাতে ন্যায়বিচারের মর্যাদা রক্ষার জন্য আইনের যথাযথ প্রয়োগের নির্দেশ সহজে পেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি The Calcutta Police Act নামে একখানা আইনের বইও প্রকাশ করেন।

এইভাবে কালীপ্রসন্নের সমগ্র জীবন আলোচনা করলে দেখা যাবে যে তিনি জীবনে শুধু সাহিত্যসৃষ্টি, রঙ্গমঞ্চের উন্নতি এবং সংবাদপত্র পরিচালনেই

ব্যস্ত ছিলেন না, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদিকে যেমন সমাজসংস্কারের নানা চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ন্যায়বান ও নিরপেক্ষ বিচারপতি হিসাবেও তাঁর কর্মদক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। কিন্তু দেশ ও জাতির পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কালীপ্রসন্নের জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

শেষজীবন :—

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মহাভারত অনুবাদ সম্পূর্ণ হওয়ার পর মাত্র চার বছর কালীপ্রসন্ন জীবিত ছিলেন। সাধ্যের অতিরিক্ত দান ও সদনুষ্ঠানের ব্যয়ে তিনি শেষজীবনে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

মন্মথনাথ ঘোষ উল্লেখ করেছেন, "কেহ কেহ বলেন, একমাত্র মহাভারত প্রকাশে ও বিতরণে তাঁহার ন্যূনাধিক আড়াইলক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। তাঁহার উড়িষ্যার বিস্তৃত জমিদারী ও কলিকাতার বেঙ্গল ক্লাব প্রভৃতি মূল্যবান সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছিল।" তবে বেঙ্গল ক্লাবের বাড়ী পরে হস্তান্তরিত হলেও তা যে প্রথমে ঐ ক্লাবের কাছে লীজ দেওয়া হয়েছিল, জুন ২৮, ১৯৭০ তারিখের সানডে স্টেটস্‌ম্যানে R. P. Gupta এর লেখা বেঙ্গল ক্লাবের পুরাতন ইতিহাস-চর্চায় সে কথার উল্লেখ পাই। "...... In that year (1845) the Club (the Bengal club) moved to chowringhee and the building chosen was the Calcutta home of Macaulay when he was Law Member of the Supreme council from 1834 to 1838. The owner of the house was Kali Prasonna Singh who attained immortality in Bengali literature under the penname of Hutom or the owl. The house was taken on lease and so also were the houses at No. 1. Park Street and No. 1/1, Russel Street, to provide accomodation for resident members" অবশ্য উপরি উদ্ধৃত তথ্যেও কিছু বিভ্রান্তি এবং অস্পষ্টতা আছে। কারণ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে যদি বেঙ্গল ক্লাবের বাড়ীটি লীজ দেওয়া হয়ে থাকে তবে সে লীজ দেওয়া হয়েছিল কালীপ্রসন্ন সিংহের কাছ থেকে নয়, তাঁর পিতা নন্দলাল সিংহের কাছ থেকে, কারণ তিনি তখনও জীবিত। আর পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন সিংহ বেঙ্গল ক্লাবকে

বাড়ীটি বিক্রি করেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে উদ্ধৃতিতে কোন তথ্যের উল্লেখ নাই। যাই হোক্, কালীপ্রসন্ন শেষজীবনে কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধু কর্তৃক যথেষ্ট প্রতারিত হয়ে অবশেষে অধিকাংশ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। ১০ই শ্রাবণ, ১২৭৭ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' উল্লিখিত হয়েছে, "নিজ বিষয়—বিভবের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণ চেষ্টায় ইহঁার অতিশয় ঔদাসীন্য ছিল। এই দোষে শেষে ইনি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন।" প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে কালীপ্রসন্নের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক কলকাতার ছোট আদালতের তৃতীয় জজ হরচন্দ্র ঘোষ তার কিছুদিন আগে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে (১২৭৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে) লোকান্তরিত হন। যতদিন হরচন্দ্র ঘোষ জীবিত ছিলেন ততদিন কালীপ্রসন্নকে সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়নি। হরচন্দ্রের মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন তঁার চরিত্রগত সরলতা ও বিশ্বাসপরায়ণতার ফলে কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধু কর্তৃক যথেষ্ট প্রতারিত হয়ে অবশেষে অধিকাংশ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। অনেক সময় কালীপ্রসন্ন এই সব কপট আত্মীয়দের কপটতা বিশেষভাবে জেনেও তঁার বিশ্বাসপ্রবণ স্বভাবের জন্য তঁাদের উপর পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন করতেন। পরবর্তীকালে দানবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নেতাজী সুভাষ বোসের অনুরূপ ইঙ্গিতটি [১৮] প্রাসঙ্গিকভাবে আমাদের মনে পড়ে যায়।

যে মানব-সাধারণের কল্যাণের জন্য কালীপ্রসন্ন তঁার সর্বস্ব ব্যয় করেছেন, সেই মানব সাধারণের একাংশ—যারা আবার বিশেষভাবে আত্মীয়রূপে পরিচিত—তাদেরই কাছে বিশ্বাসভঙ্গের আঘাত পেয়ে তঁার শেষ জীবন অত্যন্ত অশান্তিতে কাটে। ঠিক এমনি বিশ্বাসভঙ্গের বেদনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত মানবতাবাদীও শেষ জীবনে কিছুটা 'সিনিক' হয়ে পড়েছিলেন এবং কার্মাটাড়ের সাঁওতালপল্লীতে শুধু দেহের নয়, হৃদয় ও মনের শুশ্রূষার জন্য বিশেষভাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু কালীপ্রসন্ন তঁার শেষজীবনে এরূপ কোন আশ্রয় খুঁজে পান নি। ফলে তিনি জীবনের অন্তিমপর্বে অতিরিক্ত মদ্যপান ক'রে সেই জ্বালা ভুলতে চেয়েছিলেন। 'পুরাতন প্রসঙ্গে' আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, "মৃত্যুর কয়েকবৎসর পূর্ব হইতেই তঁাহার কতকটা নৈতিক অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল।" কৃষ্ণকমলের উক্তিতে একথা স্পষ্ট যে কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পূর্বের কয়েক বছর ছাড়া তাঁর বাকী জীবনে কোন নৈতিক অবনতি ঘটেনি। সুতরাং মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর পূর্বে

থেকে তাঁর যে নৈতিক অবনতি শুরু হয়েছিল তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আজ একথাই বলতে হবে যে, আত্মীয় বন্ধুদের দ্বারা নানাভাবে প্রতারিত হয়ে মানুষের প্রতি অভিমান, অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু এবং সম্পত্তিনাশ ও ঋণজাল একসঙ্গে এই সবকটি কারণই তার জন্যে দায়ী; এজন্য কালীপ্রসন্নের চরিত্রে তাঁর প্রাপ্যের অতিরিক্ত দোষ দর্শন বা কলঙ্কলেপন করা হলে তা হবে তাঁর প্রতি তাঁর মৃত্যুর পরে আবার একবার বিশ্বাস-ঘাতকতার কাজ। এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হবার জন্য বর্তমান পাঠকসমাজের কাছে ১০ই শ্রাবণ, ১২৭৭ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' থেকে তথ্য পেশ করি "……শেষে ইনি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। ইঁহার সম্পত্তি নাশও তন্নিবন্ধন অবমাননা ও মনের অসুখই ইহঁার অকালমৃত্যুর কারণ।" অবশ্য এই সময়েও, এই মদ্যপান ইত্যাদি তথাকথিত নৈতিক অবনতির সময়েও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদির অধ্যয়নই যে তাঁর একমাত্র শান্তি ও আনন্দের কারণ ছিল সেকথা মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' গ্রন্থে উল্লেখ করে-ছেন। সুতরাং কালের ব্যবধান পেরিয়ে আজ আমাদের একথা বলার সময় এসেছে যে, তুষারের শুভ্রতা ও মেঘের মালিন্য দুই-এ মিলে যেমন গিরিশৃঙ্গের স্বর্গমুখিনতাই প্রকাশ করে, প্রতারিত শেষ জীবনে একই সঙ্গে শাস্ত্র ও সুরায় আত্মতৃপ্তি অন্বেষণের প্রচেষ্টাও তেমনি কালীপ্রসন্নের উন্নত মনের অপার্থিবতাই প্রকাশ করে।

তিরোভাব ঃ—

কালীপ্রসন্ন (১৮৪০—১৮৭০) মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

১০ই শ্রাবণ, ১২৭৭ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ—"৯ই শ্রাবণ অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময়ে বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদে ভারতবর্ষীয় মাত্রেই শোকার্ত হইবেন সন্দেহ নাই।"

এ সম্বন্ধে The Indian Mirror (July 29, 1870) পত্রিকায় যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

"........Last Sunday at about 8 O' Clock P.M. he died of a disorder of the liver brought on by his excesses,

in the 29th year of his age" সম্ভবতঃ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের জন্ম ধরে 'ইন্ডিয়ান মিরার' "the 29th year of his age" বলেছেন। কিন্তু কালীপ্রসন্নের জন্ম যে ১৮৪০-এর ফেব্রুয়ারী মাসে তার নিঃসংশয় প্রমাণরূপে আমরা 'ক্যালকাটা কুরীয়ার' পত্রে প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের জন্মোৎসবের বিবরণটি ইতিপূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁর বয়স যে ত্রিশ বছর পাঁচ মাস হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আবার সমসাময়িক সংবাদপত্রে মৃত্যুর সময় সম্পর্কে সামান্য দ্বিমত থাকলেও ('সোমপ্রকাশে' অপরাহ্ন তিন ঘটিকা', 'ইন্ডিয়ান মিরারে' '8 O' Clock P.M.'), মৃত্যুর তারিখ ২৪শে জুলাই ১৮৭০ (৯ই শ্রাবণ, ১২৭৭) সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই।

মন্মথনাথ ঘোষও লিখেছেন, "১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই দিবসে ৯ই শ্রাবণ, ১২৭৭ বঙ্গাব্দে বেলা তিন ঘটিকার সময় [কালীপ্রসন্ন] দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।" বেলা 'তিন ঘটিকা' সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়না যেহেতু সমকালীন দুটি ভিন্ন পত্রে ভিন্ন সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, তবে মন্মথনাথ কথিত দুরারোগ্য ব্যাধি যে 'disorder of liver' এবং সেটি যে 'brought on by his excesses' সে তথ্য পাওয়া গেল 'ইন্ডিয়ান মিরারে'। ['সেই সময়' উপন্যাসে কালীপ্রসন্নের (নবীন কুমারের) মৃত্যু হয়েছে এক পাগল নাকি হঠাৎ বুকের থেকে এক খাবল মাংস কামড়ে নেওয়ার ফলে। কিন্তু তা' যে সত্য নয়, সে তথ্য পাওয়া গেল তৎকালীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে।]

কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর 'বঙ্গভূষণ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন—

> "যদিও তোমাতে কিছু দোষ দেখা যায়,
> এ হেন মহান গুণে সে দোষ কি আর
> ধরে কেহ ;"

১২৭৭ সালের ১০ই শ্রাবণ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' 'বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যু' শীর্ষক প্রস্তাবে লেখা হয়েছে—"তাঁহার কিছু দোষ ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার গুণে পৃথিবী লাভবান হইয়াছেন, দোষে তাঁহারই ক্ষতি হইয়াছে। তিনি যথার্থই মানুষের বন্ধু ছিলেন।"

এই হল কালীপ্রসন্নের জীবন। প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসন্ন সিংহের কাছে বঙ্গদেশবাসীর কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অন্যতম নিদর্শন তাঁর 'মহাত্মা' উপাধি থেকেই প্রমাণিত হয় যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অন্তিম পর্বের কিছু দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে তাঁর সাহিত্যপ্রীতি, স্বদেশপ্রেম, সত্যনিষ্ঠা ও ধর্মপ্রাণতার মাহাত্ম্য চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়ের কথা দিয়েই কালীপ্রসন্নের জীবন প্রসঙ্গ শেষ করি।

"রহিল তোমার নাম সমুজ্জ্বল হয়ে
বালার্ক বিভার সম এ বঙ্গনিলয়ে।"

পরবর্তী বংশধারা :—

কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী শরৎকুমারী দাসী কালীপ্রসন্নের ভ্রাতুষ্পুত্র (বলাইচন্দ্র সিংহের তৃতীয় পুত্র) বিজয়চন্দ্র সিংহকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সেই সময়' উপন্যাসে দেখিয়েছেন নন্দলাল (রামকমল) সিংহ কালীপ্রসন্নের জন্মের পূর্বে হুগলী জেলার বাকসা থেকে তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্র গঙ্গানারায়ণকে দত্তবরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য এই যে নন্দলাল সিংহ নয়, মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে নিঃসন্তান কালীপ্রসন্নের অকালমৃত্যুর সময় তিনি তাঁর পত্নীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়ে যান এবং সেই অনুমতিক্রমে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী সেই জোড়াসাঁকোর সিংহ বংশেরই বলাইচন্দ্র সিংহের তৃতীয় পুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন। এই বিজয়চন্দ্র সিংহও কিভাবে সিংহ বংশের গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছিলেন এখানে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

বসন্তকুমার বসু প্রণীত 'কায়স্থ পরিচয়ে' বিজয়চন্দ্রকে "স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সুবিদ্বান, সহৃদয়, বিনয়ী, নম্রস্বভাব ও পরোপকারী ব্যক্তি" রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এছাড়াও তাঁর কর্মজীবনের বহু বিচিত্র পরিচয় আছে। তিনি পিতৃ-পরিচালিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজ নূতন আর্টপেপারে ছাপা উচ্চ শ্রেণীর সচিত্র সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশ করেন এবং 'দর্শক' নামে একখানি সচিত্র বাঙ্গালা সাপ্তাহিকও প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষে উন্নত প্রণালীর মুদ্রণ ও চিত্রশিল্প প্রবর্তনের জন্য লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে তিনি বিশাল মুদ্রাযন্ত্র ও ব্লক প্রস্তুত বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে বিশেষ সাফল্য

লাভ করেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, সাফল্য লাভের পরেই সেই মুদ্রণ ও ব্লক প্রস্তুতের সমস্ত জিনিসই 'বসুমতী' কে স্বল্পমূল্যে দিয়ে দেন এবং এর ফলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই 'বসুমতী' এক অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।[১৯]

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জগতে তিনি ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। তিনি তাঁর গবেষণা শক্তির দ্বারা ডায়াবেটিসের নবাবিষ্কৃত এলোপ্যাথিক ঔষধ ইনসুলিনের হোমিওপ্যাথিক সংস্করণ বের করে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর নিজের শরীরে অনেক বিষৌষধিরও পরীক্ষা করতেন এবং তার ফলাফল আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রবন্ধের মারফতে জানাতেন এবং সেখানকার সকলকে চমৎকৃত করে দিতেন। তাঁর আবিষ্কৃত বহু ঔষধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বলেন, "হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রে বিজয়চন্দ্রের স্থান মহাত্মা হ্যানিমানের অব্যবহিত পরেই।"[২০] যতীন্দ্রবিমলের এই মন্তব্যে একটু অতিরঞ্জন থাকলেও যক্ষ্মার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আবিষ্কার যে বিজয়চন্দ্রের চিকিৎসক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এত বড় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হয়েও তিনি নিজে যে শুধু প্রত্যহ দরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন তাই নয়, তাদের বিনামূল্যে ঔষধাদিও বিতরণ করতেন। তাছাড়া দরিদ্রদের জন্য তিনি দুজন বেতনভোগী চিকিৎসকও নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর চিকিৎসায় যেমন সুনাম ছিল, তাতে খুব সহজেই তিনি বহু অর্থ উপার্জন করতে পারতেন. কিন্তু চিকিৎসাবৃত্তিকে মানবসেবার উপায়রূপে গ্রহণ করেছিলেন বলে ধনী-দরিদ্র কারো কাছ থেকেই তিনি চিকিৎসার জন্য নিজ পারিশ্রমিকের মূল্য গ্রহণ করেননি। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং গৃহস্থ হয়েও গুরুর মত নিস্পৃহ সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করেছেন। তাঁর জ্ঞান-পিপাসা এতই প্রবল ছিল যে যখন যেখানে যে কোনও প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকযন্ত্রের আবিষ্কার হত, সাধ্যায়ত্ত হলেই তিনি তা তখনই ক্রয় করে তাঁর লেবরেটরীতে নিয়ে আসতেন। ইয়োরোপে এক্সরে মেসিন সবেমাত্র আবিষ্কার হলেও আমাদের দেশে যখন তার প্রচলন হয়নি বললেও চলে, সেই সময় বিজয়চন্দ্র চিকিৎসার সুবিধার জন্য তাঁর লেবরেটরীতে ইয়োরোপ থেকে এক্সরে মেসিন কিনে আনেন।

এ্যান্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটি স্থাপনের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ, পরামর্শ, অনুপ্রেরণা এবং অর্থসাহায্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

চিকিৎসা জগৎ এবং চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়াও জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর অসামান্য আগ্রহ ছিল। তাঁর বাড়ীর ত্রিতলের ছাদের উপর একটি সুউচ্চ লৌহমঞ্চ, তৈরী করিয়ে কখনো কখনো রাত চারটা পর্যন্ত সেই লৌহ মঞ্চে বসে তিনি শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে গ্রহতারার গতিবিধি নিরীক্ষণ করতেন।

চিত্রাঙ্কণেও ছিল তাঁর সবিশেষ আগ্রহ। বস্তুতপক্ষে আধুনিক হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসায় এবং ভেষজ গবেষণায় বিশ্বখ্যাতি অর্জন করে, দরিদ্রের বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং ঔষধাদি বিতরণে ব্যস্ত থেকে এবং অনলস অধ্যবসায়ে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করেও তিনি যে চিত্রাঙ্কণেও তাঁর আগ্রহ ও প্রবণতা দেখিয়েছিলেন তা প্রকৃতই এক বিস্ময়ের ব্যাপার।

তাছাড়া শিশুদের 'মল্টেড ফুড' তৈরী, রাশিয়ান ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা নিজ বাড়ীতে প্রকাণ্ড উনান তৈরী করিয়ে পাঁউরুটি তৈরী, এবং ভারতে প্রথম লিকুইড সাবান তৈরী প্রভৃতি বহু বিচিত্র কর্মেও তিনি মনোনিবেশ করেন।

তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের ধারা বজায় রেখে নিতান্ত সঙ্গোপনে এবং নির্লিপ্তভাবে যে দান করতেন তার পরিমাণও ছিল প্রচুর। কোন বিপন্ন ব্যক্তিই তাঁর কাছ থেকে রিক্ত হাতে ফিরে যেত না। তিনি সংসারে থেকেও এমন নিরাসক্ত ছিলেন যে, একবার একটি ইহুদি কোম্পানীকে ছ'লক্ষ টাকা ধার দিয়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হবার পরেও তাঁর সদাপ্রসন্ন হৃদয়ের কোন ভাবান্তর হয়নি।

নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সদ্‌গ্রন্থপাঠই ছিল এই গৃহস্থ সন্ন্যাসীর চিত্তবিনোদনের প্রধান উপায়। রাত্রি প্রায় দুটো আড়াইটা পর্যন্ত তিনি প্রায়শঃই পাঠনিরত থাকতেন।[২১]

কালীপ্রসন্ন সিংহের বর্তমান বংশধর সঞ্জীবচন্দ্র সিংহ, শুকদেবচন্দ্র সিংহ এবং অমলচন্দ্র সিংহের স্মৃতিচারণা থেকে জানিতে পারি বিজয়চন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র সিংহের ঐকান্তিক উৎসাহে ও যত্নে সিংহ বাড়ীর ঠাকুর দালান ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও নেতাজী সুভাস বসু প্রমুখ দেশনেতাদের উপস্থিতিতে (আঃ ১৯২২-

২৩ খৃষ্টাব্দে) কংগ্রেসের যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, তার উদ্বোধন করেন স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

এই বিজয়চন্দ্রের একমাত্র পুত্র সঞ্জীবচন্দ্র এখনও জীবিত আছেন। তিনি এখন বৃদ্ধ; কিন্তু বৃদ্ধের ধীরতা ও শিশুর সারল্য মিশিয়ে তাঁর চরিত্রে যে এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে তা কিছুতেই সহজে কাটিয়ে ওঠা যায় না। তাঁর তিন পুত্র বর্তমান— জ্যেষ্ঠ বাল্মীকি, মধ্যম ভার্গব ও কনিষ্ঠ গৌতম।

শান্তিরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহের বংশধরদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র সিংহের পুত্র শুকদেবচন্দ্র সিংহ জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারের প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত অট্টালিকার একাংশ এখনো সযত্নে বজায় রেখেছেন। তাঁর দুই কন্যা বর্তমান—জ্যেষ্ঠা শ্রীলা ও কনিষ্ঠা শর্মিলা। এ ছাড়া সিংহ বংশ সম্বন্ধে যাঁর কাছে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি, তিনি ঐ সিংহ বংশের বংশধর বিভাস চন্দ্র সিংহ। ১৯৮০ খৃষ্ঠাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রায় ৮৪ বছর বয়সে তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর সাতজন কন্যা ও পাঁচজন পুত্র সকলে জীবিত আছেন। কন্যাদের নাম যথাক্রমে রেবা, চিত্রলেখা, মণিকা, অনিমা, মঞ্জুশ্রী, রুনুশ্রী ও পূর্ণিমা এবং পুত্রদের নাম যথাক্রমে সুশান্ত সিংহ, প্রশান্ত সিংহ, জয়ন্ত সিংহ, শ্রীকান্ত সিংহ ও বেদান্ত সিংহ। সুশান্ত সিংহ বর্তমানে জার্মানীতে প্রবাসী; প্রশান্ত সিংহ দিল্লীতে, জয়ন্ত ও শ্রীকান্ত সিংহ কলকাতায় কর্মরত এবং বেদান্ত সিংহ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে বর্তমানে কানাডায় গবেষণারত। এ ছাড়া সিংহবংশের পরিপূর্ণ বংশপঞ্জী 'পরিশিষ্ট' অংশে সংযোজিত হয়েছে।

———

১) শিবনাথ শাস্ত্রীঃ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নিউ এজ সং ১৩৬২) পৃঃ ১০৯

২) মন্মথনাথ ঘোষঃ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৩২২) পৃঃ ৮

৩(i) **Peary Ch. Mitra : A Biographical sketch of David Hare—P. 20—21.**

৩(ii) তদেব, পৃঃ ৯৪, ৯৯, ১০১—১০২

৪) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য সাধক চরিতমালা ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সং বৈশাখ, ১৩৮৩) পৃঃ ৮—৯,

বসন্তকুমার বসু প্রনীত 'কায়স্থ পরিচয়' কলিকাতা খণ্ডেও (১ম ভাগ, ১ম সং ১৩২৮ সাল) এই তথ্য সমর্থিত হয়েছে।

৫) কলকাতার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের জন্মস্থান চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে একটি পুরাতন জরাজীর্ণ গ্রন্থাগারে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার যে খণ্ডগুলি এখনও সংগৃহীত আছে, তা থেকে এই সংবাদটি সংগ্রহ করার আমি সুযোগ লাভ করেছি। তবে পত্রিকাগুলি এমন অবস্থায় আছে যে অবিলম্বে সেগুলি সযত্নে রক্ষার ব্যবস্থা না হলে বিনষ্ট হবারই সমধিক সম্ভাবনা।

৬) ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খন্ড, (৭ম সং) পৃঃ ২০৩

৭) মন্মথনাথ ঘোষ : মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, (১৩২২) পৃঃ ৮

৮) The Indian Mirror, July 29. 1870

৯) মন্মথনাথ ঘোষ : মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, (১৩২২) পৃঃ ১১

১০। হুতোম প্যাঁচার নক্শা, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৮৪, পৃঃ ৪৯

১১। 'পুরাতন প্রসঙ্গের' পাঠকমাত্রেই আচার্য কৃষ্ণকমলের সঙ্গে পরিচিত আছেন। তবু অতীতের সেই প্রখ্যাত পুরুষ সম্বন্ধে এটুকু উল্লেখ করা হয়ত নিতান্ত বাহুল্য হবে না যে, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, সারদাচরণ মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, কবি নবীনচন্দ্র সেন, প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত বাঙ্গালী এক সময়ে এঁর ছাত্র ছিলেন। পরে ইনি হাইকোর্টের ওকালতি করেন এবং Tagore Law Lecturer হন। ইনি 'হিতবাদী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদকও ছিলেন ; বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পূর্বে ইনি 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃত সূচনা করেন।

জীবনের শেষভাগে তিনি রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল হন এবং অনেক বছর পরে অবসর গ্রহণ করেন।

১২। 'অর্ঘ্য'— অগ্রহায়ণ ১৩১৮

১৩। মন্মথনাথ ঘোষ : 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' (১৩২২) পৃঃ ৮

১৪। কালীপ্রসন্নের বর্তমান বংশধর (দত্তকপুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহের একমাত্র পুত্র)

অশীতিপর বৃদ্ধ সঞ্জীবচন্দ্র সিংহের বিবৃতি থেকে জানতে পারি ঃ—
"কালীপ্রসন্নের প্রথমা ও দ্বিতীয়া পত্নীর নাম ছিল যথাক্রমে ভুবনমোহিনী দাসী ও শরৎ কুমারী দাসী এবং তাঁর মায়ের নাম ছিল ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসী। আমার (সঞ্জীবচন্দ্রের) জন্ম ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আর কালীপ্রসন্নের মা ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসীর মৃত্যু হয় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে।"

এই নামগুলি এ পর্যন্ত কালীপ্রসন্নের কোন জীবনীগ্রন্থে পাওয়া না গেলেও সঞ্জীবচন্দ্র সিংহ সংরক্ষিত ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসীর হস্তাক্ষর দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছে আমার। কালীপ্রসন্নের মায়ের আলোকচিত্র পেয়েছি সিংহ পরিবারের বর্তমান বংশধরদের অন্যতম শুকদেবচন্দ্র সিংহের নিকট সংরক্ষিত সিংহ পরিবারের পারিবারিক আলোকচিত্র থেকে।

১৫। 'সোমপ্রকাশ' ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৩।

১৬। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ৩১শে মার্চ ১৮৬২।

১৭। 'The Indian Field' April 26, 1862.

১৮। পত্রাবলী ঃ দেশবন্ধুর জীবনচরিত লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্তকে লিখিত নেতাজীর পত্র। (মান্দালয় ২০।২।২৬)

১৯। ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সম্পাদিত 'পূর্ণচন্দ্র সিংহ স্মৃতি তর্পণ' (১৩৫৭) পৃঃ ৪৯

২০। তদেব। (১৩৫৭) পৃঃ ৪৮

২১। তদেব। (১৩৫৭) পৃঃ ৫০

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজপ্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন

শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, বাংলার সমাজেও মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ একটি অসামান্য নাম। সাহিত্যের মত সমাজেও তাঁর প্রচেষ্টা ছিল বহুমুখী। তাঁর এই সমাজচেতনা ও সমাজ-হিতৈষণা যে সমাজের প্রায় সর্বস্তরেই প্রসারিত হয়েছিল আমরা তার পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করব নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমে—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিচালিত বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ—বহুবিবাহ নিবর্তন আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা—কৌলীন্যপ্রথা রহিতকরণে চেষ্টা—কলকাতায় বারবণিতাদের বাসস্থান নির্দেশ-করণে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব—কৃষিবিষয়ে উৎসাহ—শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য—সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য সাহিত্য ও সংবাদপত্র উন্নয়নে দান—দুর্ভিক্ষ ও নানা জনহিতকর কার্যে দান—নীল-চাষীদের অকৃত্রিম বন্ধু ও সমাজব্রতী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার সম্বন্ধ—নীলদর্পণ মামলায় রেভারেণ্ড লঙের পক্ষ সমর্থন—সম্পূর্ণ নিজব্যয়ে 'নীলদর্পণ' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ এবং বিনামূল্যে বিতরণ—জমিদার হয়েও প্রজার পক্ষ অবলম্বন।

এই অধ্যায়ের আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে প্রথমেই যে কথাটি আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন তা হল, সমাজজীবনের বিস্তৃত পটভূমিতে স্থাপিত করে কালীপ্রসন্নের সমাজ-হিতৈষণার মূল্যায়ণ না হলে তৎকালীন সমাজ-চিত্রণই যে শুধু খণ্ডিত হবে তাই নয়, কালীপ্রসন্নের সমাজচেতনা ও সমাজকর্মের সঠিক গুরুত্বও উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না।

প্রথমে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের কথাই ধরা যাক্। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৩১শে শ্রাবণ ১২৭৭ সালে (১১ই আগষ্ট, ১৮৭০) খানাকুল কৃষ্ণনগরনিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এগার বছরের বিধবাকন্যা ভবসুন্দরীর সঙ্গে নিজের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে এক পত্রে লেখেন—"বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।"

কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের বহুপূর্ব থেকেই বাংলাদেশে বিক্ষিপ্তভাবে বিধবাবিবাহের চেষ্টা চলছিল। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিস্ময়কর হলেও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'কুলপঞ্জী'তেই বিধবাবিবাহের উল্লেখ আছে, গয়ঘড় বন্দ্য বংশীয় ফুলিয়া মেলের কুলীন ব্রাহ্মণ মথুরেশের একমাত্র পুত্র রাজারাম যে বিধবাবিবাহ করেছিলেন সে সম্বন্ধে 'কুলপঞ্জী'তে লিখিত হয়েছে ঃ "রাজারামস্য বিধবাবিবাহঃ চং রামজীবনরায়স্য কন্যা" এটি যদিও একটি ব্যক্তিগত ঘটনা এবং এর দ্বারা যদিও তখন কোন সমাজ-সংস্কার আন্দোলনও উপস্থিত হয়নি, তবু বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব রচনার সময় এই ঘটনার সন্ধান পেলে নিশ্চয়ই আরও বিস্মিত এবং উৎসাহিত হতেন। অতঃপর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবাবিবাহের ঠিক এক শ' বছর আগে) ঢাকার রাজা রাজবল্লভ আপন বিধবা কন্যার বিবাহ দেবার জন্য বিক্রমপুর, নদীয়া, বারাণসী, মিথিলা, দ্রাবিড় ও তৈলঙ্গদেশের পণ্ডিত সমাজের কাছে শাস্ত্রীয় বিধান প্রার্থনা করেন। তাঁরা সকলেই এই ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছিলেন, কিন্তু সার্বভৌম, বিদ্যাবাগীশ ও সিদ্ধান্ত—রাজবল্লভের এই তিন সভাপণ্ডিতের মধ্যে সিদ্ধান্ত পণ্ডিতের বিরুদ্ধসিদ্ধান্তের জন্য এবং নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতার জন্য শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টা কার্যে পরিণত হয়নি। রাজবল্লভের প্রস্তাব শুনে কৃষ্ণচন্দ্র বলেছিলেন—"এ ব্যবস্থা শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হলেও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলে রাজবল্লভকে নিরাশ করতে হবে। একজন বৈদ্যজাতীয় যে এই চির-অপ্রচলিত ব্যবহার প্রচলিত করে যাবেন এ কোনমতেই সহা যায় না।" রাজবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্রের চাতুরী বুঝতে না পেরে ঐ প্রচেষ্টা থেকে বিরত হন। পরবর্তীকালে নবদ্বীপরাজ শ্রীশচন্দ্র বলতেন—কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভের পাঠানো ব্যবস্থাপত্র পাঠ করে বলেন, "হায় আমি কেন আগে এ বিষয়ে চেষ্টা করিনি।"[১]

রাজা রামমোহন রায় যদিও প্রকাশ্যে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য কোন চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায় না, তবু তিনি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে যে 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন, তার বৈঠকে বালবৈধব্য ও বাল্যবিবাহ সম্পর্কেও যে আলোচনা হ'ত সে তথ্য পাই ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের Calcutta Journal-এ প্রকাশিত একটি বৈঠকের বিবরণে—"At the meeting the necessity of an infant widow passing her life in a state of celibacy, the

practice of polygamy and of suffering widows to burn with the corpse of their husbands, were condemned........"

১৮২৮ ২৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্র-শিষ্যদের 'Academic Association'—এর বৈঠকেও এইসব সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে নিয়মিত আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হয়েছে। তিরিশের গোড়া থেকে ইয়ংবেঙ্গল দল হিন্দুসমাজের এইসব কুসংস্কার ও অনাচারের ওপর তীব্র কশাঘাত করতে থাকেন।

তিরিশের আন্দোলনের ফলে এবং গোপনে শিশুহত্যা প্রথার মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভারতীয় 'ল কমিশন' হিন্দু বালবিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যাপারে আইন প্রণয়নের জন্য বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা শুরু করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তৎকালীন ভারতীয় 'ল কমিশনে'র সেক্রেটারি জে. পি. গ্রান্ট হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য কোন আইন পাশ করা যায় কিনা এ বিষয়ে মতামত জানাবার জন্য কলকাতা, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের সদর আদালতের বিচারকদের কাছে একটি পত্র লেখেন। ঐ পত্রের উত্তরে বিভিন্ন আদালতের ইংরেজ বিচারকরা যে মতামত জানান তার মর্মার্থ হল—হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা না থাকার ফলে সমাজে নানারকম কুফল দেখা দিচ্ছে একথা সত্য হলেও এবং মানবিক কর্তব্যের দিক থেকে আইন পাশ করা ন্যায়সঙ্গত হলেও এরকম কোন আইন প্রণয়ন করলে তার দ্বারা হিন্দুদের জাতিগত প্রথা ও সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। সুতরাং এরূপ কোন আইন প্রণয়ন না করাই সরকারের পক্ষে যুক্তিসংগত।

এদিকে জে. পি. গ্রান্টের ঐ পত্র লেখার দুমাস পূর্বে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় দেশে স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের প্রচলনের ব্যাপারে উৎসাহ দেবার জন্য একটি সভা আহ্বান করার সংবাদ প্রকাশিত হয়। 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া', 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', 'হরকরা', 'ক্যালকাটা কুরীয়ার', 'ইংলিশম্যান', 'রিফর্মার' ও 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় বিধবাবিবাহের সমর্থনে অনেক পত্র ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৪২-এর এপ্রিল সংখ্যা 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এ এক পত্রলেখক এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য একটি বিস্তারিত কর্মসূচীও লিপিবদ্ধ করেন। ঐ বছরের ২৬শে এপ্রিল 'সংবাদ প্রভাকরে' এই পত্রের তীব্র সমালোচনা করা হলে পরের মাসে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয়

প্রবন্ধে এই সমালোচনার উত্তর দেওয়া হয় এবং বিধবাবিবাহে কোন্ কোন্ শাস্ত্রীয় আচার পালনীয় সে সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়। ১৮৪২-এর জুলাই সংখ্যা 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটরে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্পষ্টই লেখা হয়—"এক্ষণে হিন্দুজাতীয় বিধবার বিবাহ পুনঃস্থাপনের অন্য কোন শাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইতেছে না ···আমরাও সম্প্রতি হৃষ্টচিত্তে দেখিতেছি যে উক্ত নিষেধ স্মৃতি শাস্ত্রের বিপরীত। এক্ষণে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে উক্ত বিষয় কি প্রকারে সিদ্ধ হইবেক? তাহাতে আমরা এইমাত্র কহিতে পারি যে অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা ও যুবাদিগের কর্তব্য কর্ম্মে সাহসাবলম্বনের উপদেশ ব্যতিরেকে এতদ্বিষয় ক্রমশ সিদ্ধ হইবার আর সদুপায় নাই আর আমাদিগের বোধ হয় যে কতিপয় হিন্দু ব্যক্তিরা যদ্যপি পুনর্ভূবিবাহ করিয়া পথ দেখান তবে ইহার প্রতি লোকের যে দ্বেষ আছে তাহাও ক্রমে হ্রাস হইয়া পরে সর্ব্বসম্মতরূপে প্রচলিত হইতে পারিবে।"

অতঃপর ১৮৪৩ এর ১৫ই জানুয়ারী 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটরে' এক পত্রলেখক তাঁর এই অভিমত প্রকাশ করেন যে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে সাফল্য লাভ করতে হলে শুধু শাস্ত্রীয় সমর্থন নয়, সরকারের আইনানুগ স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এদিকে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতার 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'ও বিধবাবিবাহের ব্যাপারে 'ধর্মসভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী-সভা'র সঙ্গে পত্রালাপ করেন। ঠিক তখনই এই পত্রালাপের কোন প্রত্যক্ষ ফল দেখা না গেলেও 'তত্ত্ববোধিনীসভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় সমাজসংস্কারে উদারনীতির আবহাওয়া ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত এই 'তত্ত্ববোধিনীসভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন সক্রিয় সদস্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিধবাবিবাহ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের চেষ্টা এবং কালীপ্রসন্নের সহযোগিতা বিশেষভাবে আলোচ্য। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম মত প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রথম সংস্করণের ২000 বই এক সপ্তাহের মধ্যে নিঃশেষিত হয়; দ্বিতীয় সংস্করণের ৩000 বই ও তৃতীয় সংস্করণের ১0,000 বইও অতি অল্পকালের মধ্যেই বিক্রীত হয়ে যায়। স্বাধীনতার

তিরিশ বছর পরেও যে দেশে শতকরা সত্তরভাগ লোক নিরক্ষর সেখানে আজ থেকে একশ'কুড়ি বাইশ বছর আগে দেশের শিক্ষিতের সংখ্যা এবং উপরি-উদ্ধৃত পুস্তকবিক্রয়ের হিসাবের কথা চিন্তা করলে এই বিধবা-বিবাহ আন্দোলন কত ব্যাপক হয়েছিল তা অনুমান করা যাবে। বিরুদ্ধবাদীরা বিদ্যাসাগরের মতের বিরুদ্ধে কিছু পুস্তিকা প্রকাশ করলে বিদ্যাসাগর আবার তাঁদের মত খণ্ডন করে ঐ বছরেরই অক্টোবর মাসে তাঁর বিধবা-বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। সে সময় সে যুগের প্রায় অধিকাংশ দেশীয় বাংলা সংবাদপত্রই যখন তাঁর নিন্দা করতে থাকে তখন কেবল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' 'সম্বাদ ভাস্কর' 'মাসিক পত্রিকা' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'ই তাঁর পক্ষ সমর্থন করে। আবার যশোহর 'হিন্দু ধর্মরক্ষিণীসভা' এবং কলকাতার 'ধর্মসভা' যখন বিদ্যাসাগরের মতকে প্রবলভাবে আক্রমণ করে, তখন কালীপ্রসন্ন 'সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে প্রবলভাবে সমর্থন জানায়। অতঃপর বিদ্যাসাগর শুধু মত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হলেন না, বিধবাবিবাহের ফলে জাত সন্তান যাতে বৈধ সন্তানরূপে স্বীকৃত হয় সেজন্য (১৮৫৫, ৪ঠা অক্টোবর) সরকারের কাছে প্রায় ১০০০ ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত একটি দীর্ঘ আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। এর ফলে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে যখন সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বিধবাবিবাহের আইন জারি করা সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা চলছিল, এবং যখন এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে কলকাতা থেকে প্রায় ৩৭০০০ স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র এবং ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, নদীয়া, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি স্থান থেকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত আরও ৪০টি আবেদনপত্র পেশ হচ্ছিল, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে বিদ্যোৎসাহিনী সভা থেকে বিধবাবিবাহের সমর্থনে বহু গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক-সভায় প্রেরণ করা হয়েছিল।

এ সম্পর্কে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে (১২মে, ১৮৫৬) নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপন দেখা যায়ঃ "বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবাবিবাহ পক্ষে লেজিসলেটিব কৌন্সেলে যে দরখাস্ত দিতে ইচ্ছা করিতেছেন তাহাতে তিন সহস্র ভদ্রলোকের স্বাক্ষর হইয়াছে, যদ্যাপি কেহ স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছা করেন বিদ্যোৎসাহিনী সভায় আগমন করিলেই স্বাক্ষর পুস্তক পাইবেন।"

এইসব আবেদন পত্র-পুষ্ট আন্দোলনের ফলে এসম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের নির্বাচিত সমিতি বিধবাবিবাহের প্রস্তাব সমর্থন করে ৩১শে মে তারিখে তাঁদের মন্তব্য প্রেরণ করেন এবং ১৯শে জুলাই মূল পাণ্ডুলিপিটি তৃতীয়বার (১৮৫৫-এর ১৮ই নভেম্বর প্রথমবার, ১৮৫৬-এর ৯ই জানুয়ারী দ্বিতীয়বার) পঠিত ও গৃহীত হয়: ২৬শে জুলাই গভর্ণর জেনারেলের সম্মতিক্রমে এটি আইনে পরিণত হয় (Act xv of 1856)।

বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হলে সেই বছরের নভেম্বর মাসেই কালী-প্রসন্ন সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন যে, যাঁরা বিধবাবিবাহ করতে ইচ্ছুক হবেন, বিদ্যোৎসাহিনী সভা তাঁদের প্রত্যেককে এক সহস্র টাকা পুরস্কার দিতে স্বীকৃত আছেন। এ বিষয়ে ২২শে নভেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল তা নীচে দেওয়া হল:

বিজ্ঞাপন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবাবিবাহেচ্ছু ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞাত করিতেছেন যে ১৭৭৭ শকীয় ঊনবিংশ সভায় সভার অধ্যক্ষ মহোদয়গণ প্রতি বিবাহে এক এক সহস্র মুদ্রা প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন, অতএব প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ সম্বন্ধ নিব্বন্ধ পত্রে স্বাক্ষরিত হইলেই বিবাহের পূর্ব্বে বিদ্যোৎসাহিনী সভা সঙ্কল্পিত অর্থ প্রদান করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

ঐ একই তারিখের গৌরীশংকর তর্কবাগীশ সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জানা যায়, কালীপ্রসন্ন শুধু প্রথম কয়েকজন বিধবাবিবাহকারীকে নয়, অগ্রহায়ণ থেকে কার্তিক পর্যন্ত সম্বৎসরের মধ্যে সকল বিধবাবিবাহকারীকেই এক হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন।

সম্বাদ ভাস্কর। সম্পাদকীয় ২২শে নভেম্বর ১৮৫৬। ৯৪ সংখ্যা।

"পাঠক মহাশয়েরা গত ভাস্করের (১৫ই নভেম্বর সংখ্যা) প্রথমাংশে এক বিজ্ঞাপন দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন (।) ঐ বিজ্ঞাপনের নীচে শ্রীযুক্তবাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নাম লিখিত আছে। কয়েক বৎসর হইল বিদ্যোৎসাহিনী নামে যে সভা হইয়াছে সিংহবাবু ঐ সভার সম্পাদকীয়

কার্যে বহু ধন ব্যয় করিয়াছেন। তাহাতে সাধারণের উপকার হইয়াছে ও হইতেছে। সভার অধীন পাঠশালায় বহু বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে ইহাতে কালীপ্রসন্নবাবু সাধারণের চিরস্মরণীয় হইবেন, রাজপুরুষেরা বিধবাবিবাহের বিধি প্রচার করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং বাহাদুর গল্পেং বলিয়াছেন যদি এতদ্দেশীয় কোন মান্য লোক উদ্যোগী হইয়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত করেন তবে কেবল মহারাজ বাহাদুর নামে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন এমত নহে, মহারাজ বাহাদুরের যে সকল চিহ্ন প্রয়োজনীয় হয় তাহাও দিবেন (।) ইহাতে বিধবাবিবাহের উদ্যোগকারী মহল্লোকদিগের পক্ষে লার্ড বাহাদুরের এই উদ্যোগ মহদুদ্যোগ হইয়াছে (।) কিন্তু প্রথমে যে পুরুষ বিধবানারী বিবাহ করিবেন এবং যে বিধবা ঐ পুরুষের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইবেন তাঁহারদিগের উৎসাহবৃদ্ধির জন্য কি রাজা কি প্রজা কেহ কোন অঙ্গীকার প্রচার করেন নাই, কালীপ্রসন্নবাবু যন্ত্রাগারে আসিয়া আমারদিগের সাক্ষাতে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং স্বহস্তলিখিত পত্র বিজ্ঞাপন দিয়াছেন (।) আমরা সাক্ষাৎকার তাঁহার বাক্যে সাক্ষীস্বরূপ হইয়াছি, যে স্ত্রীপুরুষ প্রথম বিবাহিত হইবেন, কালীপ্রসন্নবাবু তাঁহারদিগকে সহস্র টাকা পারিতোষিক দিবেন (।) এতদ্দেশে ধনীলোক অনেক আছেন এবং অনেকে বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানেও কষ্টস্বীকার করিতেছেন কিন্তু প্রথম বিবাহিত স্ত্রীপুরুষদিগকে পারিতোষিক দিবেন স্পষ্টরূপে কেহ এমত রাষ্ট্র করেন নাই, কালীপ্রসন্নবাবু একজন প্রধান হিন্দু এবং কলিকাতা নগরের আদি দলপতি বংশ, এইক্ষণেও ধনজন দলবলে পুষ্ট আছেন, তত্রাচ নিঃশঙ্ক হইয়া সমাচারপত্রে সহস্রমুদ্রা প্রদানের অঙ্কপাত করিয়াছেন; ইহাতে কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুকে হিন্দু প্রবরদিগের মধ্যে যথার্থ নরসিংহরূপে সম্বোধন করিতে হয় কিনা রাজপুরুষগণ দর্শন করুন, বিশেষত শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং ও শ্রীমতি লেডি কেনিং এবং শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ত গবর্ণর বাহাদুর ও ব্যবস্থাপক—সমাজবর শ্রীযুত গ্রাণ্ট বাহাদুর শ্রীযুত কালভিল বাহাদুর প্রভৃতি মহোদয়গণ বিবেচনা করিবেন; বহুকাল হইল আমরা যখন হিন্দু বিধবাবিবাহের প্রথমানুষ্ঠান করিয়াছিলাম তখন কেবল বাবু মতিলাল শীল মহাশয় বলিয়াছিলেন যদি কোন বিশিষ্ট লোক বিধবাবিবাহ করেন তবে ঐ স্ত্রী-পুরুষের সন্তোষ জন্য বিংশতি সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন, তৎপরে অন্য কোন ধনী হিন্দুমুখে আমরা এ বিষয় শ্রবণ করি নাই, গত মঙ্গলবার বেলা একাদশ ঘণ্টাকালে সিংহবাবু আমারদিগের বাটীতে আসিয়া ঐ মঙ্গল সমাচার বলিয়া গিয়াছেন এবং আরো

কহিয়াছেন এই অগ্রহায়ণাবধি আগামি কার্ত্তিক পর্যন্ত যত বিধবাবিবাহ হইবে প্রতি বিবাহিত স্ত্রী পুরুষকে সহস্র টাকা দিবেন (।) অতএব আমরা তাঁহার উদারতা, সাহসিকতা বদান্যতা ও সাধারণ হিতৈষিতা ইত্যাদি মহদ্‌গুণে আবদ্ধ হইয়া হিন্দু বিধবাবিবাহ সপক্ষসমাজে তাঁহাকেই রাজটীকা দিলাম, পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় 'মহারাজ বাহাদুর' নামের যোগ্য পাত্র হউন।"

বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রথম বিধবাবিবাহ হয় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর। এই বিধবাবিবাহে কালীপ্রসন্ন যে বিশেষভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন তার ইঙ্গিত পাই ১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৫৬ তারিখের 'সম্বাদভাস্করে'র সম্পাদকীয়তে—

"......পূর্বোক্ত মহামহিমদিগকে সম্বোধন করিয়া মহারাজ (বর্ধমানের) প্রথমতঃ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিলেন (।) তৎপরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য ধনী গন্যমান্যগণ যাঁহারা উদ্যোগী হইয়া বিধবাবিবাহ সম্পন্ন করিয়াছেন তাঁহারদিগকে বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুকে সাধুবাদ দিলেন (।) তৎপরে কহিলেন এত শীঘ্র বঙ্গদেশে বিধবাবিবাহ নির্ব্বাহ হইবেক পূর্ব্বে আমার এমত বিশ্বাস হয় নাই, এতদ্দেশীয় লোকেরা মৌখিকাড়ম্বরে দরিদ্র নহেন, কার্য্যকালে সে আড়ম্বর অম্বরাশ্রয়ে লজ্জা সম্বরণ করে। বিধবাবিবাহ সপক্ষেরা এ বিষয়ে যেমন সসংকল্প হইয়াছেন অমনি সম্পন্ন করিয়াছেন (।) অতএব আমি তাঁহারদিগের প্রতি অপরিত [অপরিমিত] সন্তুষ্ট হইয়াছি, অভিলাষ করি উৎসাহ প্রদানার্থ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে এক রৌপ্য থালা এবং বেশ্ নামক এক রৌপ্য পাত্র যৌতুক দিব, রৌপ্য থালার উপরে বেশ্ পাত্র রক্ষিত হইবে, থালে এবং বেশপাত্রের চতুর্দিকে এইরূপ বিবরণ লেখা থাকিবে এতকালের পরে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন হিন্দু বিধবাবিবাহের পুনর্জন্মের জন্মদাতা হইলেন, শ্রীযুত মহারাজ আরো অনেক সদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্য স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।......"

কিন্তু কালীপ্রসন্ন যে সব ক্ষেত্রে সম্বৎসরের মধ্যে সকল বিধবাবিবাহকারীকে এক হাজার টাকা পারিতোষিক দানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি সে তথ্য পাই কয়েকমাস পরের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় প্রকাশিত কোন এক পত্রলেখকের একখানি পত্রে। পত্রলেখক লেখেন ঃ

"শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে গমনপূর্ব্বক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করতঃ বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিয়াছিলেন সম্বৎসর মধ্যে বিধবাবিবাহের সাহায্য ও উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে প্রত্যেক বিবাহে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন, সে বিজ্ঞাপন এইক্ষণে কোথায় থাকিল, বাবুমহাশয়ের বাক্য শরৎ-কালের মেঘগর্জনের ন্যায় কেবল ডাক হাঁক সার হইল. আমি বিধবারমণীর পাণিপীড়ন করিয়া মহাবিপদগ্রস্ত হইয়াছি. কোন ব্যক্তির পরামর্শক্রমে উক্ত মহাশয়কে পত্র লিখিয়া বিস্তারিত জ্ঞাপন করিয়াছি, অনুমান ছিল বাবু মহাশয়ের বদান্যতা সফল হইবেক, তাহা কৈ হইল, সে পত্র প্রাপ্ত হইলেন কিনা তাহাই বা কিসে জানিতে পারিব ; এইক্ষণে মহাশয়ের অতুল্য অমূল্য ভাস্করের আশ্রয় ভিন্ন আর উপায় দেখি না, মহাশয় দয়াপূর্ব্বক এই পত্রখানি প্রকাশপূর্ব্বক আমার হৃদয়াকাশের চিন্তারূপ অন্ধকার বিনাশ করিয়া বাধিত করিবেন।"—শ্রীহরি চক্রবর্তী।

কালীপ্রসন্ন কেন কোন কোন ক্ষেত্রে পারিতোষিক দান করেননি তার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। বিধবাবিবাহ আইন পাশ হবার পর যখন রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় পাওয়া গেল তখন কিছু লোক অর্থলোভে বিধবাবিবাহে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং অর্থপ্রাপ্তির পর বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই পত্নীকে পরিত্যাগ করতেও বিলম্ব করতেন না। আসলে এঁদের অনেকেই বিধবাবিবাহের নামে বহুবিবাহই করেছেন এবং সেজন্য উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে যথাসম্ভব আর্থিক সাহায্য ও আদায় করেছেন। এই সত্য অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্বয়ং বিদ্যাসাগরের কাছেও প্রকট হয়ে উঠেছিল এবং হরি চক্রবর্তীর মতো অর্থলোভী ও অপদার্থ লোকের বিধবাবিবাহে তিনিও অত্যন্ত মর্মাহত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই প্রবঞ্চনা বন্ধ করার জন্য বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের পাত্রকে দিয়ে একখানি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে সই করিয়ে নিতেন।

এবার বিদ্যাসাগরের লেখা যে পত্রাংশটিতে কেউ কেউ কালীপ্রসন্নের প্রতি কটাক্ষপাত আছে বলে মনে করেন তা কতদূর যুক্তিগ্রাহ্য বিচার করা প্রয়োজন।

"·...আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ

বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্ম্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, কেহ ভুলিয়াও এবিষয়ের সংবাদ লয়েন না।······"

শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ তাঁর 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে উপরিউদ্ধৃত পত্রাংশটি উল্লেখ করে অনুমান করেছেন যে এতে বিদ্যাসাগর কালীপ্রসন্ন সিংহের মতো ধনী ব্যক্তি দিগের কটাক্ষ করেই এইরূপ উক্তি করেছেন। কিন্তু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (পরবর্তী কালের দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) লেখা বিদ্যাসাগরের ঐ পত্রটি সম্পূর্ণ পাঠ করলে দেখা যাবে যে ঐ পত্রের প্রথমাংশে তিনি সোজাসুজি তাঁর বন্ধু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য দায়ী করে পরিশেষে এই সাধারণ মন্তব্যটি করেছেন। দুর্গাচরণকে লেখা তাঁর ঐ পত্রের প্রথমাংশ হল:

"···কেহ মাসিক কেহ এককালীন কেহ বা উভয় এইরূপে নিয়মে অনেকে [অর্থ সাহায্য] দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কোন হেতু দেখাইয়া কেহ বা তাহা না করিয়াও দিতেছেন না। অন্যান্য ব্যক্তি-দিগের ন্যায় তুমিও [দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়] মাসিক ও এককালীন সাহায্য-দান স্বাক্ষর কর। এককালীনের অর্দ্ধমাত্র দিয়াছ অবশিষ্টার্দ্ধ এ পর্য্যন্ত দাও নাই এবং কিছু দিন হইল মাসিক দান রহিত করিয়াছ।"

অবশ্য ঐ পত্রের শেষাংশে "অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, কেহ ভুলিয়াও এ বিষয়ের সংবাদ লয়েন না" বিদ্যাসাগরের এই আক্ষেপে দুর্গাচরণ ছাড়া আরও অনেককেই দায়ী করা যায়। কিন্তু ঐ অনেকের মধ্যে বিদ্যাসাগর কোথাও (ঐ পত্রের মধ্যে বা অন্য কোথাও) প্রত্যক্ষভাবে কালীপ্রসন্নকে দায়ী করেন নি। বরং কালীপ্রসন্নের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের দীর্ঘস্থায়ী সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক, এমন কি হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র স্বত্বা-ধিকারী হলে ঐ পত্র পরিচালনায় বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধান, কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদের সময় বিদ্যাসাগরের সক্রিয় সহযোগিতা এবং কালীপ্রসন্ন প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রভৃতির কথা মনে রাখলে কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে ঐ ধরণের কোন সন্দেহ

আমাদের মনে ছায়াপাত করতে পারে না। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগরের আপোষহীন একরোখা মনোভাব এবং স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব দিলে বিদ্যাসাগর-কালীপ্রসন্নের সপ্রসন্ন সহযোগিতার আলোকে কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে এই কাল্পনিক সন্দেহ সহজেই নিরসন হতে পারে। কারণ বিদ্যাসাগরের ঐ স্পষ্টবাদিতা এবং কপটতার প্রতি ঘৃণার জন্য তাঁর অনেক বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গেও সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল। এ ধরণের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার দৃষ্টান্ত হল বিধবাবিবাহের ব্যাপারে রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মনোমালিন্য— যদিও রমাপ্রসাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পূর্বে খুবই হৃদ্যতা ছিল। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা হল ঃ

"শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সর্ব্বপ্রথম বিধবাবিবাহ হয়। তখন কলিকাতার অনেক বড়লোক এ বিষয়ে সাহায্য করিতে এবং বিবাহ স্থলে উপস্থিত হইতে প্রতিশ্রুত থাকিয়া একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করেন। লজ্জার বিষয় এই যে কেহই উপস্থিত হন নাই। এ বিবাহের পূর্ব্বে তিনি (বিদ্যাসাগর) স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রমাপ্রসাদ রায় বলিলেন, 'আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, সাহায্যও করিব, বিবাহস্থলে নাই গেলাম।' এই কথা শুনিয়া-ঘৃণা এবং ক্রোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিয়ৎক্ষণ কথা বাহির হইল না। তারপর দেওয়ালে স্থিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'ওটা ফেলে দাও।' এরূপ বলিয়া চলিয়া গেলেন।"[২]

এখানে লক্ষনীয় হল, রমাপ্রসাদ রায়ের মত লোক যখন প্রথম বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতেও শঙ্কিত হয়েছেন, তখন ১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৫৬ তারিখের 'সম্বাদভাস্করে'র সম্পাদকীয়তে দেখা যায় "...যাঁহারা উদ্যোগী হইয়া (প্রথম) বিধবাবিবাহ সম্পন্ন করিয়াছেন তাঁহারদিগকে বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুকে (বর্ধমানের মহারাজা) সাধুবাদ দিলেন।" বিধবাবিবাহ ব্যাপারে কালীপ্রসন্নের এই সহযোগিতা যে শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল সে সম্বন্ধে প্রমাণ পাই কালীপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যুর পর ১০ই শ্রাবণ ১২৭৭ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদে—

"...বিধবাবিবাহ ও অন্য অন্য সামাজিক উৎকর্ষসাধন প্রস্তাবে তাঁহার ন্যায় অল্পলোকে সাহায্য দান করেন।"

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ফলাফল বিচারে আজ অবশ্য একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, বিদ্যাসাগরের এই প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও অর্থব্যয় এবং কালীপ্রসন্নের সবিশেষ সহযোগিতা সত্ত্বেও বিধবাবিবাহ বিশেষ প্রচলিত হয় নি। এখনকার সমাজে তো আবার অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে অবিবাহিতা কন্যার বিবাহই বিশেষ সমস্যা হয়ে উঠেছে, বিধবাবিবাহের কথা চিন্তা করারও অবকাশ নেই। কিন্তু যে যুগে ৯ বছর বা তারও কম বয়সের মেয়েরাও বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসত এবং তাদের উপর সারাজীবন বৈধব্যপালনের ফতোয়া জারি হত আর এই সামাজিক কুপ্রথার গোপন সুড়ঙ্গপথে দুর্নীতি, ব্যভিচার ও ভ্রূণ হত্যার মত পাপও সমাজে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এই সমাজ সংস্কারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। তা ছাড়া আন্দোলনের সার্থকতা বিচারে শুধু সংখ্যাগত বা পরিমাণগত হিসাবই যথেষ্ট নয়, গুণগত মূল্য বিচারও কর্তব্য সুতরাং বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় এবং কালীপ্রসন্নের সহযোগিতায় কতগুলি বিধবাবিবাহ হয়েছিল, সেটাই বড় কথা নয়, এই আন্দোলনের ফলে স্ত্রীজাতির প্রতি যে শ্রদ্ধা ও মানবতাবোধ জাগ্রত হয়েছিল সেটাই প্রধান বিচার্য বিষয় কারণ স্ত্রীজাতি যে শুধু পুরুষের ভোগ্যপণ্য ও সেবাদাসী নয়, তাদেরও যে সুখ দুঃখ আছে, স্বাধীন সত্তা আছে এই সত্যের স্বীকৃতি, স্ত্রীজাতির প্রতি এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল এবং মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা থেকে আধুনিক যুগ ও মানবতাবোধে উত্তরণের একটি প্রধান তোরণ দ্বার।

বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের পর বহুবিবাহ নিবর্তন। ১৮৫৫-এর ৪ঠা অক্টোবর বিধবাবিবাহের জন্য আবেদন পত্র পেশ হয়েছিল, আবার ঐ বছরেরই ২৭শে ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বহুবিবাহ নিবর্তনের আইন প্রণয়নের জন্যও আবেদনপত্র পেশ হল।

এই আন্দোলনেও কালীপ্রসন্ন সিংহ ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হওয়ায় এ আন্দোলন স্থগিত থাকে। বিদ্রোহের গোলযোগ প্রশমিত হবার পরে পুনরায় এ বিষয়ে চেষ্টা হলেও ইংরেজ সরকার বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করতে ভরসা পেলেন না। 'পুরাতন প্রসঙ্গে' আচার্য কৃষ্ণকমল খুব সুন্দরভাবে এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন,—"ইংরাজ

গভর্নমেণ্ট বহুবিবাহ নিষেধক আইনের দিকে অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না। বিধবাবিবাহের বৈধতাসম্পাদক আইন তাঁহারা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার কথা স্বতন্ত্র। কারণ বিধবাবিবাহে কোনও জবরদস্তি নাই, কেবল অনুমতি দেওয়া মাত্র (permissive—not Coercive)। আইন বিধবাকে বলিতেছে—'ইচ্ছা হয়, বিবাহ কর ; না হয় না কর ; কিন্তু যদি কর তোমার সন্তান আইনমতে জারজ বলিয়া পরিগণিত হইবে না।' পক্ষান্তরে বহুবিবাহ নিষেধ করিতে গেলে জবরদস্তি করা হয় ; এই জবরদস্তি করিতে ইংরেজ গবর্নমেন্টের ভরসা হয় নাই। তাঁহাদের অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে, বিধবাবিবাহের আইন সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। সুতরাং এরূপ আইন বিষয়ে ইংরাজের আতঙ্ক জন্মিয়াছিল।" যাই হোক, এই প্রথম পর্বের আন্দোলনের পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ থেকে বিদ্যাসাগর আবার একবার (তখন কালীপ্রসন্ন সিংহ মৃত) আন্দোলনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তখনও ইংরেজসরকার আইন প্রণয়ন করতে সাহসী হন নি। এ আইন অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিধিবদ্ধ হল স্বাধীন ভারতবর্ষে (তার বহু পূর্বেই অবশ্য বিদ্যাসাগর পরলোকে)।

বহুবিবাহ রোধ ছাড়া কৌলিন্যপ্রথা রহিত করার জন্য বিদ্যাসাগর যে আন্দোলন গড়ে তোলেন, কালীপ্রসন্ন তাতেও সহযোগী ছিলেন। বাংলা-দেশে কৌলিন্যপ্রথার অত্যাচার যে কী বীভৎস ছিল, সমাজের বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় আজ আর তা ঠিক আঁচ করা যাবে না ; শুধু সমসাময়িক কিছু গ্রন্থে ও সংবাদপত্রে তার যে সাক্ষ্য থেকে গেছে, তা থেকেই এই সমস্যার গভীরতা বোঝা যাবে। মধ্যযুগের 'কুলসার' গ্রন্থে কুলের মহিমা ঘোষিত হয়েছিল এইভাবে—

"আর গুণ যার গুণ তার সঙ্গে যায়।
কুলগুণ মহাগুণ পুরুষক্রমে পায়॥
অসৎ করয়ে সৎ কুলের এই কর্ম্ম।
লোহারে করয়ে সোনা পরশের ধর্ম্ম॥"

কিন্তু শুধু কৌলিন্য প্রথায় সমাজের যত অনিষ্ট সাধন হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী অনিষ্ট সাধিত হল দেবীবর ঘটক বিশারদের 'মেলবন্ধন' ব্যবস্থায়। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে বল্লাল সেন, আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা ও দান কৌলিন্যের এই নয়টি গুণ[৩] অনুসারে ব্রাহ্মণদের কুলীন, শ্রোত্রীয়, গৌণকুলীন, বংশজ ও সপ্তশতী

এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছিলেন; আর তাঁর প্রায় দু'শ' বছর পরে দেবীবর ঘটক দোষ অনুসারে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছত্রিশ রকমের 'মেলবন্ধনের' সৃষ্টি করলেন। যে যে কুলীন বংশ একই প্রকার দোষে দূষিত তারা এক সম্প্রদায় বা 'মেল' ভুক্ত হল—'দোষান্মেলয়িতীতি মেলঃ'। এইভাবে দুর্নীতি, বিভিন্ন ধরণের ব্যভিচার ইত্যাদি পৃথক পৃথক দোষ অনুসারে সে যুগের কুলীনেরা মোট ছত্রিশটি মেলে বিভক্ত হলেন। কোন্ কোন্ দোষে কি কি মেলবন্ধন হয়েছিল তার বিস্তারিত উল্লেখ আছে 'দোষমালা' গ্রন্থে। এখানে তা থেকে ধন্ধদোষ, মঘদোষ, মুলুকজুরী দোষ প্রভৃতি কয়েকটি দোষের উদাহরণ দিলে সেইসব বিভিন্ন দোষের দ্বারা মেলবন্ধন ও সেই মেলের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টার মধ্যে কৌলীন্যপ্রথার বিকৃতিটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমে ধরা যাক ধন্ধদোষের কথা। শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দুই অবিবাহিতা কন্যা ধন্ধ নামক স্থানে এক যবন কর্তৃক বলাৎকৃতা হয়। এর নাম হয় 'ধন্ধদোষ'। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মঘ-পর্তুগীজ দস্যুরা কন্যাহরণ করতে থাকে এবং তা থেকে বাংলার কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যারাও রেহাই পান না। এর ফলে যখন কোন কুলীন কন্যা 'মঘেন নীতা' হয়, তখন সেই কুলীন বংশের হয় 'মঘদোষ'। আবার গঙ্গানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবাচার্য মুলুকজুরী কন্যা বিবাহ করেন, এর নাম হয় 'মুলুকজুরী দোষ'। এইভাবে কৌলীন্যের কোন গুণ অবশিষ্ট না থাকলেও গুণভিত্তিক কৌলীন্যপ্রথার পরিবর্তে দোষভিত্তিক কৌলীন্যপ্রথার দ্বারা বিবাহসম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ সমাজে দৃঢ়মূল হয় এবং এর পরিণামও হয় সাংঘাতিক। কারণ পূর্বে কুলীনেরা নিজেদের মধ্যে অবাধে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারতেন, কিন্তু দেবীবরের 'মেলবন্ধন' নীতি অনুযায়ী মেলের বাইরে বিবাহ যখন একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে যায়, তখনই কুলীন কন্যাদের বিবাহ এক বিরাট সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। দেবীবরের প্রচলিত বহু 'মেল' কালক্রমে সংকীর্ণ হয়ে আসায় মেলবন্ধনযুক্ত কুলীন পাত্রের জন্য সমাজে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং তারই অবশ্যম্ভাবী কুফলরূপে একদিকে যেমন বহু কুলীন কন্যা আমৃত্যু অনূঢ়া থাকে তেমনি অন্যদিকে দেখা দেয় সমাজে পণপ্রথার প্রবল অত্যাচার। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার ছোটলাট স্যার সিসিল বীডন বহুবিবাহ ও পণপ্রথা সম্বন্ধে যে তদন্তকমিটি নিয়োগ করেন তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় 'India Gazette'-এ। ঐ রিপোর্টের একস্থানে প্রকাশ—"Families, it is said, are ruined in order to provide the large sums

requisite to give a consideration on the occasion of their marriages ...." । রিজলি সাহেব তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Tribes and Castes of Bengal'-এ উল্লেখ করেছেন যে পণের অঙ্ক দু' হাজার টাকায় (যে যুগে ধানের মণ প্রায় দু টাকা[8]) প্রায়ই উঠত এবং পূর্ববঙ্গে কুলীনের চাহিদা এত বেশী ছিল যে দশবছর বয়স হলেই কুলীন সন্তানের বিবাহের কথা আলোচিত হত এবং বিশ বছর বয়সের পূর্বেই সেই কুলীন সন্তান বহুপত্নী লাভে সমর্থ হতেন। বিবাহের পর এই সব পত্নীদের অধিকাংশই পিত্রালয়ে সারাজীবন কাটাতেন এবং তাঁদের গর্ভজাত সন্তানেরাও মাতুলালয়ে পালিত হতেন—কুলীন পিতারা সব সময় তাঁদের চিনতেনও না। এ সম্বন্ধে তৎকালে যে মজার প্রবাদ প্রচলিত ছিল তার মধ্যে সামাজিক অভিশাপের নগ্নরূপটি সরস রসিকতায় আভাসিত হয়েছে। একজন কুলীন যুবক শ্বশুরালয় থেকে হঠাৎ পুত্রের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ পেয়ে যখন ভেবে অবাক হচ্ছিলেন যে সঙ্গত সময়ের মধ্যে তিনি ঐ শ্বশুরালয়ে না যাওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তাঁর পুত্রসন্তান হল তখন তাঁর এই বিমর্ষভাব দেখে তাঁর কুলীন পিতা ঈষদ্‌হাস্য করে সান্ত্বনা দিলেন যে তিনিও তাঁর বর্তমান পুত্রের জন্মসংবাদ এইভাবেই পেয়েছিলেন।

এই কৌলীন্য প্রথা বাংলাদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুসমাজে কতদূর ব্যাপক হয়েছিল তা তৎকালে প্রকাশিত কয়েকটি তালিকা থেকে বোঝা যাবে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় বহুবিবাহকারী কুলীনদের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। এতে ২৭জন কুলীনের ৮১৮টি বিবাহের সংবাদ পাওয়া যায়। আবার ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'— পুস্তকে যে তালিকা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় হুগলী জেলার ৭৬টি গ্রামের ১৩৩জন কুলীনের ২১৫১জন পত্নী ছিলেন। সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগর এ-ও বলেছেন যে, যে সব কুলীনের পত্নীসংখ্যা পাঁচের কম ছিল, তিনি তাদের এই তালিকাভুক্ত করেন নি। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গ ও এব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না। পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে ৬৫২জন কুলীনের ৩৫৮৮জন পত্নী ছিলেন। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তালিকা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, "তালিকাটি প্রমাদশূন্য নহে" এবং "কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না—কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না—কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, আপনা

হইতেই (বহুবিবাহ) কমিতেছে"—তবু বাংলা ১২৯৮ সালে অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের তালিকা প্রকাশিত হওয়ার প্রায় বিশ বছর পরে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা এবিষয়ে বহু অনুসন্ধান করে যে তালিকা প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায়, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, বীরভূম, মেদিনীপুর, ২৪পরগণা. কলকাতা, নদীয়া, যশোর. বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার ২৭৬টি গ্রামে ১০১৩জন কুলীনের ৪৩২৩জন পত্নী ছিলেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে এই বিকৃত ও বীভৎস বহুবিবাহ প্রচলনের জন্য কৌলীন্য প্রথাই ছিল সম্পূর্ণ দায়ী। এ প্রসঙ্গে পাদ্রী ওয়ার্ড লিখেছেন—"Vallal's creation of the order of Merit ended in a state of monstrous polygamy, which had no parallel in the history of human depravity. Among the Turks seraglios [luxurious Harems] were confined to men of Wealth. But in Bengal a Hindu Brahmin, possessing only a shred of cloth and a naita kept more than a hundred mistresses." ৫ একগাছি পৈতার জোরে দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণেরা যেভাবে সহস্র সহস্র বঙ্গনারীর সর্বনাশ করেছেন অথবা সর্বনাশের আশায় বসিয়ে রেখেছেন, সত্যই তার তুলনা নেই। ১৭৬৪ শকের (১৮৪২ খৃঃ) 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় 'চিঠিপত্র' স্তম্ভে এই কৌলীন্য প্রথার বিষময় সামাজিক ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে একজন পল্লীবাসী পত্রলেখক লেখেন—"আপনারা সর্বদাই নগরমধ্যে বসতি করেন, পল্লীগ্রামের সকল ব্যাপার জানিতে পারেন না, গ্রাম্যসমাজে যাঁহারা কুলীনরূপে পূজ্য হইয়াছেন, তাহারদিগের অহংকার দেখিলে বোধ হয় তাঁহারাই বল্লাল সেনের রাজ্যভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক কুলীন ভার্য্যাগণের পরিত্রাণার্থ মহাশয়কে যত্নশীল দেখিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম (।) এইক্ষণে নিতান্ত মনে প্রার্থনা করি জগদীশ্বর মহাশয়কে অচিরাৎ কৃতকার্য্য করুন।" ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটকে অধর্মরুচির উক্তিটিও এ প্রসঙ্গে সত্যই স্মরণীয়—"মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়ে গেছেন তার হাজাশুকো নেই—তাতেই আমরা সুখে আছি। আমরা রাজারও রেয়েত নই, সেধেরও খাতক নই, আপনি কি কুলীনের ছেলের বিষয় জানেন না?" বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "গত দুর্ভিক্ষের সময়, একজন ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। তিনি লোকের নিকট আস্ফালন করিয়াছিলেন, দুর্ভিক্ষে কত লোক অন্নাভাবে মারা

পড়িয়াছে, কিন্তু আমি কিছুই টের পাই নাই ; বিবাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছি।"

এই কৌলীন্যপ্রথার দাপট যে শুধু উনবিংশ শতাব্দী নয়, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্তও বর্তমান ছিল তা দেখা যায় সরকারী তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত বর্ধমান, হুগলী, ঢাকা, যশোর প্রভৃতি জেলার District Gazetteer-গুলিতে। সুতরাং বিদ্যাসাগর-কালীপ্রসন্নের কালে এই কৌলীন্য প্রথার অত্যাচার যে কিরূপ প্রবল ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

কৌলীন্য প্রথার এই বিকৃতরূপ সমাজে প্রচলিত থাকায় বিবাহিতা ও অবিবাহিতা কুলীন কন্যাদের লাঞ্ছনাও যেমন বেড়েছিল, তেমনি বহু কুলীন কন্যা এবং শ্রোত্রিয় ও বংশজপুত্র অবিবাহিত থাকায় এবং অধিকাংশ বিবাহিতা কুলীন কন্যাদেরও চিরজীবন পিত্রালয়ে থাকার ফলে সমাজে ব্যাপক দুর্নীতি এবং ব্যভিচারও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

কৌলীন্য প্রথার এই মর্মন্তুদ সামাজিক অবস্থায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কালীপ্রসন্নও কৌলীন্য-প্রথা রহিত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কালীপ্রসন্ন ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ রচনা করে স্বপ্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় কালীপ্রসন্ন কৌলীন্য প্রথা সম্বন্ধে লেখেন, "...যদ্যপি এক্ষণে অনেক ব্যক্তির মনোমধ্যে কৌলীন্য প্রথা রহিত, বিধবাদিগের পুনরুদ্বাহদান, এবং এক স্ত্রী বিদ্যমানে পত্ন্যন্তর পরিগ্রহ নিষেধাদি পরম মঙ্গলাকর কার্য্যসকল কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে (,) কিন্তু তাঁহারা কেবল লোক নিন্দাভয়ে এতদনুষ্ঠানে সাহসী হইতেছেন না (।) সকলে যাবৎ না সাহস পূর্ব্বক ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া এই সকল বিষয় প্রচলিত করিবেন তাবৎ অস্মদ্দেশের দুরবস্থা সকল নির্ব্বাসিত হইতে পারিবে না, অতএব সকলেরই হিতকর নিয়ম স্থাপনে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।" এজন্য ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী আইন প্রণয়ন করে কৌলীন্যপ্রথা রহিত করার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় যে আবেদনপত্র প্রেরিত হয়, কালীপ্রসন্ন তারও অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

এছাড়া 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন উদ্যোগী হয়ে কলকাতার ভদ্রপল্লী মধ্যে বেশ্যাপল্লী তুলে দিয়ে নগর প্রান্তে তাদের স্বতন্ত্র বাসস্থল

নির্দেশকরণ সম্বন্ধে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন করেন। এ সম্বন্ধে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে যে আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাবার প্রস্তাব হয়, তা ১৯শে নভেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয় এবং ২২শে নভেম্বর, ১৮৫৬ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে'ও এর অনুলিপি প্রচারিত হয়।

কালীপ্রসন্নের এই আবেদন পত্রের কতকগুলি কথার উপর আমি বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করি যাতে বোঝা যাবে কলকাতার তৎকালীন নাগরিক সমাজের অবক্ষয় এবং তার প্রতিকার সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন কি সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন—"....বারযোষাকুল সমস্ত রাত্রি মদ্যপান দ্বারা গীতবাদ্যাদির কোলাহলে এত উৎপাত আরম্ভ করে যে ভদ্রলোক মাত্রেই উক্ত পল্লীতে শয়নাগার ত্যাগ করণে বাধ্য হন—রাত্রিকালে মদ্যবিক্রয় যাহা ভয়ানক শান্তিভঙ্গ করে তাহা কেবল বার-যোষাগণের নিমিত্ত হয়, কলহ, মদ্যপান দ্বারা জীবনসংহার, ব্যসন দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি ভয়ানক অত্যাচার করণ এই বারস্ত্রীগণের আলয়েই সম্পাদিত হয়—বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ... কি প্রাতঃকালে কি সায়ংকালে সাবকাশ হইলেই এই কদাচার কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয়—কেবল যে বেশ্যাদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইবায় এত উৎপাত হইতেছে তাহাও নহে; বঙ্গদেশীয় ধনবানগণ স্বীয় স্বীয় বসতবাটীতেও অধিক ভট্টালোভী হইয়া ভদ্রপল্লী মধ্যে বেশ্যাগণকে স্থান দান করিয়া অতুল সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন— একঘর বেশ্যাবৃদ্ধি হইবায় সেই ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপূর্ণ হইতেছে— অতএব হে সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা মনো-যোগী হইয়া বেশ্যাগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসতির আজ্ঞা করুন—অতিপূর্বে সোনাগাছি নামক স্থানে বেশ্যাদিগের বাসস্থল ছিল অদ্যাপিও তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়—পূৰ্ব্বসময়ে যেরূপ শান্তি রক্ষার নিয়ম ছিল মধ্যে তাহার উল্লেখ না হইবায় একেবারে তাহা মিলিত হইয়া গিয়াছে. অযোধ্যা, কাশী, দিল্লী ইত্যাদি নগরে এবং ইউরোপীয় নানা নগরে এই প্রকার রীতি প্রচলিত আছে, তজ্জন্য আমরা বিনীতভাবে এই নিবেদন করি যে দেশীয় স্বাস্থ্যবৃদ্ধি ও শান্তিকাৰ্য্য উত্তমরূপ নির্বাহ জন্য বেশ্যাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নির্দ্দিষ্ট করুন..."।

আবার ২৩শে মে, ১৮৫৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে'ও এ সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন প্রচারিত একটি বিজ্ঞাপন দেখা যায়।

বিজ্ঞাপন

অদ্য শনিবার যামিনী ৭ ঘটিকার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভার

বেশ্যাগণের বাস করিবার নিমিত্ত এক নির্দ্দিষ্ট পল্লী নিরূপিত হয়" তন্নিমিত্ত লেজিসলেটিভ কৌন্সলে আবেদন অর্পণ হইবেক, তাহার বিচার ও সেই বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ হইবেক, দর্শক ও সভ্য মহোদয়গণ সভারোহণ করিয়া বাধিত করিবেন।—

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

কালীপ্রসন্নের এই উদ্যোগ ও আবেদনের ফলে অবশেষে ভদ্রপল্লী মধ্যে বেশ্যাদের বাস বন্ধ হয় এবং (তৎকালীন) নগরপ্রান্তে সোনাগাছি প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষস্থানে তাদের স্বতন্ত্র বাসস্থল নির্দিষ্ট হয়।

একদিকে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ নিবর্তন এবং কৌলীন্যপ্রথা-রহিতকরণে চেষ্টা, অন্য দিকে ভদ্রপল্লী মধ্যে বারবনিতাদের বাস বন্ধ করে স্বতন্ত্র পল্লী গঠনের আবেদনে সমগ্র নারীসমাজ সম্বন্ধে কালীপ্রসন্নের চিন্তা, চেষ্টা এবং উৎসাহে আমরা একটি যুক্তিপূর্ণ, মমতাস্নিগ্ধ আধুনিক মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরই সবিশেষ পরিচয় পাই।

অবশ্য কালীপ্রসন্নের সমাজহিতৈষণা ও সৎকর্মোদ্যোগ শুধু নারী-সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি। সমাজের বৃহত্তম অংশ যে কৃষককুল তাদের মঙ্গলকামনাতেও কালীপ্রসন্নের চেষ্টা নিয়োজিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে— ...তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। ...যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।" বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই আক্ষেপ করেছিলেন, তারপর একশ' বছরেরও বেশী কাল কেটে গেছে; দেশও ইংরেজের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। কিন্তু এখনও কজন 'চশমা-নাকে বাবু' লেখাপড়া শিখে দেশের এই বৃহত্তম অংশ কৃষককুলের প্রকৃত মঙ্গল সাধনায় নিয়োজিত হয়েছেন? অথচ ভাবতে অবাক লাগে, বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে বয়সে দুবছরের ছোট কালীপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের এই কৃষক-চিন্তারও প্রায় দশ বছর আগে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন ডেভিড হেয়ার সাম্বাৎসরিক স্মৃতিসভায় বাংলার কৃষি সম্বন্ধীয় অবস্থা ও কৃষি প্রদর্শনী

বিষয়ে একটি স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'সোমপ্রকাশ' (১, ৬. ১৮৬৩) পত্রিকায় এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়—

"১লা জুন সোমবার শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে মৃত মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বৎসরিক সমাজে বঙ্গদেশীয় কৃষিকার্য্যের বর্ত্তমান অবস্থার সমালোচন, কৃষিকার্য্যের উপযোগিতা, কৃষিসমাজ ও কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা এবং কৃষিজাত দ্রব্য ও কৃষিসাধন অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রদর্শনের মহোপকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।"

আজ থেকে প্রায় এক'শ কুড়ি বছর আগে কালীপ্রসন্ন কৃষিসমাজ ও কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা এবং কৃষিজাত দ্রব্য ও কৃষিসাধন অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রদর্শনের মহোপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। আর আজ স্বাধীনতা লাভের পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চেষ্টায়, কল্যাণীতে একটি কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত হলেও এখনও যে কৃষির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যথেষ্ট সংখ্যক কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন এবং সাধারণ কৃষকদের নিকট কৃষিসাধন অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়নি সে কথা বলাই বাহুল্য। এদেশে কৃষি বিষয়ে প্রথম নিয়মানুগভাবে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন অবশ্য একজন বিদেশী। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে পাদরী উইলিয়ম কেরী ভারতে 'এগ্রিকালচারাল এন্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা গদ্যের জন্ম-ইতিহাসের সঙ্গে এই কৃষিসমিতির জন্ম ইতিহাসেও তাই উইলিয়ম কেরীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্যারীচাঁদ মিত্র এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য নির্বাচিত হন। দেশীয় লোকেদের মধ্যে কৃষি বিষয়ে জ্ঞান প্রচারের জন্য ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদের প্রস্তাবে এই সভার **Transaction Journal** থেকে প্রবন্ধাদি বাংলাভাষায় প্রচার করার জন্য একটি অনুবাদ সমিতিও গঠিত হয়। সমিতির চেষ্টায় 'ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ' ১ম-২য় খণ্ড ১৮৫৩, ৩য়-৪র্থ খন্ড ১৮৫৪, ৫ম খন্ড ১৮৫৫ এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৬] অতঃপর কৃষি বিষয়ে উৎসাহ দানের একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। ঐসময় ছোটলাট স্যার সিসিল বিডন বেলভিডিয়ারে যে বিরাট কৃষিপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন, তাতে প্যারীচাঁদের সঙ্গে কালীপ্রসন্নও একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

কৃষি ছাড়া কালীপ্রসন্ন দেশে শিক্ষা বিস্তারেও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। সেই সময় দেশে শিক্ষাবিস্তারের কিরূপ ব্যবস্থা ছিল তা জানলে কালীপ্রসন্নের

এই চেষ্টার গুরুত্ব বোঝা যাবে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এইচ, এইচ, উইলসন বলেছিলেন, "There is a great want of the mean of instructing the people generally in their own languages. There are very few Bengalees who can read or can write Bengali with any degree of correctness. The first requisite, therefore, is to improve the varnacular education of the people in the different classes, and to adopt that education to their different stations and circumstances of life." এর কিছু পূর্বে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করা হয়েছিল—"যদি বলেন যে, ইংরাজী বিদ্যানুশীলন পূর্বক অনেকে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, একথা অতি যথার্থ বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প, এই বৃহদ্রাজ্যের অসংখ্য মনুষ্য বিদ্যাশিক্ষার উপায়বিরহে অজ্ঞানতার অন্ধকারে মগ্ন রহিয়াছেন, কেবল অল্প সংখ্যক ব্যক্তি বিলাতীয় বিদ্যার আলোকপ্রাপ্ত হইয়া তটস্থ মনুষ্যদিগের সভ্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণকে সভ্য করিয়াছেন ...।"

অতঃপর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মে বাংলায় ছোটলাটের পদ সৃষ্টি হলে ফেড্রারিক জে, হ্যালিডে প্রথম ছোটলাট হয়ে ১৬ই নভেম্বর যে শিক্ষাসংক্রান্ত মিনিটটি বড়লাটের অনুমোদনের জন্য পাঠান তার প্রধান উৎস ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা এক মন্তব্য। বিদ্যাসাগরের সেই মন্তব্যের অন্তত দুটি অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধারযোগ্য।

১। সুবিস্তৃত এবং সুব্যবস্থিত বাংলা শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কেন না, মাত্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব।

২। লেখাপড়া আর কিছু অঙ্ক শেখাতেই এই শিক্ষা পর্যবসিত হইলে চলিবে না; শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শারীরতত্ত্ব শেখান প্রয়োজন।

মনে রাখা দরকার এর মাত্র কয়েকমাস পূর্বে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই স্যার চার্লস উডের বিখ্যাত এডুকেশন ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হয়। এই ডেসপ্যাচ অনুসারে সর্বপ্রথম একটি শিক্ষা অধিকার (ডি, পি, আই) গঠন করা হয়, ভারতের প্রধান শহরগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা হয়, শিক্ষক

শিক্ষণের জন্য বিদ্যালয় গঠন করার কথা বলা হয়, কিছু বিদ্যালয়কে সর্বপ্রথম ঘাটতিপূরণ প্রকল্পের অধীনে আনা হয়, উচ্চতর ক্লাসগুলিতে বাংলাকেই শিক্ষার মাধ্যম করার সুপারিশ করা হয় এবং নিম্নতর ক্লাসগুলিতে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম রাখার জন্য বলা হয়। আরও বলা হয় যে স্ত্রীশিক্ষা এখন থেকে সরকারের বিশেষ আনুকূল্য পাবে।

সরকারের এই নীতি প্রশংসনীয় হলেও এই নীতির বাস্তবায়নে বিশেষতঃ ঘাটতিপূরণ প্রকল্পের বিদ্যালয় স্থাপনে সরকারী আগ্রহ এত অকিঞ্চিৎকর ছিল যে তা যেন ক্ষুধিতের সামনে কণামাত্র অন্ন পরিবেশন করে ক্ষুধিতের ক্ষুধা বাড়িয়ে দেওয়ার মতই হয়েছিল। আবার স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সরকারী আনুকূল্যের উপর ভরসা করে বিদ্যাসাগর বিভিন্ন জেলায় যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাতে ৩০শে জুন, ১৮৫৮ পর্যন্ত প্রায় আট মাসের মধ্যেই শিক্ষকদের মোট বেতন বাকী পড়ে ৩৪৩৯টাকার মত। অনেক লেখালেখির পর এবং ছোটলাট হ্যালিডের ব্যক্তিগত চেষ্টায় ভারত সরকার এই টাকা মিটিয়ে দিলেও এই স্কুলগুলির জন্য নিয়মিত পৌনঃপুনিক অর্থসাহায্য করতে সরকার অস্বীকৃত হন, নূতন স্কুল স্থাপন তো দূরের কথা। তখন কিছু স্কুল বন্ধ হয়ে যায় এবং কিছু স্কুল বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত চেষ্টায় এবং কিছুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা তুলে আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থায় কোনরকমে টিঁকে থাকে।

এই যখন দেশের শিক্ষার অবস্থা, তখন কালীপ্রসন্ন স্থানে স্থানে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং কোন কোন দুঃস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহায্য দান ক'রে দেশবাসীর যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাভাজন হন। এ প্রসঙ্গে ২৬শে মার্চ ১৮৫৮ তারিখের 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে' প্রকাশিত একখানি পত্র বিশেষভাবে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি।

"ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বংশবাটী গ্রামে বঙ্গীয় বিদ্যালয় নামে এক পাঠশালা সাধারণের সাহায্যে দ্বিবর্ষাতীত হইল সংস্থাপিত হইয়া বঙ্গবিদ্যা প্রচার করিতেছিল, পরে সম্প্রতি কলিকাতা নিবাসী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তথায় শুভাগমন করত বালকগণের পরীক্ষা গ্রহণান্তর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য মাসিক একশত টাকা দান স্বীকার করিয়া ইংরাজি শিক্ষক ও পন্ডিত নিযুক্ত করিয়াছেন।

এই নবযুব বিদ্যোৎসাহী সিংহ মহাশয় পরোপকারে সিংহস্বরূপ হইয়াছেন, ইনি দিগ্বিদিগে আর ছয়টা অবৈতনিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া দীনহীনগণকে তিমিরহারী জ্ঞানচক্ষু দিতেছেন, ইঁহার জীবনবৃদ্ধি ও ধনবর্দ্ধন হইলে অস্মদ্দেশীয় জনগণের যে কত উপকার হইবে তাহা বর্ণনাতীত।...বিদ্যানুরাগী।" তাছাড়া কালীপ্রসন্ন-প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র অধীনে যে বিদ্যোৎসাহিনী পাঠশালা পরিচালিত হত সে সম্বন্ধে তথ্য পাই ২২শে নভেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে— "কয়েক বৎসর হইল বিদ্যোৎসাহিনী নামে যে সভা হইয়াছে সিংহবাবু ঐ সভার সম্পাদকীয় কার্য্যে বহুধন ব্যয় করিয়াছেন (;) তাহাতে সাধারণের উপকার হইয়াছে ও হইতেছে, সভার অধীন পাঠশালায় বহু বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে (।) ইহাতে কালীপ্রসন্ন বাবু সাধারণের চিরস্মরণীয় হইবেন।"

এখানে লক্ষণীয় যে, ভারত সরকার যখন ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহে অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তখন কালীপ্রসন্ন তাঁর একক প্রচেষ্টাতেই 'বিদ্যোৎসাহিনী পাঠশালা' সমেত ৭টি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং আর একটি বিদ্যালয়ে মাসিক একশত টাকা বেতনে ইংরাজি শিক্ষক ও পন্ডিত নিযুক্ত করেন।

কালীপ্রসন্ন আবার ছাত্রদের বাংলা রচনায় উৎসাহিত করার জন্য সময়ে সময়ে পুরস্কার ও পদক বিতরণ করতেন। ১লা জুন, ১৮৫৮ তারিখের 'হিন্দু-রত্ন কমলাকর' পত্রে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে, ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর চারজন ছাত্রকে বাংলা বিষয়ে উত্তম লেখার জন্য কালীপ্রসন্ন পদক প্রদান করেছিলেন। অনেক ছাত্র আবার কালীপ্রসন্নের কাছে অর্থসাহায্য পেয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভেরও সুযোগ পেয়েছে। ১লা অক্টোবর, ১৮৬০ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন—

"আমরা শ্রীযুতবাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দানশীলতা প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা পরিপূর্ণ একখানি প্রেরিত পত্র পাইয়াছি। স্থানের অসম্ভাবপ্রযুক্ত আবিকল পত্রস্থ করিতে পারিলাম না। পত্রপ্রেরক মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা শ্রেণীর প্রথম বর্ষের ছাত্র। তাঁহার এরূপ সঙ্গতি নাই যে, উপযুক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কলেজে পাঠ করেন। উল্লিখিত সিংহবাবু অনেক অংশে আনুকূল্য করাতে তাঁহার সেই অসঙ্গতি জন্য ক্লেশ দূরগত হইয়াছে। কালী-প্রসন্ন বাবুই অর্থের যথার্থ ব্যবহার করিতেছেন সন্দেহ নাই।"

শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য ছাড়াও সমাজের সার্বিক উন্নতির উদ্দেশ্যে তিনি যে সাহিত্য ও সংবাদপত্রের উন্নয়নের জন্যও অকাতরে দান করেছেন, সেকথা এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিভিন্ন সময়ে প্রতিযোগিতামূলক প্রবন্ধ ও কবিতা রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা এবং বহু লেখকের নূতন গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য ছাড়াও কালীপ্রসন্ন 'সোমপ্রকাশ', 'তত্ত্ববোধিনী', 'ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র', 'মুখার্জি'স্ ম্যাগাজিন', 'বেঙ্গলী', 'হিন্দুপেট্রিয়ট', 'দূরবীন' প্রভৃতি বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশেও প্রভূত অর্থসাহায্য করেছেন। আবার অপরের দ্বারা পরিচালিত এইসব সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র প্রকাশে সাহায্য ছাড়াও কালীপ্রসন্ন স্বপরিচালিত 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা', 'সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' এবং 'পরিদর্শক' এই ক'খানি সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সমাজচেতনার পরিচয় রেখে গেছেন। এ বিষয়ে 'সাময়িক পত্র ও দৈনিক পত্র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

কালীপ্রসন্নের ছদ্মনামে রচিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'-তেও যে তৎকালীন সমাজের অনেক কুপ্রথা ও দুর্নীতির ওপর বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হয়েছে, 'কালী-প্রসন্নের সামাজিক নক্শা' অধ্যায়ে সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা হবে। এখানে হুতোম সম্বন্ধে কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মন্তব্যটিই উদ্ধার করি—"বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা, হুতুম পেঁচার ন্যায় লেখক এবং ভোলাময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া বড়ই আবশ্যক।"[৮]

কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর প্যারীমোহন কবিরত্নও লিখেছিলেন—

"কম লিখেছে কি হুতোম পেঁচায়, টের পেয়েছেন অনেক বাছায়,
অনেকের দোষ শুধরে গেছে, যারা ছিল দোষের সাগর।"

কালীপ্রসন্ন অবশ্য শুধু সমালোচনাতেই ক্ষান্ত থাকেননি, সব্যসাচীর মত একহাতে যেমন সমাজ-সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি সমাজ সেবারও ভার নিয়েছেন। নারীসমাজ, কৃষকসমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন দিকে কিভাবে তাঁর বিপুল কর্মোদ্যোগ প্রসারিত হয়েছিল তা আমরা দেখেছি। তাছাড়াও তাঁর সেই সমাজ সেবার আর একটি প্রধান পরিচয় ছড়িয়ে আছে দুর্ভিক্ষে দান এবং নানা জনহিতকর কার্যে দানের মধ্যে।

প্রথমে দুর্ভিক্ষে দানের কথাই ধরা যাক্।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় তাতে কালীপ্রসন্ন মুক্তহস্তে দান করেন এবং 'মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব কোথায়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রে এবং তা বিনামূল্যে বিতরণ ক'রে দেশবাসিগণকে দুর্ভিক্ষ দমনে সাহায্য করতেও উদ্বুদ্ধ করেন। ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা সম্বন্ধে লিখিত হয়েছে : A succession of famines constitutes one of the darkest features of the history of the post 1857 period. A terrible famine disolated Agra, the Punjab, Rajputana and Cutch in 1861.[৯]

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে ঐ দুর্ভিক্ষে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের জনসংখ্যার প্রায় এক দশমাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

"একবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খুব দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্ম সমাজের একটা সভা হয়। সেই সভায় পিতৃদেব বেদী হইতে যেরূপ মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন তাহা আমি কখন ভুলিব না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকেরা অমনি মুগ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, যাহার কাছে যাহা কিছু ছিল, তৎক্ষণাৎ সে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে দান করিল। কেহ আঙ্গুল হইতে আংটি খুলিয়া দিল, কেহ ঘাড় ও ঘড়ির চেন খুলিয়া দিল। আমার স্মরণ হয় ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহুমূল্য উত্তরীয় বস্ত্র (বোধ হয় শাল) তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন।"[১০] দুর্ভিক্ষের সময়ে কালীপ্রসন্নের প্রচেষ্টা কেবল তাৎক্ষণিক আবেগেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের সেবায় কালীপ্রসন্ন যে ভারতবন্ধু ডাফের সঙ্গেও আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছিলেন, সে তথ্যের উল্লেখ পাই কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই The Indian Mirror পত্রিকায়—"Nor was he wanting in public spirit. The ardent co-operation which he rendered to Dr. Duff during Famine of 1861 in the N. W. Provinces amply testify to this."

কিন্তু এইভাবে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে কয়েকজন বদান্যব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রশংসণীয় হলেও দুর্ভিক্ষ দমনে ইংরেজ শাসক কিরূপ শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সময় জুড়ে

দুর্ভিক্ষ-জনিত মৃত্যুহারের পূর্ণাঙ্গ তালিকাটি দেখলে তা বোঝা যাবে।[১১]

সময়	দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর হার
১৮০০—২৫	১,০০০,০০০
১৮২৫—৫০	৪০০,০০০
১৮৫০—৭৫	৫,০০০,০০০
১৮৭৫—১৯০০	১৫,০০০,০০০

মানুষের দুঃখ দুর্গতিতে পরদুঃখকাতর কালীপ্রসন্ন শুধু জাতি-ধর্ম নয়, স্বদেশ-বিদেশেরও কোন পার্থক্য বিচার করার প্রয়োজন বোধ করতেন না। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি ল্যাংকাশায়ার দুর্ভিক্ষ তহবিলে সহস্র-মুদ্রা দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' নিম্নলিখিত তথ্যটি প্রকাশিত হয়ঃ

"We are glad to see that the subscriptions in aid of the Lancashire [Famine] Fund are pouring in rapidly. Some of our leading townsmen have subscribed munificently. Rajah Pertaub chunder Sing has contributed another thousand. The other one-thousand—Wallahs are Ranee Surnomoyee, Baboo Prossunno Coomar Tagore, Baboo Kali Prossunno Sing, and Baboo Herallaul Seal."

দুর্ভিক্ষে দান ছাড়া কালীপ্রসন্ন যেসব জনহিতকর কার্যে দান করেন তার মধ্যে প্রথমেই দাতব্য ঔষধালয়ের উল্লেখ করতে হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে চিৎপুরে একটি দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করে কালীপ্রসন্ন যে স্থানীয় জন-সাধারণের অসুবিধা দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে তথ্য পাই ১২৭২ সালের কার্তিক সংখ্যা 'বামাবোধিনী' পত্রিকায়।

"নূতন সংবাদ।······আমরা শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সংপ্রতি চিতপুরে একটি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়া তত্রত্য লোকদিগের মহোপকার করিতেছেন।"

এছাড়া কলকাতায় যখন বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোন পরিকল্পিত ব্যবস্থা হয়নি, তখন কালীপ্রসন্ন বিলাত থেকে চারটি ধারাযন্ত্র আনিয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপনের সংকল্প করেছিলেন। এ সম্বন্ধে ৬ই ডিসেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' লেখা হয়—

"বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দত্ত দুই সহস্র টাকা দ্বারা ইংলণ্ড হইতে ধারাযন্ত্র ৪টী আনয়ন করা হইয়াছে। উহার ব্যয় সর্ব্বশুদ্ধ ২৯৮৫৷৷ ৵. আনা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্থাপনের ব্যয় স্বতন্ত্র দেওয়া হইবে।"

১৫ই জুন' ১৮৬৫ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, এই সকল ধারাযন্ত্রগুলির মধ্যে একটি ধারাযন্ত্র ডালহৌসি স্কোয়ার ও ক্লাইভ স্ট্রীটের সংযোগস্থলে, একটি স্ট্র্যান্ড রোড ও ধর্মতলা স্ট্রীটের সংযোগস্থলে, একটি এসপ্লানেড রো এবং গভর্ণমেণ্ট প্লেস ইস্টের সংযোগস্থলে এবং একটি রাজা গুরুদাস স্ট্রীট ও বিডন স্ট্রীটের সংযোগস্থলে স্থাপিত হবার প্রস্তাব ছিল। ফলে হিন্দু পেট্রিয়ট প্রস্তাব দেন যে একটি ধারাযন্ত্র যেন বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে দাতা কালীপ্রসন্নের বাটীর সন্নিকটে স্থাপিত হয়।

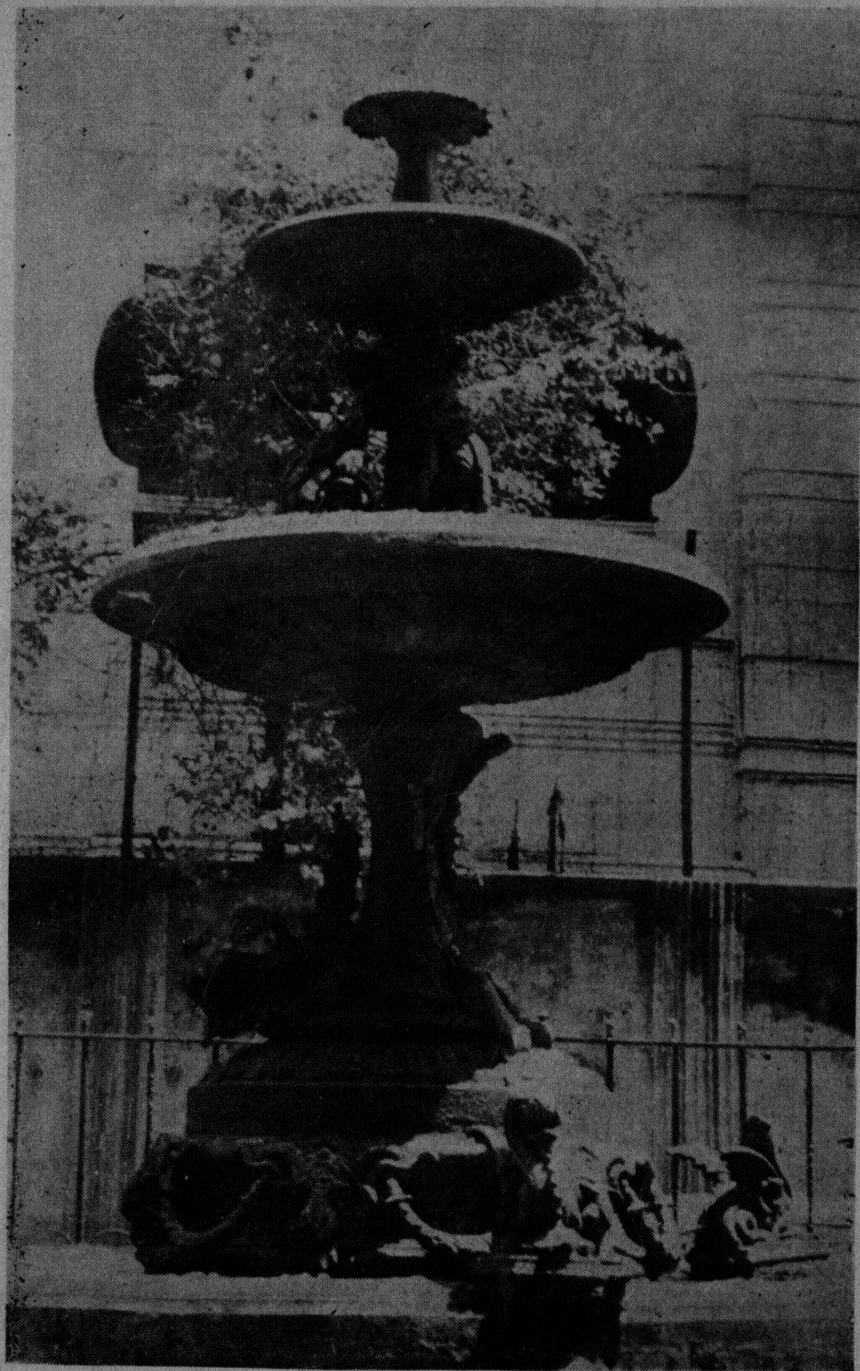
'হিন্দু পেট্রিয়টে'র প্রস্তাব মত বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে কালীপ্রসন্নের আবাসস্থলের নিকটে একটি ধারাযন্ত্র এবং আর একটি রাজা গুরুদাস স্ট্রীট ও বিডন স্ট্রীটের সংযোগস্থলে স্থাপিত হয়েছিল। বাকী দুটি ধারাযন্ত্র প্রস্তাবিত তিনটি জায়গার মধ্যে কোথায় কোথায় স্থাপিত হয়েছিল তা জানা যায় না।

এই ধারাযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝতে হলে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 'আত্মজীবন চরিতে' কলকাতার জলের যে ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা আছে, সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। পরবর্তীকালে অবশ্য প্রধানত পরিশ্রুত কলের জলের জন্যই কলকাতা শহরের সুনাম হয়েছিল। কলকাতার সুখ প্রসঙ্গে একজন কবিয়াল কলের জলের কথা দিয়ে ছড়া বেঁধেছিলেন:

সুখ বলতে একটি আছে
হাত বাড়ালেই জলটি কাছে।

কিন্তু কালীপ্রসন্নের সময়ে এই সুখ যখন পর্যাপ্ত ছিল না, হাত বাড়ালেই যখন জলটি কাছে পাওয়া যেত না এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে অসুখ বিসুখের প্রাদুর্ভাব যখন লেগেই ছিল, সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে কালী-প্রসন্নের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই জনকল্যাণকর কাজের গুরুত্ব বোঝা যাবে।

আবার শুধু ব্যক্তিগত দান নয়, সমাজের মঙ্গল কামনায় যে কেউ যে কোন ভাবে ব্রতী হয়েছেন, কালীপ্রসন্ন তাঁর সঙ্গেও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতার কথা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার ছিল কেবল নারীমুক্তির আন্দোলন সম্পর্কিত। এইখানেই বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারের সীমাবদ্ধতা। তাঁর পূর্বে



কলিকাতায় যখন বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোন পরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল না, তখন (১৮৬৫ খৃঃ) কালীপ্রসন্ন কর্তৃক বিলাত হইতে আনীত বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে স্থাপিত প্রথম ধারাযন্ত্র।

চিত্র—৮ (উপর হইতে গৃহীত আলোকচিত্র)



"বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দত্ত দুই সহস্র টাকা দ্বারা ইংলণ্ড হইতে ধারাযন্ত্র ৪টি আনয়ন করা হইয়াছে। ইহার ব্যয় সর্বশুদ্ধ ২৯৮৫।। √. হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্থাপনের ব্যয় স্বতন্ত্র দেওয়া হইবে।"

—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৬৫

(পূর্ববর্তী ধারাযন্ত্রের পার্শ্ব হইতে গৃহীত আলোকচিত্র) চিত্র—৯

রামমোহন প্রজা-স্বার্থ এবং কৃষক-স্বার্থের কথা আলোচনা করলেও বিদ্যাসাগর এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থেকে গেছেন। এমনকি ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে নীলবিপ্লবের সময়েও কৃষকদের স্বার্থে তাঁর কোন সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায় না। ('নীলদর্পণ' নাটক অভিনয়ে রোগ সাহেবের প্রতি চটি ছুঁড়ে মারার কাহিনীটিতে নারী জাতির প্রতি মমতাই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে)। অথচ কৃষকদের এই দুঃখ দুর্দশা এবং কৃষকদের উপর একদিকে জমিদার এবং অন্যদিকে নীলকরের অত্যাচার—সংক্ষেপে এই কৃষক-সমস্যা ছিল তখনকার সমাজের একটি প্রধান সমস্যা। ১৮৫৯-৬০-এ নীলবিদ্রোহের পরের তিন দশক জুড়ে মাঝে মাঝেই পাবনা, যশোর, খুলনা, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় প্রজাবিদ্রোহ চলেছে। অবশ্য ১৮২৯-৩০-এর সময় রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর নীলকরদের ব্যাপক অত্যাচারের কথা কল্পনা করতে পারেন নি। তাঁরা সে সময় বলেছেন, নীলকরদের অত্যাচার আকস্মিক এবং কখনোসখনো ঘটে, আসলে নীলকরদের এলাকায় লোকে সুখে শান্তিতে বাস করছে। কিন্তু অতঃপর নীল চাষের জন্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে যে সব ইংরেজ কর্মচারী নিয়ে আসেন তারা আগে থেকেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের রবার বাগিচায় নিগ্রো ক্রীতদাসদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে হাত পাকিয়ে এসেছে। তাছাড়া সিপাহী বিদ্রোহের পর নীলকর সাহেবদের মনে যখন প্রতিশোধস্পৃহা দেখা দেয়, তখন সহায়সম্বলহীন চাষীদের ওপরেই তাদের অত্যাচার প্রবলভাবে বেড়ে ওঠে। এই সব নানা কারণে বাংলাদেশে নীলকরের অত্যাচার ১৮৫৯-৬০ এর সময়ে বিভীষিকার রূপ ধারণ করে। এই সময় প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করে নীলকরদের বিরুদ্ধে যিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন সেই হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কালীপ্রসন্ন যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রসিদ্ধ কাগজ 'হিন্দু পেট্রিয়টে' বিভিন্ন স্থানের নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী সংগ্রহ করে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রকাশ করতেন এবং এমন খোলাখুলি ভাবে নীলচাষীদের পক্ষ সমর্থন করতেন যে তাঁর মৃত্যুর পর লোকের মুখে মুখে এই গান শোনা যেত:

"নীল বানরে সোনার বাংলা কল্লে এবার ছারেখার।
অসময়ে হরিশ মলো লংয়ের হলো কারাগার
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।"

নীলকর অত্যাচারের এইসব বিবরণ এবং বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যাপারে বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়ার জন্য হরিশচন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়ট'কে স্বয়ং লর্ড ক্যানিং বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে' শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—"এরূপ শুনিয়াছি, পেট্রিয়ট বাহির হইবার দিন লর্ড ক্যানিং-এর ভৃত্য আসিয়া পেট্রিয়ট অফিসে বসিয়া থাকিত, প্রথম কয়েকখানি কাগজ মুদ্রিত হইলেই লইয়া যাইত।" হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর বহু সাধের এই 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র অবলুপ্তি যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল, তখন কালীপ্রসন্ন পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পত্রিকার মুদ্রাযন্ত্র এবং সর্বস্বত্ব কিনে নিয়ে একদিকে যেমন তাঁর দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করলেন, তেমনি এই দেশহিতৈষী পত্রিকাটিকেও মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করে তার পরিচালনা অব্যাহত রাখলেন। তাছাড়া হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও তাঁর বিধবা পত্নীকে প্রতিবাদী করে আর্চিবাল্ড হিল্স্ নামে একজন নীলকর সাহেব যে মোকদ্দমা চালান তাতে ইংরেজ বিচারক যখন মোকদ্দমার ব্যয় বাবদ হরিশচন্দ্রের বিধবা পত্নীকে এক হাজার টাকা[১২] দণ্ডের আদেশ দেন এবং অনাদায়ে ঐ বিধবাপত্নীর বসতবাটী ক্রোক করার আদেশ দেওয়া হয়, তখনও এই বিপন্ন পরিবারের উদ্ধারের জন্য কালীপ্রসন্নের প্রচেষ্টা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারবর্গ তখন নিঃস্ব। অথচ আশ্চর্যের কথা, এই দুঃসময়ে, যে বৃটিশ ইন্ডিয়ান সভা হরিশচন্দ্রের যত্নে ও চেষ্টায় বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল সেই সভারই সহকারী সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল এবং কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্য হরিশচন্দ্রের বিধবা পত্নী ও পরিবার-বর্গকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রদানের প্রতিকূলতা করেছিলেন।[১৩] কিন্তু কালীপ্রসন্ন এই দুঃস্থ পরিবারের গৃহরক্ষার জন্য তাঁর সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিলেন।

শুধু তাই নয়, হরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্যও কালীপ্রসন্ন প্রশংসনীয় চেষ্টা করেন। তিনি হরিশচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা তহবিলে পাঁচ শত টাকা দান করেন এবং স্মৃতিরক্ষা সমিতিতে কিভাবে হরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা হবে সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়ায় ঐ সমিতির অন্যতম সদস্য হিসেবে তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর তারিখে একখানি পত্রে স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে কার্যনির্বাহক সমিতির কাছে প্রস্তাব করেন যে, যদি হরিশচন্দ্রের কোনও স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তিনি ঐ স্মৃতিমন্দিরের জন্য তাঁর সুকিয়া স্ট্রীটের দুবিঘা জমি দান

করতেও সম্মত আছেন। পরে তিনি পাঠাগার, বিবিধ বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি সভাগৃহ এবং সঙ্গীত-নাটক ইত্যাদি পরিবেশনের জন্য মঞ্চ সমন্বিত একটি সুন্দর স্মৃতিমন্দির নির্মাণের একটি পরিকল্পনাও পাঠান। এখনকার দিনে বড় জোর একটি মর্মরমূর্তি স্থাপন বা দু'একটি বৃত্তি প্রদান করাই যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্মৃতিরক্ষার প্রধান উপায় বিবেচিত হয়, তখন কালীপ্রসন্নের পরিকল্পনা কি উদার এবং ব্যাপক ছিল তা, তাঁর পত্র পাঠে জানা যায়।

To

BABOO KRISTODOSS PAUL,

SECRETARY, HURRISH MEMORIAL COMMITTEE.

Sir,

As the form of the Memorial to the memory of the late Baboo Hurish Chander Mukerjee has not been definitely settled, I believe it would be in consonance with the views and wishes of many of the subscribers, if the funds were applied to the erection, of a building for public use, to be called after his name, instead of being employed in the establishment of one or two scholarships as originally contemplated. I, for one decidedly, am for such a memorial building, and if my colleagues in the committee approve of the proposition I will feel it a pride to dedicate to this purpose a portion of my land, say 2 beeghas or thereabout, situated in sukeas-street, commonly called Badoor Bagan....... If the Memorial Building such as I suggest can be erected you can open there Reading and Assembly Rooms, establish a conversazione, have lecture, music, dramatic performances and diverse other enlightened recreations and amusements, such as make life agreeable and society enjoyable....... I need hardly add that nothing could be a more fitting testimonial to the memory of the lamented deceased than this, who, be it remembered, was a staunch and earnest friend to the

promotion of worthy intellectual and social intercourse among our countrymen.

Should my colleagues in the Committee approve of the proposition I shall be glad to execute a deed of conveyance for the above-mentioned and in favour of such Trustees as they may appoint.

I have & c.
(Sd.) Kaliprussunno Singh.

কালীপ্রসন্নের এই প্রস্তাব ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা হরিশ্চন্দ্রেরই আন্তরিক যত্নে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেই সভারই কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যের ঔদাসীন্যে এই শুভ প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর ষোল বছর পরে হরিশ্চন্দ্র স্মৃতিরক্ষা তহবিলের সংগৃহীত ১০,৫০০ টাকা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যয়িত হয় এবং এই সভাগৃহের নিম্নতলে একটি মাত্র কক্ষ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরী রূপে নির্দিষ্ট হয়।[১৪]

এইভাবে হরিশ্চন্দ্র স্মৃতিরক্ষণ সমিতির উদাসীনতা ও কপটতায় এবং চাঁদা আদায়ের স্বল্পতায় কালীপ্রসন্নের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত না হলেও এই উদ্দেশ্যে কালীপ্রসন্নের অর্থসাহায্য এবং পরিকল্পিত স্মৃতিমন্দির নির্মাণের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সুকিয়া স্ট্রীটে দুবিঘা জমি দানের প্রস্তাব পাঠানোর মধ্যে তাঁর হৃদয়ের বিশালতা, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। এ প্রসঙ্গে 'মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের নিকট আবেদন' নামে তিনি যে পুস্তিকা প্রচার করেছিলেন তাতে তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন, "......কলিকাতা নগরীয় ঐশ্বর্য্যমত্ত ধনিগণ।......তোমরা স্থির করিয়াছ যে, তোমরা হনুমানের ন্যায় অমর, কখনই মরিবে না—চিরকাল বালাখানায় বৈঠকখানায়—বাগানে সুখে বিহার করিবে, স্বদেশের শুভ চিন্তায় বিবৃত হওয়া, তাহার শ্রীসাধন কার্য্যে ব্যয় করা মূর্খের কার্য্য; সুতরাং এ বিষয়ে তোমাদিগের অপেক্ষা নীলকার্য্যের প্রজাগণে অধিক সাহায্য করিবে—কৃষকের সরল হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ। আজ যদি সোনাগাছির খোঁড়া ব্রাহ্মের শ্রাদ্ধ হইত বা পাগলা ছিরুর সপিণ্ডন হইত তাহা হইলে তোমরা সাহায্য করিতে পথ পাইতে না; আজ আস্তাবল

বা হোটেলরক্ষক কোন ফিরিঙ্গী মরিলে সাধ্যমতে সাহায্য করিতে। তোমরা চালচিত্রের অসুরের মত শুদ্ধ দর্শনীয় নতুবা পদার্থে তৃণ হইতেও নিকৃষ্ট।·····

নীলকর হৃতসর্বস্ব বঙ্গদেশীয় প্রজাগণ! আমি বঙ্গদেশীয় কি ধনবান্ কি গৃহস্থ সকলকে উপেক্ষা করিয়া প্রথমে তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দি, দেখিও কৃষকের কোমল হৃদয়ে যেন অকৃতজ্ঞতা স্পর্শ করিতে না পারে। যে মহাত্মা তোমাদিগের জীবন প্রদান করিয়াছেন, যাহা হইতে তোমরা যম-যাতনাপেক্ষা গুরুতর ক্লেশে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছ ; সুদ্ধ যাহার একমাত্র যত্নে তোমাদিগের সর্বস্ব রক্ষিত হইয়াছে ; সতীগণে সতীত্বরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে ; অকালমৃত্যু, উদ্বন্ধনে প্রাণনাশ, গ্রামদাহ রহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের যেরূপ ভাগ্য—দেবতা সহায়েও তোমাদিগের যে দুরবস্থার অপনোদন না হইত, একা হরিশ্চন্দ্রের দ্বারা তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারে—অভীষ্ট দেবতার ন্যায় পিতার ন্যায় ও প্রাণদাতার ন্যায় স্মরণ করা কর্তব্য। আমার আর অধিক বলা প্রয়োজনাভাব যদি তোমরা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত উপকারে কৃতজ্ঞ না হও, তাহা হইলে তোমরা কি বলিয়া মুখ দেখাইবে বলিতে পারি না এবং পরিণামে তোমাদের যে কি দুর্দশা হইবে তাহারও ইয়ত্তা করা যায় না।”

নীলচাষীদের অকৃত্রিম বন্ধু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতি অনুরক্তি এবং নীলচাষীদের প্রতি এই সহানুভূতির কথা মনে রাখলে নীলদর্পণ-মামলায় রেভারেণ্ড লঙের হয়ে কালীপ্রসন্নের এক হাজার টাকা জরিমানা দেওয়ার ঘটনাকে হঠাৎ উত্তেজনা-প্রসূত কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হবে না। একথা সকলেই জানেন রেভারেণ্ড লঙ দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ না করলেও রেভারেণ্ড লঙকে অনুবাদক ও প্রকাশক ভেবে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এবং এ সম্বন্ধে তিনি যে বিবৃতি দেন তার দ্বারা 'ইংলিশম্যান' ও 'হরকরা' পত্রদ্বয়ের স্বত্বাধিকারীদের এবং নীলকর সাহেবদের মানহানির অপরাধে তাঁর যখন এক মাস কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়, তখন কালীপ্রসন্ন তৎক্ষণাৎ বিচারালয়েই লঙের জরিমানার এক হাজার টাকা দিয়ে দেন। এই ঘটনায় টাকার অঙ্কটাই অবশ্য সব চেয়ে বড় কথা নয়, বড় কথা হ'ল নীলচাষীদের প্রতি তাঁর তীব্র সহানুভূতি এবং তাদের হয়ে যাঁরাই লড়েছেন তাঁদের সঙ্গেও তাঁর আন্তরিক সম্প্রীতি। আচার্য্য কৃষ্ণকমল 'পুরাতন প্রসঙ্গে' এ বিষয়ে স্মৃতিচারণ করতে

গিয়ে বলেছেন, "কেহ তাঁহাকে টাকা লইয়া যাইবার পরামর্শ দেন নাই। আমরা কেহই জানিতাম না যে, তিনি মনে মনে এই প্রকার সংকল্প করিয়াছিলেন।" সুতরাং একটু অবহিত হলেই আমরা লক্ষ্য করব যে, যে সময় জমিদারেরা ইংরেজ সরকারের প্রসাদ ভিক্ষা করে রায়বাহাদুর উপাধিলাভের জন্য লালায়িত হতেন, তখন প্রকাশ্য আদালতেই রেভারেণ্ড লঙের হয়ে কালীপ্রসন্নের জরিমানার টাকা দাখিল করায় একই সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের বলিষ্ঠতা, নীলচাষীদের প্রতি সহানুভূতি, কৃষকদরদী বিদেশী লঙের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং সরকারী অনুগ্রহ-লাভের প্রতি তীব্র ঔদাসীন্য ফুটে উঠেছে।

আবার 'নীলদর্পণ' নাটকের রচয়িতা হিসাবে দীনবন্ধু মিত্রের নাম না থাকায় প্রথমে তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকলেও কিছুদিন পরেই যখন তাঁরও অভিযুক্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিল, তখন কালীপ্রসন্ন তাঁকেও যে যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন, সেকথা দীনবন্ধু মিত্রের তৃতীয় পুত্র ললিত চন্দ্র মিত্রের বিবৃতি থেকে জানা যায়।

তাছাড়া দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোম প্রকাশে' প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, ঐ সময় 'নীলদর্পণের' প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় দেশের মধ্যে 'নীলদর্পণের' প্রভাব অব্যাহত রাখার জন্য কালীপ্রসন্ন নিজ ব্যয়ে নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণ করেন।

তাছাড়া বিচারপতি কালীপ্রসন্ন সামাজিক অসাধুতা দূরীকরণের জন্য বিশেষতঃ অসাধু ব্যবসায়ীদের দমনের জন্য কিরূপ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি। অসাধু ব্যবসায়ী সেকালের চেয়েও আজ এমন একটি তীব্র সমস্যা যা সমাজের প্রায় সর্বস্তরেই তার দীর্ঘ শিকড় বিস্তার করে ফেলেছে। কলকাতার অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট রূপে কাজ করার সময় কালীপ্রসন্ন এইসব অসাধু ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৮ জনকে কম ওজনের কৃত্রিম বাঁটখারা ব্যবহারের জন্য প্রত্যেকের ২৫ টাকা হিসাবে জরিমানা করেই ক্ষান্ত হন নি, ক্রেতা সাধারণের প্রতি এই সব ধূর্ত দোকানদারের প্রবঞ্চনা বন্ধ করার জন্য বারান্তরে এরূপ অপরাধীর দণ্ড বাড়িয়ে এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদ নির্দিষ্ট করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন। আবার টেরিটির বাজার অপরিষ্কৃত রাখার জন্য তিনি বর্ধমানের মহারাজাকেও যতদিন না ঐ বাজার পরিষ্কৃত হয়, ততদিন প্রত্যহ ৫০ টাকা হিসাবে জরিমানা করেছেন। এখনকার দিনে কলকাতার

প্রধান প্রধান রাস্তার ওপরেও আবর্জনাস্তূপের দৃশ্য দেখলে কালীপ্রসন্নের এই নির্ভীক ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে যায়।

এবার জমিদার শ্রেণীর বিভিন্ন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের বিভিন্ন জায়গায় যে প্রজাবিক্ষোভ ঘটেছিল তাতে জমিদার কালীপ্রসন্নের দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল সে কথা উল্লেখ করেই আমরা 'সমাজপ্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়টি শেষ করব।

সেকালের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখব. ১৮৪২ সাল থেকে পরবর্তী তিন-চার দশক জুড়ে ফরিদপুরে, পাবনায়, নদীয়ায় এবং বিক্ষিপ্তভাবে বাংলার প্রায় সর্বত্র মাঝে মাঝে প্রজা বিদ্রোহ চলেছে। প্রজাদের এই বিক্ষোভ কখনো জমিদারদের বিরুদ্ধে, কখনো নীলকরদের বিরুদ্ধে, কখনো এক সঙ্গে উভয়ের বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে 'ওয়াহাবী বিদ্রোহের' নেতা তিতুমীরের পর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলায় ফারাজী আন্দোলনের নেতা মহম্মদ সোহাইনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনিই প্রথম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন—"পৃথিবীর সমস্ত জমির মালিকই আল্লাহ, আর তাঁর চোখে সব মানুষই সমান। তাই আমরা যারা আল্লাহকে মান্য করি, তারা কেউ আর জমিদারদের খাজনা দেব না, নীলকর সাহেবদের জন্য নীল বুনব না ও বিদেশী ফিরিঙ্গীদের রাজত্বকেই মানব না।"[১৫] এই মহম্মদ সাহাইনই গ্রাম বাংলায় খ্যাতি লাভ করেছিলেন দুদু মিঞা নামে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার দুদু মিঞাকে গ্রেপ্তার করে এবং ১৮৬২ তে ইংরেজের জেলখানাতেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

আবার ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পাবনায় যে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হল তাতেও কৃষকেরা রুখে দাঁড়াল শুধু জমিদারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে নয়, খাস জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে। গ্রামে গ্রামে জমিদারদের খাজনা না দেওয়ার জন্য সাড়া পড়ে গেল—পাবনার সিরাজগঞ্জের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নোলান বললেন, "বিবাদের প্রকৃত উৎস হলো, সাফশাহি পরগণায় প্রায়ই খাজনা বৃদ্ধি এবং বে-আইনী আদায়।" 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রে 'লণ্ডন স্পেক্টেটর' থেকে উদ্ধৃতি বের হল—"পাবনা জেলার ৮ লক্ষ রায়ত সংঘবদ্ধ হয়েছে, খাজনা দেবে না বলে ঘোষণা করেছে, অন্যান্য জেলায় দূত পাঠিয়েছে। ঢাকার রায়তরা, তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে।.....রায়তদের এই রণধ্বনি নতুন ও বিপজ্জনক।......সরকার এর ফলে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছে।......জনসাধারণই একমাত্র আমাদের বিব্রত

অথবা ধ্বংস করতে পারে।" শেষ পর্যন্ত অবশ্য জমিদার আর ইংরেজ সরকারের সাঁড়াশী আক্রমণের ফলে এই কৃষক আন্দোলনও ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু প্রশ্ন হল কেন এই ঘন ঘন প্রজাবিক্ষোভ? এর কারণ জানতে হলে সেকালে বেশীর ভাগ গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ জমিদার কিভাবে প্রজা-নিপীড়ন করতেন সে কাহিনী জানা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে ১৭৭২ শকের (১৮৫০ খৃঃ) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা' শিরোনামে যে ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয় তাতে বাঙালী জমিদারদের লোমহর্ষক অত্যাচারের বিবরণ পাওয়া যায়—

"……তাঁহারা প্রজাদের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি দূরে থাকুক, তাহারদিগের শরীরও আপনার অধিকারভুক্ত জ্ঞান করেন, এবং তদনুসারে তাহারদিগের কায়িক পরিশ্রমও আপনার ক্রীত বস্তু বোধ করিয়া তাহার উপর দাওয়া করেন। তাঁহারদের এই প্রকার অখণ্ড্য অনুমতি আছে যে, বিনা মূল্যে ও বিনা বেতনে তাঁহারদিগকে গোপেরা দুগ্ধ দান করিবেক, মৎস্যোপজীবিরা মৎস্য প্রদান করিবেক, নাপিতে ক্ষৌর করিবেক, যান-বাহকে বহন করিবেক, চর্ম্মকারে চর্ম্মপাদুকা প্রদান করিবেক, ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব উপজীব্যোচিত অনুষ্ঠান দ্বারা তাহারদিগের সেবা করিবেক,। ক্রীতদাসকেও ঐরূপ দাসত্ব করিতে হয় না। সেও স্বীয় কার্য্যের বেতন স্বরূপ অন্ন বস্ত্র প্রাপ্ত হয়। আর ইহাঁরা স্বীয় অধিকারস্থ ব্যবসায়ীদিগের নিকট যাবতীয় বস্তু ক্রয় করেন, তাহারও উচিত মূল্য দান করেন না।…· দূরদেশীয় মনুষ্যেরা ইহারদের আচরণ শ্রবণ করিলে সহসা বোধ করিতে পারেন, প্রজাকুল সমূলে উন্মূল করাই ইহাদের উদ্দেশ্য।……

……ভূস্বামিরা যে কত প্রকার কৌশল করিয়া লোকের ধন হরণ করেন, তাহা নির্ব্বাচন করা দুষ্কর। · কখন দেখ, তিনি লোভাক্রান্ত হইয়া পুনঃ-পুনঃ ভূমি পরিমাণ পূর্ব্বক নানা কৌশলে রাজস্বের বাহুল্য করিতেছেন, কখন কোন প্রজার নিরূপিত কর পরিবর্ত্তন করিয়া যথেচ্ছা বৃদ্ধি করিতেছেন, কখন বা সাতিশয় ধনতৃষ্ণা-পরবশ হইয়া স্বেচ্ছানুসারে এক প্রজার ভূমি গ্রহণ পূর্ব্বক অধিকতর করে, অন্যের হস্তে অর্পণ করিতেছেন।"

এর পর জমিদারদের প্রজা-নির্যাতন কৌশলের একটি তালিকাও দিয়েছেন লেখক—

"ভূস্বামিদিগের লোকে বলদ্বারা তাহারদের ধান্য গ্রহণ করে, গো সকল হরণ করে, এবং তাহারদিগকে…… জল-মগ্ন করে ও প্রহার করে। ভূস্বামী

ও দারোগা এবং তাহারদের কর্ম্মচারিরা প্রজাদিগের যে প্রকার শারীরিক দণ্ড করে, তাহা কলিকাতাবাসি অনেক লোকে সবিশেষ অবগত নহেন। অতএব পশ্চাৎ কয়েক প্রকার কায়দণ্ডের বিবরণ করা যাইতেছে ঃ

১। দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত করে।

২। চর্ম্মপাদুকা প্রহার করে।

৩। বংশকাষ্ঠাদি দ্বারা বক্ষঃস্থল দলন করিতে থাকে। (২০শে জ্যৈষ্ঠের 'ভাস্কর' পত্রে ইহার উদাহরণ আছে)

৪। খাপরা দিয়া কর্ণ ও নাসিকা ঘর্ষণ করায়।

৫। ভূমিতে নাসিকা ঘর্ষণ করায়।

৬। পৃষ্ঠভাগে বাহুদ্বয় নীত রাখিয়া বন্ধন করিয়া বংশদণ্ডাদি দ্বারা মোড়া দিতে থাকে।

৭। গাত্রে বিছুটি দেয়।

৮। হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় নিগড়-বন্ধ করিয়া রাখে।

৯। কর্ণধারণ করিয়া ধাবন করায়।

১০। কাটা দিয়া হস্ত দলন করিতে থাকে। (অর্থাৎ দুইখান কঠিন বাখারির এক দিক বাঁধিয়া তাহার মধ্যে হস্ত রাখিয়া মর্দ্দন করিতে থাকে। এই প্রাণ-ঘাতক যন্ত্রের নাম কাটা)।

১১। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রে পাদদ্বয় অতি বিমুক্ত করিয়া ইষ্টকোপরি ইষ্টক হস্তে দণ্ডায়মান করিয়া রাখে।

১২। অত্যন্ত শীতের সময় জলমগ্ন করে ও গাত্রে জল নিক্ষেপ করে।

১৩। গোণীবদ্ধ করিয়া জলমগ্ন করে।

১৪। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ধান্যের গোলায় পুরিয়া রাখে। সেই সময় গোলার অভ্যন্তর অত্যন্ত উষ্ণ হয়, এবং ধান্য হইতে প্রচুর বাষ্প উঠিতে থাকে।)

১৫। চুনের ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখে।

১৬। কারারুদ্ধ করিয়া উপবাসী রাখে, অথবা ধান্যের সহিত তণ্ডুল মিশ্রিত করিয়া তাহাই এক সন্ধ্যা আহার করিতে দেয়।

১৭। গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া লংকা মরীচের ধূম প্রদান করে।"

প্রজাদের উপর জমিদারদের এইসব অত্যাচার দেখে ১২৫৯ বঙ্গাব্দের (১৮৫২ খৃঃ) ২৮শে ভাদ্র সংখ্যার 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদকীয় নিবন্ধে ইংরেজ সরকারকে ধিক্কার দিয়ে লেখা হয়েছে ঃ

"হা পরমেশ্বর! যাঁহারদিগের অধীনস্থ প্রজামণ্ডলীর ঈদৃশ দুরবস্থা তাঁহারদিগের সুসভ্য ও রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিতে কি লজ্জাবোধ হয় না? যে পর্য্যন্ত কৃষকদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইবেক, সে পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞ সমাজে কদাচ প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবেন না।"

অবশ্য প্রজাদের উপর জমিদারদের এই অত্যাচারের পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের ইতিহাস। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধে' এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা একটু দীর্ঘ হলেও একটা কালানুক্রমিক ঐতিহাসিক রূপ ফুটে উঠেছে বলে এখানে তা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি।

"প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে জমিদার ছিল না। প্রজারা ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইত।·······মুসলমানদিগের সময়ে প্রথম জমিদারের সৃষ্টি। ····তাঁহারা পরগণায় পরগণায় এক এক ব্যক্তিকে করসংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। তাহারা একপ্রকার কর-সংগ্রহের কণ্ট্রাক্টর হইল। রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের লাভ থাকিবে। ইহাতেই জমীদারির সৃষ্টি, এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীনের সৃষ্টি। এই কন্ট্রাক্টরেরাই জমীদার। ... .তাহার পর ইংরেজেরা রাজা হইলেন।. ... লর্ড কর্ণওয়ালিস্ মহাভ্রমে পতিত হইয়া প্রজাদিগের আরও গুরুতর সর্ব্বনাশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জমীদারদিগের জমীদারীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব নাই বলিয়াই জমীদারীতে তাঁহাদিগের যত্ন হইতেছে না। জমীদারীতে তাঁহাদিগের স্থায়ী অধিকার হইলে পর, তাহাতে তাঁহাদের যত্ন হইবে। সুতরাং তাঁহারা প্রজাপীড়ক না হইয়া প্রজাপালক হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃজন করিলেন। রাজস্বের কন্ট্রাক্টরদিগকে ভূস্বামী করিলেন। তাহাতে কি হইল? জমীদারেরা যে প্রজাপীড়ক, সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে, প্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ত্ব একেবারে লোপ হইল।·· কর্নওয়ালিস্ বলিলেন যে, 'প্রজা প্রভৃতির রক্ষার্থে ও মঙ্গলার্থে গবর্নর জেনেরল যে সকল নিয়ম আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তখনই বিধিবদ্ধ করিবেন। তজ্জন্য জমীদার প্রভৃতি খাজানা আদায় করার পক্ষে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।"[১৬]

'বিধিবদ্ধ করিবেন' আশা দিলেন, কিন্তু করিলেন না। বরং তদ্বিপরীতই করিলেন। ১৮১২ সালের ৫ আইনের দ্বারা প্রজার যে কিছু স্বত্ব ছিল, তাহা লোপ করিলেন। এই বিধি হইল যে জমীদার প্রজাকে যে কোন হারে পাট্টা দিতে পারিবেন। ইহার অর্থ এই হইল যে, জমীদার যে কোন প্রজার নিকট, যে কোন হারে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন। ডিরেক্‌টরেরা স্বয়ং এই অর্থ করিলেন[১৭], সুতরাং কৃষককে ভূমিতে রাখা না রাখা জমীদারের ইচ্ছাধীন হইল। পরে ১৮১২ সালের ১৮ আইন। ৫ আইন তদ্দ্বারা আরও স্পষ্টীকৃত হইল। ডিরেক্‌টরেরা লিখিলেন যে, এই আইন অনুসারে জমীদারেরা কদিমী প্রজাদিগকেও নিরিকের বিবাদচ্ছলে তাহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন।

তাহার পর ১৮৫৯ সাল পর্য্যন্ত আর কোন দিকে কিছু হইল না। ১৮৫৯ সালে বিখ্যাত দশ আইনের সৃষ্টি হইল, ইংরাজ কর্ত্তৃক প্রজার উপকারার্থ এই প্রথম নিয়ম সংস্থাপন হইল। ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিস্ যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন. প্রায় ৭০ বৎসর পরে প্রাতঃ স্মরণীয় লর্ড ক্যানিঙ্ হইতে প্রথম তাহার কিঞ্চিৎমাত্র পূরণ হইল।...... তথাপি এইটুকু মাত্র প্রজার পক্ষতা দেখিয়া প্রজাদ্বেষী, স্বার্থপর কোন কোন জমীদার কতই কোলাহল করিয়াছিলেন। অদ্যাপি করিয়াছেন।

এই পটভূমিতে জমিদার কালীপ্রসন্নের প্রজাদের সম্বন্ধে কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় "মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের নিকট আবেদন" শীর্ষক তাঁর স্বরচিত রচনার একাংশে—

"১৮৫৯ সালের ১০ আইন কেবল তাঁহার [হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের] একমাত্র পরিশ্রম যত্ন ও অধ্যাবসায় প্রচলিত হয় (।) তাহার কোন কোন ভাগে বঙ্গবাসী ৩ কোটী লোক স্বাধীন-প্রায় হইয়াছে। জমিদারদিগের প্রজাগণের উপর আর তাদৃশ প্রভুত্ব নাই ; জমিদার মনে করিলেই প্রজাবর্গকে তাঁহার কর্ম্মালয়ে আসিতে হইবে, তিনি, শান্তিরক্ষকের (Police-এর) অজ্ঞাতসারে প্রজার ধান্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবম্প্রকার বহুবিধ অনিষ্টকর নিয়ম একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।"

জমিদার হয়েও কালীপ্রসন্নের প্রজার পক্ষ সমর্থনের এই গুণটি তাঁর মৃত্যুর পর ১০ই শ্রাবণ ১২৭৭ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়—

"...সাধারণের কল্যাণকর কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ যত্ন ছিল। তিনি দয়ার সাগর ও বদান্যতার আকর ছিলেন। এই নিমিত্ত জমিদার হইয়াও প্রজার পক্ষ অবলম্বন করেন।"

দুঃখের বিষয়, ঐ সময়ের পুরাতন সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের অনেক সংখ্যা এখন দুষ্প্রাপ্য (বিলুপ্ত ?) হওয়ায় বহু চেষ্টা করেও যদিও কালী-প্রসন্নের এই প্রজাদরদী গুণ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত তথ্য আহরণ করা সম্ভব হল না, তথাপি যে, 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে বলেছেন, "বঙ্কিমবাবু চরিত্রাংশে...দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সমকক্ষ লোক ছিলেন না" তাঁর সাংবাদিক সত্যনিষ্ঠার প্রতি আস্থা স্থাপন করলে "জমিদার হইয়াও প্রজার পক্ষ অবলম্বন করেন" এই একটি মাত্র তথ্যই জমিদারদের বিরুদ্ধে কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রজাদের পক্ষাবলম্বনের সত্যভাষী সাক্ষ্যরূপে বিবেচিত হতে পারে। তাছাড়া পূর্বে উল্লিখিত কালীপ্রসন্নের স্বরচিত 'মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের নিকট আবেদন' শীর্ষক প্রবন্ধে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের দ্বারা প্রজাদের উপর জমিদারদের অত্যাচার নিবারণের কিছুটা উপায় হওয়ায় কালীপ্রসন্নের উৎসাহিত হওয়ার ব্যাপারটিও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এখানে একটি কথা—তৎকালে অধিকাংশ জমিদার ব্রিটিশ সরকারের শাসন ও শোষণের প্রচ্ছন্ন যন্ত্র হলেও সত্যের খাতিরে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, সকল জমিদারই প্রজাদ্বেষী বা প্রজাপীড়ক ছিলেন না এবং সংখ্যায় খুব কম হলেও কোন কোন জমিদার প্রভূত দানের জন্যও বিখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ স্বল্পসংখ্যক দানশীল জমিদারদেরও বেশির ভাগ দানই যখন খাম-খেয়ালির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত, তখন কালীপ্রসন্নের দানশীলতা ছিল সৃজনেষণা, আদর্শবোধ এবং সমাজসংগঠন ও সমাজসংস্কারের পরিকল্পনার সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত। আচার্য কৃষ্ণকমল কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "তিনি যেমন তাঁহার purse এর সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন, তেমন আর কেহই জানিত না।" তথাপি এই অতুলনীয় দানশীলতার চেয়েও জমিদার কালীপ্রসন্নের বড় কৃতিত্ব হল দেশের শতকরা আশী ভাগ কৃষকের স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন সময়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাবিক্ষোভে প্রজার পক্ষ অবলম্বন করা। জমিদারি বৃক্ষের ফল খেয়ালের বশে বা সুখ্যাতির লোভে এবং

কখনো বা করুণার চাপে মুক্তহস্তে দান করতে যত উদারতার প্রয়োজন, তার থেকে অনেক বেশী উদারতার প্রয়োজন সেই জমিদারি বৃক্ষের আয়ের অবৈধ মূলের ওপরে প্রজাদের কুঠারাঘাতের প্রচেষ্টায় জমিদার হয়েও প্রজাদের পক্ষ সমর্থন করার মনোভাবে।

এইভাবে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার পটভূমিতে কালীপ্রসন্নের সমাজকর্মের ধারাবাহিক ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, হঠাৎ কোন উত্তেজনা বা ভাবাবেগের বশে নয়, একটি সুস্থ, পরিচ্ছন্ন সামাজিক দায়িত্ববোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েই কালীপ্রসন্ন তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীস্বার্থ, প্রজাস্বার্থ ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে তাঁর চিন্তা ও চেষ্টাকে অব্যাহত রেখেছিলেন।

১। অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ঃ উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি (১ম সং) পৃঃ ৫৯-৬০।

২। বিনয় ঘোষঃ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ৩য় খণ্ড (১ম সং ১৩৬৬) পৃঃ ৩৬৯-৭০।

৩। আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুল লক্ষণম্॥

৪। Capt. G. S. Anderson : Revenue Survey Report, 1868.

৫। Ward : View of the History, Literature and Religion-Vol III.

৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড, (৩য় সং ১৩৫১) পৃঃ ১৫।

৭। Selections from the Records of the Bengal Govt. No. XXII—Correspondence relating to Vernacular Education (Calcutta 1855)

৮। 'ভারতী' ১৩০৪ বৈশাখ—গোপাল চন্দ্র শাস্ত্রীঃ ভোলা ময়রা।

৯। N. K. Sarkar & A. C. Bandopadhyaya : History of India (6th edn. 1958) p. 642-43.

চতুর্থ অধ্যায়

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু সে আলোচনার পূর্বে প্রথমেই 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' স্থাপনের কাল সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকরে' ও 'সম্বাদ ভাস্করে' উল্লিখিত তথ্য, সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনের তারিখ এবং সভার পক্ষ থেকে মাইকেল মধুসূদনকে দেওয়া মানপত্রে উল্লিখিত সভার প্রতিষ্ঠাকাল সংক্রান্ত তথ্যে যে অনৈক্য আছে তার বিচার করে ঐ সভার সঠিক প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে আমাদের নিঃসংশয় হওয়া প্রয়োজন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি (২০শে মাঘ ১২৬২ সাল) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ ঃ

"৭ মাঘ [১৯শে জানুয়ারি] যামিনী ৭ ঘন্টার সময়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাম্বৎসরিক সভা নিৰ্ব্বাহিত হইয়াছে. এই সভা দ্বারা দেশের যে কত হিত-সাধন হইবেক তাহা বলা যায় না। এই সভার বয়ঃক্রম এক বৎসর হইল (।) ইহার মধ্যে দেশের অনেক কুপ্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই, প্রথমতঃ ইতিপূৰ্ব্বে এই কলিকাতা নগরে একটিও বাঙ্গালা সভা ছিল না, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করিবাতে অধুনা অনেক ভদ্র সন্তানেরা আপনাপন বাটীতে এক এক বাঙ্গালা সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কেহ বা সপক্ষে কেহ বা বিপক্ষে ও কেহ বা এই দৃষ্টান্ত দৃষ্টে যদ্যপি তাঁহারা ঈর্ষাবৃত্তির বশীভূত হইয়া এই মঙ্গলকর পথের পথিক হয়েন তাহা হইলেও তাহারদিগকে নিন্দা করা যায় না, কারণ এ বিষয়ে জিগীষা প্রবৃত্তি না হইলে কখন উৎসাহ চিরস্থায়ী হয় না। আমরা দেশীয় সকল ব্যক্তিকে এই পরামর্শ প্রদান করি যে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দৃষ্টান্তের অনুগামী হউন, তহা হইলে বোধ করি অত্যল্পকাল মধ্যে দেশস্থ তাবতেই সভ্যতা সোপানে পদার্পণ করিতে পারিবেক।"

১৯শে জানুয়ারি ১৮৫৬ তারিখে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভার' প্রথম সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হওয়ায় সভার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বলে মনে

করা স্বাভাবিক। কিন্তু 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র প্রথম দিকের সাম্বৎসরিক সভাগুলি যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়নি ; ১১শে জানুয়ারি ১৮৫৬ থেকে ১৪ই জানুয়ারি ১৮৫৭ তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রথম তিনটি সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হয়।[১] সভার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ ধরা হলে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসেই তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা হওয়া সম্ভব নয়। আবার ২২শে নভেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করের' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ও দেখা যায়—"কয়েক বৎসর হইল বিদ্যোৎসাহিনী নামে যে সভা হইয়াছে সিংহবাবু ঐ সভার সম্পাদকীয় কার্য্যে বহুধন ব্যয় করিয়াছেন।"

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে "কয়েক বৎসর হইল" কথাটি লেখা হলে খুব সঙ্গত কারণেই ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সভার প্রতিষ্ঠাকাল সম্বন্ধে সংশয় দূরীভূত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৪ই জুন ১৮৫৩ (১লা আষাঢ় ১২৬০) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত একটি সংবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

"জ্যেষ্ঠ মাসের বিবরণ।... ৺নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য এক সভা করিয়াছেন।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন "এই সভাই যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা, তাহাতে সন্দেহ নাই।[২] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এই বিবরণ থেকে সভাপ্রতিষ্ঠার তারিখ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নি (বিবরণে তারিখের কোন উল্লেখও নেই)। কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের তারিখটিকেই সভা প্রতিষ্ঠার তারিখ মনে করে 'পুরাতন প্রসঙ্গের' (বিদ্যাভারতী সংস্করণ, ৬ই শ্রাবণ ১৩৭৩) সংশোধন ও সংযোজন অংশে উল্লিখিত হয়েছে—বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাকাল ১৪. ৬. ১৮৫৩ 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস' গ্রন্থে অজিত দত্ত ও উল্লেখ করেছেন—"১২৬০ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে, ১৪ই জুন, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য' কালীপ্রসন্ন এক সভা স্থাপন করেন। এই সভাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'।" স্পষ্টতঃই এই উভয় ক্ষেত্রে গুরুতর অনবধানতা-দোষ ঘটেছে—কারণ ১৪ই জুন, (১ লা আষাঢ়) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' 'জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবরণ' হিসেবে ঐ সভার কথা বিজ্ঞাপিত হয়েছে। সুতারং ঐ সভা প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৪ই জুন ১৮৫৩ নয়, অন্ততঃ তার প্রায় এক মাস কাল পূর্বে।

কিন্তু ঐ সভাই যে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' সে সম্বন্ধে এখনও সংশয় থেকে যায়। ১৪ই জুন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের 'সংবাদ প্রভাকরের' ঐ বিজ্ঞাপনে সভার

কোন নাম উল্লিখিত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ ঐ 'সংবাদ প্রভাকরে'রই ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ তারিখের সংবাদে স্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে, "৭ মাঘ শনিবার যামিনী ৭ ঘন্টার সময়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাম্বৎসরিক সভা নির্ব্বাহিত হইয়াছে,… এই সভার বয়ঃক্রম এক বৎসই হইল।" 'সংবাদ প্রভাকর' ছাড়া (যেখানে ঐ দুটি সংবাদই প্রচারিত হয়েছে) অন্য কোন সংবাপত্রে এই সংবাদপত্রে এই সংবাদ পরিবেশিত হলে হয়ত অজ্ঞতাবশতঃ সংবাদ পরিবেশনের ভ্রম বলে ধরে নেওয়া যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। আবার ২রা ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দে (ফেব্রুয়ারি, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে) বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে মাইকেল মধুসূদনকে দেওয়া মানপত্রে উল্লিখিত হয়েছে—

"প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।" [২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখের সোমপ্রকাশে' মানপত্রখানি উদ্ধৃত হয়েছে।] এক্ষেত্রেও বিদ্যোৎসাহিনী সভার' প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ নিরূপিত হয়। বিদ্যোৎসাহিনী সভার কর্তৃপক্ষ দ্বারা সযত্ন রচিত মানপত্রে বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠাকাল সম্বন্ধে তথ্যের ভ্রান্তি হওয় সম্ভব নয় বলেই আমার মনে হয়।

সুতরাং এ বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত এই যে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে যে সভা স্থাপিত হয় তার নাম 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' ছিল না [সম্ভবতঃ তা এক ধরণের Debating Club ছিল—দ্রঃ আচার্য কৃষ্ণকমলঃ 'পুরাতন প্রসঙ্গ'] পরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ঐ সভার নামকরণ হয় 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ থেকে সভার প্রথম প্রতিষ্ঠাকাল হিসাব করে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি থেকে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে অতি অল্পদিনের ব্যবধানে তিনটি সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন করে নেওয়া হয়। সম্ভবতঃ প্রথম দিকের সাম্বৎসরিক সভাগুলির যথাসময়ে অধিবেশন না হওয়ার এইটিই প্রকৃত কারণ।

এবার ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বিবরণ থেকে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র সামাজিক গুরুত্ব বিষয়ে কয়েকটি তথ্যের উপরে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এই সভা যে তৎকালীন সমাজের অনেক কুপ্রথা দূরীকরণে সহায়ক হয়েছিল, 'সংবাদ প্রভাকর' তার সাক্ষ্য দিয়েছেন এইভাবে, "এই সভার বয়ঃক্রম এক বৎসর হইল ইহার মধ্যে দেশের অনেক কুপ্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।" আবার ঐ সভা-

স্থাপনের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে আরও অনেক সভা যে উঠেছিল সে সম্বন্ধে উল্লেখ পাই 'সংবাদ প্রভাকরে'র ঐ বিবরণে—"প্রথমতঃ ইতিপূর্ব্বে এই কলিকাতা নগরে একটিও বাঙ্গালা সভা ছিল না, শ্রীযুতবাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করিবাতে অধুনা অনেক ভদ্র সন্তানেরা আপনাপন বাটীতে এক এক বাঙ্গালা সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কেহ বা সপক্ষে কেহ বা বিপক্ষে ও কেহ বা এই দৃষ্টান্ত দৃষ্টে যদ্যপি তাঁহারা ঈর্ষাবৃত্তির বশীভূত হইয়া এই মঙ্গলকর পথের পথিক হয়েন তাহা হইলেও তাহারদিগকে নিন্দা করা যায় না, কারণ এ বিষয়ে জিগীষা প্রবৃত্তি না হইলে কখন উৎসাহ চিরস্থায়ী হয় না।'' অবশ্য কালীপ্রসন্নের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'ই প্রথম বাঙ্গালা সভা নয়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'ই প্রথম বাঙ্গালা সভা। তবে ঐ সভায় অনেক সামাজিক সমস্যা আলোচিত হলেও প্রধানতঃ তা ছিল ধর্মীয় সভা এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সামাজিক গুরুত্ব যথেষ্ট হলেও মূলতঃ তাও ধর্মীয় সভা, যেহেতু তারও উদ্দেশ্য ছিল "ব্রহ্মসমাজ যাহাতে স্থানে স্থানে স্থাপিত হয়, এবং যে রূপেতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম ধর্ম্ম বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হয় তাহার সাধন।"[৩] সুতরাং এ দুটিকে ধর্মীয় সভাও সামাজিক সভার মিশ্ররূপ হিসাবে ধরলেও ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা', ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'সর্বশুভকরী সভা' এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি' ছিল উল্লেখ-যোগ্য সামাজিক সভা। যদি 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র আদিরূপের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ ধরা হয়, তাহলেও অন্তত: 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' এবং 'সর্বশুভকরী সভা' এর অগ্রগামী। এর মধ্যে ঠনঠনিয়ায় ৺রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত 'সর্বশুভকরী সভার' উদ্দেশ্যই ছিল কৌলীন্যপ্রথা রদ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রোধ, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সমাজসংস্কারে লিপ্ত হওয়া। এই 'সর্বশুভকরী সভা' ও এই সভা দ্বারা পরিচালিত 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'র সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তবে "প্রথম দুই সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর সর্বশুভকরী সভায় গন্ডগোল উপস্থিত হয়।"[৪] সুতরাং এই সভার প্রভাব বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। আর সেদিক থেকে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' ঠিক প্রথম বাঙ্গালা সভা না হলেও সমাজ ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রথম দীর্ঘস্থায়ী সভা এবং পরবর্তীকালে নূতন

নূতন সভা স্থাপন ও সামাজিক বিষয়ে উদারনৈতিক মতবাদ প্রচারের ব্যাপারে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র প্রভাবও অবশ্য স্বীকার্য। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র সাম্বৎসরিক অধিবেশনের শেষে 'সংবাদ প্রভাকর'ও দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন—"আমরা দেশীয় সকল ব্যক্তিকে এই পরামর্শ প্রদান করি যে শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের দৃষ্টান্তের অনুগামী হউন, তাহা হইলে বোধ করি অত্যল্পকাল মধ্যে দেশস্থ তাবতেই সভ্যতা সোপানে পদার্পণ করিতে পারিবেক।"

'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' কিভাবে সামাজিক আন্দোলন ও সমাজ-সংস্কারে লিপ্ত হয়েছিলেন এবারে তার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বিধবাবিবাহ সম্পর্কে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন কালীপ্রসন্ন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রসর হন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় যখন ঐ প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমাজের বহু আবেদনপত্র প্রেরিত হচ্ছিল এবং একটি দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে উঠছিল, তখন কালীপ্রসন্ন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে বহু গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করার ব্যবস্থা করেন। এ সম্পর্কে ১২মে ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিত হয়ঃ

"বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবাবিবাহ পক্ষে লেজিসলেটিব কৌন্সেলে যে দরখাস্ত দিতে ইচ্ছা করিতেছেন তাহাতে তিন সহস্র ভদ্রলোকের স্বাক্ষর হইয়াছে, যদ্যপি কেহ স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছা করেন বিদ্যোৎসাহিনী সভায় আগমন করিলেই স্বাক্ষর পুস্তক পাইবেন।"

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিধবাবিবাহ আইন জারি হলে কালীপ্রসন্ন সংবাদপত্রে ঘোষণা করেনঃ—

বিজ্ঞাপন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবাবিবাহেচ্ছু ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞাত করিতেছেন যে ১৭৭৭ শকীয় ঊনবিংশ সভায় সভার অধ্যক্ষ মহোদয়গণ প্রতি বিবাহে এক ২ সহস্র মুদ্রা প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন, অতএব প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ সম্বন্ধ নির্বন্ধপত্রে স্বাক্ষরিত হইলেই বিবাহের পূর্বে বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংকলিত অর্থ প্রদান করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' চেষ্টা করেন। কলকাতা নগরের ভদ্রপল্লীমধ্যে বেশ্যাগণের বাস ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকায় যখন "ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপূর্ণ" হয়ে উঠেছিল, তখন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' তৎকালীন কলকাতার নগরপ্রান্তে (সোনাগাছি ইত্যাদি স্থানে) "বেশ্যাগণের একত্র নিবসতির" জন্য ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করেন। ১৯শে নভেম্বর, ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এই আবেদন পত্রটি প্রকাশিত হয়ঃ

প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

বিদ্যোৎসাহিনী সভা, কলিকাতা নগরপ্রান্তে বেশ্যাদিগের বাসস্থল নির্দিষ্ট [করার] জন্য লেজিস্‌লেটিব কৌন্সেলে আবেদন করিবেন, আবেদনপত্র আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি। পাঠকবর্গের বিদিতার্থ প্রভাকরে প্রকাশ করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক

কিন্তু একবার মাত্র আবেদন পত্র পেশ করেই যে এ সম্বন্ধে কালীপ্রসন্নের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভার' উৎসাহ শেষ হয়ে যায়নি, সংকল্প সিদ্ধির জন্য ঐ সভার যে যথেষ্ট দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায় ছিল তার পরিচয় পাই ২৩শে মে ১৮৫৮ (১১ই জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে।

বিজ্ঞাপন

অদ্য শনিবার যামিনী ৭ ঘটিকার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভায় "বেশ্যাগণের বাস করিবার নিমিত্ত এক নির্দ্দিষ্ট পল্লী নিরূপিত হয়" তন্নিমিত্ত লেজিসলেটিব কৌন্সেলে আবেদন অর্পণ হইবেক, তাহার বিচার ও সেই বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ হইবেক, দর্শক ও সভ্য মহোদয়গণ সভারোহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

দেখা যায় যে সভা-প্রতিষ্ঠার কাল থেকে প্রথম কয়েক বৎসর অর্থাৎ সভা-সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই সভার সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন স্বয়ং। সেই বালক বয়সেই কালীপ্রসন্ন যে এই সভার সম্পাদকের কাজ

চালাতে পেরেছিলেন, এতে আমাদের বিস্ময় বোধ হয়। কিন্তু আমরা আরো বিস্মিত হই যখন দেখি, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, কৃষ্ণদাস পাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ তৎকালীন বহু বিখ্যাত ব্যক্তিই এই সভার সভ্য হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'পুরাতন প্রসঙ্গে' ৫ আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন ;

"আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। প্রথম পরিচয় ঠিক কেমন করিয়া কোন সময়ে হয় তাহা এখন আমার স্মরণ নাই। তাঁহার বাড়ীর দোতালায় একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে কৃষ্ণদাস পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখন ও আমার বেশ মনে আছে, সেদিন কৃষ্ণদাস পাল Commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন ; ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।......আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায়। আমি ছেলেমানুষ বলিয়াই হৌক বা আর কোনও কারণেই হউক, প্রবন্ধ গুলির জন্য আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল—কি বিষয়ে যে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবাবিবাহের উপর। এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, 'ছেলেমানুষের প্রশংসা করে রাত কাটান যাবে নাকি?' কালী সিংহ সভার নাম দিয়াছিলেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা;' দুষ্ট লোকে তাহার নামকরণ করিল 'মদ্যোৎসাহিনী সভা'। তিনি নিজ সভার patron গোছ ছিলেন। কখন ও কোন ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন কিনা মনে পড়ে না। মধ্যে মধ্যে সভ্যাদিগের ভোজনাদির ব্যবস্থা হইত ; আমি কিন্তু কখন ও আহারাদিতে যোগদান করি নাই।"

কৃষ্ণকমলের স্মৃতি কথায় 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া গেলেও কিছু তথ্যগত ভ্রান্তিও ঘটেছে।

প্রথমতঃ কালীপ্রসন্ন শুধু যে "সভার patron গোছ" ছিলেন না, সভার প্রথমাবস্থায় এবং পরে ও অনেকদিন সভার সম্পাদক ছিলেন তার মুদ্রিত প্রমাণ আমরা তৎকালীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাতেই পেয়েছি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে আমরা আর ও যে কয়েকজনের নাম সম্পাদকরূপে পাই, তাঁরা হলেন উমেশচন্দ্র মল্লিক, ক্ষেত্রনাথ বসু ও রাধানাথ বিদ্যারত্ন।

তাছাড়া যদিও আচার্য কৃষ্ণকমল বলেছেন, (কালীপ্রসন্ন) "কখনও কোন প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে না," তবু পুরাতন স্মৃতিকথায় সঠিক মনে না পড়ার জন্যই হোক অথবা সভার সকল অধিবেশনে তিনি উপস্থিত না থাকার জন্যই হোক, এ বিষয়ে তিনি সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে পারেন নি। কালীপ্রসন্ন যে স্বরচিত অনেক প্রবন্ধ এই সভায় পাঠ করতেন তার প্রমাণ পাই সমাচার সুধাবর্ষণ' পত্রে [১৬-১৭ আগষ্ট ১৮৫৫] একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণেঃ-

"আমরা গত শনিবাসরীয় যামিনীযোগে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভায়' গমন করিয়াছিলাম……। ন্যূনাধিক দুইশত ভদ্রসন্তান ঐ সভায় বিদ্যমান ছিলেন, কালীপ্রসন্ন বাবু প্রসন্ন বদনে সমাদরপুর্ব্বক তাঁহারদিগকে সম্বোধন করিয়া অকুণ্ঠ সুকণ্ঠস্বরে বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগের পত্র সকল পাঠ করিলেন,……। শ্রী যুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়…… মূল প্রস্তাব অর্থাৎ বাণিজ্যবিষয়ে কি ২ উপকার সংক্ষেপে তাহার বিবরণ ব্যক্ত করিলেন……অনন্তর কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবু ঈষদ্‌হাস্য প্রসন্নবদনে বলিলেন, সভ্য ও দর্শক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রস্তাবিত বিষয়ে যে ভাষায় যিনি যাহা বলিতে পারেন বক্তৃতা করুন…… সর্ব্বসাধারণ লোকেরা বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকাতেই তাহা দেখিতে পাইবেন।"

এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল থেকে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র মুখপত্রস্বরূপ 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'ও প্রকাশিত হতে থাকে। এতে কালীপ্রসন্নের রচনাবলী, বিশেষতঃ যে সকল প্রবন্ধ তিনি 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'য় পাঠ করতেন সেগুলি মুদ্রিত হত। 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রথম দুই সংখ্যায় [এ পর্যন্ত এই দুটি সংখ্যাই পাওয়া গেছে] কালীপ্রসন্নের যে প্রবন্ধগুলি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় পঠিত হবার পর প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হলঃ

১ম সংখ্যাঃ সভ্যতার বিষয়, চাঞ্চল্য (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)।
২য় সংখ্যাঃ বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য, চাঞ্চল্য, বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা।

তাছাড়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ সংবাদ প্রভাকরে'র একটি বিজ্ঞাপনেও বিদ্যোৎসাহিনী সভা'য় কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধপাঠের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ

অদ্য শনিবার সন্ধ্যার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রকাশ্য সভা হইবেক, দর্শক ও সভ্যগণ সভাস্থ হইয়া বাধিত করিবেন। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সম্পাদকীয় আসনে এইবার শেষ উপবেশন করিয়া 'বঙ্গদেশের কুরীতি' বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। শ্রীউমাচরণ নন্দী। কর্ম্মাধ্যক্ষ।

কালীপ্রসন্নের স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ ছাড়াও ঐ সভায় আরও যেসব প্রবন্ধ পাঠ এবং বক্তৃতাদি হত তৎকালীন সংবাদপত্রের কয়েকটি বিজ্ঞাপন থেকে তার আভাস পাওয়া যায়ঃ

(১) আগামি শনিবাসরে সি. জি. মন্টেগিউ [ডেভিড হেয়ার অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক] সাহেবের বক্তৃতা করিবার ভার ছিল, অকস্মাৎ তাঁহার কোন বাধা ঘটিবায় তিনি আগামি শনিবারে আসিতে অক্ষম, আগামি শনিবারের পর শনিবারে তিনি "Labour its importance, dignity, piety and triumphant results." এই বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, "মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব কি?" এই বিষয়ক প্রস্তাব শ্রীযুত ি্রমাধব বসুর দ্বারা এই শনিবারে পঠিত হইবেক।

শ্রী শ্রীধর শর্ম্মা

—'সংবাদ প্রভাকর' ১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬।

(২) আগামি শনিবার সন্ধ্যার পরে যুগল সেতুস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় শ্রীযুত কার্কপেট্রিক সাহেব "Sentiments proper to the age and Country." অর্থাৎ দেশকাল বিষয়োপযোগী অভিপ্রায় বিষয়ে লেকচর অর্থাৎ উপদেশ করিবেন, অতএব উক্ত সময়ে সভ্য ও বিদ্যোৎসাহি দর্শক মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক

—'সংবাদ প্রভাকর' ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬।

[এখানে উল্লেখ্য যে, ১৫ই মার্চ, ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' "সম্পাদকীয় আসনে এইবার শেষ উপবেশন করিয়া" লিখিত হলেও তার পরেও যে কালীপ্রসন্ন সম্পাদকের কাজ করেছেন ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ এর এই বিজ্ঞাপন তার প্রমাণ। অবশ্য তারও মধ্যে মধ্যে উমেশচন্দ্র মল্লিক বা ক্ষেত্রনাথ বসু যখন সম্পাদকের পদে বৃত হয়েছেন, তখন কালীপ্রসন্ন যে সহকারী কর্মাধ্যক্ষের কাজ করেছেন, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে সে তথ্যও সামান্য পরে উদ্ধৃত করেছি।]

শুধু প্রবন্ধপাঠ এবং বক্তৃতা নয়, অতি অল্প বয়সেই কালীপ্রসন্ন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'কে বাংলা সাহিত্য চর্চার একটি প্রশংসার্হ প্রতিষ্ঠান রূপেও গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে অর্থাৎ মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি যে 'বাবু নাটক' রচনা করেছিলেন তা দু'বছরের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় পুনর্মুদ্রণের সময় গ্রাহকভুক্তির জন্য ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৫৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ঃ

পূর্বে প্রায় দুই বৎসর গত হইল আমি একবার বাবু নাটক নামক গ্রন্থ রচিয়া প্রকাশ করি কিন্তু তাহা এক্ষণে এমত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে কত লোক চারি মুদ্রা স্বীকার করিয়াও পান নাই, অতএব আমি পুনরায় মুদ্রিত করিবার অভিলাষি, যদ্যপি কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় নামধাম লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহাকে গ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য করা যাইবেক মূল্য ।।৹, বিনা স্বাক্ষরকারী ৷৹ মাত্র। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। সম্পাদক।

এছাড়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 'বিক্রমোর্বশী', ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 'সাবিত্রী সত্যবান' এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে 'মালতীমাধব'—কালীপ্রসন্নের এই তিনখানি নাটক ও 'বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

কালীপ্রসন্নের এই নাট্যরচনা ছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং "৭ জন কৃতবিদ্য সদস্য" পন্ডিতের যৌথ প্রচেষ্টায় মূল মহাভারতের গদ্যানুবাদ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে পরিচালিত হয়। এই বিরাট মহাভারত (১—১৭শ খণ্ড) মুদ্রিত করে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য তাঁর উড়িষ্যার বিস্তৃত জমিদারীও যে বিক্রয় করতে হয় তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। [দ্রঃ- 'জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার ও কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়।]

'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'য় মহাভারত ছাড়া কালীপ্রসন্ন রামায়ণ অনুবাদেরও যে সঙ্কল্প করেছিলেন সে সংবাদ পাই ১৩ই জুলাই ১৮৫৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে।

বিজ্ঞাপন।

মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়েরা ১লা শ্রাবণ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় উপস্থিত হইবেন, ঐ দিনে রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদারম্ভ হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

কিন্তু মহাভারত অনুবাদের কাজের বিশালতা দেখে কালীপ্রসন্ন একই সঙ্গে রামায়ণ অনুবাদের সংকল্প পরে পরিত্যাগ করেন বলেই মনে হয়। যাই হোক্, কালীপ্রসন্নের বাসগৃহের দোতালায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধিবেশন কক্ষটি মহাভারত অনুবাদের ব্যাপক কাজকর্মের উপযোগী না হওয়ায় কালীপ্রসন্নের বরাহনগরের বাড়ী থেকে এই অনুবাদ-কর্ম পরিচালিত হতে থাকে বলে কালীপ্রসন্ন এই বাড়ীটির নাম রাখেন 'সারস্বতাশ্রম' এবং 'পুরাণ সংগ্রহ কার্যালয়'।

কালীপ্রসন্নের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'য় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্বর্ধনা। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরে অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত এই অপূর্ব কাব্যকে উপলক্ষ্য করে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে যখন একই সঙ্গে নিন্দা-প্রশংসার ঝড় বইতে থাকে তখন গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন সিংহই প্রথম 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে মাইকেল মধুসূদনকে সম্বর্ধিত করার আয়োজন করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা, শরৎ-সম্বর্ধনা ইত্যাদি অনেক কবি-সাহিত্যিক-সম্বর্ধনা হলেও বাংলাদেশে কালীপ্রসন্ন সিংহের দ্বারাই এই রীতি প্রথম প্রচলিত হয়। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন—"বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্ধিত হইবার সৌভাগ্য বোধহয়, মধুসূদনের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে।" এই সভায় উপস্থিত হবার জন্য বহু গণ্য-মান্য লোককে কালীপ্রসন্ন যে আমন্ত্রণপত্রটি পাঠান তা এইরূপ :—

My dear Sir,

Intending to present Mr. Michael M.S. Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with success the Blank Verse into our language, I have been advised to Call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at my house on the occasion of the presentation, in order to impart as much as solemnity as it is capable of receiving, while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better ; I shall therefore

be obliged, and I have no doubt all will be pleased by your kind presence at mine on Tuesday next, the 12th instant at 7 P.M.

Yours truly
Kaly Pruesunno Singh
Calcutta, the 9th February, 1861.

এই সম্বর্ধনা সভায় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌরদাস বসাক প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ মাইকেল মধুসূদনকে একখানি মানপত্র ও একটি মূল্যবান সুদৃশ্য পানপাত্র উপহার দিয়েছিলেন।

২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই মানপত্রখানি প্রকাশিত হয়ঃ—

এড্রেস।—
মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু।
কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্ত্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম (অত্যুত্তম? 'সোমপ্রকাশে মুদ্রণ প্রমাদ?) অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি, আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম (অত্যুত্তম?) অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোক সামান্য কার্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই

উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসিগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনাআপনি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শনজনিত দুঃসহ শোক-সাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমন্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গালাভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান হউন। আপনাকর্ত্তৃক যেন ভাবী বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহারদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজী ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এসকল মহোদয়গণের সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাঁহারদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

কলিকাতা
বিদ্যোৎসাহিনী সভা — বিদ্যোৎসাহিনীসভা সভ্যবর্গানাম্।
২রা ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দা।

এই মানপত্রের উত্তরে মধুসূদন বাংলায় যে বক্তৃতা করেন তাও ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৬১ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' থেকে উদ্ধৃত করা হল :

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম বর্ণনা করা অসাধ্য।

স্বদেশের উপকার করা মানবজাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত

অসম্ভবনীয়। তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা।

বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জলপ্রাপ্তে যাদৃশ উর্ব্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এপ্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সামাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি।

প্রকৃতপক্ষে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ১ম খণ্ড প্রকাশের পর নিন্দা-প্রশংসার দোলায় দোলায়মান স্পর্শকাতর কবিহৃদয়ে এই সম্বর্ধনা সাত যে মধুসূদনের ভাষায় "ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়" উৎসাহ সঞ্চার করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য এখানে একথাও স্মরণীয় যে, কেবল সাহিত্যসাধনা নয় একই সঙ্গে স্বর্ণমৃগয়ার ক্ষেত্রেও উচ্চাভিলাষী কবির আত্মনিয়ন্ত্রণে অক্ষমতার জন্য এই উৎসাহও আর কবি-জীবনে পূর্বের মত ফলপ্রসবে সহায়তা করতে পারে নি।

মধুসূদন-সম্বর্ধনার পর-বৎসর কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে রেভারেণ্ড লঙ সাহেবকেও সম্বর্ধিত করেছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক ইংরেজিতে প্রচার অভিযোগে নীলকরেরা লঙের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করলে আদালতে যখন লঙের এক মাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হয়, তখন কালীপ্রসন্ন অযাচিত ভাবে আদালতেই (২৪শে জুলাই, ১৮৬১) লঙের পক্ষ সমর্থনে এক হাজার টাকা দিয়ে দেন। ঐ ঘটনার কয়েক মাস পরে যখন লঙ স্বদেশ যাত্রা করেন, তখন প্রজাদরদী লঙ সাহেবকে কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে অভিনন্দনপত্র দিয়ে সম্মানিত করেন। এই উপলক্ষে ৩রা মার্চ ১৮৬২ তারিখের 'হিন্দু-পেট্রিয়টে' লিখিত হয়েছিল:

[Saturday, Ist March]·· ···The Biddotsahini Sabha headed by Baboo Kaliprosunno Sing presented an excellent

valedictory address to the Rev. James Long on the day of his departure. The address does honour to those from whom it emnated.

এইভাবে সাহিত্যিক ও লোকহিতৈষী ব্যক্তিদের সম্বর্ধিত করা ছাড়াও বিদ্যোৎসাহিনী সভায় বঙ্গসাহিত্যানুশীলনে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে উত্তম প্রবন্ধ রচনার জন্যও মাঝে মাঝে পুরস্কার ঘোষণা করা হত। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে এ ধরণের দুটি বিজ্ঞাপন এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

(১) "জগতে সুখি কে ?" এই বিষয়ক প্রবন্ধ যে ব্যক্তি লিখিতে ইচ্ছা করেন উত্তম হইলে বিচারমতে ২২ আষাঢ়ের মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তাঁহাকে ২০০ দুইশত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন, ৮ পেজি ফরমার, ১ ফরমার ন্যূন হইলে গ্রহণযোগ্য নহে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ
সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষ

['সংবাদ প্রভাকর' ৪ জুন, ১৮৫৬]

(২) "হিন্দুধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা" বিষয়ক প্রবন্ধ নানাপ্রকার প্রমাণাদি সহিত লিখিত হইবে, যিনি লেখকগণের মধ্যে বিচারে উত্তম হইবেন তাঁহাকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা ৩০০ তিন শত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন। ২ মাঘ সাম্বৎসরিক সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক। শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু।

বিদ্যোৎসাহিনী সম্পাদক

['সংবাদ প্রভাকর' ৪ নভেম্বর ১৮৫৬]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল থেকে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র মুখপত্রস্বরূপ 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' প্রচারিত হতে থাকে। তাছাড়া 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র অধীনে একটি পাঠশালাও পরিচালিত হয়। ২২শে নভেম্বর ১৮৫৬ তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' পাঠশালা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত সংবাদটি পরিবেশিত হয় ঃ—

"……কয়েক বৎসর হইল বিদ্যোৎসাহিনী নামে যে সভা হইয়াছে সিংহবাবু ঐ সভার সম্পাদকীয় কার্য্যে বহু ধন ব্যয় করিয়াছেন তাহাতে সাধারণের উপকার হইয়াছে ও হইতেছে, সভার অধীন পাঠশালায় বহু বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে ইহাতে কালীপ্রসন্ন বাবু সাধারণের চিরস্মরণীয় হইবেন।"

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' জনসাধারণের বিদ্যাচর্চায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনের ও আয়োজন করেছিলেন। ১২ই মার্চ ১৮৫৭ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল:

"পুস্তকালয় সংস্থাপন।—আমরা শুনিলাম যোড়াসাঁকো বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যেরা এক সাধারণ ...পুস্তকালয় সংস্থাপন করিবেন, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহাতে উচিৎ মত সাহায্য করিবেন, এবং আরো অবগতি হইল ঐ সভ্যেরা বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।" এই সংবাদে স্পষ্টই দেখা যায় যে জনকল্যাণ মূলক কাজে কালীপ্রসন্ন কোনরূপ-একগুয়েমি বা অহংকারের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে প্রয়োজন হলেই অন্যান্য দেশ হিতৈষী ব্যক্তিদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে ও কুণ্ঠিত হতেন না।

'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' এই ভাবে প্রায় সকল দিক থেকেই তার নামের সার্থকতা সাধন ক'রে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের যে চেষ্টা করেছে তা স্বভাবতই: বিস্ময় উদ্রেক করে। কিন্তু যখন দেখা যায়, একজন পঞ্চদশ বর্ষীয় কিশোর এই বহুমুখী ও ব্যাপক কর্মসমন্বিত সভা এবং তার মুখপত্র স্বরূপ 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' পরিচালনা করেছেন তখন আমাদের বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

'বিদ্যোৎসাহিনী সভার' সমস্ত কৃতিত্ব অবশ্য এখন ও শেষ হয়নি যেহেতু 'বিদ্যোৎসাহিনী সভার' আর একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হল 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ'। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমরা পরবর্তী স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করব।

—০—

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সাহিত্য সাধক চরিত মালা ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা (৪র্থ মুদ্রণ ১৩৫৩) পৃষ্ঠা ৯, পাদটীকা।

২। তদেব, পৃষ্ঠা, ৯।

৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা সাময়িক পত্র, ১ম খণ্ড (৪র্থ সংখ্যা) পৃষ্ঠা ৮২।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা ১১৫।

৫। পুরাতন প্রসঙ্গ (বিপিন বিহারী গুপ্ত সংগৃহীত, ২য়, বিদ্যাভারতী সংখ্যা) পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯।

পঞ্চম অধ্যায়

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

নাটকের পরিপূর্ণ সাফল্য মঞ্চনির্ভর। মঞ্চকে বাদ দিয়ে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত নিছক সাহিত্য হিসাবেই নাটকের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়—এ ধরণের ধারণা যে ভ্রমাত্মক সে প্রসঙ্গে Dr. Evans-এর মতটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—' In the first place an illusion, utterly false, has been created that drama can be appreciated independence of the theatre." নাটকের এই বৈশিষ্ট্য শুধু পাশ্চাত্ত্যে নয়, প্রাচ্যের প্রাচীন নাট্য পরিকল্পনা সম্বন্ধেও প্রায় সমানভাবে প্রযোজ্য। আচার্য ভরত তাঁর নাট্য-শাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে নাট্যবেদের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন, তাতেও নাটকের এই বিশিষ্ট লক্ষণটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে ঃ—

ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ভবেৎ
তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ণিকম্।

নাটকের এই দৃশ্য-শ্রব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে ভরত অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে নাটককে 'দৃশ্যকাব্য' বলা হয়েছে—'দৃশ্য' অর্থাৎ দেখার যোগ্য কথাটির পারিভাষিক অর্থ হল অভিনয়যোগ্য। সুতরাং অভিনয়-যোগ্যতা পরবর্তী সংস্কৃত নাটকেরও বিশিষ্ট লক্ষণ।

এবার পাশ্চাত্ত্যের প্রাচীনতম নাট্যাচার্য এ বিষয়ে যে প্রশ্ন তুলেছেন সেটি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। ট্রাজেডির বিচারপ্রসঙ্গে এরিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্‌স্‌'-এ লিখেছেন—"Whether it is to be judged in itself or in relation also to the audience—this raises another question." এর উত্তরে তিনি যে দুটি আপাতবিরোধী ইঙ্গিত দিয়েছেন পরবর্তীকালে তা অনেক কোলাহলের সৃষ্টি করেছে। এরিস্টটল যখন বলেন যে,—অভিনয় না দেখে শুধু কানে শুনেও ভাল ট্র্যাজেডির রস আস্বাদন করা যায়, তখন অনেকেই ধরে নেন যে এরিস্টটল অভিনয়ের অপরিহার্যতা স্বীকার করেন নি। আবার যখন নাটকের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারে মঞ্চসাফল্যকেই

তিনি একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ না করার পরামর্শ দেন, তখন তাঁদের সে মত দৃঢ়তর হয়। আবার ঐ নাট্যশাস্ত্রেই তিনি যখন বলেন, 'নাটক শেষ পর্যন্ত অভিনেয়—অভিনয়ের সাহায্যেই নাট্যরস নিষ্পাদ্য' তখন বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁদের মতের সমর্থনে সেই এরিস্টটলকেই সাক্ষীরূপে দাঁড় করান। যাই হোক, পরবর্তীকালে এবিষয়ে আমরা দুটি অতিকোটিক মত পেয়ে থাকি। ভলতেয়ার এবং জে. ই. স্পিনগার্ণ যে অতিকোটিক মত পোষণ করেন তাহ'ল--নাটক অভিনয়-নিরপেক্ষ। স্পিনগার্ণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলেন, "...... the theatre does not exist."[১] আবার বিপরীত দিকে লেসিঙ, সার্সি, গ্রানভিল বার্কার প্রমুখ নাট্যবিদদের মতগুলিও দেখা যাক্। লেসিঙ বলেছেন, "চিমনির পাশে বসে পাঠ করলেই যদি নাটকের রস সম্পূর্ণ আস্বাদন করা সম্ভব হয়, তবে থিয়েটারই বা কেন আর অভিনয়ের জন্য এত কষ্ট করারই বা প্রয়োজন কি?"[২] সার্সি বলেছেন, "অভিনয় বাদ দিয়ে নাটক কল্পনাই করা যায় না। সুতরাং যে পরিমাণ নাটক অভিনেয় তথা দর্শকচিত্তরঞ্জক সেই পরিমাণেই নাটকের উৎকর্ষ।"[৩] গ্রানভিল বার্কার বলেছেন—"নাট্যকার শুধু বীজটুকুই দেন, অভিনয়েই নাটকের পূর্ণরূপ ব্যক্ত হয়।"[৪] এই কথাটিকেই সামান্য একটু ঘুরিয়ে আবার কেউ বলেছেন, "লিখিত নাটক গানের স্বরলিপি মাত্র। যেমন গায়কের কণ্ঠের স্পর্শে স্বরলিপি গানে পরিণত হয় তেমনি অভিনয়ের স্পর্শে নাটকের কথাগুলি প্রকৃত নাটকে পরিণত হয়।"[৫] এই মতবিরোধের মধ্যে যাঁরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন তাঁদের মধ্যে এ. ডবলু শ্লেগেল এব এলারডাইস নিকেলের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্লেগেল বলেছেন, "সাধারণ লোকে অভিনয় ছাড়া নাটকের পূর্ণরূপটি উপলব্ধি করতে পারে না একথা ঠিক বটে, কিন্তু যাঁরা বিচক্ষণ এবং সহৃদয় তাঁরা বিনা অভিনয়েই নাটকের স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পারেন।"[৬] এলারডাইস নিকলও নাটকবিচারে মঞ্চসাফল্য এবং সাহিত্যিক মূল্য দুয়েরই গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

এই মতবাদের কোলাহলে আমরা এরিস্টটলের মতটিকে আবার একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারি, কারণ এরিস্টটলের যে দুটি পরস্পরবিরোধী ইঙ্গিতকে দুই বিরোধী পক্ষ নিজ নিজ পক্ষ সমর্থনে ব্যবহার করেছেন, আমাদের মনে হয় সেই দুটি ইঙ্গিতের মধ্যে কোন প্রকৃত বিরোধ নেই, ইঙ্গিত দুটি আপাতবিরোধী মাত্র। প্রথমতঃ এরিস্টটল বলেছেন বটে যে, অভিনয় না দেখে শুধু কানে শুনেও ভাল ট্র্যাজেডির রস আসবাদন করা যায়; কিন্তু পূর্ণরস

আস্বাদন করা যায়, একথা তিনি বলেননি। দ্বিতীয়তঃ নাটকের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারে মঞ্চসাফল্যকেই তিনি একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ না করার পরামর্শ দিয়েছেন সত্য, কিন্তু আমাদের মনে হয় মঞ্চব্যবস্থা, অভিনয়ের ত্রুটি বা দর্শকসাধারণের রসগ্রহণের সীমাবদ্ধতার জন্য যদি মঞ্চসাফল্য না আসে তবে তার দায় যেন উৎকৃষ্ট নাটককেও বহন করতে না হয় এই সতর্কতাই এরিস্টটলের এই উক্তির নিহিতার্থ। এই কারণেই যখন তিনি আবার বলেন যে,—'নাটক শেষ পর্যন্ত অভিনেয়, অভিনয়ের সাহায্যে নাট্যরস নিষ্পাদ্য' তখন তাঁর ইঙ্গিত দুটির মধ্যে আপাতবিরুদ্ধতা যতই থাক্, প্রকৃত বিরোধিতা যে নেই, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। অর্থাৎ অবহিত হয়ে বিচার করলে এরিস্টটলের মত সম্পর্কে আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, কানে শুনেও ভালো নাটকের রস কিছুটা আস্বাদন করা গেলেও পূর্ণরসাস্বাদনের জন্য নাটককে অভিনয়ের অপেক্ষায় থাকতে হয়, এবং যেহেতু একদিকে সস্তা উত্তেজনা ইত্যাদির জন্য অনেক সময় বাজে নাটকও মঞ্চসফল হয়ে যায় এবং অন্যদিকে মঞ্চকলা বা অভিনয়কলার ত্রুটির জন্য অনেক সময় ভালো নাটকও তথাকথিত মঞ্চসাফল্য লাভ করতে পারে না, সেজন্য কোন বিশেষ সময়ের বা বিশেষ মঞ্চের মঞ্চসাফল্য দ্বারাই নাটকের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে মঞ্চসাফল্য নির্ণয়ে এই ব্যর্থতার জন্য যাতে ভালো নাটক ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্যই এরিস্টটলের এই বিশেষ সতর্কতা।

এরিস্টটলের এই অভিমত আজকের দিনেও কতখানি সত্য তা বিশেষ ভাবে বোঝা যায় বর্তমানকালের নানা নূতন ধরণের নাট্যরচনার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকের মঞ্চসাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে বহুদিন কোন পেশাদার নাট্যসংস্থাই এই ধরণের নাটক অভিনয়ে সাহসী হন নি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে 'বহুরূপী' প্রভৃতি নাট্যসংস্থা এ ধরণের সংশয় যে ভ্রান্ত তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই প্রমাণ করেছেন। তবু এরিস্টটলের সময় থেকে নাটকরচনা ও অভিনয়রীতি এক স্থানে দাঁড়িয়ে নেই, আর সেই বিবর্তনের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রাখলে নাটকের উৎকর্ষ বনাম মঞ্চসাফল্য সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আমাদের আজ এই কথাই বলতে হয় যে, নাটকের প্রকৃতি অনুযায়ী এ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া উচিত। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে ঘটনা-প্রধান নাটক যতখানি মঞ্চনির্ভর, ভাবপ্রধান বা ভাবনা-প্রধান নাটক তা নয় কারণ যদিও মঞ্চকলা

বা অভিনয় কলার সুপ্রয়োগে ভাবপ্রধান বা ভাবনা-প্রধান নাটককেও অভিনয়ে সফল করা যায়, তবু কেবল কানে শুনে বা নিজে পড়েও ঐ শ্রেনীর নাটকের রস ঘটনা-প্রধান নাটকের তুলনায় অনেক বেশী গ্রহণ করা যায়। আবার ঘটনা প্রধান নাটকেও যে সব দৃশ্যে একটা বিরাট কল্পনার অবকাশ আছে যেমন 'King Lear' এর Storm Scene-এ, সেখানে ও আজকের মঞ্চকলার অতি-উন্নত প্রয়োগ পদ্ধতি সত্ত্বেও পাঠকের আকাঙ্খার কথা বিবেচনা করলে ঐ দৃশ্যের পরিপূর্ণ মঞ্চসাফল্য সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। এই জন্য পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ মঞ্চকলা সম্বন্ধে তাঁর যে বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচার করেছিলেন, "চিত্রপটে প্রয়োজন নাই, আমার দরকার চিত্তপটের। সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব"[৭] কিংবা "আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত,"[৮] তারও বিশেষ গুরুত্ব আছে, তবে তা কেবল ভাব-প্রধান, ভাবনা-প্রধান বা কল্পনা-প্রধান নাটক বা দৃশ্যের ক্ষেত্রেই আংশিক ভাবে প্রযোজ্য, সকল শ্রেণীর নাটকে সর্বাংশে প্রযোজ্য নয়। অভিনেতা অভিনেত্রীর আসল চেহারা এবং পরিচয়ের সঙ্গে নাটকে সর্বাংশে প্রযোজ্য নয়। অভিনেতা অভিনেত্রীর আসল চেহারা এবং পরিচয়ের সঙ্গে নাটকে বর্ণিত জগতের ব্যবধান ভোলার জন্যই রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট, রূপসজ্জা, আলোক-সম্পাত, নেপথ্য সঙ্গীত, আনুষঙ্গিক শব্দক্ষেপন ইত্যাদির সাহায্যে মঞ্চমায়া সৃষ্টি অপরিহার্য। তবে আয়োজনের ক্রমবর্ধমান বাড়াবাড়ির দ্বারা মঞ্চশিল্পের শৈল্পিক প্রচেষ্টাকে স্থূলতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রবীন্দ্রনাথের এই সময়োচিত সাবধান বাণীর প্রয়োজনীয়তাও অবশ্য স্বীকার্য।

এ বিষয়ে এত কথা বলার প্রয়োজন হল এই জন্যই যে রবীন্দ্রনাথ যে য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রতিবাদ করেছেন, প্রধানতঃ সেই য়ুরোপীয় রঙ্গমঞ্চের প্রেরণাতেই ঊনিশ শতকে বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটেছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বিকৃষ্ট, চতুরস্র এবং ত্র্যস্র [অর্থাৎ আয়ত, চতুষ্কোণ এবং ত্রিকোণ] এই তিন ধরণের নাট্যগৃহ, রঙ্গপীঠ, নেপথ্যগৃহ, সোপানাকৃতি আসনশ্রেণী, ভিত্তিকর্ম, দারুকর্ম, লেপকর্ম, চিত্রকর্ম প্রভৃতির কথা বলা হলেও নাট্যাভিনয়ের সেই মঞ্চাশ্রয়ী ধারা আজ ভারত-বাসীর জীবনে স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত। পরবর্তীকালের সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল যুগে ভাস, কালিদাস,

ভবভূতির নাটকগুলিও যে ধরণের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হত তার কোন অভিজ্ঞান আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে নিরুৎসাহব্যঞ্জক হওয়ায় এবং সুদীর্ঘ মধ্যযুগ জুড়ে ভারতবর্ষের মুসলমান আধিপত্য-কালে পূর্ববর্তী হিন্দু রাজাদের ন্যায় নাট্যাভিনয়ের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় এবং তারও পূর্বে থেকে ভাষা-বিবর্তনের ধারায় সংস্কৃতের পরিবর্তে প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং নূতন নূতন নব্যভারতীয় আর্যভাষার (N.I.A.) উৎপত্তি হওয়ায় আমরা ধীরে ধীরে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের সেই জাতীয় উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হলাম, কিন্তু পরিবর্তে নূতন শাসক সম্প্রদায়ের উৎসাহে বা অবদানে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে আর কোন নূতন নাটকও যেমন রচিত হল না, তেমনি আর কোন নূতন রঙ্গমঞ্চেরও দ্বার উন্মোচিত হল না। এই অবস্থায় লৌকিক যাত্রা, কথকতা ইত্যাদির মতো লোকায়ত অনুষ্ঠানের দ্বারা বিনাব্যয়ে বা স্বল্পব্যয়ে জনসাধারণের রসপিপাসা কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হতে লাগলো। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কয়েক দশক জুড়ে কলকাতার হঠাৎ-বাবুদের প্রশ্রয়ে যে যাত্রা, কবিগান, পাঁচালী ও হাফ আখড়াই ব্যাপকতা লাভ করল, তাতে রসবিকৃতি ও রুচিবিকৃতি দুইই অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে একজন বিদেশী হেরাসিম স্টেপানোভিচ্ লেবেডেফ (Gerasim S Lebedeff. Gerasim = Herasim ; G অক্ষরের ধ্বনি এখানে হ-কারের মত)[৯] তাঁর Commodious theatre-এ রিচার্ড পল জোড্রেল প্রণীত The Disguise নাটকের স্বকৃত বাংলা ভাবানুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' এর যে নাট্যাভিনয় করেন তা রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটক অভিনয়ের প্রশংসনীয় প্রথম প্রচেষ্টা হলেও একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। কলকাতায় ইংরেজী নাট্যাভিনয়ের জন্য কোম্পানীর নিজস্ব ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ English theatre এর টমাস রোওয়ার্থ ও তার চিত্রপট শিল্পী জোসেফ ব্যাটলের চক্রান্তে লেবেডেফের নাট্য-শালা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিপন্ন লেবেডেফ বাংলাদেশ ত্যাগ করার পরেই সে চেষ্টার অবসান হয়।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-য় আমাদের দেশে ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের উদ্যোগে দেশীয় রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের জন্য একটি অনুরোধমূলক প্রস্তাব প্রকাশিত হয়ঃ "..... ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মত শেয়ার গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে

একজন কর্ম্মাধ্যক্ষের অধীনে বেতনভোগী যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করিয়া এতদর্থে বিরচিত গীতি ও কাব্যের মাসে একবার নূতন অভিনয় করেন, তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। এইরূপে শ্রেণীনির্বিশেষে সমাজভুক্ত সকলেরই আনন্দবৃদ্ধি হইবে।"

এর কিছুদিন পর ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতৃব্য শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, গঙ্গানারায়ণ সেন, কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির উদ্যোগে শুঁড়োর বাগানে যে 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়—তাই হল বাঙালী প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গমঞ্চ। কিন্তু এখানে উদ্যোক্তাদের প্রধান লক্ষ্য হল ইংরেজী নাটক বা সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী অনুবাদের অভিনয়। শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার', উইলসন সাহেব কর্তৃক ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে'র ইংরেজী অনুবাদ এবং কয়েকমাস পরে 'Nothing Superfluous' নামে একখানা প্রহসন এখানে অভিনীত হয়। 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার দুবছর পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চ হল বাঙালী প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় রঙ্গমঞ্চ। এই রঙ্গমঞ্চে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর নাট্যাকারে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হলে ২২শে অক্টোবর তারিখের 'হিন্দু পাইওনীয়ার' নামক ইংরেজী পাক্ষিকপত্রে যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তা থেকে ঐ সময়ের ইংরেজী নাট্যশালা দ্বারা এবং কিছুটা তৎকালীন যাত্রা দ্বারা প্রভাবিত বাংলা রঙ্গমঞ্চ গঠনের উদ্যোগপর্বে বাংলা রঙ্গমঞ্চের একটি বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

"...সুমধুর ঐকতান বাদনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ হয়। সেতার সারেঙ্গী, পাখোয়াজ প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্র বাজাইয়াছিল। ...যবনিকা উত্তোলনের পূর্বে হিন্দুপ্রথামত পরমেশ্বরের স্তোত্র পাঠ করা হয় এবং প্রত্যেক দৃশ্যের পূর্বে একটি ভূমিকা আবৃত্তি করিয়া অভিনয়ের বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। দৃশ্যাঙ্কন সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। চিত্রগুলির 'পারস্পেকটিভ', মেঘ, জল প্রভৃতি ঠিক হয় নাই। এইগুলিতে সুরুচি ও চিত্রাঙ্কনের রীতিজ্ঞান উভয়েরই অভাব লক্ষিত হইল। কেবলমাত্র একটির উপরে আর একটিকে বিন্যস্ত করা, ভিন্ন মেঘ ও জলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। দেশীয় কারিগরদিগের দ্বারা কৃত হইলেও একটু নিপুণ হাতে পড়িলে এগুলি আরও অনেক ভাল হইতে পারিত; ইহাদের মধ্যে রাজা বীরসিংহের প্রাসাদ ও তাঁহার কন্যার কক্ষ অংকন একটু ভাল হইয়াছিল। এই নাটকে বিশেষ করিয়া স্ত্রীচরিত্রের অভিনয়

খুব চমৎকার হইয়াছিল। ...দেশীয় রঙ্গমঞ্চ ও তাহার পরিচালন পদ্ধতি এইরূপ।"[১০]

লেবেডেফের পর বাংলা নাট্যাভিনয়ে নবীনচন্দ্রের রঙ্গমঞ্চেই প্রথম স্ত্রী-লোকদের দ্বারা স্ত্রী-ভূমিকার অভিনয় হয়। কিন্তু এছাড়া নবীনচন্দ্রের নাট্যপ্রযোজনায় আরও কিছু অভিনবত্ব ছিল। 'বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার' গ্রন্থে সুধীর রায়চৌধুরী লিখেছেন—"নবীনচন্দ্র বসু মঞ্চে ঝড় বিদ্যুৎ দেখাবার জন্য নাকি ইংলন্ড থেকে বহুব্যয়ে বিবিধ বৈজ্ঞানিক উপকরণ এনেছিলেন। তাছাড়া নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। যেমন সুন্দর যেখানে বকুল গাছের তলায় দিঘির পাড়ে বসে আছে, সে অংশটি দেখানো হয়েছিল নবীনচন্দ্রের বাড়ীর পুকুরের পাশে। তেমনি মালিনীর কুঁড়েঘর দেখাবার জন্য দর্শকদের উঠে যেতে হয় বাড়ির অন্য এক প্রান্তে। বর্ধমান রাজার কক্ষটি ছিলো নবীনচন্দ্রের বৈঠকখানায়। মালিনীর ঘর থেকে বর্ধমান রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সত্যি সত্যি সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়েছিলো। বাস্তব দৃশ্যাবলিকে ব্যবহার করে এই ছড়ানো মঞ্চ নির্মাণ পদ্ধতি নবীনচন্দ্র কোথা থেকে নিয়েছিলেন বলা মুশকিল। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করেন মধ্যযুগের ইউরোপীয় মঞ্চের কথা শুনে হয়তো নবীনচন্দ্র অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবেন। তবে উত্তর ভারতে প্রচলিত রামলীলা যাত্রার কথাও এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। মন্মথমোহন বসু অবশ্য লিখেছেন, যে শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্যদেব অভিনীত দানলীলায় অনুরূপভাবে বাস্তবদৃশ্যকে পটভূমি করা হয়েছিল।" যাইহোক নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে রঙ্গমঞ্চ পরিকল্পনায় বাস্তবতা সৃষ্টির ওপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হলেও ঘন ঘন দর্শক এবং অভিনেতাদের স্থান বদলের ফলে একটি সংহত ও ঘনীভূত নাট্যিক রসাবেদন সৃষ্টিতে কিছুটা বাধার সৃষ্টি হয়।

কিন্তু নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যশালা লেবেডেফের নাট্যশালার মত আর একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা হয়ে রইল—কারণ এরপর ইংরেজী নাটক অভিনয়ের জন্য বাঙালীদের দ্বারা কিছু সখের ইংরেজী নাট্যশালা স্থাপিত হলেও বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে আবার চলেছে দীর্ঘ বাইশ বছরের নীরবতা। অতঃপর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতার সিমলায় আশুতোষ দেবের বাড়ীতে (জানুয়ারি ১৮৫৭), চড়কডাঙ্গায় রামজয় বসাকের বাড়ীতে (মার্চ ১৮৫৭) এবং জোড়াসাঁকোয় কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে (এপ্রিল ১৮৫৭)

নাট্যশালা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাস প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। প্রবোধচন্দ্র সেন এ বিষয়ে তাঁর 'Bengali Drama and Stage' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন, "The year 1857 marks the beginning of a new epoch in the history of Bengali Drama and the theatre. In fact, Bengali Drama and the stage have had a continuous history since that memorable year."

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে এই রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের ইতিহাস সম্বন্ধে যা বলেছেন তা একটু দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি।

" ...সে সময়ে বঙ্গসমাজে নাট্যকাব্যের অভ্যুদয় ও রঙ্গালয়ের আবির্ভাব নিবন্ধন লোকের মনে এক প্রকার উত্তেজনা চলিতেছিল। বঙ্গদেশে নাট্যকাব্যের অভ্যুদয় একটা বিশেষ ঘটনা। তৎপূর্বে যাত্রা, কবি, হাপ আকড়াই প্রভৃতি লোকের আমোদ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার একমাত্র উপায় ছিল। অধিকাংশ স্থলে এই যাত্রা, কবি ও হাপ আকড়াই অভদ্র অশ্লীল বিষয়ে পূর্ণ থাকিত। ইংরাজী শিক্ষা দেশমধ্যে যেমন ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে এই সকলের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। অনেকে যাত্রা কবি প্রভৃতিতে উপস্থিত থাকিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। তখন বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া সুরাপান ও হাস্যপরিহাস প্রভৃতি করাই তাঁহাদের একমাত্র সামাজিক আমোদ অবশিষ্ট রহিল। শিক্ষিত ব্যক্তি-দিগের মধ্যে অনেকে ইংরাজগণের স্থাপিত রঙ্গালয়ে গিয়া অভিনয় দর্শন করিতেন। সে সময়ে (১৮৫৬।৫৭ সালে) সহরে ইংরাজদের একটি প্রসিদ্ধ রঙ্গালয় ছিল, তাহাতে দেশের অনেক শিক্ষিত লোক ও বড়লোক অভিনয় দেখিতে যাইতেন। দেখিয়া আসিয়া আমাদের মধ্যে এরূপ রঙ্গালয় নাই কেন বলিয়া ক্ষোভ করিতেন। তাহার ফল-স্বরূপ সহরের দুই একজন বড় লোক উদ্যোগী হইয়া ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে অভিনেতা করিয়া ইংরাজী নাটক অভিনয় করিয়া বন্ধুবান্ধবের চিত্ত বিনোদন করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন।... কিন্তু ক্রমে ধনিগণ অনুভব করিলেন যে, ইংরাজী নাটক অভিনয় করিলে সাধারণের প্রীতিকর হয় না। এইজন্য বাঙ্গালা নাটকের অভিনয়ের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় কোনও ধনী-প্রদত্ত পারিতোষিক লাভের উদ্দেশ্যে

'কুলীন কুল সৰ্ব্বস্ব' নামক এক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের প্ররোচনায় ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে একবার তাহার অভিনয় হয়। ইহাতেই দেশীয় নাটক অভিনয়ের দ্বার খুলিয়া গেল। তৎপরে ১৮৫৭ সালে সিমুলীয়ার বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) উদ্যোগী হইয়া শকুন্তলাকে বাঙ্গালা নাটকাকারে পরিণত করিয়া অভিনয় করাইলেন। তৎপরেই মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় নিজ ভবনে বেণীসংহার নাটকের অভিনয় করাইলেন; এবং কিছু দিন পরে মহাসমারোহে তাঁহার নিজের অনুবাদিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অভিনয় হইল। দেখিতে দেখিতে সহরে বাঙ্গালা নাটক অভিনয়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া গেল।"১৮

ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটক অভিনয়ের দ্বারা দেশীয় নাটক অভিনয়ের দ্বার খুলে যায়—এই তথ্যটির প্রতি এযাবৎ কোন বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসেই মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নি। যোগীন্দ্রনাথ বসু 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতে' বলেছেন, "১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের দুইজন অভিনেতার উদ্যোগে, চড়কডাঙ্গাস্থ জয়রাম বসাক মহাশয়ের বাটিতে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীন কুল সর্বস্ব নাটক অভিনীত হয়। বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের পর বোধ হয়, ইহাই প্রথম বাঙ্গালা অভিনয়। কুলীন কুল সর্বস্ব অভিনয়ের পর দিবস কলিকাতার তৎকালীন প্রসিদ্ধ ধনী, খ্যাতনামা বাবু আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) বাটিতে শকুন্তলা নাটক অভিনীত হইয়াছিল। সেই বৎসর মহাভারতের লব্ধ প্রতিষ্ঠ অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ও তাঁহার বাটিতে বেণীসংহার নাটক অভিনয় করাইয়াছিলেন।" 'পুরাতন প্রসঙ্গে' মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বলেছিলেন, [১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে] চড়কডাঙ্গা রোডে রামজয় বসাকের বাড়ীর স্টেজে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটক অভিনয়ের পর ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) বাড়ীতে নন্দকুমার রায় রচিত 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় হয়। কিন্তু তিনজনেই 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকের অভিনয়কে এই পর্বের প্রথম বাংলা নাট্যাভিনয় বললেও রামজয় (জয়রাম) বসাকের বাড়ীতে 'কুলীন কুল সর্বস্ব'-এর অভিনয় প্রথম অভিনয় নয়, কারণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগে দেখিয়েছেন যে ছাতুবাবুর বাড়ীতে 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয়

হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩০এ জানুয়ারি এবং রামজয় বসাকের বাড়ীতে কুলীন কুল সর্বস্ব'-এর অভিনয় হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হল এই যে, রামজয় বসাকের বাড়ীর অভিনয়ের পূর্বে আশুতোষ দেবের বাড়ীর অভিনয় হলেও তারও পূর্বে যে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্ররোচনায় ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়েছিল এই ঘটনাটির প্রতি এ পর্যন্ত কোন নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। অবশ্য ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে ইংরেজী নাট্যাভিনয়ের মধ্যে 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকের অভিনয় একটি ব্যতিক্রম এবং সেদিক থেকে দীর্ঘ ব্যবধানের পর আশুতোষ দেবের বাড়ীতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩০এ জানুয়ারি নন্দকুমার রায় রচিত 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় থেকেই যে বাংলা নাট্যাভিনয়ের জন্য নাট্যশালা স্থাপনের প্রথম ধারাবাহিক প্রচেষ্টা শুরু হয়, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার (৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭) মন্তব্য থেকে এ ধরণের সিদ্ধান্তই সমীচীন মনে হয়—"বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। নাট্যশালা বলিয়া যে আমাদের একটা জিনিষ ছিল, তাহাও আমরা ভুলিয়া গেলাম। এমন সময়ে একটি নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া আমরা জানিতে পারিলাম যে, পূর্ববর্তী নাট্যশালার ভস্মাবশেষের উপর ফিনিক্স পক্ষীর ন্যায় আর একটি বঙ্গীয় নাট্যশালা আবির্ভূত হইয়াছে। এই নিমন্ত্রণের মধ্যে আরও উৎসাহের বিষয়— যে নাটকটির অভিনয় হইবে, উহা একটি সত্যকার বাংলা নাটক— কালিদাসের বিখ্যাত নাটক শকুন্তলার অনুবাদ।"[১২]

সুতরাং এই সব তথ্যাদি থেকে আমাদের এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে ইংরেজী নাটক অভিনয়ের মধ্যে ব্যতিক্রমমূলক 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটক অভিনয়ের পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩০-এ জানুয়ারি আশুতোষ দেবের বাড়ীতে নন্দকুমারের 'শকুন্তলা' নাটকটি অভিনীত হয় এবং তার কিছু পরে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে চড়কডাঙ্গা রোডে রামজয় বসাকের বাড়ীতে কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয়। আর এর প্রায় এক মাস পরেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল রামনারায়ণ তর্করত্ন অনুদিত ভট্টনারায়ণ কৃত 'বেণীসংহার' নাটকের প্রথম অভিনয় দ্বারা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয়। অবশ্য এর এক বছর পূর্বেই অর্থাৎ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দেই যে 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' প্রতিষ্ঠিত হয়, সে তথ্য পাই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে'

প্রকাশিত একটি সংবাদে—"The Bidyotsahini theatre is in the second year of its existence." যখন বাংলা রঙ্গমঞ্চের অভাবে বাংলা নাটকের বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছিল, তখন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মাত্র ষোল বছরের কিশোর কালীপ্রসন্ন প্রতিষ্ঠিত এই রঙ্গমঞ্চ নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। এ সম্বন্ধে 'নাট্যকার কালীপ্রসন্ন সিংহ' প্রবন্ধে ডঃ সুশীল কুমার দে উল্লেখ করেছেন. "বেলগাছিয়া নাট্যশালার মত এই রঙ্গমঞ্চও এককালে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং বাংলা নাট্যাভিনয়ে নবযুগ প্রবর্ত্তনে ইহার প্রভাব কোন অংশে ন্যূন ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ইহারই দৃষ্টান্তে এক বৎসর পরে বেলগাছিয়া নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছিল।" 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' 'বেণীসংহার' নাটক অভিনয়ের মাত্র দুমাস পূর্বে সিমলানিবাসী আশুতোষ দেবের বাড়ীর রঙ্গমঞ্চে নন্দকুমার রায় অনূদিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় হলেও ঐ নাট্যাভিনয়ের সাফল্য সম্বন্ধে মতৈক্য নেই। এ সম্বন্ধে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এবং 'সমাচারচন্দ্রিকা' প্রশংসা জ্ঞাপন করলেও প্রত্যক্ষদর্শী কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর 'Modern Hindu Drama' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, "The performance of 'Sakuntala' at Simla was, however, a failure. This is not to be wondered at ; for Sakuntala being a master piece of dramatic genious, requires Versatile and Consumate talent for its representation, rarely to be met with in this country."

'শকুন্তলা'র অভিনয় সম্বন্ধে এরূপ মতবিরোধ থাকলেও 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় সাফল্য সম্বন্ধে পুরাতন সংবাদপত্র ও স্মৃতিকথা ইত্যাদিতে কোন মতপার্থক্য নেই। বিপিনবিহারী গুপ্ত সংগৃহীত 'পুরাতন প্রসঙ্গে' আচার্য কৃষ্ণকমল বলেছেন, "যে প্রাঙ্গণে রামনারায়ণ পণ্ডিতের 'বেণীসংহার' নাটক অভিনীত হইয়াছিল, সেই প্রাঙ্গণ সেই রাত্রের কথা একটিও ভুলি নাই।" 'বেণীসংহার' অভিনয় সম্বন্ধে ১৫ই এপ্রিল, ১৮৫৭ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তা এইরূপ ঃ

"যুগল সেতুনিবাসী সিংহ বাবুদিগের ভবনে গত শনিবার [১১ এপ্রিল] সন্ধ্যার পর মহাসমারোহে নাট্যক্রীড়া হইয়াছিল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার আরথর বুলার সাহেব, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্টের প্রধান সেক্রেটারী মেং সিসিল বিডন সাহেব প্রভৃতি ৫/৭ জন প্রধান ইংরাজ এবং নগরীর অনেক আঢ্য

মহাশয়েরা ঐ নাট্যক্রীড়া দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নাট্য কৌতুক দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন।" 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' 'বেণী সংহার' অভিনয়ের একজন অভিনেতা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিপিনবিহারী গুপ্ত সংগৃহীত 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বলেছেন, "কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ী…… … রামনারায়ণ পণ্ডিতের 'বেণী সংহার' নাটক অভিনীত হয়। আমি কর্ণ সাজিয়াছিলাম। দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতীর রূপ যেন Stage এর উপর ঝল্‌মল্‌ করিতে লাগিল। পট উত্তোলিত হইলে যখন ভানুমতীকে দণ্ডায়মানা দেখা যাইত, সমগ্র দর্শকমণ্ডলী আনন্দে হাততালি দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিত। তেমন applause আর কেহ কখনও পাইয়াছে কিনা জানি না।" এই অভিনয় সম্বন্ধে তিনি আরও বলেছেন, "ক্ষেত্রমোহন সিংহ ও মণিমোহন সরকার ওরফে 'মণিলাড্‌' অভিনয়ে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।" 'বেণীসংহার' অভিনয়ের সময় একটি মজার ঘটনার কথাও মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন—

"এই স্থানে একটি কথা, মজার কথা বলি শুন। কালী সিংহ একটি ভদ্রলোকের ছেলেকে এমন স্নেহ করিতেন যে, তাহাতে সাধারণ মোসাহেবের দল ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। সেইজন্য ঝাল ঝাড়িবার ব্যবস্থা করা হইল এই অভিনয়ের দিনে। যখন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ টিকিট দিয়া একে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সকলকেই এক এক খণ্ড মুদ্রিত কাগজ দেওয়া হইল। তাহাতে লেখা ছিল—

"আর না পাইব যেতে
না পাব Lemon খেতে
তুমি ত এসব সাধে
বিসম্বাদ ঘটালে।
পেয়েছ ইংরাজি জুতো
মনোমত মজবুত
আমার কপালে জুতো
আর নাহি ঘটালে।।
বিলাতি এসেন্স নানা
দেখেনি তোর নানী নানা
আপনি মেখেছ কত
আমারে না মাখালে।

পুরাতন মদ যত
সব তব বাস গত
আপনি খেয়েছ দাদা,
আমারে না খাওয়ালে ॥

কে লিখিয়াছে এবং কাহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা হইয়াছে তাহা কাহারও জানিতে বাকী রহিল না।"

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১১ই এপ্রিল 'বেণীসংহার' নাট্যাভিনয় ও ২৪শে নভেম্বর কালীপ্রসন্নের স্বরচিত 'বিক্রমোর্বশী' নাট্যাভিনয়ের মধ্যবর্তীসময়ে আরও একখানি নাটক অভিনয়ের সংবাদ সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে যথাক্রমে মণিমোহন সরকারের অনুদিত নাটক 'মহাশ্বেতা' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের বিক্রমোর্বশী' নাটক অভিনীত হইয়াছিল।"[১২]

১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ তারিখের 'এডুকেশন গেজেট' ও 'সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে' জনৈক পত্রলেখকের পত্রে প্রকাশিত হয় যে আশুতোষ দেবের বাড়ীতেও ঐ 'মহাশ্বেতা' নাটকটি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর অভিনীত হয়। ঐ পত্র থেকে আরও জানা যায় যে ঐ 'মহাশ্বেতা' নাটকের কাদম্বরীর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন, তিনিই বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে 'বেণীসংহার' নাটকের দুর্যোধন পত্নীর ভূমিকায় অভিনয় করে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। পত্রলেখকের কথায়—"...কাদম্বরীর ভার যাহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল তিনি বালক। কিন্তু বালক হইয়াও স্বীয় ভাব এরূপ মর্য্যাদার সহিত নিষ্পন্ন করিয়াছেন যে দর্শক মাত্রেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন, উক্ত মহাশয় বেণীসংহার নাটকের অভিনয়কালীন দুর্যোধন সীমন্তিনী হইয়াও যথেষ্ট প্রশংসাভাজন হন।" 'মহাশ্বেতা' নাটকের অভিনয়ে কে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তা নাটকখানির 'ভূমিকায়' দেওয়া আছে। সেই সূত্রের সঙ্গে ঐ পত্রলেখকের পত্র মিলিয়ে জানা যায়, ঐ 'মহাশ্বেতা' নাটকে কাদম্বরীর ভূমিকায় এবং 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' 'বেণীসংহার' নাটকে দুর্যোধন পত্নী ভানুমতীর ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। [সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সেই সময়' উপন্যাসে 'ভানুমতী'-স্ত্রীচরিত্রে নবীনকুমার (কালীপ্রসন্ন) অভিনয় করেছেন বলে যে দেখিয়েছেন, তা যে সঠিক নয়, এই তথ্য থেকে জানা যায়।]

যাই হোক্, 'বেণীসংহার' নাট্যাভিনয়ের পর 'মহাশ্বেতা' নাট্যাভিনয় হলেও বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের প্রথম নাটক 'বেণীসংহারের' অভিনয় সাফল্য সম্বন্ধে "নগরীর অনেক আঢ্য মহাশয়েরা" ছাড়াও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি' স্যার আরথর বুলার এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী স্যার সিসিল বীডন পর্যন্ত সকলে একবাক্যে প্রশংসা করায় কালীপ্রসন্ন উৎসাহিত হয়ে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য স্বয়ং 'বিক্রমোর্বশী' নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'বিবিধার্থসংগ্রহে' লিখেছেন, "বেণীসংহার নাটকের অভিনয়ে যে প্রশংসা পাইয়াছিলেন তাহাতে উত্তেজিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং সেই উদ্যমের ফলস্বরূপ আমরা বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের গৌড়ীয়ানুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।......পূর্ব্বে প্রস্তাবিত গ্রন্থের কিয়দংশ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রে প্রকটিত হইয়াছিল; এইক্ষণে বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার নিমিত্ত সমুদায় একত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।"

কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের বিজ্ঞাপনে আমরা এই নাটক রচনার উদ্দেশ্য এবং বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমির কথাও জানতে পারি :—

"বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ [অভিনয়] বহুকালাবধি বঙ্গবাসিগণ' দর্শন করেন নাই, কারণ অতি পূর্ব্বকালে মহাকবি কালিদাসাদির দ্বারা যে সমস্ত সংস্কৃত নাটক রচিত হয়, তাহারই অনুরূপ [অভিনয়] হইত, পরে প্রায় দুই তিন শত বৎসর অতীত হইল সংস্কৃত ভাষায় নাটক ও অনুরূপাদি এক কালেই রহিত হইয়াছে, সেই অবধি আর কোন ধনবান্ ভবনে নাটকাদির অভিনয় হয় নাই। পরে সেক্সপীয়র ও অন্যান্য ইংরাজি নাটকাদি বঙ্গদেশে অভিনয় হইলে হিন্দুগণের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ করিতে ইচ্ছা হয়। উইলসন সাহেব লেখেন প্রায় অশীতিবর্ষ অতীত হইল কৃষ্ণনগরাধিপতি ৺প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় বাহাদুরের ভবনে চিত্রযজ্ঞ নামক এক সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ হয়, কিন্তু রঙ্গভূমির নিয়মাদির অনুবর্ত্তী হইয়া অভিনয় করেন নাই, ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইবার কারণ অনেকের মনোরঞ্জন হয় নাই।

এক্ষণে এই বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে বঙ্গবাসিগণ পুনরায় বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ দর্শনে পারগ হইলেন। প্রথমতঃ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ

ভট্টাচার্য্য কৃত বাঙ্গলা অনুবাদের অভিনয় হয়, যে মহাত্মারা উক্ত অভিনয় সময়ে রঙ্গভূমিতে উপনীত ছিলেন, তাঁহারাই তাহার উত্তমতার বিষয়ে বিবেচনা করিবেন. ফলে মান্যবর নটগণ যথাবিহিত নিয়মক্রমে অনুরূপ করায় দর্শক মহাশয়দিগের প্রীতিভাজন ও শত শত ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

পরে উপস্থিত দর্শক মহোদয়গণের নিতান্ত আগ্রহাতিশয়ে এবং তাঁহাদিগের অনুরোধবশতঃ পুনরায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে অনুরূপ [অভিনয়] কারণেই বিক্রমোর্ব্বশী অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল, এক্ষণে বিদ্যোৎসাহিনী মহোদয়গণের পাঠযোগ্য এবং নাগরীয় অন্যান্য রঙ্গভূমির অনুরূপযোগ্য হইলে আমার শ্রম সফল হইবে।"

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে 'বিক্রমোর্বশী নাটক' ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর মহাসমারোহে অভিনীত হয়। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং এই অভিনয়ে পুরুরবার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া অন্যান্য যে সব প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৪] কলকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি এই অভিনয় দেখে যথেষ্ট পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। এই অভিনয় প্রসঙ্গে ২৫শে নভেম্বর ১৮৫৭ তারিখের 'সংবাদপ্রভাকরে' লিখিত হয়:

"যোড়াসাঁকো নিবাসি ধনরাশি বিদ্যোৎসাহি শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীর বৈঠকখানাস্থিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে গতদিবস রজনী ৮ ঘটিকা হইতে একাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত নাট ক্রীড়াচ্ছলে 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হয়. তদ্দর্শনার্থে কয়েকজন সুসম্ভ্রান্ত প্রধান ইংরাজ এবং বহুসংখ্যক এতদ্দেশীয় মান্যলোকের সমাগম হইয়াছিল, নেপথ্য এবং নাট্যশালার সুসজ্জায় এবং নটনটী প্রভৃতি সমুদয় কেলিকিল অর্থাৎ ক্রীড়ক কদম্বের ক্রীড়ায় তাবতেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এতদ্দেশীয় নাট্যক্রীড়ার প্রাচীন প্রথা, যাহা বহুকাল পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া সাধারণের গোচরপথের অগোচর রহিয়াছে, তাহার পুনরুদ্দীপনে যাঁহারা যত্নশীল হইতেছেন, আমরা সাধুবাদ সহযোগে অগণ্য ধন্যধ্বনি সম্বলিত তাঁহারদিগকে নমস্কার করিতেছি।"

কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' অভিনয়ের সংবাদ কলকাতায় এবং কলকাতার উপকণ্ঠ পর্যন্ত এমন ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল যে, যে বিপুল সংখ্যক

দর্শক অভিনয় দেখার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে তাঁদের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। 'বিক্রমোর্বশী' অভিনয়ের পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই অভিনয়ের একটি দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়ঃ

"আমরা ছয় সপ্তাহকাল পূর্বে আমাদের পত্রিকায় বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের বাংলা অনুবাদের সমালোচনা করিয়াছিলাম ....এ সংখ্যায় আমরা ঐ বাবুরই উদ্যোগে তাঁহার নিজের বাটীতে বিক্রমোর্বশী নাটকের অভিনয়ের পরিচয় দিব। বুদ্ধি, সুরুচি, বিজ্ঞতা বিলাস ও সম্ভ্রমে কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠের দেশীয় সমাজের যাঁহারা প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তাঁহারা সকলেই মহার্ঘ শীতবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু নিমন্ত্রিতের সংখ্যা নাট্যশালার আয়তনের অনুপাতে বেশী হইয়াছিল। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত শুনিলাম, দর্শকের ভিড়ের জন্য চৌরঙ্গীর অভিজাতবর্গের মধ্যে অনেকে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্বিচারে টিকিট বিতরণ সম্বন্ধে জনসাধারণের যতই আপত্তি থাকুক না কেন, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রতি আমাদের অবিচার করা উচিত নয়। তাঁহার বদান্যতা ও অকুণ্ঠিত অর্থব্যয়ের ফলে কলিকাতায় বিশুদ্ধ আমোদের একটি চমৎকার স্থান প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় বৎসর চলিতেছে। ইহা লীপ্রসন্নবাবুর নিজস্ব সম্পত্তি হইলেও বুদ্ধিমান ও ভদ্র ব্যক্তিমাত্রেই ইহাতে গিয়া স্বাধীনভাবে আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন।" [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত।[১৭]]

তাছাড়া যে কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর 'Modern Hindu Drama' প্রবন্ধে আশুতোষ দেবের (সাতুবাবুর) বাড়ীতে 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে বলেছিলেন, "The performance of 'Sakuntala' at Simla was, however, a failure." তিনি বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে 'বিক্রমোর্বশী'র অভিনয় প্রসঙ্গে লিখেছেন, "There was a large gathering of native and European gentlemen who were unanimous in praising the performance. Among the latter, Mr., afterwards Sir, Cecil Beadon, the then Secretary to the Government of India,

expressed to us his unfeigned pleasure at the admirable way in which the principal characters sustained their parts."[১৬]

প্রতিভার একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে, কোন বিশেষ দিক বা রীতিতে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জিত হলেও সেই বিশেষ রীতিতেই তা স্থির থাকতে পারে না, বার বার দিক পরিবর্তনের দ্বারা নূতন পথ সৃষ্টির আগ্রহ তাকে সর্বদাই বেড়া ভাঙার প্রেরণা জোগায়। এই জন্য দেখি, কালীপ্রসন্ন শুধু রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে, নাটক রচনা করে এবং সদ্যপ্রচলিত প্রথায় সেই নাটকের অভিনয় করে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করলেও নাট্যাভিনয়ের সেই রীতিতেই তিনি স্থির থাকতে পারেন নি। পর বৎসর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি অনুবাদ নাটকের পথ ত্যাগ করে মৌলিক নাট্যরচনায় যেমন মনোনিবেশ করেন, তেমনি ঐ বৎসরেরই ৫ই জুন অভিনয়রীতিতে এক নূতন রীতিরও প্রবর্তন করে তাঁর সদ্যরচিত মৌলিক নাটক 'সাবিত্রী সত্যবান' মঞ্চস্থ করেন। এ সম্বন্ধে ৪ঠা জুন, ১৮৫৮ শুক্রবারের 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন: "আগামি শনিবার ৭ ঘন্টার সময় কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গভূমিতে শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত সাবিত্রী সত্যবান নাটকের আভিনয়িক পাঠ হইবেক এরূপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী সেক্সপিয়র প্রভৃতি যেরূপ পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপে পঠিত হইবেক অধিকন্তু ইহাতে বিস্তর গীত সংযোজিত হইবায় তাহা যন্ত্রের সহিত মিলাইয়া গান করা যাইবেক।"

ডঃ সুকুমার সেন এ সম্বন্ধে লিখেছেন, "কালীপ্রসন্নের দ্বিতীয় নাট্যরচনা 'সাবিত্রী-সত্যবান' (১৮৫৮) মৌলিক রচনা বলিয়া কথিত; তৃতীয় নাটক 'মালতীমাধব' (১৮৫৯) ভবভূতির অনুবাদ। ......কালীপ্রসন্নের সদ্গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে বই দুটি হয়ত ঠিক অভিনীত হয় নাই, নাট্যোচিত আবৃত্তি (dramatic recital) হইয়াছিল বলিয়াই অনুমান করি।"[১৭]

'সংবাদ প্রভাকরে'র ভাষায় 'আভিনয়িক পাঠ' অথবা ডঃ সেনের ভাষায় 'নাট্যোচিত আবৃত্তি' যে নামই দেওয়া যাক না কেন, তৎকালীন সংবাদ-পত্র থেকে জানা গেল যে, "এরূপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই।" এই জন্যই ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে' লিখেছেন, "রঙ্গমঞ্চে আভিনয়িক পাঠ এই প্রথম।"

কিন্তু 'রঙ্গমঞ্চে আভিনয়িক পাঠ এই প্রথম" হলেও এই নূতন অভিনয়-রীতির পূর্বসূত্র পাওয়া যায় 'নূতন যাত্রা' রূপে উল্লিখিত ১৮২১ খৃষ্টাব্দে 'কলিরাজার যাত্রা', ১৮২২ খৃষ্টাব্দে 'নলদময়ন্তী যাত্রা' এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে 'নন্দবিদায় যাত্রা'র মধ্যে। সাময়িক পত্রে এই ধরণের নূতন যাত্রার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করলে এই দুই অভিনয়-রীতির মূল সাদৃশ্যগুলি অনুধাবন করা যাবে।

নূতন যাত্রা ।। কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের অনেক ভাগ্যবান বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া নলদময়ন্তী যাত্রার সৃষ্টি করিয়াছেন·· ঐ যাত্রাতে··· নানাপ্রকার রাগরাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নৃত্য এবং গ্রন্থমত পরস্পর কথোপকথনএ অতি চমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা চাঁদা করিয়া ঐ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন । (৩০ আষাঢ় ১২২৯ 'সমাচার দর্পণ')।

কালীপ্রসন্নের পিতৃব্য শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়ীতে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে এই ধরণের আর একটি নূতন যাত্রা 'নন্দবিদায় যাত্রা'র তৃতীয় অভিনয় সম্বন্ধে ১৭ই এপ্রিল 'সম্বাদ ভাস্করে' লিখিত হয় ঃ

"এতদ্দেশে যে সকল যাত্রা হইয়া থাকে এ যাত্রা সেরূপ যাত্রা নহে, ইহা নূতন প্রকার।"

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পিতৃব্য শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়ীতে যখন এই 'নন্দবিদায় যাত্রা' হয় তখন কালীপ্রসন্নের বয়স ৯ বছর। সুতরাং এই "নূতন প্রকার" যাত্রা বালক কালীপ্রসন্নের মনে যে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং ১৮ বছর বয়সে রঙ্গমঞ্চে প্রথম "আভিনয়িক পাঠ প্রবর্তন করার সময় কালীপ্রসন্ন যে তাঁর পূর্বস্মৃতির দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন একটি সম্ভাবনা যদি মনে আসে তবে তাকে বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত বলা চলে না।

আধুনিক নাটক ও নাট্যশালার কতটুকু ইউরোপীয় আদর্শে এবং কতটুকু দেশীয় যাত্রার আদর্শে সে বিষয়ে অবশ্য নানা পণ্ডিতের নানা মত আছে। অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ একাধিক প্রবন্ধে বলেছেন ঃ "যাত্রা হইতেই আমাদের দেশে থিয়েটারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া—আমার বিশ্বাস।"[১৮] এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমত পোষণকারী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হল ঃ "বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাটকের উৎপত্তি ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীদের দ্বারা বিদেশী আদর্শে, একথাটি ভাল করিয়া স্মরণ রাখা উচিত। পুরাতন যাত্রার

সহিত বাংলা নাটকের কোন নাড়ীর যোগ নাই। যাত্রা হইতে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয় নাই, বরং নব্য নাটকের প্রভাবেই যাত্রার রূপান্তর ঘটিয়াছিল।"[১৯] অমূল্যচরণ অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথের শেষ কথায় অর্থাৎ নব্য নাটকের প্রভাবে যাত্রারও যে রূপান্তর ঘটেছিল সে বিষয়ে একমত। যাই হোক, এই দুই বিপরীত মতের মধ্যে মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী হলেন সুশীল কুমার দে। তাঁর মতে, "Although greatly influenced by it, the Bengali theatre did not as a matter of fact, grow out of the Bengali Yātrā, nor did the demand for the theatre come from the class which still patronized the yātrā..... At the same time it must be said that some of the peculiar features of the yātrā, such as its overflow of song and dance, its long drawn-out theme, its predilection for declamation, rhetoric and irrelevant farcical episodes, continued to manifest themselves throughout the history of the Bengali theatre down to the days of Girish chandra Ghosh and Kshirod Prasad, and even up to the present time."[২০]

বাংলা নাটকে যাত্রা ও পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শের পারস্পরিক প্রভাব সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের মঞ্চচেতনা বিশেষতঃ তাঁর 'ফাল্গুনী' নাট্যাভিনয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়রীতি যে প্রধানতঃ বিদেশী আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ডঃ সুশীল কুমার দে এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন, "Bengal simply adopted the mid-Victorian stage with all its accessories of painted scenery, costume and make-up, but fortunately with a genuine love of the drama and of amateur acting as an art."[২১]

বলাবাহুল্য, "amateur acting as an art" হলেও সে আর্ট যাত্রার আর্ট নয়, কলকাতার তৎকালীন বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে শেকস্‌পীয়ার প্রভৃতি ইংরেজী নাট্যাভিনয়ের আর্ট।

রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়রীতির এই পাশ্চাত্ত্য অনুকরণের মধ্যে কালীপ্রসন্ন প্রবর্তিত এই আভিনয়িক পাঠে" দেশীয় "নূতন যাত্রা"র ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য "সেকস্‌পিয়র প্রভৃতি" পাঠের সমন্বয় সাধনের দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় রীতির যে একটি অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ঘটেছিল তা রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, ঋতুনাট্য ইত্যাদি প্রবর্তনের পূর্বপর্যন্ত উপযুক্ত উত্তর সাধকের অভাবে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকে। অবশ্য উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকের মাঝামাঝি থেকে যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি যে একধরণের 'গীতাভিনয়' শুরু হয়েছিল, তা কালীপ্রসন্নের আভিনয়িক পাঠে'র শিল্পরীতির দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে যেহেতু 'এই গীতাভিনয় নাটক অভিনয়েরই মত, তবে কথকতার মত বক্তৃতাবহুল এবং প্রাচীন যাত্রা অনুসারে গীতপূর্ণ।'[২২] কিন্তু আভিনয়িক পাঠের সঙ্গে এই গীতাভিনয়ের মূলগত পার্থক্য হল কালীপ্রসন্নের 'আভিনয়িক পাঠ' পরিচালিত হয়েছিল রঙ্গমঞ্চের পটভূমিতে আর 'গীতাভিনয়' হত কোনরকম রঙ্গমঞ্চ বা দৃশ্যপটাদির সাহায্য ছাড়াই। এই ধরণের গীতাভিনয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়: "প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। রঙ্গভূমি করিয়া নাটকের অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ তৎপ্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা এদেশের পক্ষে শ্লাঘনীয় অনুষ্ঠান সন্দেহ নাই।" ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "সখের দলে তখনকার সুপরিচিত নাটক-গুলিই কাটছাঁট করিয়া এবং অতিরিক্ত গান যোগ করিয়া"[২৩] গীতাভিনয় হইত; তাছাড়া "ইহাতে স্টেজের প্রয়োজন নাই।"[২৪] ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে উল্লেখযোগ্য গীতাভিনয়ের মধ্যে আমরা অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শকুন্তলা গীতাভিনয়' এবং কালীদাস সান্যালের 'নল দময়ন্তী' গীতাভিনয়ের পর 'সাবিত্রী সত্যবান' গীতাভিনয়ের পর সাবিত্রী সত্যবান' গীতাভিনয়ের সন্ধান পাই। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ঐ ১৬ই নভেম্বর তারিখের 'সংবাদপ্রভাকর' থেকেই আমরা জানতে পারি যে জগদ্ধাত্রী পূজার সময়ে বৌবাজারের বিশ্বনাথ মতিলালের বাটীতে এবং তার কয়েকদিন পরে শোভাবাজারের রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে 'সাবিত্রী সত্যবানের' গীতাভিনয় হয়। এই 'সাবিত্রী সত্যবান' গীতাভিনয় কালীপ্রসন্নের 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটক অবলম্বনেই রূপায়িত হয়েছিল বলে মনে হয় কারণ এর পরবর্তী তিনকড়ি ঘোষালের 'সাবিত্রী সত্যবান গীতাভিনয়' ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল।[২৫] এই সব গীতাভিনয়ের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের যে অন্ততঃ দর্শক হিসাবেও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল সে বিষয়ে তৎকালীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখে বহুবাজারের দত্ত বাড়ীতে এই ধরণের একটি গীতাভিনয়ে কালীপ্রসন্ন যে উপস্থিত ছিলেন সে সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন : '... গত মঙ্গলবার কার্ত্তিক পূজার রজনীতে উক্ত বহুবাজারের বাবু রাজেন্দ্র দত্তের বাটীতে মাইকেল মধুসূদন প্রণীত পদ্মাবতী নাটকের গীতাভিনয় হইয়াছে। সূক্ষ্ম যবনিকা অবলম্বন করিয়া ইহার অভিনয় হয়। ...শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, বাবু হীরালাল শীল, বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক ও মৌলবী আবদুল লতিফ প্রভৃতি বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোক অভিনয়স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।" সাধারণতঃ গীতাভিনয়ে কোন স্টেজের প্রয়োজন না থাকলেও এখানে দেখা গেল যে "সূক্ষ্ম যবনিকা অবলম্বন" করেই এই গীতাভিনয় হয়েছিল।

কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে যে 'আভিনয়িক পাঠ' হয়, তার দ্বারা এই গীতাভিনয় কিছুটা প্রভাবিত হয়ে থাকলেও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে 'আভিনয়িক পাঠ' ও গীতাভিনয়' এক জিনিস নয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা রঙ্গমঞ্চে কালীপ্রসন্ন প্রবর্তিত অভিনয়শিল্পের এই ধারাটি রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত অব্যবহৃতই ছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও ঋতুনাট্যকে অবলম্বন করে এই আভিনয়িক পাঠ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এখন নাটক ও নাট্যাভিনয়ের রূপ-রীতি-প্রকরণের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে যখন অনেকে "Conquest of song by dialogue" বলে বিশ্বাস করেন, তখন কালীপ্রসন্ন প্রবর্তিত বাদ্যগীতাদি সহযোগে আভিনয়িক পাঠ এবং পরবর্তীকালে তারই ক্রমবিকশিতরূপ রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও ঋতুনাট্যে গীত-বাদ্যের আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ প্রশ্নের বিচার হতে পারে ঐ ধরণের অভিনয়ে গান বহিরঙ্গ উপাদান, না, অন্তরঙ্গ উপাদান—এই বিশেষ মানদণ্ডে—কারণ অভিনয়ে গান যদি বাহ্যিক উপাদান হয় তবে তাকে অনায়াসেই বাদ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু যদি অন্তরঙ্গ উপাদান হয়, তবে তা অন্যতম প্রকাশমাধ্যম হয়েই বজায় থাকে।

এখানে লক্ষণীয়, নাটকে গানের মাত্রা কমে এলেও শুধু যাত্রাভিনয়ে নয়, নাটকের অভিনয়েও গান অতীতে কিছু কিছু প্রযুক্ত হয়েছে এবং বর্তমানেও তার ব্যবহার লোপ পায়নি, বরং অনেক ক্ষেত্রে তার সীমিত ব্যবহার সুপ্রযুক্ত হয়ে উঠেছে। আবার গানের সঙ্গে যন্ত্রসংগীতের সহযোগিতাও উন্নত নাট্যাভিনয়-

রীতি প্রবর্তনের সাথে সাথে প্রায় সব দেশেই রঙ্গমঞ্চেও প্রয়োজনমত নিজের স্থান দখল করে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ অজিতকুমার ঘোষের মন্তব্য অত্যন্ত মনোজ্ঞ,—"আলোর এক একটি রঙের সঙ্গে যেমন এক একটি ভাবজগৎ সম্পৃক্ত হয়ে আছে, তেমনি এক একটি সুরের সঙ্গে এক একটি দৃশ্যজগৎ ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে।……কোনো করুণ দৃশ্য দেখবার সময় যদি বেহালার সুর কানের মধ্যে প্রবেশ করে তবে করুণ দৃশ্যটি আরো করুণ হয়ে ওঠে। কোনো দৃশ্য আরম্ভ হবার আগে যদি বাঁশের বাঁশির সুর কানে আসে তবে সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মন ছায়াঘেরা কোনো পল্লীপ্রকৃতির পথেপ্রান্তরে ঘুরতে থাকে। বাঁশির সঙ্গে মাদলের সুর মিলিত হলেই আবার তাদের মন চলে যাবে মহুয়ামাতাল কোনো পাহাড়ী পরিবেশে। কোনো যুদ্ধের দৃশ্যে যদি কিছুক্ষণ ধরে নাকাড়ার শব্দ করা হয়, তবে দর্শকদের চিত্ত যুদ্ধরসে মেতে উঠবে।" সুতরাং নাটকে গান যোজনা, সংলাপে কাব্যিকতা বা যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার নাট্যাভিনয়ের "organic form" এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা একমাত্র সেইদিক থেকেই এ প্রশ্নের বিচার হতে পারে। আর এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে সংগীত ও বাদ্য সাধারণ নাট্যাভিনয়ে কোথাও কোথাও অন্তরঙ্গ উপাদান হয়ে থাকলেও তা গৌণ প্রকাশ মাধ্যম হিসাবেই থাকে, কিন্তু কালীপ্রসন্ন প্রবর্তিত আভিনয়িক পাঠে তা শুধু অন্তরঙ্গ উপাদানই নয়, সংলাপের মতই একটি মুখ্য প্রকাশমাধ্যম এবং পরবর্তীকালের রবীন্দ্র গীতিনাট্য ও ঋতুনাট্যে সংগীত সংলাপকে আরও হৃতগৌরব করে প্রায় একমাত্র প্রকাশমাধ্যম হয়ে উঠেছে।

এইভাবে বাংলা নাটক ও নাট্যশালার এই গঠমানতার যুগে 'বিদ্যোৎসাহিনীর রঙ্গমঞ্চে' যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল, তাতে কালীপ্রসন্নের কৃতিত্ব ছিল দ্বিমুখী। তিনি যে শুধু অভিনয়োপযোগী নাটক রচনা করে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে সেগুলি বিভিন্ন পদ্ধতিতে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন তাই নয়, নিজেও সেইসব অভিনয়ে অভিনেতারূপে অংশ গ্রহণ করে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। ডঃ সুশীল কুমার দে তাঁর 'Bengali Literature গ্রন্থে বলেছেন, "The Bengali theatre was fortunate in having a remarkable series of actor—dramatists." এই "series of actor—dramatists" বা অভিনেতা-নাট্যকার শ্রেণীর প্রথম পথিকৃৎ এর সম্মান বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে কালীপ্রসন্নেরই প্রাপ্য, তারপর এই ধারা গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে পরিপুষ্ট হয়ে এগিয়ে চলেছে। যদিও বহু প্রতিভাবান

নাট্যকার নিজে অভিনেতা না হয়েও অনেক মঞ্চসফল নাটক সৃষ্টি করেছেন, তবু নাট্যকার অভিনেতা হলে নাটকের প্রয়োগরীতি সম্পর্কে যে তাঁর সচেতনতা বাড়ে একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলা নাটকের সেই আদি পর্ব থেকেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে মনে করি। রামনারায়ণ তর্করত্নের এবং মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে যথার্থ নাট্যপ্রতিভা থাকায় নিজেরা অভিনয়ে অংশ গ্রহণ না করলেও তাঁদের অনেকগুলি নাটক, বিশেষতঃ রামনারায়ণের 'কুলীন কুল সর্বস্ব' এবং মধুসূদনের প্রহসনগুলি মঞ্চসফল (অবশ্য সেই আদি পর্বে যতটা হওয়া সম্ভব) হতে পেরেছে। কিন্তু তারাচরণ শিকদার, গোবিন্দ চন্দ্রগুপ্ত (লঙের মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকায় জি. সি. গুপ্ত। "কেহ কেহ মনে করেন পূর্ণনাম যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। তাহা হইতে পারে না যেহেতু "যোগেন্দ্র" নামের আদ্যক্ষর ইংরেজীতে কদাপি G হইবে না, J কিংবা Y হইবে।"[২৬] কিংবা হরচন্দ্র ঘোষ আদিপর্বের এই তিনজন নাট্যকার (এঁদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ আবার দীর্ঘ কুড়ি বছর নাটকরচনায় আগ্রহ এবং অধ্যবসায় বজায় রেখে 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' 'কৌরববিয়োগ' 'চারুমুখচিত্তহরা' ও 'রজতগিরি নন্দিনী' রচনা করেছিলেন) কেউই অভিনেতা না হওয়ায় এবং যে পরিমাণ নাট্যপ্রতিভা থাকলে অভিনেতা না হলেও অভিনয়-সচেতনতা থাকে তা না থাকায় তাঁদের সব নাটকগুলিই প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নাটক ও নাট্যশালার আদিপর্বে নাট্যকার কালীপ্রসন্ন ও অভিনেতা কালীপ্রসন্নের মধ্যে যে সমন্বয় দেখা গিয়েছিল তা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বাংলা নাট্যশালার আভ্যুদয়িক পর্বে অভিনেতা কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে যে তথ্যাদি পাওয়া যায়, তা স্মরণ করা প্রয়োজন মনে করি। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার' নাট্যাভিনয়ের দ্বারা 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে'র উদ্বোধন হ'লে ঐ নাট্যাভিনয়ে কালীপ্রসন্নের অভিনয় যে প্রশংসনীয় হয়েছিল সে বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' উল্লেখ করেছেন: "বেণীসংহার নাটকের অভিনয়ে যে প্রশংসা পাইয়াছিলেন তাহাতে উত্তেজিত হইয়া শ্রীযুক্তবাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং নাটকরচনায় প্রবৃত্ত হন,……" এই প্রশংসা তিনি কি ধরণের দর্শকদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন?

১৫ই এপ্রিল ১৮৫৭ তারিখের 'সংবাদপ্রভাকরে' প্রকাশিত পূর্বোল্লিখিত বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি:

"...সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার আরথর বুলার সাহেব, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী মেং সিসিল বিডন সাহেব প্রভৃতি ৬।৭ জন প্রধান ইংরাজ এবং নগরীর অনেক আঢ্য মহাশয়েরা ঐ নাট্যক্রীড়াদর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নাট্য কৌতুক দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন।"

'বেণী সংহারে'র অভিনয়ে উৎসাহিত হয়ে কালীপ্রসন্ন ২৪শে নভেম্বর ১৮৫৭ তারিখে 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' যে স্বরচিত 'বিক্রমোর্বশী' নাটক মঞ্চস্থ করেন, তাতে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং পুরুরবার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' লিখেছেন, "..হিন্দু পেট্রিয়ট অভিনয়ের দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই নাটকে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং পুরুরবার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল।" কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে কালীপ্রসন্নের এই সুন্দর অভিনয় সম্বন্ধে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র অভিমতটি বিশদভাবে উদ্ধৃত করেন নি (অবশ্য 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' এ সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখের সুযোগও সীমিত)। যাই হোক্, ৩রা ডিসেম্বর ১৮৫৭ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' 'বিক্রমোর্বশী' অভিনয়ে অভিনেতা কালীপ্রসন্নের ভূমিকা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, তা এখানে উদ্ধৃত করি:

The part of the king Pururoba represented by baboo Kali Prossona Sing was admirably done. His mein was right royal, and his voice truly imperial. From the first scene of the play when he with his pleasant companion, a civilized buffoon, commenced to interchange words of fellowship, to the last scene when he was translated with his fair Oorbasi to heaven, he kept the attention of the audience continuously alive and made a most glad-some impression on their minds. Every word he gave utterance to was suited to the action which followed it. In the language of the poet he did truly hold the mirror up to nature."

প্রত্যক্ষদর্শী কিশোরীচাঁদ মিত্র Calcutta Review 1873-এ তাঁর Modern Hindu Drama' শীর্ষক প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে, সমবেত দেশীয়ও

ইউরোপীয় ভদ্রমণ্ডলী একবাক্যে 'বিক্রমোর্বশী' অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন এবং প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির অভিনয় সম্বন্ধে ভারত সরকারের তৎকালীন প্রধান সেক্রেটারী স্যার সিসিল বিডন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এই প্রধান প্রধান চরিত্রের মধ্যে কালীপ্রসন্ন অভিনীত পুরূরবা চরিত্রটি যে অবশ্যই পড়ে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখন 'বিক্রমোর্বশী' নাট্যাভিনয়ে পুরূরবার ভূমিকায় কালীপ্রসন্নের এই সাফল্যের মূল কারণটি কি তা দেখা যেতে পারে। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'নাটকের কথা'য় বলেছেন, "অভিনেতার চেহারা যদি নাট্যকারের চরিত্র অনুযায়ী না হয় তবে দর্শক চিত্তে তিনি কখনো রস উদ্রেক করতে পারবেন না। নায়কের ভূমিকার জন্য অবশ্য তাঁর ঋজু, দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ চেহারার প্রয়োজন।...অভিনেতার কণ্ঠস্বর তাঁর অন্যতম প্রধান সম্পদ।·· অভিনয়ের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই যে, কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য কিংবা আরোহণ অবরোহণের দ্বারা বিভিন্নভাব ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। কণ্ঠস্বর পর্দায় পর্দায় ক্রমাগত বাড়ালে কিংবা কমালে দর্শকচিত্তের মধ্যে কৌতূহল ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।" অভিনয় সাফল্য সম্বন্ধে ডঃ অজিত কুমার ঘোষের এই সাধারণ মন্তব্যের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের অভিনয় সম্পর্কে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত অভিমতটি মিলিয়ে দেখলেই কালীপ্রসন্নের অভিনয় সাফল্যের কারণ বোঝা যেতে পারে ঃ "His mein was right royal, and his voice truly imperial. From the first scene·· to the last scene·· he kept the attention of the audience continuously alive and made a most glad-some impression on their minds."

নাট্যশাস্ত্রে ভরত অভিনয়ের যে চারটি অঙ্গের কথা বলেছেন তা হল— 'আঙ্গিক,' 'বাচিক', 'আহার্য' ও 'সাত্ত্বিক'। এর মধ্যে 'আঙ্গিক' ও 'বাচিক' অভিনয় হল অঙ্গভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের সাহায্যে অভিনয়, 'আহার্য' হল অভিনয়োপযোগী সাজসজ্জা আর 'সাত্ত্বিক' অভিনয় হল প্রয়োজন অনুযায়ী স্তম্ভ, স্বেদজল, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বিবর্ণতা, অশ্রু ও প্রলয়—এই আটটি সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যে যে কোন এক বা একাধিক ভাবের পরিস্ফুটন। 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে উর্বশীর বিরহে পুরূরবার উন্মাদ দৃশ্যে এই সাত্ত্বিক অভিনয়ের যথেষ্ট সুযোগ আছে। তাছাড়া 'বিক্রমোর্বশী' মূলতঃ রোমান্টিক নাটক এবং "রোমান্টিক নাটক অভিনয়ে ভাবাবেগের প্রবলতা ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন। সেখানে অভিনেতাকে কল্পনাও কবিত্ব শক্তির অধিকারী হতে হবে।"[২৭]

কালীপ্রসন্নের পুরূরবার ভূমিকা অভিনয়ে কতটা সাত্ত্বিকভাবের স্ফুরণ ঘটেছিল সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকলেও রোমান্টিক নাটক অভিনয়োপযোগী কল্পনা ও কবিত্বশক্তির যে তাঁর অভাব ছিল না সে কথা বোঝা যায় যখন দেখি প্রত্যক্ষদর্শী কিশোরীচাঁদ মিত্র Calcutta Review-তে 'বিক্রমোর্বশী' অভিনয় সম্বন্ধে লেখেন, "...a large gathering of native and European gentlemen....were unanimous in praising the performance." তাছাড়া সাত্ত্বিক অভিনয় প্রসঙ্গে প্রাচ্য মতের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য অভিমতের সমন্বয় সাধন করে ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা মেনে নিলে অন্ততঃ পুরূরবার উন্মাদ দৃশ্যে কালীপ্রসন্নের প্রশংসনীয় অভিনয়ের কিছু কিছু অংশকে 'সাত্ত্বিক' অভিনয় বলতে ও কোন বাধা থাকেনা। ডঃ ভট্টাচার্যের ভাষায় "সাত্ত্বিক অভিনয়—পরিবর্তনশীল ভাবাবেগের বিচিত্র রূপগুলিকে অনুকরণ করা—expression of moods and emotions।... দেহের মধ্যে সেই ধরণের একটি কৃত্রিম অথচ যথাযথ আবেগিত অবস্থার সৃষ্টি করা—তন্ময়ীভূত হওয়া—স্ট্যানিশ্লাভস্কির ভাষায়, to arouse...a conscious or superconscious emotions ; আর তা করা তখনই সম্ভব যখন 'will'টি অভিনেতার বশীভূত থাকে। স্ট্যানিশ্লাভস্কি খুব জোর দিয়েই বলেছেন—The inner technique that I preach and that is necessary for promoting a proper creative mood is based in the main on will." তবে 'আঙ্গিক', 'বাচিক', 'আহার্য' ও 'সাত্ত্বিক' এইসব ক'টি অঙ্গ মিলিয়ে যথার্থ অভিনয়-সাফল্যের জন্য যা প্রয়োজন তা হল 'ব্যক্তিত্বের রূপান্তর'। নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে অভিনেতার নিজের দেহত্যাগ করে অন্যের দেহে প্রবেশ করা বা অন্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব লাভ করতে পারার ক্ষমতার উপরেই সার্থক অভিনয়ের মাত্রা নির্ভর করে। আমাদের একথা মানতেই হবে যে অভিনয় সম্পর্কে এর চেয়ে বড় কথা আজ পর্যন্ত আর কেউ বলতে পারেন নি যেহেতু এই 'ব্যক্তিত্বের রূপান্তর'ই হল অভিনয়ের ব্যাপারে প্রথম এবং শেষ কথা। আমাদের মনে হয়, কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' নাট্যানুবাদ নাটক হিসাবে খুব বেশি* উন্নত না হলেও এই অভিনয় দক্ষতার জন্যই তৎকালীন গুণীজনের দ্বারা এমন উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছিল।

অতঃপর 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 'সাবিত্রী সত্যবান' এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে 'মালতীমাধবে'র যে আভিনয়িক পাঠ হয় তাতে কালী-প্রসন্নের ভূমিকা কি ছিল সে সম্বন্ধে কোথাও কোন উল্লেখ পাওয়া না গেলেও তিনি যে পাঠ এবং সংগীতাংশে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সে বিষয়ে অনুমান করতে বাধা নেই কারণ পূর্বোদ্ধৃত 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সাক্ষ্য থেকে আমরা জানি যে 'his voice (was) truly imperial' এবং তিনি যে সংগীতজ্ঞ ছিলেন সে বিষয়েও নিশ্চিত সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। ডঃ সুশীল কুমার দে 'নাট্যকার কালীপ্রসন্ন সিংহ' প্রবন্ধে কালীপ্রসন্নের 'মালতীমাধব' নাটক প্রসঙ্গে লিখেছেন, এই নাটকের প্রারম্ভে অনুবাদকের স্বরচিত একটি প্রস্তাবনা এবং তাহাতে দুইটি গান দেওয়া আছে। মূলের শ্লোকগুলির ছন্দোনুবাদ বর্জন করিয়া তৎপরিবর্তে এই নাটকে বারটি গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাংলা নাটকে গান সংযোগের রীতি এই প্রথম নয়। রামনারায়ণের 'রত্নাবলীতে' (১৮৫৮) দশটি গান আছে। সেগুলি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ও সে সময়ের উৎকৃষ্ট সংগীত-রচয়িতা বলিয়া খ্যাত গুরুদয়াল চৌধুরী রচনা করিয়াছিলেন। রামনারায়ণের 'মালতীমাধবে'ও (১৮৬৭) এইরূপ কতকগুলি গান দেওয়া হইয়াছে। সেগুলি বানোয়ারীলাল রায় নামক কোন ব্যক্তি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন স্বয়ং সংগীতজ্ঞ ছিলেন। কালীপ্রসন্নের সংগীত অনুরাগের পরিচয় দ্বিতীয় বর্ষের 'পুণ্য' পত্রিকায় (পৌষ-মাঘ ১৩০৫) হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিপিবন্ধ করিয়াছেন।"[২৮] 'পুণ্য' পৌষ-মাঘ ১৩০৫ সংখ্যায় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কালীপ্রসন্ন সিংহ' প্রবন্ধে লিখেছেন—"একজন বিশিষ্ট গায়কের মুখে শুনিয়াছি যে বিখ্যাত মহাভারতের অনুবাদক ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় স্বাভাবিক অলাবুর তুম্বের অনুকরণে কাগজের তুম্ব প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকাস্থ বৈঠকখানার মজলিসে আনা হইয়াছিল, তৎসাহায্যে গাওনাও হইয়াছিল। কাগজের তুম্ব অনেকটা শুষ্ক অলাবু তুম্বের কাছাকাছি যায়; কিন্তু কাষ্ঠের করিলে সেরূপ হয় না। ৺কালি সিংহ মহাশয়ের তাম্বুরু নামক কলাবতী বীণার এরূপ কাগজের তুম্বী নির্মাণের চেষ্টার জন্য সমস্ত সংগীত সমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।"

এইভাবে একাধারে নাট্যকারও সংগীতজ্ঞ হওয়ায় এবং 'his mein··· right royal' এবং 'voice truly imperial' হওয়ায় অভিনেতা হিসাবে কালীপ্রসন্নের এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করার পক্ষে যে অনেক অনুকূলতা হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' 'বেণীসংহার', 'বিক্রমোর্বশী', 'সাবিত্রীসত্যবান' এবং 'মালতীমাধব' নাটকের অভিনয় ও আভিনয়িক পাঠে কালীপ্রসন্নের অভিনেতা হিসাবে (এবং সম্ভবতঃ প্রযোজক-পরিচালক হিসাবে) অংশগ্রহণ ছাড়াও অভিনয় ব্যাপারে কালীপ্রসন্নের উৎসাহের আরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে যে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটির উদ্বোধন হয়, তার কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।[২৯] এই নাট্যশালায় মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনের দ্বিতীয় অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' লেখা হয়ঃ "উক্ত অভিনয়স্থলে বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি অনুন এক শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই মুক্তকণ্ঠে অভিনেতাদিগের সাধুবাদ করিয়াছেন।" আবার ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখে বহুবাজারের রাজেন্দ্র দত্তের বাড়ীতে মাইকেল মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকের যে গীতাভিনয় হয় তাতেও যে কালীপ্রসন্ন উপস্থিত ছিলেন, 'সংবাদ প্রভাকরে' (১৬ নভেম্বর, ১৮৬৫) সে তথ্যও প্রকাশিত হয়। বিপিন বিহারী গুপ্ত সংগৃহীত 'পুরাতন প্রসঙ্গে'-ও তৎকালীন অভিনেতাদের অন্যতম রাধামাধব কর তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, "এটর্ণি দীননাথ বসুর বাটীতে আমাদের তৃতীয় অভিনয় [দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'] হইল। যে রাত্রিতে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ আমাদের অভিনয় দেখিয়া বলিলেন—"তোমরা বেশ প্লে করেছ, কিন্তু তোমাদের স্টেজ ভাল নয়।" রাধামাধব করের এই উক্তিতে কালীপ্রসন্নের পরিশীলিত অভিনয়রস-সংবেদ্যতা এবং মঞ্চ সচেতনতা দুইই চমৎকার ফুটে উঠেছে।

এখন 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে'র দর্শক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি যেহেতু নাট্যকার, অভিনেতা ও দর্শক—তিনের পারস্পরিক সম্পর্কেই নাট্যাভিনয় সম্পন্ন হয়। "Drama's laws the drama's patrons give"—বেন জনসনের এই উক্তিতে কিছু অতিশয়োক্তি থাকলেও কোন বিশেষ যুগের নাটক ও নাট্যাভিনয়ের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ে দর্শকের রুচিরও যে কিছুটা ভূমিকা আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেজনা "গোগোলকে দর্শকের স্তরে নামিয়ে এনো না, বরং দর্শককেই গোগোলের স্তরে উন্নত করো" চেকভের এই বক্তব্য কিছুটা সত্য হলেও যে সব দর্শকের কাছে গোগোল অনধিগম্য তাদের কাছে গোগোলকে উপস্থিত করাও যে বিড়ম্বনামাত্র সেকথাও স্বীকার্য। সুতরাং

কোন রঙ্গমঞ্চ এবং নাট্যাভিনয়ের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পেতে হলে তার দর্শকদেরও যথাসম্ভব পরিচয় নিতে হবে।

যে পাশ্চাত্ত্য, বিশেষতঃ শেক্‌স্‌পীরীয় নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাটকও নাট্যশালা গড়ে উঠেছিল, সেই এলিজাবেথীয় দর্শকের সঙ্গে বাংলা নাট্যশালার আদিপর্বের দর্শকদের তুলনামূলক আলোচনা করলে এ বিষয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যেতে পারে। প্রখ্যাত সমালোচক Bradley-র মতে এলিজাবেথীয় দর্শকেরা ছিলেন প্রধানতঃ অজ্ঞ, হৈ হল্লাকারী, নাচগান ও কুৎসিত রসিকতাপ্রিয়;[৩০] এবং Louis Harap-এর মতে the large majority of these were craftsmen, tradesmen and labourers, while small minority were professionals and the gentry,[৩১] তবু Bradley-র ভাষায় they loved poetry এবং শুধু তাই নয়, তাদের ছাড়া the Elizabethan drama could never have been the thing it was.

এবার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাটকের গঠমানতার যুগে দর্শকবৃন্দের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে যখন ধনী ব্যক্তিদের গৃহে নাট্যাভিনয় হত, তখন দর্শকেরা ছিলেন নির্বাচিত—প্রধানতঃ ইংরেজী শিক্ষিত শহুরে ভদ্র-সম্প্রদায়। এবার 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে'র দর্শকদের দিকে একবার তাকানো যাক্‌। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় হলে ১৫ই এপ্রিল 'সংবাদপ্রভাকর' লেখেন, "...সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার আরথর বুলার সাহেব, ইন্ডিয়া গবর্ণমেন্টের প্রধান সেক্রেটারী মেং সিসিল বিডন সাহেব প্রভৃতি ৫।৭ জন প্রধান ইংরাজ এবং নগরীর অনেক আঢ্য মহাশয়েরা ঐ নাট্যক্রীড়া দর্শনে গমন করিয়াছিলেন।" আবার ২৪শে নভেম্বর ১৮৫৭ তারিখে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে 'বিক্রমোর্বশী' নাটক অভিনীত হলে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখেন, "বুদ্ধি, সুরুচি, বিজ্ঞতা, বিলাস ও সম্ভ্রমে কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠের দেশীয় সমাজের যাঁহারা প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তাঁহারা সকলেই মহার্ঘ শীতবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলেন।" অবশ্য তারও পূর্বে, 'বিক্রমোর্বশী' নাট্যাভিনয়ের পরদিনই ২৫শে নভেম্বর ১৮৫৩ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে'

প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়—"…বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে গত দিবস রজনী ৮ঘটিকা হইতে একাদশ ঘটিকা পর্যন্ত নাট্যক্রীড়াচ্ছলে 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হয়, তদ্দর্শনার্থ কয়েকজন সুসম্ভ্রান্ত প্রধান ইংরাজ এবং বহুসংখ্যক এতদ্দেশীয় মান্য-লোকের সমাগম হইয়াছিল।" এই জন্য প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁর 'Western Influence in Bengali Literature' গ্রন্থে 'বিদ্যোৎসাহিনীর রঙ্গমঞ্চে'র দর্শক প্রসঙ্গে লিখেছেন, "With reference to the Western influence in these theatricals it might be noted…that the audience was mixed, many European gentlemen were invited to witness the performances…"।

দর্শক প্রসঙ্গ ছাড়াও প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁর ঐ মন্তব্যে 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ করেছেন—…the band from the Fort William served the Vidyotsahini as its orchestra. The implication of these two factors [mixed audience and the band from the Fort William] should be properly understood, for in the otherwise eastern atmostphere, they sought to impart a new tone, the novelty of the music and the need of explaining the play to the Europeans and making them interested had both their significance and must have influenced the art of those who had organised the show." ঐ গ্রন্থে 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' প্রসঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, "…there are entrances and exits by a sudden pull at the screen, পটোত্তোলনান্তর প্রবেশ and পটপ্রক্ষেপেন নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে 'enters by lifting up the screen' and 'all go out (Exeunt Omnes) by hastily raising the screen,"

২৫শে নভেম্বর ১৮৫৭ তারিখের 'সংবাদপ্রভাকরে' প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে'র নেপথ্য এবং মঞ্চসজ্জা সম্বন্ধে জানা যায়ঃ "…নেপথ্য এবং নাট্যশালার সুসজ্জায় এবং নটনটী প্রভৃতি সমুদয় কেলিকিল অর্থাৎ ক্রীড়ক কদম্বের ক্রীড়ায় ভাবতেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।"

'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' আলোকসম্পাত কিভাবে হত সে বিষয়েও কৌতূহল দেখা দিতে পারে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি 'বিদ্যোৎসাহিনী

রঙ্গমঞ্চে'র অন্যতম অভিনেতা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "[ঐ রঙ্গমঞ্চে 'বেণীসংহার' অভিনয়ে] দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতীর রূপ যেন stage এর উপর ঝলমল করিতে লাগিল। পট উত্তোলিত হইলে যখন ভানুমতীকে দণ্ডায়মানা দেখা যাইত, সমগ্র দর্শক মন্ডলী আনন্দে হাততালি দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিত। তেমন applause আর কেহ কখনও পাইয়াছে কিনা জানি না।" ভানুমতীর রূপ যেমনই হোক্‌না কেন তা "stage এর উপর ঝলমল" করতে হলে যে উজ্জ্বল আলোকসম্পাতেরও প্রয়োজন সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকতে পারে না। নাট্যমঞ্চে আলোকসম্পাতের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' ঐ আলোক-সম্পাত সম্ভব হয়েছিল গ্যাসের আলোর দ্বারা। ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য তাঁর 'নাটকের রূপ, রীতি ও প্রয়োগ' গ্রন্থে লিখেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে আরম্ভ করে—দ্বিতীয়ার্ধের একাধিক দশক পর্যন্ত 'গ্যাসের' আলোই ছিল আলোকসম্পাতের প্রধান উপায়।" ডঃ অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'নাটকের কথা'য় বলেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীতে গ্যাসের আলোর প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলোক নিয়ন্ত্রণের অনন্ত সম্ভাবনার পথ খুলে গেল। গ্যাসের আলোতে সুবিধা হল এই যে, রঙ্গমঞ্চ উজ্জ্বলভাবে আলোকিত করা যেত এবং প্রয়োজন হলে হঠাৎ নিভিয়ে দেওয়াও যেত। প্রেক্ষাগৃহের আলোও এভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেত। গ্যাসের আলোর পর আলোকসম্পাতের বৈপ্লবিক ধারা প্রবর্তিত হল বৈদ্যুতিক আলোর মধ্য দিয়ে। ১৮৮০ থেকে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান রঙ্গালয়গুলিতে পরিবেশের বাস্তবতা ভাব পরিমন্ডল সৃষ্টি করবার জন্য বৈদ্যুতিক আলোক সম্পাত প্রচলিত হল।"

এবার 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ', শুধু 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' কেন, ন্যাশন্যাল থিয়েটারের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার সমস্ত রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কেই একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, এই সব রঙ্গমঞ্চে 'প্রম্‌টার' বা নেপথ্য পাঠকের কোন ভূমিকা ছিল না—অভিনেতাকে সম্পূর্ণ নিজ কৃতিত্বেই অভিনয় করতে হত, তাঁকে সাহায্য করার জন্য পর্দার আড়ালে বই হাতে করে কেউ থাকত না। এ প্রসঙ্গে নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, "...পাঠক জানেন না, যে ন্যাশন্যাল থিয়েটার হইতেই প্রম্‌টার নামে একজন নেপথ্যে অভিনয়কারী সৃষ্টি হইয়াছে। প্রম্‌টারের বলেই ন্যাশন্যাল থিয়েটারে নূতন নূতন নাটক বুধবার ও শনিবারে হইত। ইহাতে রঙ্গালয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আজও চলিতেছে।"[৩২]

ন্যাশন্যাল থিয়েটারের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা রঙ্গালয়ে (ব্যতিক্রম—লেবেডেফ ও নবীনচন্দ্রের রঙ্গমঞ্চ) আরও একটি প্রথা বিশেষ প্রচলিত হতে পারেনি—সেটি হল রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীলোকের দ্বারা স্ত্রীভূমিকার অভিনয়। এই প্রথাটি যে প্রম্‌টার-প্রথার মত অভিনয়ের ক্ষতি না করে অভিনয়ের স্বাভাবিকতা সৃষ্টি ক'রে অভিনয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনই করেছে, সেকথা অবশ্য আমাদের স্বীকার করতে হবে। তবে একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যদিও স্বাভাবিক নাট্যাভিনয়ের বিচারে স্ত্রীভূমিকায় পুরুষের অভিনয় একটি দুর্বলতা, তবু বাংলা নাট্যশালার গঠমানতার যুগে ভালো অভিনেত্রী দুর্লভ হওয়ার জন্য এবং কিছুটা আমাদের সংস্কার ও নীতিবোধে আঘাত লাগার জন্য লেবেডেফ এবং নবীনচন্দ্র বসুর রঙ্গমঞ্চ ব্যতীত বাংলা রঙ্গমঞ্চের আদিপর্বে স্ত্রীলোকের দ্বারা স্ত্রীভূমিকার অভিনয় হয়নি। ডঃ সুশীল কুমার দে তাঁর 'Bengali Literature' গ্রন্থে এ বিষয়ে যথার্থই লিখেছেন,—"Although actresses are said to have figured in the early theatre of Gerassim Lebedeff and Nabin Chandra Basu, the employment of men for female roles continued down to the time of National Theatre, until women actors were int oduced on the public stage by the Bengal Theatre সুতরাং ধরে নিতেই হয় যে, কালীপ্রসন্নের 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে'ও পুরুষের দ্বারা স্ত্রীভূমিকা অভিনয়ের দুর্বলতা ছিল। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়। আশুতোষ দেবের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল থিয়েটারের' প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত ও পন্ডিত সামশ্রমী প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে যে কমিটি করেন, তাঁদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদনই স্ত্রী অভিনেত্রী গ্রহণের উপদেশ দিয়ে বলেন, "তোমরা গোঁফ দাঁড়ি কামানো ব্যাটা ছেলেকে স্ত্রীলোক সাজাইতে পারিবে না।"[৩৩] মধুসূদনের ঐকান্তিক আগ্রহে স্ত্রীভূমিকায় অভিনয়ের জন্য স্ত্রীলোক নেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঐ কমিটির সংশ্রব ত্যাগ করেন।[৩৪] বঙ্কিমচন্দ্রও যে অভিনেত্রীর দ্বারা অভিনয়ের জন্য সাধারণ রঙ্গালয় সম্বন্ধে তাঁর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেন সেকথাও হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' দ্বিতীয় খন্ডে উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সময়েও যখন অভিনেত্রীর দ্বারা অভিনয় নিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেই এমন তীব্র মতানৈক্য চলতে থাকে তখন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে

'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' পুরুষের দ্বারা স্ত্রীভূমিকার অভিনয় দুর্বলতা হলেও যুগ ও পরিবেশের বিচারে ক্ষমাহ' দুর্বলতা। [অবশ্য আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' দুর্যোধন-পত্নী ভানুমতীর ভূমিকায় অভিনয় করে মহেন্দ্রনাথ ঘোষ যথেষ্ট প্রশংসাভাজন হন।] আমাদের মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে রঙ্গমঞ্চ গঠনে, দৃশ্যসজ্জায়, পোষাক পরিচ্ছদে, আলোক সম্পাতে, অভিনয়রীতিতে আজ পর্যন্ত যে বিবর্তন ঘটে চলেছে, তা কখনোই একসঙ্গে বা একবারে হয়নি। সুতরাং ইতিহাস ও যুগপরিবেশের ভিত্তি বাদ দিয়ে ঐসব প্রচেষ্টার মূল্যায়ণ করতে গেলে তা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় এবং অর্থহীন হয়ে পড়বে। যাই হোক্, কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পরেও বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে'র ভূমিকা যে শেষ হয়ে যায় নি, এখানে তাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথম ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার (৭.১২.১৮৭২) মাত্র তিনমাস পরেই (৮.৩.৭৩) যখন ঐ থিয়েটারের দলটি ভেঙে গিয়ে একটি 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' এবং অন্যটি 'হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটারে' পরিণত হয়, তখন ঐ ভাগাভাগির ফলে 'হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটার' মঞ্চসজ্জা এবং দৃশ্যপট ইত্যাদি না পেয়ে প্রথমে কিছুদিন লিন্ডসে স্ট্রীটের অপেরা হাউসে এবং পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে তাঁদের নাট্যাভিনয় করেন। আবার আরও পরবর্তীকালে একাধিক পেশাদারী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ফলে যখন সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের নামকরা দলগুলির অবলুপ্তি ঘটল অথচ পেশাদারী রঙ্গালয়গুলিও উন্নতধরণের নাট্যাভিনয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা অপেক্ষা কেবল ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকেই দৃষ্টি রাখল, তখন পূর্ববর্তী যুগের সৌখীন ও অভিজাত রঙ্গমঞ্চগুলির স্মৃতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশ শতকের শেষ দশকে নূতন নাট্যাভিনয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আগ্রহী হয়ে 'সংগীত সমাজ' এর প্রতিষ্ঠা করেন,—আর সেই 'সংগীত সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয় কালীপ্রসন্নের 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে'। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: এই 'সংগীত সমাজে' ও দলাদলি দেখা দেওয়ায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'র অনতিদূরে একটি বাড়ী 'লীজ' নিয়ে 'ভারত সংগীত সমাজ' এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।[৩৫] এইভাবে বাংলা নাট্যশালার গঠমানতার যুগে 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' সম্বন্ধে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে

প্রকাশিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন—"এইরূপ একটি নাট্যশালা চিরস্থায়ী হওয়া উচিত এবং দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিমাত্রেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত। নাট্যানুরাগী ব্যক্তিরা যদি এই উদ্দেশ্যে সমবেত হন, তবে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তাঁহাদের যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।"৩৬ মন্মথনাথ ঘোষ 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' গ্রন্থে 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটারের সাফল্যই পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং বাবু (পরে মহারাজা স্যার) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতিকে বেলগাছিয়ার বাগানে প্রসিদ্ধ নাট্যশালা-সংস্থাপনে প্রণোদিত করে। সুতরাং এতদ্দেশীয় নাট্যশালার ইতিহাসে কালীপ্রসন্নের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। বিপিন-বিহারী গুপ্ত সংগৃহীত 'পুরাতন প্রসঙ্গে'ও কালীপ্রসন্নের সমকালীন খ্যাতিমান পুরুষ আচার্য কৃষ্ণকমল 'পুরাতন প্রসঙ্গে' তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, "রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের সেই অধ্যায়ে আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু), কালীপ্রসন্ন সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও পাইকপাড়ার রাজাদিগের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।"

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি ও পুষ্টির ক্ষেত্রে এই অবিস্মরণীয় অবদান ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে কালীপ্রসন্নের উপরেও এই রঙ্গমঞ্চের প্রভাব খুব কম ছিল না। আমাদের একথা স্বীকার করতেই হবে যে 'বিদ্যোৎ-সাহিনী রঙ্গমঞ্চ' এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার' অভিনয়ের সংস্পর্শে না এলে কালীপ্রসন্ন কোনদিনই নাটক লেখার প্রেরণা বোধ করতেন কিনা সন্দেহ, কারণ অন্যান্য অনেক নাট্যকারের মতই কালীপ্রসন্ন আগে অভিনেতা এবং পরে নাট্যকার।

—o—

ষষ্ঠ অধ্যায়

নাটকে কালীপ্রসন্ন

সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে নাটকের যে একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে তা হল নাটককে একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলতে হয়— drama as literature এবং drama as theatre। এ সম্বন্ধে Raymond William তাঁর 'Drama in Performance' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, "In much contemporary thinking, a seperation between literature and theatre is constantly assumed ; Yet the drama is, or can be, both literature and theatre, not the one at the expense of the other, but each 'because' of the other."[১]

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে লেবেডেফের [M. Joddrel-এর 'The Disguise' অবলম্বনে] 'কাল্পনিক সংবদল'[২] এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে অভিনীত নাট্যাকারে 'বিদ্যাসুন্দর'[৩]— দীর্ঘদিনের ব্যবধানে এই দুই বিচ্ছিন্ন চেষ্টাকে ব্যতিক্রম হিসাবে ধরে নিলে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের উৎপত্তির ক্ষেত্রে স্পষ্টতঃই তিনটি ধাপ চোখে পড়ে। প্রথম ধাপে 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটকের বাংলা অনুবাদ 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' (১৮২২ খৃঃ), 'হাস্যার্ণব' (১৮২২ খৃঃ) রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'কৌতুকসর্বস্ব নাটক' (১৮২৮ খৃঃ), কাদিহাটী নিবাসী বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন অনুদিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক' (রচনাকাল ১২৪৬ সাল, ইং ১৮৩৯ খৃঃ), দ্বারিকানাথ রায়ের 'বিশ্বমঙ্গল নাটক' (১৮৪৫ এবং পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রমণী' নাটক (১৮৪৮ খৃঃ)। এগুলি 'নাটক-নামিত' রচনা হিসাবে প্রকাশিত হলেও কোনক্রমেই নাটক নয়, নাটক হিসাবে এগুলির কোন অভিনয়-যোগ্যতাও ছিল না। এগুলি নাটকের নীহারিকা-রূপ মাত্র।

দ্বিতীয় ধাপে জি সি. গুপ্তের [যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত নয়, সম্ভবতঃ গোবিন্দ চন্দ্র গুপ্তের[৪]] 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২ খৃঃ), তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২ খৃঃ) এবং হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩ খৃঃ)— কিছুটা নাটকের আকার পেলেও এগুলিও আংশিকভাবে নাটকের সাহিত্যিক-

মূল্য এবং সম্পূর্ণভাবে নাটকের অভিনয়-যোগ্যতার গৌরব থেকে বঞ্চিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এগুলি কোনদিন অভিনীতও হয়নি।

বাংলা নাটক সৃষ্টির ইতিহাসে তৃতীয় ধাপের শুরু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা নাটকের ইতিহাসে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের একটি বিশেষ মূল্য আছে, যেহেতু এই খৃষ্টাব্দ থেকেই বাংলা দেশে নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ের ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। ডঃ প্রবোধ চন্দ্র সেন তাঁর 'Bengali Drama and Stage' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন—"The year 1857 marks the beginning of a new epoch in the history of Bengali drama and the theatre. In fact, Bengali drama and the stage have had a continuous history since that memorable year."[৫] এই খৃষ্টাব্দে একদিকে আশুতোষ দেব ওরফে সাতুবাবুর বাড়ীতে নন্দকুমার রায় রচিত কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের অনুবাদ 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় (৩০শে জানুয়ারী, ১৮৫৭), অন্যদিকে নূতন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়ীতে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটকের অভিনয় (মার্চ ১৮৫৭) এবং ঐ খৃষ্টাব্দেরই ১১ই এপ্রিল কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'বেণীসংহার' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। অতঃপর 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয়-সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং তাঁর প্রথম অনুবাদ-নাটক 'বিক্রমোর্বশী' রচনা ও প্রকাশ করেন। এটিও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' মহাসমারোহে অভিনীত হয়।

বাঙালী প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন থিয়েটারে বহুদিন ইংরেজী নাটক অভিনয়ের পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঙালীর লেখা বাংলা নাটকের এই প্রথম ধারাবাহিক অভিনয়-সাফল্যের গৌরব অর্জনকারী নাটক চারখানির রচনাকাল—'কুলীনকুল সর্বস্ব' (১৮৫৪), 'শকুন্তলা' (১৮৫৫), 'বেণীসংহার' (১৮৫৬) এবং 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭)।

প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই বাংলা নাটক রচনা ত্রিমুখী ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে—ইংরেজী নাটক অনুবাদের ধারা, সংস্কৃত নাটক অনুবাদের ধারা এবং মৌলিক নাট্যরচনার ধারা। মৌলিক নাট্যরচনার ধারা আবার দ্বিবিধ—একটি ধারা প্রহসন জাতীয় এবং অন্যটি সিরিয়াস। এখানে লক্ষণীয়, ইংরেজী

আদর্শে রচিত মৌলিক নাটক কিংবা সোজাসুজি ইংরেজী থেকে অনূদিত নাটক কোনটিই ঐ সময়ে অভিনয়-সৌভাগ্য পায় নি। সামাজিক নক্শা-নাটক পুরাণের বিষয়বস্তু অবলম্বনে মৌলিক নাটক এবং সংস্কৃত থেকে অনূদিত বাংলা নাটকই কেবল বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবার গৌরব লাভ করেছিল।

বাংলা নাটক রচনার সূচনাপর্বের এই বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে কালীপ্রসন্নের নাটকগুলির মূল্যায়ণ করতে হবে।

সমসাময়িক তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন 'বাবুনাটক' নামে একখানি প্রহসনজাতীয় নাটক রচনা করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের 'সংবাদপ্রভাকরে' কালীপ্রসন্ন নাটকটি সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন দেন তা থেকে জানা যায়—"পূর্বে প্রায় দুইবৎসর হইল আমি একবার বাবু নাটক নামক গ্রন্হ রচিয়া প্রকাশ করি কিন্তু তাহা এক্ষণে এমত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে কত লোক চারি মুদ্রা স্বীকার করিয়াও পান নাই, অতএব আমি পুনরায় মুদ্রিত করিবার অভিলাষি. যদ্যপি কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় নামধাম লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহাকে গ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য করা যাইবেক, মূল্য ।।., বিনা স্বাক্ষরকারী দ. মাত্র। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। সম্পাদক।"

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে যখন "প্রায় দুই বৎসর গত হইল" বলা হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই নাটকটির রচনাকাল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে। আমরা আগেই দেখেছি কালীপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেছেন ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে কালীপ্রসন্নের এই 'বাবুনাটক' রচনার সংবাদ আরো কিছুকাল পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের বালক-প্রতিভার কথাই যেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় (যদিও একথাও স্মরণীয় যে উভয় প্রতিভা তুল্যমূল্য নয়)। যাই হোক্, কালীপ্রসন্নের এই নাটক এমন জনপ্রিয় হয়েছিল যে মাত্র দুবছরের মধ্যেই নাটকটির সমস্ত কপি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল এবং বিজ্ঞাপন দৃষ্টে জানা গেল যে "কত লোক চারি মুদ্রা স্বীকার করিয়াও পান নাই।" ফলে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সেটি পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হয়েছিল। অবশ্য নাটকটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হবার উপায় নেই, কারণ পরবর্তী পত্রপত্রিকায় এ সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ দেখা যায় নি এবং বহু অনুসন্ধান করেও এ পর্যন্ত বইটির কোন সন্ধান পাওয়া

যায়নি। ফলে এই নাটক সম্বন্ধে আজ আর বিস্তারিত কিছু জানার উপায় নেই। তবে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র লেখকের হাত দিয়ে কি ধরণের ব্যঙ্গনাটক লিখিত হতে পারে সে সম্বন্ধে আজ হয়ত আমরা কিছুটা অনুমাণ করতে পারি। যাই হোক্‌, এখানে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষণীয় হল, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি যে 'বাবু নাটক' সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তাতে 'অভিলাষি' পদে নামধাতুর প্রয়োগ এবং আরো বিস্ময়ের হল ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন যখন এই নাম ধাতুর প্রয়োগ করেন, তখন মধুসূদন সুদূর মাদ্রাজে ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য সাধনায় ব্যস্ত—'Captive Ladie', Visious of the Past,' 'Rizia, Empress of Inde' (1849), 'The Anglo Saxon and the Hindu' (1854)। সুতরাং আমাদের একথাই মানতে হয় যে, মধুসূদনেরও পূর্বে বালক কালীপ্রসন্নের হাতে বাংলা ভাষায় নামধাতুর প্রয়োগ হয়েছে এবং সে প্রয়োগও আবার পদ্যে নয়, গদ্যে।

এখন 'বাবুনাটক' না পাওয়া গেলেও 'বাবুনাটকে' যে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৎকালবর্তী বাবুসম্প্রদায়ই উপজীব্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই বাবুবিষয়ক ধারার উৎস সন্ধান করতে গেলে আমাদের প্রথমেই স্মরণ করতে হয় মার্শম্যান সম্পাদিত 'সমাচার দর্পণে'র কথা, কারণ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এই 'সমাচার দর্পণে'র পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয় 'বাবুর উপাখ্যান' নামে কিছু নক্‌শা জাতীয় রচনা। পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে মার্শম্যানের নাম মুদ্রিত থাকলেও প্রধানতঃ জয়গোপাল তর্কালংকার, তারিণীচরণ শিরোমণি প্রভৃতি দেশীয় পন্ডিতেরাই এই পত্রিকার সহায়ক-সম্পাদক ছিলেন। কেউ কেউ ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়কে এই 'বাবুর উপাখ্যান' রচয়িতা বলে অনুমান করলেও এবিষয়ে এখনও নিঃসংশয় হওয়া যায় নি, যাইহোক এই পত্রিকায় বাবুসম্প্রদায় সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গাত্মক রচনা বেরোত তার সরস কৌতুকবোধ এবং সূক্ষ্ম সমাজ বিশ্লেষণ-প্রবণতাই পরে ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস', কালীপ্রসন্নের 'বাবু নাটক', টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল,' কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' শীর্ষক রচনায় একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীচরণ সম্পর্কে বলেছেন, "সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম ব্যঙ্গরচনার সূচনা করেন; তাঁহারই স্পর্শে বাংলা সাহিত্যের 'শুষ্কং কাষ্ঠং' ধীরে ধীরে 'নীরস তরুবরঃ' হইয়া উঠিবার লক্ষণ প্রকাশ করে, তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্যের দর্পণে বাবু ও বিবি

বাঙালীকে নিজনিজ মুখ দেখাইয়া আত্মস্থ হইতে শিক্ষা দেন।"[৬] ব্রজেন্দ্রনাথের এই মন্তব্য ভবানীচরণের ব্যঙ্গরচনা সম্বধে সাধারণভাবে সত্য হলেও "তিনিই সর্বপ্রথম ব্যঙ্গরচনার সূচনা করেন" কথাটি কিছুটা বিভ্রান্তিমূলক যেহেতু ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে 'নববাবুবিলাস' প্রকাশিত হবার প্রায় চার বছর পূর্বে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পণে' 'বাবুর উপাখ্যান' নামে ধারাবাহিক ব্যঙ্গরচনা প্রকাশিত হয়েছে (যা আবার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে)। তবে ব্রজেন্দ্রনাথ যদি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনাকে সাহিত্যে বলে না ধরে থাকেন, তা স্বতন্ত্র কথা। যাই হোক্, বাবুবিষয়ক ব্যঙ্গরচনার মুদ্রিত পুস্তিকগুলির মধ্যে ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস'ই প্রথম পুস্তক। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রেভারেন্ড জেম্স লঙ্ ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস'কে 'One of the ablest satires on the Calcutta Babu' বলে বর্ণনা করেছেন।[৭] 'নববাবুবিলাসে'র ভাষার একটু উদাহরণ দিলেই ব্যঙ্গরচনা হিসাবে এর সার্থকতা বোঝা যাবে।

"অমাত্যবর্গেরা কহিলেন বাবুরদিগের যেরূপ বুদ্ধি ও মেধা এরূপ প্রায় দৃষ্টচর নহে আমরা পাঠশালায় দেখিয়াছি অঙ্কের সংকেত দেখাইবামাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শ্রবণমাত্রই শ্লোক অভ্যাস করেন ইঁহারা মহাশয়ের নাম সম্ভ্রম ও কুলোজ্জ্বল করিবেন আর কহিলেন বাঙ্গালা লেখাপড়া এক-প্রকার হইয়াছে আর যদি কিছু অপেক্ষা থাকে তাহাও হইয়া উঠিবেক আপনারদিগের জাতি বিদ্যা আর এমনি এ বংশের গুণ আছে না পড়িলেও বিদ্যা হয় ..."

কিন্তু এখানে একটা কথা, 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় 'বাবুর উপাখ্যান' এবং ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস' উভয়ই ছিল উপাখ্যান জাতীয়। এধরণের বিষয়বস্তুকে নিয়ে নাটকরচনা কালীপ্রসন্নের হাতেই প্রথম। ডঃ সুকুমার সেন যাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ২য় খণ্ডে মধুসূদনের পূর্বেকার দুটি-মাত্র নক্শাজাতীয় সংলাপ রচনার নাম করেছেন—মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চার ইয়ারে (র) তীর্থযাত্রা' (১৮৫৮) এবং (শ্রীশ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি কর্তৃক বিরচিত 'কলিকৌতুক নাটক' (শ্রীরামপুর ১৮৫৮)। সুতরাং (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের একেবারে গোড়ার দিকে সম্ভবতঃ জানুয়ারি মাসে (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে 'বাবুনাটকে'র বিজ্ঞাপনে এই তথ্যই প্রমাণিত হয়) কালীপ্রসন্ন যদি 'বাবুনাটক' নামে নক্শা বা প্রহসনজাতীয় নাটক রচনা

ক'রে থাকেন তবে বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রহসন রচনার গৌরব নিঃসন্দেহে তাঁরই প্রাপ্য।

শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যে যখন আধুনিক কাব্য-সাহিত্য বা উপন্যাস-সাহিত্য কোন কিছুরই জন্ম হয়নি, তখন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের 'বাবু নাটক' এবং রামনারায়ণের 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটককে অবলম্বন ক'রে সর্বপ্রথম, বাংলা নাট্যসাহিত্যেই সমাজ-সচেতনতা এবং বাস্তবজীবনবোধের স্ফুরণ ঘটেছে। অবশ্য কালীপ্রসন্নের 'বাবুনাটক' এ পর্যন্ত না পাওয়া গেলেও রামনারায়ণের 'কুলীনকুল সর্বস্ব' এবং তৎপরবর্তী যে সব সামাজিক নক্শা-নাটকের নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে এই শ্রেণীর নাট্যরচনার একটি সাধারণ দুর্বলতার কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। এই সব নাটকে কাহিনীর সম্পূর্ণতা, নাট্যিক দ্বন্দ্ব বা চরিত্রচিত্রণ অপেক্ষা সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যই মুখ্য হয়ে ওঠায় উদ্দেশ্যমুখিতার দ্বারা এই সব নাটকের নাট্যিক গুণ অনেকটা পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে। তথাপি এই নাটকগুলিই যে প্রথম বাস্তব সমাজ সমস্যামূলক মৌলিক নাটক সে গৌরব থেকে এদের কোন মতে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

কালীপ্রসন্নের 'বাবু নাটকে'র পর সংবাদপত্র ও স্মৃতিকথায় আরও যে দুখানি বাবুবিষয়ক নাটকের নামোল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি হল "বিদ্যাভূনীকৃতবাবু নাটক।" ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এ সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তা হল ঃ—

বিজ্ঞাপন

বিদ্যাভূনীকৃত বাবু নাটক

কলিকাতা মহানগর নিবাসি বাবুগণের বাবুয়ানা ও তাঁহারদিগের ব্যবহারও তাঁহারদিগের কথোপকথন অবগতি কারণ বহুকাল হইল বাবুবিলাস [=ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস'] নামক গ্রন্থ প্রকাশ হয়, কিন্তু অতি পূর্ব্বকালের পুস্তক অজ্ঞ ভট্টাচার্য্য দ্বারা বিরচিত হইবায় এই ক্ষণে তাহা পাঠযোগ্য নহে, এবং কথোপকথন ও বর্ত্তমান প্রচলিত নিয়ম মত নহে, এ নিমিত্ত নূতন মতে পদ্যে ও গদ্যে নাটকাকারে সুন্দর রূপে লিখিত হইয়া মুদ্রিত আরম্ভ হইয়াছে, মূল্য ।• আনা, বিনা স্বাক্ষরকারিগণের প্রতি ৵• আনা।

এছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথায় গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত আর একখানি বাবু বিষয়ক নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায় :—"মেজকাকা 'বাবুবিলাস' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন, একবার তার অভিনয় হয়েছিল। তাঁর মোসাহেবদের মধ্যে দীননাথ ঘোষাল বলে একটি চালাক চতুর লোক ছিল, সেই 'বাবু' সেজেছিল। অভিনয় কিরকম ওতরাল বিশেষ কিছু বলতে পারি না। আমরা ত আর সে মজলিসে আসন পাইনি, উঁকি ঝুঁকি দিয়ে যা কিছু দেখা।"[৮]

গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের উদ্যোগে তাঁর 'বাবুবিলাস' নাটকটি অভিনীত হলেও কালীপ্রসন্নের 'বাবু নাটক' অভিনয়ের কোন প্রমাণ এখনও পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নি। আমরা পূর্বেই দেখেছি কালীপ্রসন্নের 'বাবু নাটক' এমন জনপ্রিয় হয়েছিল যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়ে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দেই তা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। তথাপি বাংলা নাটকের আদি পর্বে যখন জনপ্রিয় বাংলা নাটকের একান্ত অভাব, তখন এই জনপ্রিয় নাটকটির অভিনয়-সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া খুবই বিস্ময়ের কথা। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন, "১৮৫৩ সালে কালীপ্রসন্ন 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' প্রতিষ্ঠিত করেন। এই রঙ্গমঞ্চেও তাঁহার প্রথম নাটক অথবা প্রহসন অভিনীত হয় নাই, ইহা বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নাই।" পাদটীকায় 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাকালের তথ্য হিসাবে তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'র ১নং পুস্তিকার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এখানে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছুটা অনবধানতাজনিত ত্রুটি থেকে গেছে, কারণ ব্রজেন্দ্র-নাথ তাঁর 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র প্রতিষ্ঠাকাল নির্দ্ধারণ করেছেন ১৮৫৩ খৃঃ 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে'র নয়। প্রকৃত পক্ষে রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'বেণীসংহার' নাটক অভিনয়ের দ্বারা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র অধীনে 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে'র উদ্বোধন হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল এবং এর এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যে ঐ 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' প্রতিষ্ঠিত হয় সে তথ্য পাই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে—"The Bidyotsahini Theatre is in the second year of existence." তবে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যে রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয়েছে, সেখানে তারও পূর্বে ১৮৫৪

খৃষ্টাব্দে ঐ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক রচিত 'বাবু নাটকে'র অভিনয় না হওয়ায় স্বভাবতঃই মনে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, "যে কারণে মধুসূদনের প্রহসন ('একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ') দীর্ঘকাল অভিনীত হয় নাই, এই নাটক অভিনীত না হওয়ার অন্তরালে ঐ একই কারণ বর্তমান থাকা সম্ভব।"[৯] ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ অনুমান যথার্থ বলে মনে হয় এবং এই অনুমানের সূত্র ধরে একথাও সত্য বলে প্রতীয়মান হয় যে কালীপ্রসন্নের 'বাবু নাটকে' তৎকালীন বাবুসমাজের যে বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল তা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার সাহস স্বয়ং নাট্যকারেরও ছিল না।

আজ 'বাবু নাটকে'র কোন পুঁথি আমাদের হাতে এসে না পৌঁছালেও অনুমান করতে বাধা নেই যে কালীপ্রসন্নের বাল্যকালে রচিত ঐ 'বাবু নাটকে'র বাবুই মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় আরও কিছুটা পরিপক্কতা লাভ ক'রে "ঠনঠনের হঠাৎ অবতারে" পরিণত হয়েছেন।

অতঃপর (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে 'বাবু নাটক' রচনার পর) কালীপ্রসন্ন স্বপ্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম অনুবাদ নাটক 'বিক্রমোর্বশী' রচনা ও প্রকাশ করেন। মনে রাখতে হবে তখনও পর্যন্ত সংস্কৃত থেকে অনুবাদ নাটকের ধারায় দুটিমাত্র উল্লেখযোগ্য অনুবাদ-নাটক প্রকাশিত হয়েছে—একটি নন্দকুমার রায় অনূদিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' (১৮৫৫) এবং অন্যটি রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত 'বেণীসংহার' (১৮৫৬)। সুতরাং কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭) এই ধারার তৃতীয় উল্লেখযোগ্য নাটক।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি 'সমাচারচন্দ্রিকা' পত্রে আশুতোষ দেব ওরফে সাতুবাবুর বাড়ীতে নন্দকুমার রায়ের 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে লিখিত হয়েছিল—

"··ইয়ং ব্যাঙ্গল বাবু সাহেবরা নিশ্চয় করিয়াছেন আমারদিগের বাঙ্গালির কোন শাস্ত্রাদিতে পারমার্থিক রসঘটিত কিছুই নাই, যাহা আছে ইংরেজীতেই আছে ডুমুরের মধ্যস্থ কীটের পক্ষে ডুমুরই ব্রহ্মাণ্ড তদ্রূপ ইয়ং ব্যাঙ্গল বাবুদিগের ইংরেজীই সর্ববিদ্যা, অতএব বিশিষ্ট শিষ্ট হিন্দু সন্তানেরা যদ্যপি

কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের অন্তর্গত নাটকাদি অনুপম শাস্ত্র দৃষ্টি করেন তাহার কি পর্য্যন্ত রসমাধুর্য্য আস্বাদে আশ্চর্য্য হইবেন ⋯।"

বলা বাহুল্য তৎকালীন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সর্ববিষয়ে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণকারী বাঙ্গালী সমাজের কাছে এই ধরণের ঘোষণা এবং উপলব্ধির একটি বিশেষ মূল্য ছিল। কারণ বাংলা নাটকের আদি পর্বে অনুবাদ-নাটকের যুগে এই সময় থেকেই ইংরেজী নাটক থেকে অনুবাদের তুলনায় সংস্কৃত নাটক থেকে অনুবাদের আগ্রহ এবং প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্ বাংলা গভর্ণমেন্টের কাছে তৎকালবর্তী বাংলা নাট্যসাহিত্যের অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, তাতে তিনি স্পষ্ট করেই লিখেছিলেন—"A taste for dramatic Exhibitions has lately revived among the educated Hindus, who find that translations of the Ancient Hindu dramas are better suited to oriental taste than translations from the English plays." এই রিপোর্টে তিনি একথাও জানিয়েছিলেন যে, "Foremost among the patrons of the drama are Raja Pratap Chunder Singh and a young Zamindar Kali Prasanna Singh, who has translated from Sanskrit and distributed at his own expense, the 'Malati Madhava' 'Vikramaurvasi' and 'Sabitri Satyaban." এর মধ্যে 'সাবিত্রী সত্যবান' অনুবাদ নাটক না হলেও 'বিক্রমোর্বশী' এবং 'মালতীমাধব' ছিল দুখানি অনুবাদ নাটক।

কালীপ্রসন্ন 'বিক্রমোর্বশী' অনুবাদ করেন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, আর তার বেশ কয়েক বৎসর পরে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও বহু বৎসর পরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর 'বিক্রমোর্বশী' অনুবাদ করেন। সুতরাং 'বিক্রমোর্বশী'র নাট্যানুবাদে কালীপ্রসন্নের চেষ্টাকেই প্রথম বলা যেতে পারে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যে 'বিক্রমোর্বশী নাটক প্রকাশ করেন, তা পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত এবং তার পৃষ্ঠাসংখ্যা √.+/.+৮৫।

নাটকের 'বিজ্ঞাপনে' অনুবাদক স্পষ্টই জানিয়েছেন :—

"এই গ্রন্থ মহাকবি কালিদাস বিরচিত বিক্রমোর্বশী নাটকের অবিকল অনুবাদ। মূলগ্রন্থ হইতে ভাষান্তরিত হওয়ায় অনেক অংশে ইহার লালিত্যের

ন্যূনতা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তবে যতদূর উত্তম হইতে পারে, সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করা যায় নাই।...বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধীনস্থ রঙ্গভূমিতে অনুরূপ [অভিনয়] কারণই বিক্রমোর্বশী অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল, এক্ষণে বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের পাঠযোগ্য এবং নাগরীয় অন্যান্য রঙ্গভূমির অনুরূপ-যোগ্য হইলে আমার শ্রম সফল হইবে।"

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র ৪র্থ পর্ব ৪২ সংখ্যা থেকে জানা যায়, "বেণীসংহার নাটকের অভিনয়ে যে প্রশংসা পাইয়াছিলেন তাহাতে উত্তেজিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং সেই উদ্যমের ফলস্বরূপ আমরা বিক্রমোর্বশী...নাটকের গৌড়ীয়ানুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রশংসিত বাবুর বয়ঃক্রম ১৭ বৎসরের অধিক হইবে না। ঐ কালে বালকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে; গ্রন্থরচনায় কেহই পারগ বা উদ্যত হয় না; কিন্তু উল্লিখিত বাবু ঐ কাল মধ্যে নানা গ্রন্থ সাময়িক পত্র ও বক্তৃতা রচনা করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকট প্রশংসাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।" 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' থেকে আরো জানা যায়, কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী'র কিয়দংশ 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' অভিনয়ের জন্য সমুদয় নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

তৎকালীন নাট্যরচনার মানদণ্ডে সমসাময়িক পাঠকদের কাছে কালী-প্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকটি এত সুন্দর মনে হয়েছিল যে, তা ১৭ বছর বয়স্ক কিশোর কালীপ্রসন্নের রচনা ব'লে অনেকের পক্ষেই বিশ্বাস করা সম্ভব হয়নি। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি পত্রে এ সম্বন্ধে লিখিত হয়েছিল যে, নাটকটি পণ্ডিত দীননাথ শর্মার রচিত। একথার প্রতিবাদে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক লিখলেন যে, "পণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া এই মিথ্যা নির্দেশ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছেন।"[১০]

বাংলা নাটকের গঠনমানতার যুগে সমকালীন পাঠকদের কাছে যে নাটক এত সুন্দর মনে হয়েছিল এবং 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' অভিনীত হয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল, আজ শতাধিক বৎসর পরে আধুনিক পাঠকের কাছে সে নাটকের পুনর্মূল্যায়ণ অপেক্ষিত হয়ে আছে। কারণ 'পরবর্তী পূর্ণতর যুগের অগ্রদূত স্বরূপ' এই 'অপরিণত যুগের নাট্যরচনাগুলির যে

বিক্রমোর্ব্বশী নাটক।

মহাকবি কালীদাস বিরচিত।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক মূল

সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বাঙ্গলা ভাষায়

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ।

তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দ্বারা মুদ্রিত।

১৭৭৯ শক।

বিক্রমোর্বশী নাটকের আখ্যাপত্র
(প্রথম প্রকাশ ১৭৭৯ শক, ইং ১৮৫৭ খৃ.)

চিত্র—১৩

যথেষ্ট ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য আছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের যথাযোগ্য আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

তাছাড়া কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী'র এখন যে দুএকখানি কপি আছে তা এমন দুষ্প্রাপ্য যে সাধারণের পক্ষে তার পরিচয় পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম এবং অল্পদিনের মধ্যেই পুনর্মুদ্রিত না হলে নাটকটি বিনষ্ট হওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা। সুতরাং এখনও যদি আমরা বাংলা নাট্যসাহিত্যের সৃজ্যমান যুগের এই নাটকের বিস্তৃত পরিচয় এবং সমালোচনা লিপিবদ্ধ না করি, তবে আমরা এক ঐতিহাসিক কর্তব্য থেকেই বিচ্যুত হব।

বাংলা নাটকের আদি পর্বে কালীপ্রসন্নের অনুবাদ নাটকে রচনার যে কি প্রয়োজন ছিল তা বোঝা যাবে যখন দেখি এই পর্বের অধিকাংশ নাটকের নাটকীয় ব্যর্থতার একটা প্রধান কারণই হল নাটকের প্লট বা কাহিনী নির্বাচনে ব্যর্থতা। জি.সি গুপ্ত [সম্ভবতঃ গোবিন্দ চন্দ্র গুপ্ত, যোগেন্দ্র চন্দ্র নয়] রচিত প্রথম মৌলিক নাটক 'কীর্তিবিলাস' রচনার ভূমিকায় সংস্কৃত নাটকের প্রতিবাদ থাকলেও কেবলমাত্র পাশ্চাত্ত্য রীতিসম্মত নাট্যকাহিনীর ট্র্যাজিক পরিণতি ব্যতীত প্লটের বিন্যাসে সংস্কৃত আঙ্গিকের এমন ব্যর্থ অনুকরণ করা হয়েছে যে কার্য-কারণের শৃঙ্খলা, ঘটনাসূত্রের সংলগ্নতা এবং ক্রমবিবর্তন শীলতা সমস্তই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। হরচন্দ্র ঘোষের একখানি মাত্র মৌলিক নাটক 'কৌরব বিয়োগে'র কাহিনী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিশিষ্ট অংশকে অবলম্বন করে রচিত হওয়ায় তা এমন বর্ণনা ধর্মী হয়ে পড়েছে যে প্রায় সব চরিত্রগুলিই মহাভারতের বৈশম্পায়নের স্থান অধিকার করেছে এবং নাটকের নাট্যিক গুণ প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই। একমাত্র তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকের কাহিনীতে যথেষ্ট নাটকীয় গুণ ছিল, কিন্তু তাও প্রধানতঃ পয়ার-ত্রিপদীমূলক পদ্যে রচিত হওয়ায় কখনো অভিনয়যোগ্য নাটক হিসেবে বিবেচিত হয়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কালীপ্রসন্ন মহাকবি কালিদাসের পঞ্চাঙ্ক নাটক 'বিক্রমোর্বশী'র যে নাট্যানুবাদ রচনা করলেন, অঙ্কবিভাগ অনুযায়ী তার সংক্ষিপ্ত কাহিনী হল ঃ—

রাজা পুরূরবা অপ্সরাদের ক্রন্দন শুনে বললেন—

"রাজা। ক্রন্দন করিও না, সূর্যোপস্থান করিয়া প্রত্যাগত রাজা পুরূরবা আমি, আমাকে বিজ্ঞাপন কর, কাহা হইতে তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে হইবেক" ? (কা.প্র.সি)

অনুসন্ধান ক'রে রাজা জানলেন, সখীপরিবৃতা হয়ে কৈলাসপর্বত থেকে ফেরার সময় এক দানব উর্বশীকে এবং তাঁর প্রিয়সখী চিত্রলেখাকে অপহরণ করেছে। পুরূরবা নিজ বিক্রমের দ্বারা উদ্ধার করলেন সখীসহ উর্বশীকে। ফেরার সময় রথের মধ্যে অসামান্য রূপযৌবনবতী উর্বশী এবং দেবদুর্লভ রূপবিক্রমধন্য পুরূরবা—পরস্পর পরস্পরকে দেখে মুগ্ধ হলেন, প্রথম দৃষ্টিতেই সূচিত হল প্রেম। রথ এসে নামল হেমকূটশিখরে প্রতীক্ষারতা সখীদের কাছে। রথের ঝাঁকুনিতে পুরূরবার উপরে এলিয়ে পড়ল উর্বশীর দেহ আর—

"রথক্ষুব্ধ অঙ্গ অঙ্গস্পর্শে পুলকিত।
মনোজ হইল যেন আসি অঙ্কুরিত।।" (কা.প্র.সি.)

এমন সময় পুরূরবার কাছে দেবরাজ ইন্দ্রের অভিনন্দন নিয়ে এলেন গন্ধর্ব চিত্ররথ। উর্বশীকে এবার ফিরে যেতে হবে স্বর্গলোকে। সখীদের সঙ্গে চলে যেতে যেতে লতায় জড়িয়ে গেল উর্বশীর কণ্ঠের একাবলী হার 'বৈজয়ন্তিকা'। একটুখানি মধুর ছলনার সুযোগ নিয়ে আবার হল প্রণয়ীযুগলের দৃষ্টিবিনিময়। সখী চিত্রলেখার চেষ্টায় লতার বাঁধন খুলল বটে, কিন্তু দৃঢ়তর হয়ে জড়িয়ে গেল দুটি হৃদয়ের বাঁধন। [প্রথম অঙ্ক]

রাজধানীতে ফিরে এসে যখন পুরূরবা উর্বশীর বিরহে বিষণ্ণ হয়ে প্রমোদোদ্যানে বসে আছেন, তখন সখী চিত্রলেখার সঙ্গে উর্বশী তিরস্করিণীর সাহায্যে অদৃশ্য থেকে তাঁর বিরহব্যাকুলতার কথা একখানি ভূর্জপত্রে লিখে রাজার সামনে ফেলে দিলেন। ভূর্জপত্রপাঠে রাজার হৃদয় যখন উর্বশী-মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল, তখন "প্রথমে মেঘাবলী" এবং "পশ্চাৎ সৌদামিনী"র মত প্রথমে সহচরী চিত্রলেখা এবং পরে উর্বশী রাজার সামনে আবির্ভূতা হলেন। কিন্তু এ-মিলনও দীর্ঘস্থায়ী হল না। নেপথ্য থেকে ঘোষিত হল- স্বর্গসভায় ভরতমুনি রচিত যে নাটক অভিনীত হবে তাতে অভিনয়ের জন্য ইন্দ্রের আদেশে উর্বশীকে এখনই স্বর্গে যেতে হবে। উর্বশী বিদায় নেওয়ার পর প্রমোদোদ্যানে চেটীকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন রাণী ঔশীনরী। বিদূষকের অসাবধানতায় উর্বশীর ভূর্জপত্র উড়ে গিয়ে পড়ল রাণীর পায়ের কাছে। রাজার এই গোপন প্রেমের সব রহস্যই তখন পরিষ্কার হয়ে গেল রাণীর কাছে। পুরূরবার অনুনয় অগ্রাহ্য ক'রে রাণী "বর্ষাকালের নদীর ন্যায়" কুপিতা হয়ে ফিরে চলে গেলেন রাজপ্রাসাদে। [দ্বিতীয় অঙ্ক]

এদিকে স্বর্গে 'লক্ষ্মী স্বয়ংবর' নাটক অভিনয়ের সময় পুরূরবাময় উর্বশী ভুল করে 'পুরুষোত্তমে'র স্থলে 'পুরূরবা' উচ্চারণ করায় নাট্যাচার্য ভরত ক্রুদ্ধ হয়ে উর্বশীকে স্বর্গভ্রষ্ট হবার অভিশাপ দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, রাজা পুরূরবা উর্বশীর গর্ভ-জাত পুত্রমুখ দর্শন করলেই উর্বশীর হবে শাপ-মুক্তি। শাপে বর হল উর্বশীর। মর্ত্যে নেমে এলেন অভিসারিকার বেশে—সঙ্গে তাঁর সখী চিত্রলেখা। উর্বশী তিরস্করিণীর দ্বারা প্রচ্ছন্ন হয়ে তাঁরা রাজপ্রাসাদে পৌঁছেই দেখেন ব্রতচারিণী রাণী ঔশীনরী তাঁর প্রিয়প্রসাদনব্রত পালন করতে এসে রাজাকে জানাচ্ছেন—"এই দেবতামিথুন রোহিণীশশাঙ্ককে সাক্ষী করিয়া আর্যপুত্রকে প্রসাদন করিতেছি এবং বলিতেছি, অদ্যাবধি আর্যপুত্র যে স্ত্রীতে অভিলাষী হইবেন এবং যে স্ত্রী আর্যপুত্র সমাগমাকাঙ্খা করিবেন, তাঁহার সহিত আপনি অপ্রতিবন্ধে বিহারাদি করিবেন।" (কা প্র.সি.)। ঔশীনরীর এই আত্মত্যাগে পুরূরবার সঙ্গে উর্বশীর মিলনের আর কোন বাধা রইল না। উর্বশী উল্লসিত হয়ে তিরস্করিণী ত্যাগ করে পেছন থেকে রাজার চোখ চেপে ধরলেন। রাজা উর্বশীর স্পর্শসুখ অনুভব করে বললেন, "করস্পর্শে গাত্র মম পুলক লাঞ্ছিত। কদাচ না হবে অন্য কারণ নিশ্চিত।।" (কা.প্র.সি.) উর্বশীও তাঁর সখীকে বললেন, "সখি! মহারাজ এক্ষণে দেবীদত্ত হইয়াছেন, অতএব প্রণয়বতী হইয়া ইঁহার শরীর সঙ্গতা হইলাম। তোমরা আমাকে পুরোভাগিনী বলিতে পারিবে না।" (কা.প্র.সি.) [তৃতীয় অঙ্ক]

রাজা অমাত্যবর্গের ওপর রাজ্যভার সমর্পণ করে কৈলাশ পর্বতের শিখরে গন্ধমাদন বনে উর্বশীর সঙ্গে আনন্দে বিহার করতে থাকেন। একদিন মন্দাকিনীতীরে এক সুন্দরী বিদ্যাধরী কন্যার দিকে পুরূরবা সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন ব'লে ঈর্ষায় এবং অভিমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উর্বশী ছুটে চলে গেলেন 'কুমারবনে'। নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ এইবনে প্রবেশ ক'রে উর্বশী বনের উপান্তবর্তী এক লতায় পরিণত হলেন। পুরূরবা উন্মত্তের মত উর্বশীর সন্ধানে সেই বনে ছুটে এলেন এবং অপূর্ব প্রেমোন্মাদের মধ্যে ময়ূর, হংস, হরিণ, চক্রবাক, ভ্রমর, কোকিল, পর্বত, নদী সকলের কাছেই প্রশ্ন করে উর্বশীর সন্ধান জানতে চাইলেন। এমন সময় হঠাৎ পুরূরবার চোখে পড়ল এক উজ্জ্বল মণি। কিন্তু সব কিছুতেই বীতস্পৃহ পুরূরবা যখন মণি খন্ডটি ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছেন তখন দৈববাণী হল—"বৎস। গ্রহণ কর ২ এ সঙ্গমমনীয় মণি, গৌরীপাদ-

পদ্মরাগ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহার গুণ এই যে বিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গমকারক।" (কা.প্র.সি)। পুরূরবা সাদরে সেই মণি তুলে নিলেন আর ঘুরতে ঘুরতে বনের প্রান্তে এক অপরূপ লতার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে যেই তাকে আলিঙ্গন করলেন, অমনি সেই লতার জায়গায় দেখা দিলেন তাঁর প্রিয়তমা উর্বশী। রাজার সঙ্গে পুনর্মিলিতা উর্বশী এবার প্রজাগণের স্বার্থে রাজাকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জানিয়ে বললেন—"প্রিয়ম্বদ! অনেক দিবস গত হইল, আমরা রাজধানী হইতে নির্গত হইয়াছি, আর অধিক বিলম্ব করা উচিত নহে, কারণ প্রজাগণ অসূয়াপরবশ হইলেও হইতে পারে।" (কা.প্র.সি)। [চতুর্থ অংক]

রাজা পুরূরবা এখন রাজকার্যে মন দিয়েছেন। একদিন রাজার কাছে সংবাদ এল একটি শকুনি তাঁর সঙ্গমমণিকে একটি রক্তমাখা মাংসখণ্ড মনে করে ছোঁ মেরে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। রাজা শকুনিকে বাণবিদ্ধ করার জন্য পার্শ্বস্থ যবনীকে তাঁর শর ও শরাসন আনার নির্দেশ দিলেও শকুনি যখন তাঁর দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেছে তখন কঞ্চুকী রাজার কাছে ঐ মণি এবং উর্বশীর পুত্র আয়ুর নাম খোদিত একটি তীর এনে রাজাকে জানালেন যে শকুনিটি ঐ তীর-বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়েছে। ব্যাপার দেখে রাজা বিস্মিত। এমন সময় এক তাপসী এক কুমারকে সঙ্গে নিয়ে এসে বললেন যে উর্বশীর এই পুত্র জন্মের পর থেকেই চ্যবনমুনির আশ্রমে লালিত পালিত হয়েছে। এখন আশ্রমবৃক্ষস্থ এক শকুনিকে বাণবিদ্ধ ক'রে আশ্রমের নিয়মভঙ্গ করায় চ্যবনমুণির আদেশে তিনি "উর্বশী হস্তে তদীয় ন্যাস" সমর্পণ করতে এসেছেন। কিন্তু পুরূরবা পুত্রমুখ দর্শন করে যখন আনন্দিত তখন বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো উর্বশী জানালেন, এবার তাঁর বিদায়লগ্ন সমাসন্ন। রাজা পুরূরবাও তখন এই বিরহ-বেদনা অসহ্য মনে করে বনগমনে উদ্যত। এই চরম সংকট মুহূর্তে নারদ স্বর্গ থেকে নেমে এসে ইন্দ্রের নির্দেশ জানালেন, "ত্রৈলোক্যদর্শী ঋষিগণ কহিয়াছেন, কিয়দ্দিন পরে দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, তা তুমি আমার প্রবল... সহায়, অতএব তুমি অস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া বনগমন করিও না, আর এই উর্বশী তোমার যাবজ্জীবন সহধর্মচারিণী হইয়া থাকুক।" (কা.প্র.সি) এবার রাজার ইচ্ছায় নারদ কুমার আয়ুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে স্বর্গে চলে গেলেন। (পঞ্চম অংক সমাপ্ত।)

মহাকবি কালিদাসের অনুসরণে কালীপ্রসন্নের এই 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের কাহিনী বিচার করতে গেলে আমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে নাটকের কাহিনী যুগ ও সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রকৃতি অনুযায়ী যেমন কখনও ঘটনাপ্রধান, কখনও চরিত্রপ্রধান এবং কখনও বা তত্ত্বপ্রধান হতে পারে, তেমনি আবার কখনও রসপ্রধান ও হতে পারে। কিন্তু সর্বত্রই সেই কাহিনীর একটি সূচনা, বিকাশও সমাপ্তি থাকবে। নাট্যকার তাঁর নাটকে জীবনের যে কাহিনী গড়ে তুলবেন তা যদি এলোমেলো, গতিহীন ও পরিণতিহীন হয়, তবে তা নাট্যিক সাফল্য সৃষ্টি করতে পারে না। নাটকের এই পরিণামমুখিতার জন্যই নাটককে যথাসম্ভব সুসংহত এবং বাহুল্যবর্জিত হতে হবে। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে নাটকের এই প্লট বা বৃত্ত সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধি সমন্বিতম্।

* * * *

পঞ্চাদিকা দশপরস্তত্রাংকাঃ পরিকীর্তিতাঃ।।

* * * *

চত্বারঃ পঞ্চ বা মুখ্যাঃ কার্যব্যাপৃত পুরুষাঃ।
গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রং তু বন্ধনং তস্য কীর্তিতম্।।

নাটকের বৃত্ত হবে বিখ্যাত [অর্থাৎ তুচ্ছ কাহিনী নির্ভর নয়] এবং পঞ্চসন্ধিযুক্ত। এতে পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত অংক থাকবে। কার্যব্যাপৃত চার বা পাঁচজন প্রধান পুরুষ থাকবেন এবং এর বন্ধন হবে গোপুচ্ছাগ্রের মত [অর্থাৎ নাটক যতই পরিণতির দিকে যাত্রা করবে, ততই কাহিনীতে অপ্রধান ঘটনাগুলি পরিত্যক্ত হতে থাকবে]।

এই ইতিবৃত্তকে হতে হবে অগ্রগতিশীল, ক্রমবিন্যস্ত এবং ঔৎসুক্যময়। এজন্য আরম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম—নাটকের ক্রমাগ্রসরমান কার্যের এই পাঁচটি অবস্থাভেদে ইতিবৃত্তকে যে পাঁচভাগে বিন্যস্ত করা হয় তার নাম পঞ্চসন্ধি। নাটকের সূচনা থেকে পরিণতির দিকে অগ্রসর হবার এই পাঁচটি স্তরপরম্পরা শুধু সংস্কৃত নাটকে নয়, ইংরেজী নাটকেও বর্তমান। আমরা ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাংলায় এই পঞ্চসন্ধিকে ক্রমানুসারী করে সাজিয়ে দিচ্ছ :—

ইংরাজী	সংস্কৃত	বাংলা
এক ॥ Exposition	মুখসন্ধি [আরম্ভ]	প্রস্তাবনা
দুই ॥ Rising action	প্রতিমুখসন্ধি [প্রযত্ন]	ক্রমোন্নতি
তিন ॥ Climax	গর্ভসন্ধি [প্রাপ্ত্যাশা]	তুঙ্গতা
চার ॥ Falling action	বিমর্ষসন্ধি [নিয়তাপ্তি]	ক্রমাবনতি
পাঁচ ॥ Denouncement	নির্বহণসন্ধি [ফলাগম]	উপসংহার

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য নাটকের সন্ধিবিভাগের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের সন্ধিবিভাগের একটি মূল পার্থক্য হল পাশ্চাত্ত্য নাটকে ক্রিয়াবিন্যাস অনুযায়ী সন্ধি বিভাগ হয়, কিন্তু সংস্কৃত নাটকে সন্ধি বিভাগ হয় কাহিনীবিন্যাসের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে। তাছাড়া সংস্কৃত নাটকে যে অর্থে 'ফলাগমে' নির্বহণ সন্ধি হয়, সে অর্থে tragedyর Catastrophe হতে পারে না। বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত্য নাটকের দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত অপেক্ষা সংস্কৃত নাটকের ভাব এবং রসই প্রধান বলে শেক্‌সপীরীয় নাটকের climax সংস্কৃত নাটকে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে শেক্‌সপীরীয় রোমান্টিক কমেডির সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের কিছুটা কাহিনীগত সাদৃশ্য পাওয়া যাবে। সমালোচক Peter G. Phialas শেক্‌সপীয়রের রোমান্টিক কমেডির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে লিখেছেন—"That structure deals with a love story which though for a time frustrated, is in the end brought to a happy conclusion."[১১] এখানে অবশ্য এ-ও লক্ষণীয় যে সংস্কৃত রোমান্টিক নাটকের সঙ্গে শেক্‌সপীয়রের রোমান্টিক কমেডির এই কাহিনী সাদৃশ্য থাকলে-ও একটা মৌলিক পার্থক্য এই যে সংস্কৃত নাটকে কিছু সময়ের জন্য এই frustration বা হতাশা আসে কোন বাহ্য বাধা এবং কখনো বা কোন দৈব অভিশাপের দ্বারা। কিন্তু শেক্‌সপীয়রের রোমান্টিক কমেডিতে "In addition to external obstruction··, There is an interior conflict as frustration or oppsition coming from the lovers themselves."[১২] তাছাড়া সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিকগত কিছু খুঁটিনাটি পার্থক্যও বিদ্যমান। নান্দী অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চে অভিপ্রেত অভিনয়-কার্যের জন্য মঙ্গলাচরণ, নান্দ্যান্তে সূত্রধারের দ্বারা প্রস্তাবনা অর্থাৎ নটবিশেষের সঙ্গে কথোপকথনচ্ছলে সূত্রধারের দ্বারা নাটক ও নাট্যকারের নামোল্লেখ করে ঐ নাটকের নাটকীয় বিষয়বস্তুর আমুখ' স্থাপন করা এবং 'প্রবেশক' ও 'বিষ্কম্ভক' অর্থাৎ অপ্রধান ব্যক্তির মুখে নাটকীয়. ইতিবৃত্তের নীরস অংশগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রে

ষড়রিপুর অন্য সবকটি রিপুই বিদূষকের অব্যর্থ হাস্যরসবোধের কাছে মাথা নত করে, পঞ্চম অঙ্কে কুমার আয়ু পিতাকে অভিবাদন করতে গেলে পুরূরবা পুত্রকে আলিঙ্গন করে যখন বললেন, "বৎস ! এই ব্রাহ্মণকে বন্দনা কর," তখন,

"বিদূষক। (হাসিতে২) আশ্রম নিকটে অনেক শাখামৃগ দেখিয়াছে, তাই বুঝি আমাকে বোধ করিয়াছে।" (কা. প্র. সি.)

নাটকে বিদূষকের এই ভূমিকার জন্যই সাহিত্যরসিক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য সমর্থন করে আমাদেরও বলতে হয়—"রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতিকে আমরা সম্ভ্রম করি ; রাজ্ঞী, সখী, নিপুণিকা, চতুরিকাদের জন্য না হয় আরো একটা কোমলভাব হৃদয়ে জাগে, কিন্তু ভালোবাসি ওই বিদূষককে, তার সঙ্গেই আমাদের একাত্মতা।"[১৩]

এখন কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যোপাদান – সংলাপ বা রচনাশৈলী বিশ্লেষণ করে ঐ নাটকের নাটকীয় উৎকর্ষ বিচার করা প্রয়োজন। নাটকে ঘটনার বিকাশ, ভাবনার প্রকাশ এবং নাট্যিক চরিত্রের পরিস্ফুটনে সংলাপই প্রধান অবলম্বন। নাটকীয় সংলাপ বলতে আমরা সাধারণতঃ পাত্র-পাত্রীর উক্তি প্রত্যুক্তিই বুঝে থাকি। কিন্তু সকল উক্তিপ্রত্যুক্তিই সংলাপ নয়, যেহেতু শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশনই নাটকীয় সংলাপের উদ্দেশ্য নয়। নাটকে কথোপকথন বা উক্তি প্রত্যুক্তি কয়েকটি বিশেষ গুণে মণ্ডিত হয়ে উঠলে তবেই তা নাটকীয় সংলাপের মর্যাদা লাভ করে। নাট্যকার নাটকের নেপথ্যে নির্লিপ্ত থাকেন বলে নাটকের বিভিন্ন চরিত্র অনুযায়ী সংলাপকে হতে হয় যথাযথ এবং ঔচিত্য বোধসঞ্জাত। পরিবেশের সঙ্গে যেমন তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে, তেমনি নাটকের কুশীলবের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সংলাপের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির একটা অবিচ্ছেদ্য যোগ থাকে এবং এইভাবেই সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকীয় ঘটনা ও কাহিনী গতিশীল হয়ে সমগ্র নাটকটি একটি পরিণতির মোহানায় উত্তীর্ণ হয়। এইজন্যই চরিত্র পরিবেশ ও নাট্যকাহিনীর প্রকৃতি অনুযায়ী যে সংলাপ যত স্বাভাবিক হয়, সেই সংলাপ তত সার্থক হয়। এইজন্য সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের প্রকৃতির ভিন্নতা অনুযায়ী সংলাপও ভিন্নতর হওয়া স্বাভাবিক। সামাজিক নাটকের চরিত্রগুলি বাস্তব ও পরিচিত জগৎ থেকে নেওয়া হয় বলে তাদের ভাষার মধ্যে একটা সহজ নিত্য-ব্যবহার্যতা থাকে কিন্তু ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বা সংস্কৃত অনুবাদ নাটকের

সংলাপে সর্বদা সেরূপ ভাষার নিত্যব্যবহার্যতা আশা করা যায় না। সেজন্য সংলাপের দীর্ঘতা, সমাসবদ্ধ যুক্তব্যঞ্জনপূর্ণ শব্দের প্রয়োগ এবং অলঙ্কার সমৃদ্ধি সামাজিক নাটকে যত অসঙ্গত হয়, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক কিংবা সংস্কৃত অনুবাদ নাটকের ক্ষেত্রে ততটা হয় না। তবে এখানে একথাও বলা প্রয়োজন যে, সংলাপে ভাষার আড়ষ্টতা যে কোন ধরণের নাটকেই দুর্বলতা রূপে গণ্য হবার যোগ্য। অবশ্য এ ব্যাপারে কোন নাটকের রচনাকাল এবং যুগপরিবেশের বিষয়টিও বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখতে হবে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' নাটক রচিত হবার মাত্র কয়েক বছর পূর্বে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ চন্দ্রগুপ্তের [যোগেন্দ্র নয়] 'কীর্তিবিলাস' নাটকের গদ্যসংলাপে "কথ্যভাষা দূরে থাক্, সাধুলিখ্য ভাষার কথ্য ঢং-টুকুও ফোটেনি। পদ্যসংলাপ ঈশ্বরগুপ্তের ছাঁচে ঢালা;"[১৪] তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' প্রধানতঃ পয়ার জাতীয় পদ্যে রচিত হওয়ায় নাটক হয়েছে অনেকটা পাঠ্যকাব্যের মত; হরচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' "এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞানবৃদ্ধ্যর্থ রচিত"[১৫] এমনকি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষের দ্বিতীয় নাটক 'কৌরব বিয়োগে'র ভাষাও সংস্কৃত শব্দ-বাহুল্য ও অন্বয়রীতির বিষম ভারে নিষ্প্রাণ ও আড়ষ্ট। এই নাটকগুলির কোনটিই অভিনয়যোগ্যতা লাভ করতে পারে নি। পক্ষান্তরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' নাটক 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' অভিনীত হয়ে দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছিল। বাংলা নাটকের আদি পর্বে এই চারজন নাট্যকারের নাটকীয় সংলাপের উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

[গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত : কীর্তিবিলাস।]

রাজপুত্র। ......দেখ রজনীযোগে কুমুদিনীর সুশীতল কর সুধাকর সহ বিহার সন্দর্শনে নলিনী নম্রমুখী হইয়া আক্ষেপনীরে ভাসিতে থাকেন, পরে প্রভাকর উদয় হইবামাত্র অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া নিজ নায়কের নিকট মনের সমস্ত দুঃখ ব্যক্ত করেন। হে নাথ! তোমার প্রচণ্ড প্রখর তেজোময় কিরণ দ্বারা সংসারের সমস্ত প্রাণীর দেহ দগ্ধ হইতে থাকে; কিন্তু কুমুদিনী নায়কের কোমল জ্যোতি দ্বারা সর্বসাধারণের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়। (২।৩)

সৌদামিনী। নিজে মান অভিমানী কাহাকে না মানে।
অপমান ভয় হেতু জিজ্ঞাসেন মানে॥

কি দেখি এমন সাধ হইল তোমার।
ইহাতে এতই সুখ ভাবিয়াছি সার ।। (৪।১)

[তারাচরণ শিকদার ঃ ভদ্রার্জুন ।]

নারদ। তবানুজদিগের যেরূপ ভক্তি এবং তাহাদিগের প্রতি তোমারও যেরূপ স্নেহ, এমত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; কিন্তু এরূপ স্থলে বিরোধাঙ্কুর উৎপন্ন হইলে অত্যন্তাক্ষেপজনক হইবে, যেহেতু সেই অংকুরে সকলকেই বিনাশ করিবে।

সুভদ্রা। কালসম কালরাত্রি মম পক্ষে কাল।
চাহি কাল নাহি ইচ্ছা দেখিতে সকাল ।।

[হরচন্দ্র ঘোষ ঃ কৌরববিয়োগ।]

বিদুর। হে রাজন্, শোক সম্বরণ কর। ঈশ্বর বস্তুমাত্রকেই নশ্বর করিয়াছেন। এই হেতু পশুপক্ষী কীট করী নাগ নরাদি করিয়া যাবজ্জীবেরা নিয়তিমতে কালে নাশকে পায়, ইহার কালাকাল বিবেচনা করিয়া জ্ঞানি লোকেরা প্রায় মুগ্ধ হয়েন না। আর শরীরিদের প্রাণ জলমধ্যস্থ চন্দ্রের ন্যায় চপল, ইহা নিশ্চয় জানিয়া অনুক্ষণ পুণ্যানুষ্ঠানই কর্তব্য। [সংলাপ বর্ণনাত্মক]

[কালীপ্রসন্ন : বিক্রমোর্বশী।]

চেটী। দেবী বলিয়াছেন, আর্য্য মানবক আমার উপর অত্যন্ত দয়াবান (।) কদাচ আমার ক্লেশ দেখিতে পারেন না।

বিদূ। নিপুণিকে ! প্রিয় বয়স্য কি কোন প্রতিকূলাচরণ করিয়াছেন।

চেটী। যাহার নিমিত্ত স্বামী উৎকণ্ঠিত আছেন, সেই স্ত্রীর নামে অদ্য দেবীকে আহ্বান করিয়াছেন।

বিদূ। (মনে মনে) বয়স্য স্বয়ংই যে রহস্য ভেদ করিয়াছেন, তা আমি ব্রাহ্মণ, বৃথা জিহ্বা স্তম্ভিত রাখি কেন। (প্রকাশ্যে) হাঁ উর্বশী নামে এক সুরসুন্দরী দর্শনে বয়স্য উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন, দেবীকে কেবল আয়াস দিতেছেন, এমত নহে, আমি ব্রাহ্মণও অনাহারে পীড়া পাইতেছি। [দ্বিতীয় অংক]

উর্বশী। আমি বিলম্ব করিয়া মহারাজের অপরাধ করিয়াছি ক্ষমা করিবেন।

রাজা। সুন্দরি ! এমন কথা কহিও না, আতপতপ্ত ব্যক্তিরই তরুচ্ছায়া বিশেষতঃ শ্রান্তিহর। [তৃতীয় অংক]

উপরিউদ্ধৃত উদাহরণমালা থেকে স্পষ্টই প্রতীত হবে, 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের সংলাপে তৎসম শব্দের প্রয়োগ থাকলেও তার বাহুল্য কমে গিয়ে

একটা সহজ সাবলীলতা এসেছে এবং সংলাপ সাধুভাষায় লিখিত হয়েও কথ্য ঢং-এর জন্য অনেকটা পরিমাণে নাটকীয় সংলাপের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছে। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে হ্রস্ব এবং ক্ষিপ্র নাটকীয় সংলাপ নাট্যরস জমে ওঠার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। 'বিক্রমোর্বশী' নাট্যাকারে প্রকাশিত হলে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' এই নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন—"...রচনা-চাতুর্য্য দৃষ্টে প্রতীত হইতেছে যে ইদানীন্তনের বিষয়ী গ্রন্থকারদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই ; যেহেতু ইহাতে নস্যের গন্ধমাত্র বোধ হয় না।" কিন্তু ডঃ সুশীল কুমার দে তাঁর 'নাট্যকার কালীপ্রসন্ন সিংহ' প্রবন্ধে লিখেছেন—"গ্রন্থকার মূলের অবিকল অনুবাদ করিতে গিয়া নাটকের ভাষা ও ভঙ্গিকে সরস করিতে পারেন নাই এবং পয়ারাদি ছন্দে মূলের বিচিত্র ও দীর্ঘচ্ছন্দী শ্লোকগুলির মর্যাদা রক্ষা হয় নাই। বিবিধার্থ সংগ্রহের সমালোচক বিক্রমোর্বশী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ ইহাতে নস্যের গন্ধমাত্র বোধ হয় না : কিন্তু পণ্ডিতী ভাষা না হইলেও ইহার ভাষা সংস্কৃতগন্ধী ও কৃত্রিম। চতুর্থ অঙ্কে পুরূরবার উন্মাদদৃশ্যের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে ইহার রচনার নমুনা পাওয়া যাইবে :—

রাজা। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া) কে আমাকে অনুশাসন করেন, (দেখিয়া) একি পিতামহ শশলাঞ্ছন, ভগবান তারাপতি, এই অনুশাসনে আমাকে নিতান্ত অনুগ্রহ করিলেন। (মণি লইয়া) অহে সঙ্গমমণে!

যদি আমি তব বলে প্রিয়তমা পাই।
শিরোধার্য্য হবে তুমি বলিলাম তাই ॥
অতএব কর যত্ন শীঘ্র সঙ্গমণে।
কৃতার্থ হইব আমি তবে এ ভুবনে ॥

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) কেন হে এই লতা, কুসুমবিহীনা হইলেও ইহার দর্শনে আমার অনুরাগ জন্মিতেছে।... ..." [দীর্ঘ স্বগতোক্তি]

এখানে ডঃ সুশীলকুমার দে 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের কেবলমাত্র চতুর্থ অঙ্কের পুরূরবার উন্মাদ দৃশ্য থেকে নমুনা সংগ্রহ করে নাটকের ভাষা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পাওয়ায় কিছুটা ভ্রমে পতিত হয়েছেন। কারণ কালিদাসের মূল 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের প্রায় সমগ্র চতুর্থ অঙ্কটিই প্রেমোন্মত্ত রাজার স্বগতোক্তি এবং বর্তমানে প্রায় সকল সমালোচকই স্বীকার করেন যে কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের এই অঙ্কটি কাব্যাংশে অতুলনীয় হয়েও নাটকীয়তার

বিচারে কিছুটা কৃত্রিম। সুতরাং মূলেই যেখানে কৃত্রিমতা আছে, সেখানে নাটকীয় সংলাপ বিচারে কেবল মাত্র সেই অংশ থেকেই নমুনা সংগ্রহ করে অনুবাদকের ঘাড়ে কৃত্রিমতার দোষ চাপানো হলে একদেশদর্শিতারই পরিচয় দেওয়া হবে।

কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের ভাষা সম্বন্ধে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রচিত এই নাটকেরই পদ্যসংলাপে হয়তো কিছুটা অসচেতনভাবে বাংলা সাহিত্যে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্বাভাষ অর্থাৎ শুধু অন্ত্যমিলটুকু ছাড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য পয়ারের বেড়াভাঙা প্রবহমানতা (ছন্দযতি ও অর্থযতির মধ্যে অমিল) দেখা গিয়েছিল। এই নাটকের পঞ্চম অঙ্কে এধরণের দুটি সংলাপ হল—

রাজা। প্রথমাম্বুবরিষণে অতিপথশ্রান্তি।
নিবারয়ে/কিন্তু সদ্য বজ্রপাত ক্লান্তি॥

কিংবা,

প্রথম বৈতালিক। অনুরূপ রাজপুত্র তুমি রাজ্যেশ্বর।
হইয়া সম্প্রতি পাল প্রজা বংশধর॥

দ্বিতীয় সংলাপের অন্ত্যমিলটুকু ছাড়া অমিত্রাক্ষরের প্রবহমানতা পয়ার পংক্তিক পদ্যকে প্রায় সাধারণ গদ্যরূপের বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

এর প্রায় তিন বছর পরে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে 'পদ্মাবতী' নাটকের সামান্য কিছু অংশে পরীক্ষামূলকভাবে মধুসূদনের অমিত্র ছন্দের প্রথম পদসঞ্চার হয় এবং এ প্রসঙ্গে মধুসূদন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে এক পত্রে লেখেন—**I should like very much to see Blank verse gradually introduced in our dramatic literature** এবং রাজনারায়ণ বসুকেও লেখেন—**I am of opinion that our drama should be in blank verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees.**

এখন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' প্রকাশিত হবার বেশ কয়েক বছর পর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তারও বহুবছর পরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর 'বিক্রমোর্বশী'র যে নাট্যানুবাদ প্রকাশ করেন তার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে ঐ দুই নাট্যকারের মধ্যে গণেন্দ্রনাথ কালিদাসের মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির পদ্যানুবাদ করেছেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পয়ার ত্রিপদীতে এবং গদ্য-

সংলাপের ক্ষেত্রে উভয় নাট্যকারই কালীপ্রসন্নের সাধু ক্রিয়াপদের স্থলে কথ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলেও তৎসম শব্দপ্রয়োগ প্রবণতার দ্বারা কালীপ্রসন্নের মত সাধুভাষার ছাঁদই বজায় রেখেছেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্বশী' : [পঞ্চম অঙ্ক]

নারদ। ত্রৈলোকদর্শী ঋষিগণ কহিয়াছেন, কিয়দ্দিন পরে দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, তা তুমি আমার প্রবল সাংযুগীন সহায়, অতএব তুমি অস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া বনগমন করিও না, আর এই উর্বশী তোমার যাবজ্জীবন সহধর্মচারিণী হইয়া থাকুক।

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিক্রমোর্বশী' : [পঞ্চম অঙ্ক]

নারদ। ত্রিলোকদর্শিগণ আদেশ করেছেন, দেবাসুর সংগ্রাম শীঘ্রই উপস্থিত হবে, সেই সংগ্রামে আপনি অমরদের সহায়, তন্নিমিত্ত আপনার শস্ত্রত্যাগ করা উচিত নয় : আর এই উর্বশী যাবজ্জীবন আপনার সহধর্মিণী হউন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিক্রমোর্বশী' : [পঞ্চম অঙ্ক]

নারদ। ত্রিলোকদর্শী মুনিগণ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেচেন, দেবাসুর-সংগ্রাম আসন্ন। আপনিও দেব-সংগ্রামে অমরদের সহায়; অতএব এসময় আপনার শস্ত্রত্যাগ করা উচিত হয় না। আর, এই উর্বশী যাবজ্জীবন আপনারই সহধর্মচারিণী হয়ে থাকুন।

এবার কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের সামগ্রিক রসাবেদন সম্বন্ধে আলোচনা করে বিক্রমোর্বশী প্রসঙ্গ শেষ করব। 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' নাট্যাভিনয়েব পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর তারিখের 'সংবাদপ্রভাকরে' লেখা হয়েছিল, "....এতদ্দেশীয় নাট্যক্রীড়ার প্রাচীন প্রথা, যাহা বহুকাল পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া সাধারণের গোচর পথের অগোচর রহিয়াছে, তাহার পুনরুদ্দীপনে যাঁহারা যত্নশীল হইতেছেন, আমরা সাধুবাদ সহযোগে অগণ্য ধন্যধ্বনি সম্বলিত তাঁহারদিগকে নমস্কার করিতেছি। কিন্তু এইস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, যে মহাশয় প্রাচীন কোনো সংস্কৃত নাটক বঙ্গভাষায় অনুবাদপূর্বক তাহার ক্রীড়া প্রকাশে উৎসুক হয়েন, দোহাই, দোহাই, সহস্র দোহাই, তাঁহারা অতি বিবেচনা ও সতর্কতার সহিত তৎকার্যে যেন প্রবৃত্ত হয়েন। যে ক্রীড়ক যে বিষয়ের ক্রীড়া করিবেন, তাঁহার উক্তি গদ্যই হউক, কিম্বা পদ্যই হউক তাঁহার রচনাটি প্রকৃত স্বভাবানুযায়ী হইবে, তাহাতে

প্রকৃতির কিছুমাত্রই যেন বিকৃতি না হয়,...নাটকটি অতি সুমিষ্ট বিষয়, অতএব নাটক না টক হয়। ইহার আদিবর্ণ লোপ হওয়া বড় দুঃখের ব্যাপার অতএব সাবধান সাবধান। বাবু কালীপ্রসন্ন অতি তরুণ বয়স্ক বালক, তিনি এই তরঙ্গ বয়সে যখন বিবিধ প্রকার কুকর্মের তরঙ্গ রঙ্গ ছেদ করিয়া বিদ্যানুশীলন রূপ সমুদ্রতরঙ্গে উৎসাহ-নৌকা প্রবাহিত করিতেছেন তখন আমরা তাঁহাকে আশীর্বাদপূর্বক শতশতবার প্রশংসাবাদ প্রদান করিব।"

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সমালোচকের মনে প্রাচীন সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং স্পর্শকাতর গৌরববোধ কাজ করছে, কিন্তু অনুবাদ সম্বন্ধে সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যখন তাঁর এই মন্তব্যের দিকে মনোযোগী হওয়া যায়, "উক্তি গদ্যই হউক, কিম্বা পদ্যই হউক, তাঁহার রচনাটি প্রকৃত স্বভাবানুযায়ি হইবে।"

আমরা বিস্তৃত উদাহরণ সহযোগে পূর্বেই দেখেছি, 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে পুরুরবার দীর্ঘ স্বগতোক্তি এবং অন্যান্য অঙ্কে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অতিরিক্ত তৎসম শব্দ প্রয়োগে আড়ষ্ট কিছু সংলাপ ছাড়া অধিকাংশ গদ্যসংলাপই তৎপূর্ববর্তী অন্যান্য নাট্যকারদের গদ্যসংলাপের তুলনায় [ব্যতিক্রম রামনারায়ণের 'কুলীনকুল সর্বস্ব' ১৮৫৪ খৃঃ] প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু মূল সংস্কৃত নাটকের ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের বাংলা পদ্যানুবাদের ক্ষেত্রে নাট্যকার স্বাভাবিকতার সেই সিদ্ধি অর্জন করতে পারেন নি, কারণ অধিকাংশ পদ্যানুবাদই পয়ারের নিগড়ে আবদ্ধ থেকে কৃত্রিম হয়ে উঠেছে যদিও দু-একটি ক্ষেত্রে ভাবের প্রবহমানতা সৃষ্টি করে এই পয়ারের মধ্যেই পরবর্তীকালের অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্বাভাষ সূচিত হয়েছে।

কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের সবচেয়ে কৃত্রিম এবং দুর্বলতম স্থান নাটকের চতুর্থ অঙ্ক যদিও কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের চতুর্থ অঙ্কটি সমালোচকদের বিশেষভাবে প্রশংসাধন্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একবার 'বিক্রমোর্বশী' প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "বিক্রমোর্বশীয় আদ্যোপান্ত শকুন্তলার ন্যায় সর্বাঙ্গসুন্দর নহে। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে উর্বশীর বিরহে একান্ত অধীরও বিচেতন পুরুরবা তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন—এবিষয়ের যে বর্ণনা আছে তাহা অত্যন্ত মনোহর—এমন মনোহর যে, কোনও দেশীয় কবি উহা অপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে

পারেন না, একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।" যেখানে মূল নাটকে সবচেয়ে সার্থকতা, অনুবাদে সেইখানেই সবচেয়ে দুর্বলতা—এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কালিদাসের চতুর্থ অঙ্কের সার্থকতা নাটকীয়তায় নয়, কাব্যিকতায়—প্রেমার্ত হৃদয়ের অনুভববেদ্য আবেগময়তায়; আর তার ফলে সংস্কৃত নাটকের সেই দীর্ঘ বিলাপ বাংলা অনুবাদে কৃত্রিম হয়ে পড়েছে এবং নাটকের নাটকীয় উৎকর্ষ বিচারে দুর্বলতম স্থান হয়ে উঠেছে। নাটকে যে কবিত্ব থাকবে না তা নয়. কিন্তু তার মাত্রা এত বেশি হবে না যে তা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কক্ষ ছাড়িয়ে গিয়ে কেবল আবেগময়ী বর্ণনায় পর্যবসিত হবে। 'বিক্রমোর্বশী'র চতুর্থ অঙ্ক তাই মূলে এবং অনুবাদে উভয়তঃই নাটকীয়তার দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে।

অবশ্য সমস্ত পৃথিবী জুড়েই নাটক সম্বন্ধে এখন ধারণার বিবর্তন ঘটে চলেছে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে দেনিস দিদেরো তাঁর 'নাট্যকাব্য' প্রবন্ধে নাটকের 'action' এবং—'movement' সম্বন্ধে প্রচলিত সংস্কার উপেক্ষা করে দেখিয়েছেন, নাটকের 'interest' অর্থাৎ রসকেন্দ্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার সংখ্যা এবং গতিলয়েরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। দিদেরো এজন্য 'নাটকের মর্ম জেনে ধর্মব্যাখ্যা' করার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। দিদেরোর পর জার্মান সাহিত্য-সমালোচক শ্লেগেলও নাটককে ভারতীয় সাহিত্য-শাস্ত্রীদের মতো দৃশ্যকাব্য বা 'dramatic poetry' আখ্যা দিয়ে বলেছেন, "I speak of the poetry in spirit and design of a piece." তাছাড়া জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতার পার্থক্যের জন্যও কালিদাসের নাটক এবং জাপানের 'নোহ্' নাটকগুলি পাশ্চাত্যের প্রচলিত নাট্যাদর্শকে অবহেলা করেও নাটক হিসেবে এক ধরণের স্বতন্ত্র খ্যাতি লাভ করতে পেরেছে। বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন দেশের বিচিত্র গঠন ও প্রকৃতির নাটকের নাট্যিক সাফল্য সম্বন্ধে কবি-সমালোচক টি. এস. এলিয়টের সতর্কবাণী তাই বিশেষভাবে স্মরণীয়—

"The forms of drama are so various that few critics are able to hold more than one or two in mind in pronouncing judgment of 'dramatic' and 'undramatic'. What is dramatic? If one were saturated in Japanese 'Noh', in Bhasa and Kalidasa in Aeschylus, Sophocles and Euripedes, Aristophanes and

Meanander, in the mediaeval play of Europe, in Lope' De' Vega or Calderon as well as the great English and French drama, and if one were (which is impossible) equally sensitive to them all, would not one hesitate to decide that one form is more dramatic than another ?"[১৬]।

আধুনিককালে অনেক নাট্যতত্ত্ববিদ আবার এই সব বিভিন্ন ধরণের নাটককে চারটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—(ক) রূপ প্রধান (ঘটনা প্রধানও চরিত্র প্রধান) (খ) রসপ্রধান (গ) ভাবপ্রধান (ঘ) উদ্দেশ্যপ্রধান। মোটামুটিভাবে নাটকের এই শ্রেণী বিভাগ স্বীকার করে নিলে কালিদাসের এবং তদনুসরণে কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' নাটককে বলতে হয় রসপ্রধান নাটক। নাটকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী নাটকের আরও নানা ধরণের শ্রেণীবিভাগ হতে পারে। কিন্তু এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর নাটকের মধ্যে কি কোথাও কোন সাধারণ ভিত্তিভূমি নেই? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে এই সব পরস্পরবিরোধী নাট্যসম্বন্ধীয় ধারণার মধ্যে এক জায়গায় একটি ঐক্যসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রয়েছে সেই ঐক্যসূত্র। ভরত বলেছেন, প্রকৃতি অনুযায়ী নাটক নানা প্রকার হতে পারে, কিন্তু সর্বত্রই ঔৎসুক্য এবং প্রয়োগদীপ্তিই হল নাটকের অন্তর্লক্ষণ। সুতরাং আমরা একথাই বলতে পারি, পাশ্চাত্ত্য বিধিনিয়ম না মেনেও মহাকবি কালিদাসের এবং তাঁরই অনুসরণে কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে এই ঔৎসুক্য এবং প্রয়োগদীপ্তিই নাটকটিকে নাটকীয় সার্থকতা দান করেছে যদিও মূলে স্থানে স্থানে মাত্রাতিরিক্ত কাব্যিকতা এবং অনুবাদে স্থানে স্থানে ভাষাগত আড়ষ্টতা এবং সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের লেখ্যরূপ প্রয়োগ নাটকের এই প্রয়োগ দীপ্তিকে কিছুটা ব্যাহত করেছে।

কালীপ্রসন্নের পরবর্তী নাটক 'সাবিত্রী সত্যবান' ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে কালীপ্রসন্নের মৌলিক নাটক এই 'সাবিত্রী সত্যবান।' নাটকের 'বিজ্ঞাপন' অংশে নাট্যকার স্পষ্টই লিখেছেন, "মহাভারতীয় বনপর্বান্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানের সাবিত্রীচরিত হইতে কেবল মর্মমাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে।" ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খন্ডে এই নাটক সম্বন্ধে লিখেছেন, "কালীপ্রসন্নের দ্বিতীয় নাট্যরচনা 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮) মৌলিক রচনা বলিয়া কথিত। তৃতীয়

নাটক 'মালতী মাধব' (১৮৫৯) ভবভূতির অনুবাদ। এই বই দুইটিও 'বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ' রচিত হইয়াছিল। এখন লুপ্ত বলিয়া এগুলির সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই।"[১৭] কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে— বহু অনুসন্ধানের পর কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' 'সাবিত্রী সত্যবান' এবং 'মালতীমাধব' এই তিনখানি নাটকেরই সন্ধান পেয়েছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহের মধ্যে কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' এবং 'মালতীমাধব' নাটক দুটি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। কালীপ্রসন্নের বর্তমান বংশধর (দত্তক পুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহের পুত্র) সঞ্জীবচন্দ্র সিংহের ব্যক্তিগত গ্রন্থসম্ভার থেকে কালীপ্রসন্নের 'সাবিত্রীসত্যবান' নাটকটিও দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। অবশ্য বইগুলির এমন জীর্ণদশা যে অচিরে পুনর্মুদ্রিত না হলে লুপ্ত হওয়ারই সম্ভাবনা। 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের পত্র সংখ্যা। ./.+৯৮।

মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত পতিব্রতা মাহাত্ম্যোপাখ্যানই এই নাটকের কাহিনীর উৎস। রাজা যুধিষ্ঠির বনবাস দুঃখপীড়িতা দ্রুপদনন্দিনীর মত এমন কষ্টসহিষ্ণু ও পতিব্রতা রমণী আর কোথাও দৃষ্টিগোচর বা শ্রবণ গোচর হয়েছে কিনা মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে এই প্রশ্ন করলে মহাভারতে এই সাবিত্রী উপাখ্যানের অবতারণা হয়েছে।

মহাভারতের এই উপাখ্যান সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এই বীজাকার কাহিনী অবলম্বনে কাল্পনিক চরিত্রও পরিবেশ সৃষ্টি করে কালীপ্রসন্ন তাঁর ৯৮ পৃষ্ঠা-ব্যাপী 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটক রচনা করেন।

নাটকের আরম্ভ হয়েছে সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুযায়ী নট-নটীর সংলাপের মধ্য দিয়ে—

নট। প্রিয়ে! দেখ ক্রমে রজনী বর্দ্ধিতা হইতেছে, আর বিলম্বে আবশ্যক নাই (।) এক্ষণে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত সাবিত্রী সত্যবান নাটকের অনুরূপণে যত্নবতী হও।

নাটকের পরবর্তী অঙ্কে [দৃশ্য অর্থে 'অঙ্ক' এবং অঙ্ক অর্থে 'কাণ্ড, কথাটি ব্যবহৃত; সংস্কৃত নাটকে অঙ্কবিভাগ থাকলেও দৃশ্যবিভাগ নেই, সুতরাং কালীপ্রসন্নের এই অঙ্কনামিত দৃশ্যবিভাগ ইংরেজী নাট্যাদর্শ অনুযায়ী] বিদূষকের স্বগতোক্তি—

SHABITREE SHOT[illegible]

[illegible]

BY

KALIPROSONO SING

Member of the Asiatic and Agricultu[illegible]al and Horticultural Societies of India, [illegible] *of the B*[illegible]*h Indian Association, and President of the Bedoyth Shahina Shobha of Calcutta, &c. &c. &c.*



Calcutta

PRINTED BY [illegible] ROY & CO. FOR BEDOYTH SHAHINE SHOBHA, NO. 67 CHAUKBIRE[illegible] LANE, COSSITOLLAH.

1858.

সাবিত্রী সত্যবান নাটকের ইংরেজি আখ্যাপত্র
(প্রথম প্রকাশ ১৭৮০ শক ইং ১৮৫৮ খৃ;)

চিত্র—১১

বিদূষক। (স্বগত) মহারাজ সকল প্রকারে সর্বতোভাবে সুখে সাম্রাজ্যপালন করিতেছেন, কিন্তু কেবল সন্তানবিহীনে সর্বদাই বিমর্ষ থাকেন, পরমেশ্বর নানা গুণে (গুণী এবং) প্রভৃত ধনের অধিপতি করিয়া কেবল একটি সন্তানরত্নে বঞ্চিত করত চিরদুঃখী করিলেন, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে, তা, যাই, যাহাতে মহারাজ সুখী হন তাহাই আমার কর্ম, চিন্তা করিলে কি হইবে।

ঐ অঙ্কেই কিছুপরে রাজা রাণীকে বলেন—

রাজা। পুরোহিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, যদ্দ্বারা অবশ্যই দৈববলে পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইবে।

তৃতীয় অঙ্কে [=তৃতীয় দৃশ্যে] একদিকে দেখি রাজা পুত্রের পরিবর্তে এক কন্যাসন্তান লাভ করেছেন এবং তার নাম রেখেছেন সাবিত্রী আবার, আর একদিকে রাজ্যচ্যুত এবং অন্ধ রাজা দ্যুমৎসেন পুত্র সত্যবান এবং রাণীর সঙ্গে বনবাসে এসে নিজ দুর্ভাগ্য সহ্য করে চলেছেন।

দ্বিতীয় কাণ্ডে শার্ঙ্গরব, পৈলব, সনাতন প্রভৃতি কাল্পনিক চরিত্রের মাধ্যমে রমণীর পাতিব্রত্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা বনাম ব্যভিচারিতা সম্বন্ধে কিছু বিতর্কমূলক সংলাপ এবং বয়স্য শ্বেতগর্ভের সঙ্গে সত্যবানের মানবমনে প্রেমের প্রভাব সংক্রান্ত কিছু বর্ণনাধর্মী সংলাপ পাওয়া যায়। তৃতীয় কাণ্ডের প্রথম অঙ্কে সাবিত্রীকে বধূরূপে বা পুত্রবধূরূপে প্রার্থনা করে নানা দেশ থেকে বিভিন্ন রাজার দূতপ্রেরণ, দ্বিতীয় অঙ্কে কন্যা সাবিত্রীর জন্য কোন পাত্রই মনোমত না হওয়ায় রাজার চিন্তাকুলতা, তৃতীয় অঙ্কে সাবিত্রীর সঙ্গে সখীদের রহস্যালাপ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দেখানো হয়েছে। চতুর্থ কাণ্ডের প্রথম অঙ্কে রাজা দ্যুমৎসেনের সঙ্গে ঋষি সনকের শাস্ত্রালোচনা, দ্বিতীয় অঙ্কে কামশরজর্জরিত সত্যবানের দীর্ঘ বিলাপ, শাস্ত্র ও পিতার নির্দেশ অনুসারে স্বয়ং ভর্তানুসন্ধানকারিণী সখীপরিবৃতা সাবিত্রীর তপোবন মধ্যে সত্যবান দর্শন এবং মনে মনে পতিরূপে বরণ, স্বল্পায়ু সত্যবানকে পতিত্বে বরণ না করার জন্য পিতামাতার অনুরোধ, সাবিত্রীর নিজ প্রতিভায় অবিচলতা এবং সাবিত্রী-সত্যবান পরিণয়ঘটনা দেখানো হয়েছে। পঞ্চম কাণ্ডে সত্যবানের সঙ্গে সাবিত্রীর বনগমন, সত্যবানের আকস্মিক শিরঃপীড়া ও মৃত্যু, যম-সাবিত্রী কথোপকথন, সাবিত্রীর সাহস, পাতিব্রত্যও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বিস্মিত ও বিমূঢ় যমের পরপর চারটি বরপ্রদান ও সত্যবানের জীবনলাভে নাটকের পরিসমাপ্তি।

এই নাটকের অন্য যে ত্রুটিই থাক্ না কেন, নাটকের কাহিনী নির্বাচন ও কাহিনী সংগঠনে নাট্যকার যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের অন্তর্লক্ষণ যে ঔৎসুক্য, তা প্রায় নাটকের আগাগোড়া অব্যাহত থেকেছে এবং ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে তার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কয়েকটি কাণ্ডে কয়েকটি অঙ্কের কিছু কিছু অংশে যেমন দ্বিতীয় কাণ্ডের দ্বিতীয় অঙ্কে শার্ঙ্গরব পৈলব, সনাতনের বিতর্কমূলক দীর্ঘ সংলাপে, তৃতীয় অঙ্কে কুসুম শরের পরাক্রম সম্বন্ধে সত্যবানের সুদীর্ঘ উচ্ছ্বাসে, চতুর্থ কাণ্ডের প্রথম অঙ্কে দ্যুমৎসেনের সঙ্গে ঋষি সনকের সুদীর্ঘ শাস্ত্রালোচনায় এই ঔৎসুক্যের ধারা কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও নাট্যকাহিনীর সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় যে কাহিনীটি অতিবিস্তৃত এবং নানামুখী হয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েনি। রঙ্গালয়ে নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে নাট্যাভিনয় শেষ করতে হয় বলে নাটকের কাহিনীকে যে বাহুল্যবর্জিত হতে হবে এ তথ্যটি কালীপ্রসন্ন নিজে রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে সর্বদাই স্মরণ রাখতে পেরেছিলেন।

আমরা আগেই দেখেছি 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকটি পাঁচটি কাণ্ডে এবং প্রত্যেক কাণ্ড আবার কয়েকটি অঙ্কে বিভক্ত হয়েছে এবং নাট্যকার অঙ্ক অর্থে 'কাণ্ড' এবং দৃশ্য অর্থে অঙ্ক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে বাংলা সাহিত্যের আদি পর্বের সমস্ত মৌলিক নাটকেই নাট্যকারেরা অংকবিভাগ এবং দৃশ্যবিভাগে এবং তাদের নামকরণে দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। গোবিন্দ চন্দ্র [যোগেন্দ্র চন্দ্র নয়] গুপ্ত[১৮] 'কীর্তিবিলাস' নাটকে ইংরেজী Scene কথাটিকে 'অভিনয়' বলে অনুবাদ করেছেন। তারাচরণ শিকদার 'ভদ্রার্জুন' নাটকে Scene কে করেছেন 'সংযোগস্থল'। হরচন্দ্র ঘোষ আবার তাঁর নাটকে Scene এর অনুবাদ করেছেন 'অঙ্গ'। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল সর্বস্ব'তে ছয়টি অংক থাকলেও কোন দৃশ্যবিভাগ নেই। সংস্কৃত নাটক এবং ইংরেজী নাটক উভয় নাটকেই অংকবিভাগ থাকলেও সংস্কৃত নাটকে দৃশ্যবিভাগ না থাকায় ইংরেজী নাটকের অনুসরণে নাট্যকারেরা যখন মৌলিক বাংলা নাটকে দৃশ্যবিভাগ করেছেন, তখন তার পরিকল্পনা এবং নামকরণে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম স্থাপন করতে পারেননি। কালীপ্রসন্ন তাঁর 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের মধ্যে সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয়রীতি সম্মত পাঁচটি কাণ্ড' (Act বা অংক) বিভাগ করলেও ইংরেজী নাট্যাদর্শ অনুযায়ী সেই কাণ্ডগুলিকে আবার শুধু যে

কয়েকটি 'অংক' (Scene বা দৃশ্যে) বিভক্ত করেছেন তাই নয়, নাট্যকার তাঁর স্বাধীন পরিকল্পনা অনুযায়ী ১ম কাণ্ডের ৩য় অংক [= ১ম অংকের ৩য় দৃশ্যে] 'পটোত্তোলনান্তর শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশে'র কিছু পরে 'পটপ্রক্ষেপেন নিষ্ক্রান্তার সর্বে" হলেও ঐ অংকেই [= দৃশ্যেই] 'পটোত্তোলনান্তর তপোবন সন্নিকটবর্তী নদীতীর. দ্যুমৎসেন রাজা ও রাজ্ঞীর প্রবেশ' এই মঞ্চনির্দেশ ব্যবহার করেছেন। অবশ্য আধুনিককালে অনেক নাট্যসমালোচকই এবিষয়ে একমত যে বিভিন্ন নাটকে অংকবিভাগের জৈব তাৎপর্য (organic significance) খুঁজে পাওয়া গেলেও দৃশ্যবিভাগের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রচলন করা সম্ভব নয়। যাই হোক্, কালীপ্রসন্নের 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের দৃশ্য পরিকল্পনায় প্রথানুগত্য এবং স্বাধীন প্রচেষ্টার এই মিশ্র রীতি ছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে "দৃশ্যগুলি স্বল্পায়তন, ক্ষিপ্রগতি ও অবান্তর বিষয়ের বাহুল্যবর্জিত।"[১৯] ফলে নাটকের প্রাণশক্তি-স্বরূপ নাটকীয় গতিসৃষ্টির ব্যাপারে এই নাটকের অংক ও দৃশ্য পরিকল্পনা যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

কিন্তু নাটকীয় গুণসম্পন্ন কাহিনী এবং অংকও দৃশ্যবিভাগে কৃতিত্ব দেখালেও এই নাটকের প্রধান ত্রুটি নাটকের চরিত্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে নি। এর কারণ একমাত্র সাবিত্রী চরিত্রটি ছাড়া নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলি এমনকি নায়ক সত্যবান চরিত্রটিও নাট্যক্রিয়া (action)-র মধ্য দিয়ে বিকশিত না হয়ে বাক্‌সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। অথচ নাট্যিক ক্রিয়া (action)-র সাহায্য না নিয়ে কেবল বর্ণনাধর্মী বক্তৃতা আশ্রয় করে গড়ে উঠলে কোন চরিত্রই নাটকীয় চরিত্রই হয়ে উঠতে পারে না। নাট্যতত্ত্ববিদ্ এরিস্টটল অবশ্য 'doing something' শ্রেণীর নাটকীয় চরিত্র ছাড়া 'suffering something' শ্রেণীর নাটকীয় চরিত্রের কথাও বলেছেন; বলেছেন লোকবৃত্তে যেমন ব্যক্তি সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় হয়ে পরিণাম ভোগ করে, নাটকের নায়কও ও তেমনি সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় হয়ে নাটকের সুখাবহ বা দুঃখাবহ পরিণাম ঘটাতে পারে।[২০] কিন্তু 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের নায়ক সত্যবান শুধু 'doing something' নয়, 'suffering something' শ্রেণীর নায়ক হিসাবেও সার্থকতা লাভ করতে পারেনি যেহেতু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার বনবাসের দুঃখ অপেক্ষা পূর্বরাগ ও প্রণয়ের উচ্ছ্বাসই নাটকে বড় হয়ে উঠেছে এবং সত্যবানের মৃত্যু এবং যম কর্তৃক পুনর্জীবন দানের দৃশ্যটিতেও

মৃত্যু যেন সাময়িক মূর্ছার পর্যায়ে নেমে এসেছে, তার অতিরিক্ত কোন দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগকারী নাটকীয় চরিত্রের আতিতে পরিণত হতে পারেনি।

কিন্তু সাবিত্রী চরিত্র সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। একমাত্র এই নায়িকা চরিত্রটি সমস্ত নাটকের মধ্যে নাট্যিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে এবং সেইজন্য চরিত্রটি সজীব হয়ে উঠেছে। প্রখ্যাত নাট্যতত্ত্ববিদ্ ফার্দিনান্ড ব্রুনেতিয়ে বলেছিলেন, "নাটক হচ্ছে ব্যক্তি ইচ্ছার সচেতন সংগ্রামের দৃশ্য।... যেখানে সচেতন সংগ্রাম নেই, বাধা অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছাবার ঐকান্তিক উদ্যম নেই, সেখানে নাট্যত্ব নেই।"[২১] কথাটি 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের সাবিত্রী চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। পিতামাতার শত বিরোধিতা সত্ত্বেও অল্পায়ু সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করার অবিচল প্রতিজ্ঞা থেকে আরম্ভ করে সত্যবানের মৃত্যুর পর পুনর্জীবনপ্রাপ্তি পর্যন্ত সাবিত্রী চরিত্রের মধ্যে বাধা অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছাবার ঐকান্তিক উদ্যম এবং ব্যক্তি ইচ্ছার সচেতন সংগ্রামের দৃশ্যই বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে। অবশ্য শুধু 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকেই নয়, প্রায় সমস্ত বাংলা সাহিত্যেই দেখা যায় নায়িকারই প্রাধান্য। অনেক পরবর্তীকালে বাংলা নাটকের চরিত্রচিত্রণের এই দুর্বলতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নরনারী' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "বঙ্গদেশে পুরুষের কোনো কাজ নাই। এদেশে গার্হস্থ্য ছাড়া আর কিছু নাই, সেই গৃহগঠন এবং গৃহবিচ্ছেদ স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে।... আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত কোনো বৃহৎভাব, বৃহৎকার্য, বৃহৎক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদের জীবনের বিকাশ হয় নাই।"[২২] বাংলা নাটকের আদি পর্ব থেকে আজও পর্যন্ত তাই (সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে) পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রই উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয়ে এসেছে।

নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্রের পাশে থাকে অনেক পার্শ্বচরিত্র। 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকে এই কেন্দ্রীয় চরিত্র সাবিত্রীর পাশে যেসব পার্শ্বচরিত্র গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে সত্যবানের পিতা অন্ধ রাজা দ্যুমৎসেনের চরিত্রটি বিলাপ ও খেদোক্তির দীর্ঘতা সত্ত্বেও অন্যান্য ছায়া-চরিত্রের তুলনায় কিছুটা নাটকীয় কায়া লাভ করেছে। নাটকের অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে দুজন ঋষি-শিষ্যের চরিত্র কিছুটা স্পষ্টতা লাভ করেছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দিকে নেপথ্যে রাজবাড়ীর যজ্ঞ উপলক্ষ্যে দানধ্যানের ঘোষণার পর এই দুজন ঋষি-

শিষ্যের সংলাপে কিছুটা অভিনবত্ব আছে। একথা সহজেই মনে হতে পারে যে সেকালেও সকল শিষ্যই জ্ঞানতাপস ছিলেন না ; কোন কোন শিষ্য গার্হস্থ্য মনোভাবাপন্ন ছিলেন। সেজন্য কালীপ্রসন্ন ঋষিশিষ্যদ্বয়ের চরিত্রে প্রথানুবর্তন না করে কিছুটা বাস্তবতা আনার চেষ্টা করেছেন—

প্রথম। আমি তাহা মুনির অজ্ঞাতসারে এই শিরীষবৃক্ষমূলে স্থাপন করিয়া রাখিব এবং আবশ্যক মত ব্যয় করত নির্বিবাদে জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্ষেপন করিব।

দ্বিতীয়। সখে! তোমার তো বিবাহ হয় নাই। আমি (সাহ্লাদে) উঃ অদ্যই এই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গৃহিণীর নিকট গমন করিব।······

এইভাবে ঋষিশিষ্যদ্বয়ের চরিত্রে কিছুটা মৌলিকতা দেখালেও কালীপ্রসন্ন এই নাটকে সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে যে বিদূষক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, একমাত্র ঔদরিকতা ছাড়া তার অন্য কোন সাফল্যের পরিচয় আমাদের চোখে পড়ে না।

প্রকৃতপক্ষে 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকে একমাত্র সাবিত্রী চরিত্র ছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলি বিশেষ ব্যক্তিত্বমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে নি। তবে এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে রামনারায়ণের 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নামক প্রহসনের কয়েকটি নারী-চরিত্রকে ব্যতিক্রম হিসাবে ধরে নিলে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের পূর্বে বাংলা নাটকের কোথাও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটেনি। এমন কি মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' এবং 'পদ্মাবতী'তেও ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি অপেক্ষা সংস্কৃত চরিত্রের আদর্শই প্রাধান্যলাভ করেছে। অবশ্য বাংলা নাটকের প্রথম পর্বে এই ত্রুটির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একথাই স্বীকার করতে হয় যে, এই শ্রেণীর নাটকে নাট্যকার পুরাণের পূর্বনির্ধারিত কাহিনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এবং নাটকের চরিত্রগুলিও পৌরাণিক যুগের সুনির্দিষ্ট চরিত্র হওয়ায় বাস্তব-জীবনের সজীবতা এবং ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের উৎকর্ষবিচারে পরবর্তী প্রশ্ন এই নাটকে নাট্যকার কি পরিমাণ নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পেরেছেন। নাটকের গতি নাটকের অপরিহার্য উপাদান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাটকের এই গতি সৃষ্টি হয় নাটকীয় দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের দ্বারা। 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকে এক অদৃশ্য দৈব-

শক্তির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব একমাত্র সাবিত্রী চরিত্রেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে, নাটকের অন্য কোন চরিত্রে এমনকি নায়ক চরিত্রেও কোনরূপ নাটকীয় দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেখা যায় না। অবশ্য আধুনিককালে অনেক নাট্যসমালোচক নাটকে দ্বন্দ্ব বা সংঘাতকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষপাতী নন। এ প্রসঙ্গে নাট্যতত্ত্ববিদ্ উইলিয়াম আর্চারের মতটি বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। আর্চার তাঁর আলোচনায় সর্বযুগের কয়েকখানি বিখ্যাত নাটক যেমন. "এগামেমনন্, ইডিপাস, ওথেলো, এ্যাজ ইউ লাইক ইট, গোস্ট প্রভৃতি নাটকের প্রমাণ তুলে বলেছেন—এইসব নাটকের নায়করা বিশেষ কোন লক্ষ্যে পেঁছাবার জন্যে সংকল্পিত সংগ্রাম করেছেন একথা প্রমাণ করা যায় না। এই কারণে "it is clearly an error to make conflict indispensable to drama"—দ্বন্দ্বকে নাটকের অপরিহার্য উপাদান বলে ঘোষণা করা ভুল। …ইডিপাস সম্বন্ধে আর্চারের বক্তব্য এই যে ইডিপাসের মূল দ্বন্দ্ব নিয়তির বিরুদ্ধেই, কিন্তু নাটকে সেই দ্বন্দ্ব কোথায়? নাটকে ইডিপাসের যে রূপ দেখা যায় তার সঙ্গে একমাত্র শলাকাবিদ্ধ কীটের যন্ত্রণাপীড়িত অসহায় অবস্থারই তুলনা করা যায়।"[২২] এজন্য নাটকের নাটকীয়ত্ব সম্বন্ধে আর্চারের বিশেষ অভিমত হল—'the essence of drama is crisis'—সংকট বা crisisই নাটকের আত্মাস্বরূপ। এই crisis বা সংকটসৃষ্টির সাহায্যে দর্শকচিত্তে ক্রমাগত কৌতূহল, উত্তেজনা ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করতে পারলেই নাটক প্রকৃত নাট্যগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। কালীপ্রসন্নের সাবিত্রী সত্যবান' নাটকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অন্ততঃ চারটি ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করে নাটকীয় ঔৎসুক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। নাটকের পথমেই বিদূষকের মুখে শোনা যায় রাজার জীবনে কোন সুখ নেই কারণ বিরাট রাজ্যের অধিকারী হয়েও রাজা নিঃসন্তান; নাটকের গতি এবং দর্শকের ঔৎসুক্যের প্রথম সঞ্চার হয় এখানেই। পুরোহিত যজ্ঞের আয়োজন করে এবং বহু দুঃখ স্বীকার করে রাজা যে অতুলনীয়া কন্যাসন্তান লাভ করলেন সেই সাবিত্রীর যখন মনোমত কোন পাত্রই পাওয়া গেল না, তখন সৃষ্টি হল দ্বিতীয় সংকট। পিতা এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সাবিত্রী স্বয়ং পাত্রানুসন্ধানে বেরিয়ে সত্যবানকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করলেন অথচ যখন জানা গেল যে সম্বৎসরের মধ্যেই সত্যবানের মৃত্যু অবধারিত তখন দেখা গেল নাটকের তৃতীয় সংকট। চতুর্থ এবং সর্বশেষ সংকটটি এসেছে নাটকের পঞ্চম কাণ্ডে সত্যবানের মৃত্যু এবং যম-সাবিত্রী সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করে। অবশ্য এখানে একথাও বলা প্রয়োজন যে কমেডির সংকট কোন

ট্র্যাজেডির সংকটের মত তীব্র, অন্তর্ভেদী এবং নাটকীয় চরিত্রের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হয় না যেহেতু ট্র্যাজেডিতে যেখানে চরিত্রের প্রাধান্য, কমেডিতে সেখানে কাহিনীর প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত। 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকেও সংকটগুলি নাটকের কাহিনীটিকে সর্বদা ঔৎসুক্যময় করে রাখতে সক্ষম হলেও সংকট কোথাও তীব্র এবং ঘণীভূত হয়ে কোন নাটকীয় চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি।

'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের সংলাপ ও রচনাশৈলী বিচার প্রসঙ্গে প্রথমেই দেখা দরকার পরিবেশ ও চরিত্র অনুযায়ী নাটকের সংলাপ কতদূর স্বাভাবিক ও সঙ্গত হয়েছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশনের জন্যই নাটকের সংলাপ নয়। যথার্থ নাট্য-সংলাপ হল সেই সংলাপ যা 'grows from the character, and the conflict, and in its turn, reveal the character, and carries the action." প্রকৃতপক্ষে ঘটনাপরিস্থিতি এবং চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সংলাপই নাটকীয় সংলাপ হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং চরিত্রের কতকগুলি সংলাপ বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

বিদূষক। মহারাজ অদ্যাবধি আমাকে ভোজন করান। যদ্দ্বারা আশীর্বাদ পরিপক্ব হইতে থাকিবে এবং যজ্ঞ শেষে দেবী গর্ভবতী হইয়া কালে পুত্ররত্ন প্রসব করত মহারাজের আনন্দ বৃদ্ধি করিবেন। [১ম কাণ্ড, ২য় অংক।]

রাজা। হে বিধাতঃ! রাজ্যচ্যুত ও নানা ক্লেশে ক্লেশিত করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই অন্ধ করিলেন। হায় পূর্বজন্মে আমরা কত মহাপাতক করিয়াছিলাম তাহার ফল ভোগ করিতেছি, বৎস সত্যবান! বৎস সত্যবান! [১ম কাণ্ড, ৩য় অংক]। সত্যবান। (শিলাপট্টে উপবেশন করিয়া) কামশর কি ভয়ানক ইহাতে বিজ্ঞজনেও বুদ্ধিহ্রাস হয়, এবং চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে। আঃ কিছুতেই মনের সন্তোষ নাই, সকল কর্মেই হতোৎসাহ হইতেছি (শিল পট্টোপরি শয়ন করিয়া) হে মদন! তুমি কোন গুণে এমত ভয়ানক শক্তিযুক্ত হইয়াছ তাহা বলিতে পারি না। তোমার সহযোগীগণও তদনুরূপ, হে (পরভৃত!) তুমি বাহ্যিক সৌন্দর্যবিহীন ও সামান্য বায়সতুল্য হইয়াও যে এবম্প্রকার সহযোগিতা দ্বারা মানবগণের চিত্ত উচ্চাটন করিতে সমর্থ হইবে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর··· (দীর্ঘ উচ্ছ্বাস)। [৪র্থ কান্ড, ২য় অংক]

সংলাপের এই সাধু গদ্যরীতি এবং কোথাও কোথাও দীর্ঘ উচ্ছ্বাস নাটকীয় সংলাপের পক্ষে যে কিছুটা কৃত্রিম হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে সূক্ষ্ম মার্জিত রুচিসম্পন্ন চরিত্রের মুখে স্থূল বক্তব্য এবং স্থূল চরিত্রের মুখে সূক্ষ্ম বক্তব্য পরিবেশনের মত কোন অসঙ্গতি বা অনৌচিত্য দোষ এই নাটকে দেখা যায় না। তাছাড়া দীর্ঘ উচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে সংলাপ যতটা গুরুগম্ভীর এবং আড়ম্বরবহুল হয়েছে, অন্যত্র সাধু গদ্যরীতি সত্ত্বেও ভাষায় ততটা আড়ষ্টতা আসেনি। এপ্রসঙ্গে আরও একটি কথা আলোচ্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে লিখেছেন— "ইহার ভাষা পণ্ডিতী বাংলা, সেইজন্যই ইহা অভিনয়ের বিশেষ অনুপযোগী।"[২৪] কিন্তু এই নাটকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পণ্ডিতী বাংলা ব্যবহৃত হলেও নায়িকা সাবিত্রীর সঙ্গে তার সখীদের সংলাপে শুধু যে চলিত রীতিই ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়, সংলাপ অনেক হ্রস্ব, ক্ষিপ্র এবং বাস্তবানুগ হয়েছে।

সাবিত্রী। সখী, কি সুমঙ্গল সমাচার তোমরা আমাকে বলবে না !

উভয়ে। বল্‌ব না কেন সখি, উপযুক্ত পুরস্কার পেলে অবশ্যই বল্‌ব।

সাবিত্রী। বলই না কেন।

উভয়ে। বল, কি পুরস্কার দেবে ?

সাবিত্রী। আচ্ছা পুরস্কার দেব, বল।

উভয়ে। কৈ দাও ?

সাবিত্রী। আগে বল তবে দিব।

সাগরিকা। তরলিকে ! পুরস্কার না পেলে বলা হবে না।

অথবা—

তরলিকা। এখন বের কথায় পোড়াস্‌নে, এরপর ভাতার ভাতার করে আমাদের পোড়াবি।...ইত্যাদি।

ডঃ সুশীল কুমার দে 'নাট্যকার কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রবন্ধে 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের নায়ক সত্যবানের একটি সাধু গদ্যরীতির উক্তি এবং সাবিত্রীর সখী তরলিকার একটি চলিতরীতির উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন, "একটি দোষ কালীপ্রসন্ন সিংহের সমস্ত নাটকে দেখা যায় ; সেটি এই গুরুগম্ভীর সাধু ভাষা ও অত্যন্ত লঘু চলিত ভাষা পাশাপাশি থাকিয়া অনেক স্থলে হাস্যাস্পদ হইয়াছে।" ডঃ দে কালীপ্রসন্ন সিংহের "সমস্ত নাটকে" এই কথা লিখলেও

তাঁর এই উক্তিতে কিছুটা অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটেছে, কারণ কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে সাধুভাষার পাশাপাশি যেমন কোন চলিত ভাষার সংলাপ নেই, তেমনি আবার 'সাবিত্রী সত্যবানে'র পরবর্তী 'মালতী মাধব' নাটকে সামান্য দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সাধুরীতির পরিবর্তে চলিত রীতির সংলাপই নাটকের আগাগোড়া ব্যবহৃত হয়েছে এবং নাট্যকার স্বয়ং নাটকের বিজ্ঞাপনে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। একমাত্র 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকেই সাধু এবং চলিত এই দুই রীতির সংলাপ আছে এবং তাও ঠিক "পাশাপাশি" নয়. নাটকের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধুভাষার সংলাপ ব্যবহৃত হলেও পরিবেশ ও চরিত্রের বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে কেবল সাবিত্রী ও তার সখীদের সঙ্গে কথোপকথনেই চলিত রীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। ডঃ দে যদিও নাটকে সাধুভাষার পাশাপাশি লঘু চলিত ভাষার সংলাপ প্রয়োগকে হাস্যাস্পদ বলে উল্লেখ করেছেন. তবু আমরা একথা না বলে পারি না যে নাটকের অন্যত্র সাধুভাষার প্রয়োগ আছে বলে তারই সমধর্মী করার জন্য সাবিত্রী ও তার সখীদের কথোপকথনও যদি চলিত রীতির পরিবর্তে গুরুগম্ভীর সাধু রীতিতে রচিত হত তাহলে তা আরও বেশি হাস্যকর হয়ে উঠত। সুতরাং 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকে সাধুরীতির পাশাপাশি চলিত রীতির সংলাপ ব্যবহারকে দূষণীয় না বলে আমাদের আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা উচিত নাটকের বেশির ভাগ জায়গায় সাধু গদ্যরীতির প্রয়োগ এবং কোথাও কোথাও দীর্ঘ উচ্ছ্বাসময় এবং বর্ণনাধর্মী সংলাপরচনাই নাটকের মূল দোষ কারণ বিভিন্ন চরিত্রের বক্তব্যে গভীরতা এবং তরলতা অনুযায়ী শব্দ প্রয়োগে বৈচিত্র্য থাকলেও সংলাপকে স্বাভাবিক করার জন্য ক্রিয়াপদে এবং সর্বনাম পদে সর্বদাই কথ্য ঢং-টুকু বজায় রাখা প্রয়োজন। অবশ্য বাংলা নাটকে উন্নত চরিত্রে সাধু গদ্যরীতি এবং নারীও অনুন্নত চরিত্রে চলিত গদ্যরীতি প্রয়োগের পরিকল্পনা সম্ভবতঃ সংস্কৃত নাটকের উন্নত পুরুষচরিত্রগুলির মুখে সংস্কৃত ভাষা এবং নারী ও অপেক্ষাকৃত হীন চরিত্রের মুখে প্রাকৃত ভাষার অনুকরণেই করা হয়েছিল এবং শুধু কালীপ্রসন্নের 'সাবিত্রী সত্যবানে'ই যে তা অনুসৃত হয়েছিল তা নয়, রামনারায়ণ এবং দীনবন্ধু ও এই রীতিই তাঁদের নাটকে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু চরিত্র পার্থক্য অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের এই রীতি পার্থক্যের মধ্যে বাস্তবতার যে বীজটুকু নিহিত ছিল, তা ঐ পর্বের নাট্যকারদের কিছুটা মাত্রাজ্ঞানের অভাবে অর্থাৎ উন্নত চরিত্রের সংলাপে অতিরিক্ত তৎসম শব্দ বাহুল্য, সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদের লেখ্য রূপ প্রয়োগ এবং কোথাও কোথাও সংলাপের আত্যন্তিক দৈর্ঘ্যের ফলে

ঠিকমত বিকশিত হল না, পরিবর্তে সংলাপের এই সাধু গদ্যরীতি একটা কৃত্রিম নাট্যাঙ্গিকে পরিণত হল, সে তুলনায় নারীচরিত্রে (এবং কোথাও কোথাও অনুন্নত পুরুষচরিত্রে) কথ্যরীতির প্রয়োগ এবং হ্রস্ব ও ক্ষিপ্র বাক্‌বিনিময় অনেক বেশি স্বাভাবিক হওয়ায় নাটকীয় সংলাপ হিসাবেও অনেক বেশি সার্থকতা লাভ করেছে। কালীপ্রসন্নের 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকে সাবিত্রীর সখী তরলিকার মুখে 'বের কথায় পোড়াস্‌নে, পোড়াস্‌নে, এরপর ভাতার ভাতার করে আমাদের পোড়াবি' ইত্যাদি মেয়েলি সংলাপে জাতীয় জীবনে নিত্যব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচন, বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ এবং বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গির ব্যবহারে যে সহজ বাস্তবতার রস সৃষ্টি হয়েছে তা বাংলা নাট্যসাহিত্যের সেই গঠমানতার যুগে কিছুতেই অবহেলার যোগ্য নয়।

'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের সংলাপরচনার এই বৈশিষ্ট্য ছাড়া ও এই নাটকের আর একটি লক্ষণীয় দিক হল, নাটকের মধ্যে কতকগুলি সংগীতের সংযোজন। ডঃ সুশীল কুমার দে হরচন্দ্র ঘোষের 'রজতগিরিনন্দিনী' নাটক প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "ইহার পূর্বেকার নাটকে গান নাই; বোধ হয় কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির অনুকরণে এইখানিতে গান দেওয়া হইয়াছে।" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যসাধকচরিত মালা'য় একথার সমালোচনা করে বলেছেন, "এই উক্তি ঠিক নহে; আমরা দেখিয়াছি, হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'চারুমুখচিত্তহরা'য় ১৪টি গান আছে।" কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের এই উক্তিতেও কিছু ত্রুটি থেকে গেছে, কারণ ব্রজেন্দ্রনাথ যদিও দেখাতে চেয়েছেন হরচন্দ্র তাঁর 'রজতগিরিনন্দিনী'র পূর্বে 'চারুমুখচিত্তহরা'য় গান ব্যবহার করেছেন, তবু তার দ্বারা "বোধ হয় কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির অনুকরণে গান দেওয়া হইয়াছে" ডঃ সুশীল কুমার দের এই মূল মন্তব্যের কোন অন্যথা হয় না, যেহেতু হরচন্দ্রের 'চারুমুখচিত্তহরা' (১৮৬৪)-র পূর্বেও কালীপ্রসন্নের 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮) এবং 'মালতী মাধব' (১৮৫৯)-এ অনেকগুলি গান আছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের 'সাবিত্রী সত্যবানে'র সামান্য আগে অথবা পরে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলীর' (১৮৫৮)-র বিজ্ঞাপনে রামনারায়ণ লিখেছিলেন, "যদিচ যাত্রার প্রতি আমাদিগের অসীম অশ্রদ্ধা আছে, তথাপি এককালে সংগীত মাত্র উচ্ছেদ করা কখনই অভিমত নহে। প্রত্যুত নাটক অভিনয়ে সংগীত নিতান্ত পরিবর্জিত হইলে তাহাতে রসও সৌন্দর্যের বিশেষ হানির সম্ভাবনা।" পাশ্চাত্ত্য নাটকে গান না থাকলেও তৎকালীন বাংলা নাটকে

বিশেষতঃ কালীপ্রসন্ন ও রামনারায়ণের নাটকে গান যোজনা এক হিসাবে বাঙালীর জাতীয় নাট্যস্বভাবেরই অনুবর্তন। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নাটকে গান যোজনাও যাত্রায় গান যোজনার মধ্যে একটি প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। গান যাত্রায় কথাবস্তুর অন্যতম প্রকাশ মাধ্যমরূপে এবং কিছুটা প্রয়োজনাতিরিক্তভাবেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নাটকে গান প্রকাশের মাধ্যম নয়, রসসৃষ্টির একটি সাহায্যকারী উপাদান মাত্র এবং তাও কখনো প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। নাটকের কাহিনীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে জড়িত হয়ে স্থান কাল পাত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নাটকে গান ব্যবহৃত হতে পারে, যাত্রার মতো কোন বহিরঙ্গ গান নাটকে সংযোজিত হতে পারে না। কালীপ্রসন্নের 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকে সব কটি গান এই নাটকীয় সিদ্ধি অর্জন করতে না পারলেও কতকগুলি গান যে নাটকীয় রসসঞ্চারের পক্ষে সহায়ক হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখানে এই নাটকে ব্যবহৃত দুটি রাগ-তাল সম্বলিত সঙ্গীত উদ্ধৃত করা হল ঃ

(১)

রাগ-মল্লার, তাল আড়াঠেকা।
ভজরে অবোধ জীব সেই নিত্য সনাতনে।
কৃতান্ত করেতে মুক্ত হবে যাঁহার স্মরণে ।।
মায়াতে মোহিত হয়ে, আপন আপন ক্ষয়ে,
পরকাল মুক্তিপথ চিন্তা নাহি কর মনে,
সংসারের এই রীতি, ক্ষণমাত্র হবে স্থিতি,
অবশেষে কালগৃহে ফল পাবে কর্মগুণে ।।

(২)

রাগিনী—খাম্বাজ, তাল—একতালা।
এসে ভবের হাটে হরিনামটী কেউ ভজ্‌ল না।
মরণকালে হরি বিনে তরণতরি কেউ পাবে না ।।
আমার আমার বল্‌চ বটে, আমার কেবল মুখে রটে,
সময় পেলে আমার বলার টান্‌ থাকে না।
যত দেখ ভালবাসা, সকল কেবল আশার আশা,
আলোকেরি ছায়া প্রায় অন্ধকারে আর থাকে না ।।

জগত অসার-সার, যশকীর্তি সার তার
শেষে সবে শবাকার, কেবল আগুপিছু আনাগোণা।
দেহ পিঞ্জরের প্রায়, ন'টি দ্বার খোলা তায়,
কবে পাখি উড়ে যায়, দিনক্ষণ নাহি জানা॥
সোনার খাঁচা দূরে ফেলে, আত্মাপাখি উড়ে গেলে
আবার হাজার খাবার দিলে, এমন পোষা পাখি আর পাবে না॥

প্রসঙ্গত এখানে বলা প্রয়োজন যে ঐ একই খৃষ্টাব্দে রামনারায়ণ তাঁর 'রত্নাবলী' (১৮৫৮) নাটকে দশটি গান সংযোজিত করলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলি রচনা করেন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য এবং তৎকালীন প্রখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা গুরুদয়াল চৌধুরী।[২০] কিন্তু কালীপ্রসন্ন স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন [পৌষ-মাঘ ১৩০৫ সংখ্যার 'পুণ্য' পত্রিকায় সঙ্গীতজ্ঞ কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবরণ 'জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবার ও কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে] বলে তাঁর নাটকে ব্যবহৃত সঙ্গীত রচনার জন্য তাঁকে অন্য কারো দ্বারস্থ হতে হয়নি।

'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের সামগ্রিক বিচারে আমরা লক্ষ্য করি যে এই নাটকে ইংরেজী নাটক সংস্কৃত নাটক এবং দেশীয় যাত্রা এই তিনেরই প্রভাব পড়েছে অল্পাধিক পরিমাণে। নাটকের 'কাণ্ড' ও 'অঙ্ক' (=অঙ্ক ও দৃশ্য) বিভাগে ইংরেজী নাটকের প্রভাব, উন্নত শ্রেণীর চরিত্রের সংলাপে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব, কিন্তু নারী চরিত্রের সংলাপে চলমান জীবনযাত্রার প্রভাব, সংগীত সংযোজনে দেশীয় যাত্রার প্রভাব এবং নাটকের কাহিনী নির্বাচনে দেশীয় ঐতিহ্যের অনুবর্তন সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। অনুবাদের স্তর পার হওয়ার পর মৌলিক বাংলা নাটক রচনার সময় পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শের সঙ্গে দেশীয় ঐতিহ্যের এই সমন্বয় প্রচেষ্টা কালীপ্রসন্নের 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের অন্যান্য অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। বাংলার সমাজে যে পুরোপুরি ইংরেজি নাট্যাদর্শ গ্রহণ করে নাটক রচনা সম্ভব নয়, সে বিষয়ে তৎকালীন পাকা ইংরেজীনবীশ নাট্যকার মধুসূদনও বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন বন্ধু রাজনারায়ণকে তিনি এক পত্রে লেখেন—"I write under very different circumstances. Our social and moral development are of a different character." কোন মৌলিক বাংলা নাটক রচনা করতে হলে কোন কোন ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সত্ত্বেও জাতির নিজস্ব আদর্শ ও

বৈশিষ্ট্য যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন, মধুসূদনের পূর্বে কেবল তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকেই সে বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা ছিল, গোবিন্দচন্দ্র (যোগেন্দ্র চন্দ্র নয়) গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিয়োগান্তক নাটক রচনার প্রচেষ্টা হিসাবে উল্লেখযোগ্য হলেও) নাটক হিসাবে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ; হরচন্দ্র ঘোষের সমস্ত নাটকই পাঠ্য এবং অভিনেয় উভয় দিক থেকেই ব্যর্থতা লাভ করেছে। মধুসূদনের পূর্বে একমাত্র রামনারায়ণের 'কুলীন কুল সর্বস্ব'ই জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলনে বিশেষ সিদ্ধি অর্জন করেছে, কিন্তু তাও কোন কাহিনী-পরিণাম ও চরিত্র-পরিণাম যুক্ত নাটক নয়, বিশেষ একটি সময়ের সামাজিক নকসাসম্বলিত প্রহসন মাত্র। সুতরাং মৌলিক নাট্যরচনার ইতিহাসে মধুসূদন-পূর্ববর্তী পর্বে কালীপ্রসন্নের 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের যে বিশেষ চিহ্নিত আসন পাওয়ার কথা, সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার দীর্ঘপ্রতীক্ষিত কর্তব্যসম্পাদন করাই হল এই নাটকের এই বিশদ সমালোচনার লক্ষ্য।

এবার কালীপ্রসন্নের 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮) রচনার দীর্ঘকাল পরে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ যে 'সাবিত্রী' নাটক রচনা করেন, তা থেকে তুলনামূলক বিচারের জন্য ঐ দুই নাটকের কিছু সাদৃশ্যমূলক সংলাপ উদ্ধৃত করে এপ্রসঙ্গ শেষ করব।

কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'সাবিত্রী সত্যবান' [৪র্থ কাণ্ড, ২য় অঙ্ক]

দেবী। বৎসে! সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করা হইবেক না, তিনি অতি অল্পায়ুঃ।

সাবিত্রী। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।)

দেবী। বড় যে নিরুত্তর হইয়া রহিলে ?

সাবিত্রী। মা! এবিষয়ে আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আমি যখন মনে মনে তাঁহাকে বরমালা প্রদান করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি, কোন অনুরোধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। জগতে এই রীতিই সম্যক প্রকারে (প্রচলিত) আছে, একবার মৃত্যু হয়, একবার মাতাপিতা কন্যাদান করিতে পারেন এবং পরিণীতা বালা একবার একজনকেই স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে পারে মা। আমি যখন তাঁহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, তখন কোন ক্রমেই সে বিষয়ে নিরস্ত....(হইতে পারি না)।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : 'সাবিত্রী' [২য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য]

অশ্বপতি। সাবিত্রী। সত্যবানকে পতিত্বে স্বীকার করবার সংকল্প ত্যাগ কর।

সাবিত্রী।... ...সম্পত্তি-বিভাগ-নির্ণায়িকা গুটিকা একবারমাত্র ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়; লোকে কন্যাকে একবার মাত্র প্রদান করে; এবং দান করলুম—একথাও লোকে একবার মাত্র বলে থাকে। অতএব আমি যাঁকে একবার পতি ব'লে বরণ করেছি, তিনি দীর্ঘায়ুই হউন বা অল্পায়ুই হউন—গুণবানই হউন বা নির্গুণই হউন—তিনি ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে আর আমি বরণ করতে পারি না।

উদ্ধৃত অংশটুকুতে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যাবে কালীপ্রসন্নের 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের সংলাপে কেবল সাধুক্রিয়া পদ গুলিকে যদি চলিত ক্রিয়াপদে রূপান্তরিত করা হয়, তবে তা সাবলীলতার দিক থেকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ক্ষীরোপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'সাবিত্রী' নাটকের সংলাপের কাছাকাছি চলে আসে।

এরপর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে শশাংকমোহন সেন আর একখানি 'সাবিত্রী' নাটক রচনা করেন। তাঁর এই নাটকে ব্যাধ জাতীয় কিছু নিম্নমানের পুরুষ-চরিত্রের মুখে গদ্যসংলাপ ছাড়া প্রায় আগাগোড়া কোথাও মিত্রাক্ষর, কোথাও বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। এই নাটকের একটি অমিত্রাক্ষর সংলাপের উদাহরণ :—

সত্যবান। প্রিয়তমে, তপস্বিনি, আরো কাছে এসো!
চিনিতে পারিনে তোমা, কি দেখালে তুমি!
তুমি কি দেখালে ইহা? কি শুনিনু আজ!
লক্ষ লক্ষ তারা যেন আমারে ঘেরিয়া
কোটি কন্ঠে জয়কার দিতেছে উল্লাসে!
সমস্ত গগন যেন সূর্যালোকে গলি
প্রকাণ্ড হাসির মত পড়িছে ঝরিয়া!
নূতন বিবাহ একি মোদের আবার?
এতদিন পরে আসি পাইনু তোমারে?

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বাংলা নাটকের আদিযুগ থেকে দীর্ঘকাল ধরে পুরাণ ও মহাকাব্যের বিষয়বস্তু অবলম্বনে অনেক নাটক

রচিত হলেও এই শ্রেণীর নাটকে স্পষ্টতঃই দুটি বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্বে তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' বা 'পদ্মাবতী'র মতে মহাকাব্য এবং পুরাণাশ্রিত নাটকে ধর্মভাবনার চেয়ে জীবন ধর্মপ্রকাশই সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটকে কিংবা তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত অন্যান্যদের নাটকে কাহিনী ও চরিত্রগুলি ভক্তিরসে জারিত হওয়ায় জীবন ধর্মের চেয়ে ধর্মভাবনাই প্রবলতর হয়ে উঠেছে। কালীপ্রসন্নের 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকটি দাঁড়িয়ে আছে এই দুই পর্বের মাঝখানে—নাটকে ব্যবহৃত সংগীতগুলিতে বিশেষভাবে দেখা গেছে ধর্মচেতনা (যদিও কিছু প্রণয় সংগীতও নাটকে আছে), কিন্তু পৌরাণিক কাঠামোর মধ্যে বিধৃত হলেও কাহিনী বিন্যাসে এবং চরিত্রচিত্রণে বিশেষতঃ ঋষিশিষ্যদ্বয়ের মত পার্শ্বচরিত্র সৃষ্টিতে যেখানেই নাট্যকার পৌরাণিক কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে কিছুটা স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পেরেছেন সেখানে তিনি কোন বিশিষ্ট ভক্তিবাদ অপেক্ষা জীবনধর্ম প্রকাশেই অধিকতর আগ্রহ দেখিয়েছেন।

কালীপ্রসন্নের চতুর্থ এবং সর্বশেষ নাটক একটি অনুবাদ নাটক। সংস্কৃত নাট্যকার ভবভূতি রচিত 'মালতীমাধব'-এর কালীপ্রসন্নকৃত এই নাট্যানুবাদ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সপ্তম শতাব্দীর শেষ পাদ বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে ভবভূতি তাঁর এই নাটক রচনা করে নাটকের প্রস্তাবনায় সেই বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন—

উৎপস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমান ধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী ।।

'নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথিবীতে যখন আমার সমরুচিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি জন্মাবে তখন এর সমাদর হবে।'

ভবভূতি রচিত 'মালতীমাধব' অবলম্বনে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মালতীমাধব' নাটকের উৎসর্গপত্রটি এইরূপ ঃ—

This translation is most respectfully dedicated
to all lovers of the Hindoo theatre,
by the Translator.

নাটকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ./.+৯১।

কালীপ্রসন্ন অনূদিত ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকের কাহিনী রামায়ণ, মহাভারত বা কোন পুরাণাদি থেকে নেওয়া নয়, বিশেষভাবে ভবভূতির স্বকপোল কল্পিত ; তবে কাহিনীগত কিছু সাদৃশ্য থেকে মনে করা যায় যে ভবভূতি এই নাটকের কিছু উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তৎকাল প্রচলিত 'বৃহৎকথা' থেকে। 'বৃহৎকথা' পরবর্তীকালে লুপ্ত হলেও তাকে অবলম্বন ক'রে ক্ষেমেন্দ্রের যে 'বৃহৎকথামঞ্জরী' এবং সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' লিখিত হয়েছে, তা থেকেই 'বৃহৎকথার'র উপাখ্যানের সঙ্গে এই নাটকের কিছু কাহিনীগত সাদৃশ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য 'কথা' সাহিত্য থেকে কিছু উপাদান সংগ্রহ করলেও ভবভূতি যে সামগ্রিকভাবে তাঁর নিজস্ব কল্পনাশক্তির দ্বারা 'মালতীমাধব' নাটককে একটি মৌলিক নাটকরূপেই সৃষ্টি করেছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সংস্কৃত নাট্য শাস্ত্রে দশ রূপকের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে 'নাটক' এবং 'প্রকরণ'ই শ্রেষ্ঠ। ভবভূতির 'মালতীমাধব' সেই 'প্রকরণ' শ্রেণীর নাটক। বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণে' এই 'প্রকরণ'শ্রেণীর নাটকের লক্ষণ বলা হয়েছে।—

> ভবেৎ প্রকরণে বৃত্তং লৌকিকং কবিকল্পিতং।
> শৃঙ্গারোঽঙ্গী নায়কস্তু বিপ্রোঽমাত্যোঽথবা বণিক্
> সাপায় ধর্মকামার্থপরো ধীর প্রশান্তকঃ ॥

প্রকরণের 'বৃত্ত' বা কাহিনী হবে লৌকিক ও কবিকল্পিত ; অঙ্গীরস হবে শৃঙ্গার এবং নায়ক হবেন বিপ্র, অমাত্য অথবা বণিক। তিনি হবেন ধীর-প্রশান্ত শ্রেণীর নায়ক এবং ধর্ম, কাম ও অর্থে থাকবে তাঁর আসক্তি।

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী নাটকের কাহিনী-ঐক্য অর্থে এরিস্টটলীয় কাহিনী-ঐক্য বা কাহিনীর এককতা (Singleness of the plot) সর্বদা অত্যাবশ্যক নয়, যেহেতু সংস্কৃত নাটকের ইতিবৃত্ত পরিকল্পনায় কখনো কখনো দুটি কাহিনী থাকতে পারে—একটি 'আধিকারিক' কাহিনী (main plot), অপরটি 'প্রাসঙ্গিক' কাহিনী (Sub plot)[২৬]। এই প্রাসঙ্গিক কাহিনীটি যদি আবার নাটকের শেষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে তবে তা হয় 'পতাকা' আর নাটকের অংশবিশেষেই যদি কোন প্রাসঙ্গিক কাহিনী শেষ হয়, তবে তাকে বলা হয় 'প্রকরী'।

অবশ্য সংস্কৃত নাটকে এই প্রাসঙ্গিক কাহিনীর স্থান থাকলেও এবং তা এরিস্টটলীয় সরল ঘটনা-ঐক্যকে উপেক্ষা করলেও মূলতঃ এই পার্শ্বকাহিনী-পুষ্ট কাহিনী ঘটনা-ঐক্যবিধির পরিপন্থী নয়—কারণ সেই পার্শ্বকাহিনীই নাটকে প্রযুক্ত হতে পারে যা মূল কাহিনীর রসনিষ্পত্তিতে বিরোধী না হয়ে সহায়ক হয়ে ওঠে। এইভাবে পরস্পর সাপেক্ষ মূলকাহিনী ও উপ-কাহিনীর দৃঢ় সংহতিতে একটি জটিল ঘটনা-ঐক্য গড়ে ওঠে। 'মালতীমাধব' নাটকেও মূল কাহিনীর সঙ্গে একটি প্রাসঙ্গিক কাহিনী সমান্তরালভাবে যুক্ত হয়ে তার প্লট বা কাহিনীতে একটি জটিল-ঐক্য গড়ে তুলেছে—'সুকুটিলমিতিবৃত্তং মালতীমাধবস্য'।

কালীপ্রসন্ন ভবভূতির 'মালতী মাধবে'র সর্বত্র অবিকল অনুবাদ না করে স্থানে স্থানে কিছু গ্রহণ-বর্জন করলেও নাটকের কাহিনীভাগে বিশেষ কোন পরিবর্তন করেননি। নাটকের কাহিনীটি এইরূপ :—

বিদর্ভরাজ্যের মন্ত্রী দেবরাতের পুত্র মাধব আর পদ্মাবতী নগরের প্রধান অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা মালতী পরস্পর প্রণয়াসক্ত হন। মাধবের পিতা দেবরাত এবং মালতীর পিতা ভূরিবসুও বাল্যকালে গুরুগৃহে অধ্যয়নের সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ভবিষ্যতে তাঁদের পুত্র কন্যা হলে তাদের বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করবেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী কামন্দকী উভয় বন্ধুর সেই পূর্ব প্রতিজ্ঞানুযায়ী মালতী ও মাধবের মিলন সাধনে সহায়তা করেন। একদিন মদনোদ্যানে মদনোৎসব উপলক্ষে সখীদল পরিবেষ্টিতা মালতী এবং মাধব পরস্পর পরস্পরকে দেখে অভিভূত হয়ে বকুলমালা ও চিত্রপট বিনিময়ের দ্বারা নিজেদের প্রণয়মুগ্ধ হৃদয়ের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। কিন্তু রাজার নর্মসখা নন্দন মন্ত্রীকন্যা মালতীর পানিপ্রার্থী হওয়ায় এবং রাজার তাতে বিশেষ সম্মতি থাকায় মালতী-মাধবের এই আকাঙ্ক্ষিত মিলনে দেখা দিল প্রচণ্ড বাধা। এদিকে মালতী-মাধবের এই প্রণয়-কাহিনীর পাশাপাশি গড়ে উঠেছে আর একটি প্রণয়কাহিনী—মাধবের বন্ধু মকরন্দের সঙ্গে নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকার ভালোবাসা। একদিন একটি বাঘ খাঁচা থেকে বেরিয়ে মদয়ন্তিকাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে মকরন্দ তাকে বাঘের কবল থেকে রক্ষা করে এবং তার ফলে আহত ও অচেতনপ্রায় মকরন্দকে শুশ্রূষা করার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয় প্রেম।

রাজার ইচ্ছা অনুসারে নন্দনের সঙ্গে মালতীর বিবাহ স্থির হয়ে গেলে এবং সেকথা প্রকাশ্যে ঘোষিত হলে হতাশা-পীড়িত মাধব এক অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রে যখন মহাশ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন এক নারীকণ্ঠের

আর্তধ্বনি শুনে কিছুটা অগ্রবর্তী হয়ে দেখে তারই বাঞ্ছিতা মালতীকে বলি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে কাপালিক অঘোর ঘন্ট। কাপালিককে হত্যা ক'রে মাধব উদ্ধার করে মালতীকে। কিন্তু অঘোর ঘন্টের শিষ্যা কপালকুণ্ডলা মাধবের উপর প্রতিশোধের স্পৃহা নিয়ে স্থান ত্যাগ করে। মালতীর সন্ধানে আগত ভূরিবসুর প্রেরিত শান্তিরক্ষক সৈনিকদের হাতে মাধব মালতীকে অর্পণ করে।

অল্পদিনের মধ্যেই নন্দনের সঙ্গে মালতীর বিবাহের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। নির্দিষ্ট দিনে বিবাহসাজে সজ্জিতা মালতী নগরদেবতার মন্দিরে প্রণাম করতে এলে কামন্দকীর সাহায্যে মাধবের সঙ্গে মালতী মন্দিরের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নগরপ্রান্তের বৌদ্ধমঠ সংলগ্ন উদ্যানে পূর্বপ্রস্তুতি অনুযায়ী উভয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এদিকে মন্দিরের মধ্যে মালতীর পরিত্যক্ত বিবাহসজ্জায় মকরন্দকে সজ্জিত করে কামন্দকীর ব্যবস্থাপনায় সেই মালতীবেশী মকরন্দকে বিবাহ-অনুষ্ঠানে অর্পণ করা হল নন্দনের হাতে। ফুলশয্যার রাতে মালতী-বেশী মকরন্দকে আলিঙ্গন করতে এলে মকরন্দের পদাঘাত খেয়ে নববধূকে কুলটা মনে করে বাসর ঘর ছেড়ে চলে গেল নন্দন। বরবধূর মধ্যে সন্ধি স্থাপনের শুভেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে যখন মদয়ন্তিকা বাসরঘরে ঢুকল তখন মকরন্দ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল মদয়ন্তিকাকে আর কামন্দকী-শিষ্যা বুদ্ধরক্ষিতার পরামর্শ অনুসারে মকরন্দ তার ছদ্ম নারীবেশ ত্যাগ করে মদয়ন্তিকাকে নিয়ে চলল সেই বৌদ্ধবিহারের কাছে। রাজার কাছে এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি মকরন্দকে বন্দী করার জন্য যে সৈন্যদল পাঠালেন, তাদের সঙ্গে একা মকরন্দ যুদ্ধ করতে লাগল আর বিশ্বস্ত ভৃত্য কলহংস আর সখী লবঙ্গিকার সঙ্গে মদয়ন্তিকাকে গুপ্তপথে পাঠাল সেই বৌদ্ধমঠের উদ্দেশ্যে। মাধব একথা শুনতে পেয়ে বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেল কিন্তু সেই অবসরে অঘোর ঘন্ট-শিষ্যা কপালকুণ্ডলা মালতীকে একাকী পেয়ে অপহরণ করে নিয়ে গেল শ্রীপর্বতে বলি দেওয়ার জন্য। ওদিকে অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে দুই বন্ধু যখন সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করল, তখন রাজা তাদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাদের পূর্ব অপরাধ ক্ষমা করলেন। কিন্তু তারা ফিরে এসে যখন কোথাও মালতীর কোন সন্ধান পেল না, তখন উর্বশীর জন্য পুরূরবার মতো মাধব মালতীর জন্য বিলাপ ও হাহাকার করতে থাকে। বন্ধু মকরন্দ পাশে থেকেও কোন সান্ত্বনা দিতে পারে না। মালতীর বিরহে মাধব যখন হতচেতন এবং বন্ধুর সেই অবস্থা দেখে মকরন্দও যখন জীবনে বীতস্পৃহ তখন কামন্দকী-শিষ্যা কাদম্বিনী (মূল সংস্কৃত নাটকে সৌদামিনী) কপালকুণ্ডলার হাত থেকে

মালতীকে রক্ষা করে মালতীর সঙ্গে মাধবের মিলন সম্পাদন করেন। কামন্দকীর চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হল এবং মালতী ও মাধব এবং মকরন্দ ও মদয়ন্তিকা পুনর্মিলিত হল।

ভবভূতির মূল সংস্কৃত 'মালতীমাধব' 'প্রকরণ' শ্রেণীর নাটকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দশটি অঙ্কে বিভক্ত, কিন্তু কালীপ্রসন্ন মূল সংস্কৃত নাটকের অঙ্ক-বিভাগ যথাযথ অনুসরণ না ক'রে তাঁর 'মালতীমাধব'কে চারটি 'কাণ্ড' এবং বারটি 'অঙ্কে' বিভক্ত করেছেন। কালীপ্রসন্নের এই 'কাণ্ড' এবং 'অঙ্ক' বিভাগ অনেকটা ইংরেজী নাটকের Act ও Scene বিভাগের মত। সংস্কৃত নাটকে দৃশ্যবিভাগের স্থান নেই, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত রঙ্গমঞ্চ এবং আধুনিক শিক্ষিত দর্শকের রুচি ও রসবোধের প্রয়োজনে ইংরেজী ও সংস্কৃত কমেডির দ্বিমুখী অভিঘাতে কালীপ্রসন্নের নাট্যরীতি কিছুটা মিশ্রিত আঙ্গিকযুক্ত হয়ে উঠেছিল। ইংরেজী নাটকে দৃশ্য অঙ্কের ক্ষুদ্রতর বিভাগ মাত্র এবং নাট্যকাহিনী ও চরিত্রের স্থানিক ও দৈশিক অবস্থান নির্দেশের জন্যই সাধারণতঃ এই দৃশ্য-বিভাগ ঘটানো হয়। কালীপ্রসন্নও তাঁর নাটকে বিভিন্ন কাণ্ডের বিভিন্ন অঙ্কে (= দৃশ্যে) 'মদনোদ্যান', 'রাজপুরীর অভ্যন্তরস্থ সংগীতশালা', 'রাজপুরীর নিকট চতুষ্পাঠী', 'কামন্দকীর পর্ণশালা', 'দেবতামন্দিরের নিকট শ্মশানভূমি,' 'রাজমার্গ', 'নন্দনের প্রাসাদগৃহ' ইত্যাদি স্থানিক অবস্থান নির্দেশ করেছেন। তাছাড়া তাঁর 'মালতীমাধব' নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মাঝে মাঝে বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশিকার ব্যবহার—যেমন, দ্বিতীয় কাণ্ডের পঞ্চম অঙ্কে "এস্থলে চতুষ্পাঠীর চিত্রপট পরিবর্তিত হইয়া উদ্যানের চিত্রিতপট নিবেশিত হইবেক," কিংবা তৃতীয় কাণ্ডের, সপ্তম অঙ্কে "এস্থলে শ্মশানভূমির চিত্রিত পঠ উত্তোলিত হইলে করালাদেবীর মন্দিরাভ্যন্তরের চিত্রিত পট প্রদর্শিত হইবেক, তথায় করালাদেবীর সম্মুখে বধ্যবেশধারিণী মালতী, অঘোরঘন্ট ও কপালকুণ্ডলার অবস্থান। সংস্কৃত গ্রন্থে এস্থানে পটপ্রক্ষেপ লিখিত আছে, কিন্তু অভিনয়ের লালিত্য ভঙ্গ ভয়ে এস্থলে রহিত করা গেল।"

অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগে এবং মঞ্চনির্দেশে এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের সমন্বয় করলেও সন্ধি বিভাগের ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন মূল সংস্কৃত নাটকেরই অনুসরণ করেছেন। 'আরম্ভ', 'প্রযত্ন', 'প্রাপ্ত্যাশা', 'নিয়তাপ্তি' ও ফলাগম' এই পাঁচটি অবস্থাভেদে 'মুখসন্ধি' 'প্রতিমুখসন্ধি', গর্ভসন্ধি, 'বিমর্ষসন্ধি' ও 'নির্বহণ সন্ধি' এই পঞ্চম সন্ধি পরিকল্পনা কালীপ্রসন্ন তাঁর 'মালতীমাধব' নাটকে বজায় রেখেছেন।

এই নাটকে অন্ততঃ চারটি ক্ষেত্রে— (ক) মাধব এবং মালতীর প্রণয় যখন গভীর হয়ে উঠেছে তখন রাজার নর্মসখা নন্দনের সঙ্গে মালতীর বিবাহ স্থির হওয়ায় (খ) মহাশ্মশানে কাপালিক অঘোর ঘণ্টের দ্বারা মালতীকে বলি দেওয়ার উদ্যোগে (গ) বাসরঘর থেকে মদয়ন্তিকাকে নিয়ে পালিয়ে আসার সময় নিঃসঙ্গ মকরন্দের সঙ্গে সৈন্যদলের যুদ্ধে এবং (ঘ) অঘোর ঘন্ট-শিষ্যা কপালকুণ্ডলার দ্বারা মালতী-অপহরণে- নাট্যোৎকণ্ঠা বা dramatic suspense সৃষ্টি করা হয়েছে। সাধারণভাবে অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের তুলনায় এই নাটকে ঘাত প্রতিঘাতও আপেক্ষিকভাবে বেশী! শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকে'র মত দু'এক-খানি নাটক ব্যতিক্রম হিসাবে ধরে নিলে অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকেই নাটকীয়ত্ব অপেক্ষা কাব্যত্ব বেশি; সে হিসাবে 'মালতীমাধবে' উপমার মাধুর্য, বর্ণনার সৌন্দর্য এবং কোথাও কোথাও অতিবিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে কাব্যগুণ সৃষ্টির চেষ্টা থাকলেও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা নাটকীয়ত্ব সৃষ্টি ক'রে কাব্যত্ব ও নাটকীয়ত্বের অনুপাত রক্ষা করার দিকেও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া এই নাটকের চরিত্রচিত্রণেও কিছু বিশেষত্ব আছে। নাটকের মুখ্য কাহিনী ও প্রাসঙ্গিক কাহিনীর নায়কদ্বয় মাধব ও মকরন্দের সঙ্গে মালতী ও মদয়ন্তিকার প্রেম কুমার-কুমারীর প্রথম পবিত্র প্রেম এবং তারা নিজ নিজ প্রণয়িনীকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোন রমণী-সঙ্গ করেনি। এদিক থেকে মাধব ও মকরন্দ চতুর প্রণয় ব্যবসায়ী দুষ্মন্ত বা পুরূরবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এজন্য 'মালতীমাধবে' সংস্কৃত নাটকে সাধারণভাবে প্রচলিত প্রণয় কৌশল অবলম্বন করার কোন প্রয়োজন হয়নি এবং এই জন্যই মাধব ও মকরন্দের প্রণয়-ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য কোন বিদূষকেরও দেখা পাওয়া যায় না। তবে এই নাটকের চরিত্রচিত্রণের একটা ত্রুটি এই যে, মুখ্য কাহিনীর নায়ক-নায়িকা প্রাসঙ্গিক কাহিনীর নায়ক-নায়িকার দ্বারা যেন অনেকটা পরিমাণে রাহুগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এই নাটকের মুখ্য নায়ক-নায়িকা ও প্রাসঙ্গিক নায়ক-নায়িকা ছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কামন্দকী- কারণ নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁরই হাতে নাটকের বৈচিত্র্যপূর্ণ গতি ও পরিণতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

কালীপ্রসন্ন তাঁর নাটকে নায়ক মাধবের চরিত্রে কিছু উল্লেখ্য পরিবর্তন সাধন করেছেন। মূল নাটকে মদয়ন্তিকা বাঘের কবলে পড়েছে এই কথা শুনে মাধব

তাকে রক্ষার জন্য যাওয়ার উদ্যোগ করতে মকরন্দ বাঘ মেরে কামন্দকী ও মাধবের মাঝখানে মূর্ছিত প্রায় অবস্থায় এসে উপস্থিত হলেন, আর আহত মকরন্দকে দেখে মাধবও মূর্ছিত-প্রায় হয়ে পড়লেন : তখন মদয়ন্তিকা-ধৃত মূর্ছিত মকরন্দ এবং মালতী-ধৃত মূর্ছিত মাধবকে কামন্দকী তাঁর কমণ্ডলুর জলে সিক্ত ক'রে চৈতন্য সম্পাদন করলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন তাঁর নাটকে মাধব ও মকরন্দ উভয়কেই এই ব্যাঘ্রবধের গৌরবের সমভাগী করেছেন [কা প্র. সি. 'মালতীমাধব', ২য় কাণ্ড, ৬ষ্ঠ অঙ্ক]। তাছাড়া মূল সংস্কৃত নাটকের পঞ্চম অঙ্কে মাধব মালতীকে লাভ করার সংকল্প সিদ্ধির জন্য মহাশ্মশানে মনুষ্যমাংস বিক্রয়ের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন মাধবকে হতাশ প্রেমিকরূপে (নিজের জীবন বিসর্জন দেবার উদ্দেশ্যে) মহাশ্মশানে উপস্থিত করেছেন [কা. প্র. সি. 'মালতীমাধব' ৩য় কাণ্ড, ৭ম অঙ্ক]। এছাড়া মূল সংস্কৃত নাটকের কামন্দকী-শিষ্যা সৌদামিনী কালীপ্রসন্নের নাটকে কাদম্বিনীতে পরিণত হয়েছেন।

কালীপ্রসন্নের এই নাটকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর ভাষা বা সংলাপ। নাট্যকার এই নাটকের ভাষা সম্বন্ধে নাটকের বিজ্ঞাপনে লিখেছেন—"মদ্রচিত, মৎপ্রণীত ও মদনুবাদিত অন্য নাটক হইতে মালতী-মাধবের ভাষারও প্রভেদ হইয়াছে।" এপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, "বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের অবিকল লালিত্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা নিরর্থক—কারণ অবিকল অনুবাদিত গ্রন্থ সহজেই পাঠ করিতে ঘৃণা বোধ হয়, বিশেষতঃ প্রত্যেক পদের বাঙ্গালা অর্থ ও শব্দানুকরণে যথার্থভাব সংরক্ষণ করা কাহারও সাধ্য নহে।" কালীপ্রসন্ন তাঁর পূর্ববর্তী 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের সর্বত্র এবং 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের অধিকাংশ সংলাপে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে সাধুরীতি ব্যবহার করলেও এই নাটকের সংলাপ রচনায় আগাগোড়া চলিত রীতি ব্যবহার করেছেন। 'বিক্রমোর্বশী' থেকে 'মালতীমাধব' পর্যন্ত কালীপ্রসন্ন সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন, পরবর্তীকালের প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র পর্যন্ত যেখানে ভদ্র চরিত্রের সংলাপে লেখ্য ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করে নাটকীয় সংলাপ রচনার ঔচিত্য রক্ষার ব্যাপারে মারাত্মক দুর্বলতা দেখিয়েছেন সেখানে কালীপ্রসন্নের এই নাটকে ভদ্রাভদ্র সমস্ত চরিত্রে এই চলিত রীতির প্রয়োগ সত্যই বিস্ময় উদ্রেক করে। নাটকের সংলাপ রচনায় এই মাত্রাচেতনা বাংলা নাটকের ঐ পর্বে আরও উজ্জ্বলভাবে

একমাত্র মধুসূদনের নাটকেই দেখা গিয়েছিল এবং তাও কালীপ্রসন্নের এই শেষ নাটক রচনার বছরে এবং হয়তো বা ঐ নাটকের কিছু পরে—কারণ কালীপ্রসন্নের শেষ নাটক 'মালতীমাধব' প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে (মাসের উল্লেখ নেই), এবং মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের একেবারে শেষ দিকে (১৫ পৌষ, ১২৬৫ সালে)। তবে কালীপ্রসন্নের এই নাটকে মাঝে মাঝে অনবধানতা বা মুদ্রণপ্রমাদ যে কারণেই হোক্, চলিত রীতির ক্রিয়াপদ ব্যবহারের মধ্যে হঠাৎ এক একটি লেখ্য ক্রিয়ারূপ থেকে গেছে যেমন—

মাধব। (স্বগত) একি! কি নিমিত্ত আমার মনের এতাদৃশী গতি হলো, কোন ক্রমেই যে স্ববশে আস্তে পাচ্চি না, ক্রমে লজ্জা যাচ্চে, মান যাচ্চে, ধৈর্য্য যাচ্চে, বুদ্ধির ভ্রম হচ্চে. একি আমার ষড় রিপু একত্রিত হয়ে চন্দ্রবদনীর পক্ষে পক্ষপাত কত্তে লাগিল। (১ম কান্ড, ৩য় অংক)

এখানে এতগুলি চলিত ক্রিয়াপদের মধ্যে একটিমাত্র সাধু ক্রিয়াপদ 'লাগিল' মনে হয় পুরাতন অভ্যাসের শেষচিহ্নরূপে থেকে গেছে। অবশ্য সমগ্র নাটকে এধরণের ব্যতিক্রমের উদাহরণ খুব অল্পই আছে। নাটকে ব্যবহৃত সংলাপের কথ্য ক্রিয়াপদ এবং বিশেষভাবে তার বানানভঙ্গির দিকে লক্ষ্য করলে একথা সহজেই মনে হবে যে, এখান থেকেই 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র ভাষার প্রস্তুতি চলেছে। তবে নাটকটির সর্বত্র চলিত রীতি ব্যবহৃত হলেও নাটকের চরিত্রানুযায়ী ভাষাগত তারতম্য রক্ষার যে চেষ্টা করা হয়েছে, কয়েকটি উদাহরণ দিলে তা স্পষ্ট হবে।

মালতী। কেন সখি আমি কিসে অপরাধী হলেম।

লবঙ্গিকা। সখি তোমার নিরুপম সৌন্দর্য্য ও অপাঙ্গ ভঙ্গিতে তিনি এমন মোহিত হয়েছিলেন যে মালার শেষ ভাগটী ভাল করে গাঁত্তেও পাল্লেন্ না।

কিংবা,

লবঙ্গিকা। (সসম্ভ্রমে) রাজার অনুরোধে মন্ত্রী মহাশয় নাকি কুৎসিত বরে মালতীকে সমর্পণ করেছেন? তাতে দেশসুদ্ধ লোক তাঁকে নিন্দা কর্চ্চে।

মালতী। (সরোদনে) পিতা আমাকে রাজার উপহার রূপে কল্পনা করেছেন।

কামন্দকী। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) মন্ত্রী কেমন কোরে এমন নিগুর্ণ বরে মালতীকে প্রদান কর্বেন? অথবা বৈষয়িক ব্যক্তিদিগের সন্তানে মমতা কি।

মালতী। রাজার আরাধনা করাই পিতার উদ্দেশ্য। [২য় কান্ড, ৪র্থ অঙ্ক]

আবার,

বুদ্ধরক্ষিতা। (সহাস্যে) ওমা! কোথা যাবো কি লজ্জার কথা—আ মলো, তাই নয় একটু স্যায়না হ, ওমা! তাও না, পোড়ার মুখো বুড়ো যেন মুখুয়ে ছিল। মকরন্দ মালতীর বেশে তার ঘরে গিয়েছিল মিন্সে তা কিছুই জান্তে পাল্লে না গা, মিন্সে কি কানা, গোঁপ জোড়াও কি দেখতে পেলে না—(উচ্চ হাস্যে) খুব্ করেছে, লবঙ্গিকা বোল্‌ছিলো যে ফুলশয্যার রাত্তিরে বুড়ো যেমন আলিঙ্গন কত্তে যাবে অম্‌নি মকরন্দ নাকি গোব্যাড়ান পিটেচে, তা যা হোক্‌ এই বেলা মকরন্দের সঙ্গে মদয়ন্তিকার বে দিতে হবে, তা যাই, দেখিগে, কোথাকার জল কোথায় যায়। [৩য় কান্ড, ৯ম অঙ্ক]

মাধব, মালতী, কামন্দকী ইত্যাদি চরিত্রের সংলাপ যেমন অত্যন্ত মার্জিত, তেমনি অন্যদিকে বুদ্ধরক্ষিতার সংলাপে একটা সহজ মেয়েলি রসিকতার আমেজ। তাছাড়া এই নাটকের সংলাপে শুধু যে সংস্কৃত নাটকের সন্ধি-সমাস-অলংকার বাহুল্য এবং তজ্জনিত কৃত্রিমতা নেই তা নয়, চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী পরিহাস-রসিকতা ফুটিয়ে তোলার জন্য নাট্যকার কখনো কখনো 'আ মলো' 'স্যায়না' 'পোড়ার মুখো' 'মিন্সে' 'গোব্যাড়ান' ইত্যাদি বাংলার নিজস্ব বাগ্‌ভঙ্গি ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ প্রয়োগ করেছেন। এইভাবে জাতির নিজস্ব বাগ্‌ধারা এবং আঞ্চলিক শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে নাট্যকার কালীপ্রসন্ন জাতীয় রসধারার সঙ্গে জাতীয় নাট্যসাহিত্যের একটি প্রাণের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নাটকের সর্বত্র সংলাপ এমন হ্রস্ব ও তীক্ষ্ণ হয়নি। মূলের অনুসরণে সংলাপ যেখানে অত্যন্ত দীর্ঘ হয়েছে সেখানে সংলাপে যেন নাটকীয় গতি ব্যাহত হয়ে সংস্কৃত নাটকের কাব্যিক বিস্তার প্রাধান্য লাভ করেছে। যেমন—মাধব। না প্রিয়তম! আমি এক্ষণে কোনক্রমেই উদ্যান পরিত্যাগ কত্তে পার্‌বনা, চন্দ্রবদনীর রূপ-লাবণ্য দর্শনে আমি জ্ঞান শূন্য চিত্ত হয়েছি, কি প্রকারে তা বলো গমন করি, কোনক্রমেই যে মন প্রবোধ মান্‌বে না, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ ভাবিনীর ভাবদর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হলো, তাঁহার অন্তরে কামদেবের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু আমি কিছুমাত্র শঙ্কেত (সংকেত?)

করি নাই, কেবল চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় চেয়েছিলাম, মধ্যে মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়ে হৃৎকম্প হয়েছিল. আমি এই অবস্থায় অবস্থান কচ্চি, এমত সময়ে কতকগুলি অস্ত্রধারি দ্বারপাল এবং এক বৃদ্ধা কামিনীগণকে হস্তির উপর বসাইয়া নগরাভিমুখে গমন করিল, আহা প্রিয়তম! চন্দবদনী গমনকালে পুনঃ পুনঃ মদনোদ্যানের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ কত্তে লাগলেন, দূর হতে বোধ হলো, যেন প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুল সমীরণে সঞ্চালিত হচ্চে, সখে! মৃগনয়নার অদর্শনে আমি যে যন্ত্রণা সহ্য করেছি তা বর্ণনা করা যায় না, কারণ সংসারে তাহার দৃষ্টান্ত স্থল বিরল, কখন বা কামাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে অন্তর্দাহ কত্তে লাগলো, কখন বা ভয়ানক শীতের আবির্ভাবে হৃৎকম্প হতে লাগলো, মধ্যে মধ্যে অচৈতন্য হয়েছিলাম, যখন চৈতন্য প্রাপ্ত হই তখন কি প্রকারে চিত্ত সুস্থির কর্বো কিছুই স্থির কত্তে পারি নাই।
[১ম কাণ্ড, ৩য় অঙ্ক]

এখানে অবশ্য বলা প্রয়োজন যে, এই সংলাপ দীর্ঘ হলেও মূল সংস্কৃত নাটকের সংলাপ দীর্ঘতর এবং আরও বেশি বর্ণনাবহুল। যাই হোক্ কালীপ্রসন্ন মূল নাটকের অবিকল অনুবাদ না করলেও এবং কোন কোন চরিত্রের দীর্ঘ সংলাপ কিছুটা সংক্ষেপিত এবং কোন কোন অঙ্কের কিছু অপ্রয়োজনীয় বর্ণনাবহুল সংলাপ একেবারে পরিত্যাগ করলেও মূল নাটকের অনুসরণ করতে গিয়ে যেখানে দীর্ঘ-বিবৃতিধর্মী সংলাপ বজায় রেখেছেন, সেখানে তা নাটকীয়ত্ব থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়ে পড়েছে, কারণ সংলাপ যদি নাট্যক্রিয়ার অঙ্গীভূত না হয়ে শুধু বর্ণনামূলক হয়ে পড়ে, তবে তা কাব্যধর্মী হলেও তার নাট্যরস কিছুটা ক্ষুন্ন হতে বাধ্য।

তবে কালীপ্রসন্নের হাতে 'মালতীমাধবে'র প্রথম নাট্যানুবাদের আট বছর পরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রচিত রামনারায়ণের 'মালতীমাধবে'র সংলাপের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে, ঐ নাটকে ও আক্ষরিক অনুবাদ না ক'রে অনুবাদে কিছু স্বাধীনতা গৃহীত হলেও বহুক্ষেত্রেই মূলের অনুসরণে দীর্ঘ বর্ণনামুখী সংলাপ রাখা হয়েছে এবং সংলাপের ভাষাও কালীপ্রসন্নের প্রথম প্রচেষ্টার চেয়ে বিশেষ উন্নত হতে পারে নি। তুলনার জন্য উভয় নাটকের শ্মশানদৃশ্য থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হল ঃ—

[কালীপ্রসন্ন ঃ মালতীমাধব ঃ ৩য় কাণ্ড, ৭ম অঙ্ক]

মাধব। কি ভয়ানক রাত্রি, উঃ কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না, শ্মশান স্থান কি ভয়ঙ্কর, চারিদিকে শিবাগণের শব্দে, পেচককুলের অমঙ্গল দূষিত

ধ্বনিতে, অদূরে জ্বলন্ত চিতার মধ্যস্থ দগ্ধকাষ্ঠ ফলকের শব্দে প্রলয় বৈষয়িক ব্যক্তিরও বৈরাগ্যোদয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এক্ষণে মন। কেন আর অন্য বিষয় দর্শনে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের বিরত হও?… ..[ইত্যাদি তিন পৃষ্ঠাব্যাপী স্বগতোক্তি]

[রামনারায়ণ তর্করত্ন : মালতী মাধব : তৃতীয়াংক]

মাধব।… … উঃ! কি ভয়ংকর স্থান! নিরন্তর মাংসভক্ষণে সাতিশয় নৃশংস-স্বভাব হৃষ্টপুষ্ট এক একটা শৃগাল আর কুক্কুর আহার অন্বেষণে ইতস্ততঃ গমনাগমন কচ্চো। উ:! কি ভীষণাকার গাঢ় অন্ধকার, তাড়িতের তীক্ষ্ন প্রভাবও বোধ হয় এঘোর তমোভেদ কত্তে পারে না।……[ইত্যাদি পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী স্বগতোক্তি]

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের 'মালতীমাধবে'র পর রামনারায়ণের 'মালতীমাধব' (১৮৬০) ছাড়াও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মালতীমাধব' এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মালতীমাধব' প্রকাশিত হয়। নগেন্দনাথের রচনা তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও জ্যোতিরিন্দ্র নাথের নাটকে গদ্যসংলাপ অনেক সাবলীল হয়েছে, কিন্তু সমস্ত নাটকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পদ্যসংলাপের প্রাচুর্য নাটকের গতিকে কিছুটা আড়ষ্ট করে ফেলেছে। উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট হবে :

[জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : মালতীমাধব : প্রথমাংক]

অবলোকিতা। আপনার দেখছি বিষম চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত। কি আশ্চর্য! একজন চীরধারী, ভিক্ষান্নজীবী তাপসীর হস্তে কিনা অমাত্য ভূরিবসু এইরূপ কাজের ভার অর্পণ করলেন! আর আপনি ভগবতি এখন সংসারের সমস্ত নিকৃষ্ট বন্ধন হতে মুক্ত, আপনিই বা কি করে এই ভার গ্রহণ করলেন?

কামন্দকী। আমায় তিনি যে এই দিয়াছেন ভার
স্নেহের সে ফল, উহা প্রণয়ের সার।
তপস্যা করিয়া কিম্বা প্রাণ বিসর্জন
করিতে যদি গো হয় এ কার্য্য সাধন
তবুও করিব আমি সখার এ কাজ
হইলে বিফল তাহে পাব বড় লাজ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মালতীমাধবে' এই পয়ার বাহুল্য দেখে 'বিবিধার্থসংগ্রহ' পত্রিকায় সাধারণভাবে নাটকের ভাষা প্রসঙ্গে রাজেন্দলাল মিত্রের একটি মন্তব্য আমাদের মনে পড়ে যায়, "যে অবস্থায় যে ব্যক্তি যে ভাষা কহিতে পারে, নাটকে তাহাই প্রয়োগ করা কর্তব্য ; তদন্যথায় রঙ্গভূমিতে পয়ারে রোদন, ত্রিপদীতে রাগ বা চৌপদীতে বীরত্ব ব্যক্ত করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।"

তুলনামূলক বিচারে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'মালতীমাধব' নাটকের সংলাপ রচনায় যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন তা বাংলা নাটকের সেই গঠমানতার যুগে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাছাড়া জ্যোতিরিন্দ্র নাথ যেখানে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রচুর পদ্যসংলাপ ব্যবহার করেছেন, কালীপ্রসন্ন সেখানে শুধু যে চরিত্রানুযায়ী ভাষাগত তারতম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন তাই নয়, নাটকের সংলাপকে স্বাভাবিক করার জন্য সমস্ত নাটকটিতেই চলিত রীতির গদ্যসংলাপ প্রয়োগ করেছেন। তাছাড়া মূল নাটকে যে সব জায়গায় ছন্দোবন্ধ শ্লোক আছে, কালীপ্রসন্ন সে ক্ষেত্রেও পদ্যানুবাদ না করে সমস্ত নাটকে বারটি মাত্র স্বরচিত গান ব্যবহার করেছেন। রামনারায়ণের 'মালতীমাধবে'ও কতকগুলি গান আছে, কিন্তু সেগুলি বনোয়ারীলাল রায় নামক কোন ব্যক্তির রচনা, কালীপ্রসন্নের নাটকের মত নাট্যকারের স্বরচিত নয়। কালীপ্রসন্নের 'মালতীমাধবের'র একটি সংগীতের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

রাগিনী—বাঁরোয়া, তাল—ঠুংরি
তাহে মজো না রে মন।
যাতে পরে হবে জ্বালাতন ॥
দুর্লভ বস্তুর তরে মন কি যতন করে
পরে অনুরাগ করে, হবে পর কি আপন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জানুয়ারি পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'মালতীমাধব' অভিনয়ের পর ৫ই ফাল্গুন ১২৭৫ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় ঐ নাটকের যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাতে লেখা হয়' "বন্ধুকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিলে মাধব 'কৈ, কৈ কে কোথায় আছে?' বলিয়া একটি স্ত্রীলোককে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিলেন, নিজে নায়িকার অনুরোধে গমন না করিয়া একটি স্ত্রীলোককে 'কি হইতেছে' দেখিতে বলিলেন—

এটা নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। কোন গ্রন্থকার কখনও নায়ককে এরূপ কাপুরুষ করিয়া বর্ণনা করেন নাই।" আমরা পূর্বেই দেখেছি, মূল সংস্কৃত নাটকেও মাধব বন্ধুকে রক্ষা করতে যাওয়ার উদ্যোগ মাত্র করেছেন এবং বন্ধুকে মূর্ছিত অবস্থায় আসতে দেখে নিজেও মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন তাঁর নাটকে মূল নাটকের আক্ষরিক অনুসরণ না করে মাধব এবং মকরন্দ উভয়কেই নেপথ্যে ব্যাঘ্রবধের জন্য পাঠিয়েছেন এবং উভয়কেই এই ব্যাঘ্রবধের গৌরবেব সমভাগী করেছেন। তাছাড়া ভবভূতির মূল 'মালতীমাধব' নাটকে হাস্যরসের একান্ত অভাব থাকলেও কালীপ্রসন্ন তাঁর 'মালতীমাধবে' কোন কোন ক্ষেত্রে স্বকপোলকল্পিতভাবে কিছু হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। যেমন তৃতীয় কাণ্ড, অষ্টম অঙ্কে—মকরন্দ। (সহাস্যে) দেখ দেখি ভাই আমি কেমন মালতী সেজেছি। মাধব। (সহাস্যে) বা, ঠিক মালতী. নন্দনের কপাল ভাল, তাইতেই গুঁপো মালতী পেলে।

তবে মূল নাটকে হাস্যরস প্রায় একেবারেই না থাকায় কালীপ্রসন্নের অনুবাদ নাটকে এধরনের চেষ্টা খুব সামান্য ক্ষেত্রেই আছে। আবার মূল নাটকে নাট্যকার ভবভূতি শৃঙ্গার, করুণ বা বীভৎস রস পরিস্ফুটনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখালেও যেখানে তা 'বক্তব্য বিষয়ের প্রত্যক্ষতা' (directness of expression) কে অতিক্রম করে অতিবিস্তার লাভ করেছে, সেখানে তা কিছুটা কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। তথাপি সংস্কৃত নাটকের ধ্বনি সৌন্দর্যের জন্য সেই কৃত্রিমতা কিছুটা ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু বাংলা অনুবাদ নাটকের ক্ষেত্রে সেই অতিরসতা কিছুটা আড়ষ্ট এবং কৃত্রিম হয়ে উঠেছে। এপ্রসঙ্গে আর একটি কথা আলোচ্য। অধিকাংশ সংস্কৃত নাটক যতই রসসমৃদ্ধ হোক্‌না কেন, সংস্কৃত নাট্যকারগণ তাঁদের নাটকে mass tradition-কে অবজ্ঞা করে কেবল class tradition কেই বিশেষভাবে অবলম্বন করায় সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষ ছাড়া দেশের সর্বসাধারণের হৃদয়ের সঙ্গে ঐসব নাটকের কোন সচল সংযোগ স্থাপিত হয় নি। বাংলা নাটকের উদ্ভব পর্বে কালীপ্রসন্ন তাঁর 'বিক্রমোর্বশী' এবং 'মালতীমাধব' এই দুখানি অনুবাদ নাটকে সংস্কৃত নাটকের এই Class tradition-এর অনুসরণ করলেও তাঁর 'সাবিত্রীসত্যবান' নাটকে কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটকের মত আড়ম্বর বাহুল্য সত্ত্বেও বিষয়বস্তু নির্বাচনে মূলতঃ mass tradition-এরই আনুগত্য স্বীকার করেছেন। আরও পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রের হাতে এই mass tradition সুপ্রতিষ্ঠিত

হওয়ায় তাঁর নাটকগুলি অত্যুচ্চ নাটকীয় মূল্য-সমৃদ্ধ না হয়েও তিনি হয়েছেন জাতীয় নাট্যকার এবং তাঁর নাট্যসাহিত্য হয়েছে জাতীয় নাট্যসাহিত্য।

কালীপ্রসন্নের নাট্যকর্মের সামগ্রিক আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করব, নাটকরচনার সেই সূজ্যমান যুগে একদিকে যেমন তিনি সমাজসমস্যামূলক প্রহসন জাতীয় 'বাবুনাটক' (১৮৫৪; সম্ভবতঃ রামনারায়ণের 'কুলীন-কুলসর্বস্বে'রও পূর্বে) রচনায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন, অন্যদিকে নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ, মঞ্চনির্দেশ প্রভৃতিতে কিছুটা পাশ্চাত্ত্য প্রভাব স্বীকার করে নিয়ে 'বিক্রমোর্বশী' ও 'মালতীমাধবে'র মত অনুবাদনাটকে সংস্কৃত নাটকের রসসমৃদ্ধ class tradition এবং 'সাবিত্রীসত্যবানে'র মত পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে রচিত মৌলিক নাটকে mass tradition—এই দুটি উৎসমুখের প্রতি তিনি তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তথাপি 'বাবু নাটকে'র মত প্রহসন রচনাকে ব্যতিক্রম হিসাবে ধরে নিলে শুধু অনুবাদ নাটকই নয়, মৌলিক নাটক রচনাতেও (এই mass tradition-এর অনুসরণ সত্ত্বেও) নাট্যকারের উপর সংস্কৃত নাট্যাদর্শের অভ্রান্ত প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। কালীপ্রসন্নের সামান্য পরে মাইকেল মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বাংলা নাটক-রচনায় সচেতনভাবে পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শ অনুসরণ করার চেষ্টা করলেও তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী'তে এবং সর্বশেষ নাটক 'মায়াকাননে' (ব্যতিক্রম 'কৃষ্ণকুমারী') সংস্কৃত নাটকের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। দীনবন্ধুর নাটকেও যেখানে ভদ্র চরিত্রগুলির কোন গভীর-গম্ভীরভাব বা করুণ ঘটনা বা নায়ক-নায়িকার রোমান্টিক প্রেম ব্যক্ত হয়েছে সেখানে তা সমাস বহুল তৎসম শব্দের আধিক্যে এবং সুদীর্ঘ ভাবতরল উচ্ছ্বাস প্রকাশের চেষ্টায় সংস্কৃত নাটকের প্রভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তবু এই ধরণের কিছু কিছু সংস্কৃত প্রভাব সত্ত্বেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মাইকেল মধুসূদনের সময় থেকে গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির হাতে বাংলা নাটকে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত নাটকের তুলনায় পাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রভাবই প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। কিন্তু এই প্রভাব আবার রূঢ় আঘাত পায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হাতে তাঁর নাটকরচনার দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ 'ফাল্গুনী' (১৯১৬) নাটক রচনার কাল থেকে। পাশ্চাত্ত্য নাটকের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অঙ্ক বিভাগ ও দৃশ্য পরিকল্পনা ইত্যাদির বিরুদ্ধেই যে শুধু রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন তাই নয়, তিনি যে নাটকে নাটকত্বের দাবীর কাছে কাব্যত্বের দাবী খর্ব করলেন না, তাও স্পষ্টতই সংস্কৃত নাট্যাদর্শসম্মত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এপ্রসঙ্গে তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে (১৯০২)

এবং 'ফাল্গুনী' (১৯১৬) ও 'তপতী' (১৯২৯) নাটকের ভূমিকায় তাঁর এই দ্বিতীয় পর্বের (যা তাঁর নিজেরই প্রথম পর্বের নাট্যরচনার বিরোধী) নাট্যরচনার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংস্কৃত নাট্যাদর্শের সাদৃশ্যের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। এইভাবে বাংলা নাটকের আদি পর্বে কালীপ্রসন্নের নাটকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের সঙ্গে আংশিক সমন্বয় সাধন করে বিশেষভাবে সংস্কৃত নাটকের আদর্শ অনুসরণ করার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, তা দীর্ঘকাল পরে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব-বাহুল্যের মোহ কাটিয়ে আবার রবীন্দ্রনাথের হাতে কিছুটা সংস্কৃত নাট্যাদর্শসম্মত অথচ সম্পূর্ণ অভিনব নাটকরচনার মধ্য দিয়ে এমন একটি আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি লাভ করল যা সময়ের সম্ভাবিত জঠরে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষারত ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জোড়াসাঁকোর সিংহবাড়ীতে যে তরঙ্গ উঠেছিল, বিশ শতকের প্রথমার্ধে এসে সেই জোড়াসাঁকোরই ঠাকুরবাড়ীতে তার পরিণতি দেখা গেল।

হুতোম প্যাঁচার

কলিকাতার নক্শা।

—❋—

চড়ক।

প্রথম খণ্ড।

"উৎপৎস্যতেস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা।
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।।"

ভবভুতি।

আশ্মান।

রামপ্রেসে মুদ্রিত।

নং ৮৪ হুঁকো রাম বসুর ইষ্ট্রীট।

মল্য পয়শায় দুখানা।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র
(প্রথম প্রকাশ ১৭৮৩ শক, ইং ১৮৬২ খৃঃ) চিত্র—১৩

সহৃদয়কুলচূড়

পূজনীয় শ্রীল মুলুকচাঁদ শর্ম্মা মহাশয়ের

স্বদেশ,

সাহিত্য ও সমাজের প্রিয় চিকীর্ষা নিবন্ধন

বিনয়াবনত

দাস শ্রীহুতোম প্যাঁচা কর্ত্তৃক

(তাহার এই প্রথম রচনাকুসুম)

শ্রীচরণে

অঞ্জলি প্রদত্ত হইল।

১৭৮৩ শক।

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ডের উপহার পত্র
(প্রথম প্রকাশ ১৭৮৩ শক, ইং ১৮৬২ খৃঃ)

চিত্র—১৪

সপ্তম অধ্যায়

কালীপ্রসন্নের সামাজিক নক্শা

(১)

বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগে বিচরণ করলেও 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র জন্যই কালীপ্রসন্ন বাংলাসাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র প্রথম ভাগ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে (তখনও বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখা হয়নি) এবং প্রথম-দ্বিতীয় ভাগ একত্রে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে (তখন ও 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়নি) প্রকাশিত হয়।

১৭৮৩ শকে (ইংরাজী ১৮৬২) 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' প্রথমে খণ্ডশঃ প্রচারিত হয়। এই প্রথমভাগের প্রথম খণ্ড 'চড়ক'-এর আখ্যাপত্র এইরূপ :—

হুতোম প্যাঁচার কলিকাতার নক্শা। চড়ক। প্রথম খণ্ড। আশমান। রামপ্রেসে মুদ্রিত। নং ৮৪ হুঁকোরাম বসুর ইস্ট্রীট। মূল্য পয়সায় দুখানা।

১৭৮৪ শকে অর্থাৎ ইং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র সমগ্র প্রথম ভাগ (পৃষ্ঠা (৬+১৭৬) প্রকাশিত হয়। এর ইংরেজী ও বাংলা আখ্যাপত্র এইরূপ :—

Sketches by Hootum illustrative of Every Day Life and Every Day People Vol-I. "By heaven and not a master taught." "Mislike me not for my Complexion." Shakeskpeare. Calcutta Bose and Company, Printers & Publishers 1862.

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা। (প্রবন্ধকল্পনা,) প্রথমভাগ। কলিকাতা। রামপ্রেস বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রচারিত। দরজীপাড়া। ১৭৮৪।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র দ্বিতীয়ভাগ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়, কারণ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (পৃষ্ঠা ২+১৮০+৫৪) একত্রে বাঁধাই হয়ে প্রকাশিত হয়।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র প্রথম সংস্করণের প্রথম খণ্ডের প্রারম্ভে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনুসরণে এই কবিতাটি লিখিত হয়েছিল ঃ—

হে শারদে! কোন্ দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে?
কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান?
এ কুৎসিতে! কোন লাজে সপত্নী সমাজে পাঠাইব,
হেরিলে মা এ কুরূপে—দুষিবে জগৎ -হাঁসিবে
কুমার – সে সময় মনে যান থাকে; চির অনুগত লেখনীরে।

কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে ঐ কবিতার পরিবর্তে একটি টপ্পা গানের দুটি পংক্তি উদ্ধৃত হয়—"কহই টুনোয়া
সহর সিখাওয়ে কোতোয়ালী।"

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এ (দ্বিতীয় খণ্ড, ৭ম সং) 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র আলোচনা প্রসঙ্গে পাদটীকায় বইটির যে সংস্করণের কথা উল্লেখ করেছেন তাতে ইংরেজী ও বাংলা আখ্যাপত্রের খৃষ্টাব্দে ও শকাব্দে মিল নেই। ডঃ সেনের পাদটীকায় আছে ঃ "বইটির দুইটি আখ্যাপত্র, একটি ইংরেজীতে, একটি বাঙ্গালায়. ইংরেজীতে বইটির নাম ঃ Sketches by Hootum. illustrative of Every Day Life and Every Day People, Vol. I, Calcutta Bose and Company, 1864'; বাঙ্গালায় ঃ হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা (প্রবন্ধ কল্পনা) প্রথমভাগ কলিকাতা শত্রুঘ্ন প্রেস বসু কোম্পানী কর্তৃক প্রচারিত ঋষিপাড়া ১৭৮৪।" প্রকৃতপক্ষে ১৭৮৪ শক ইংরেজী ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হয় না, হিসাবমত ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধ অথবা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধ হতে পারে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত নক্‌শার ইংরেজী এবং বাংলা আখ্যাপত্রেও দেখা যায়, "Sketches by Hootum illustrative of Every Day Life and Every Day People. Vol. 1 Calcutta Bose and Company Printers & Publishers 1862" এবং "রামপ্রেস বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রচারিত। দরজীপাড়া। ১৭৮৪।"[১] আর নক্‌শার এই প্রথমভাগ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে যে প্রথমভাগ, প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তার উপহার পত্রে দেখা যায় ১৭৮৩ শক। সুতরাং 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-র প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড ১৭৮৩ শক অর্থাৎ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে এবং সমগ্র

প্রথম ভাগ ১৭৮৪ শক অর্থাৎ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে প্রকাশিত হয়। সুতরাং ডঃ সুকুমার সেন কথিত ইংরেজী এবং বাংলা আখ্যাপত্রের ১৭৮৪ শক এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দটি যে ডঃ সেনের অনবধানতা বা মুদ্রণ প্রমাদ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে যে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, সে তথ্য আগেই উল্লেখ করেছি। কালীপ্রসন্নের জীবদ্দশায় 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রথম ভাগের আর একটি সংস্করণ হয় ১৫ই অক্টোবর ১৮৬৮ তারিখে এবং ঐ একই সময়ে প্রথমভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে (পৃ. ১৩৮+৫৪) পুনরায় বাঁধাই হয়ে প্রচারিত হয়।

(২)

'হুতোম প্যাঁচার নকশা' যে 'হুতোম' ছদ্মনামে কালীপ্রসন্নের লেখা একথাটি সুপ্রচলিত হলেও ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে হুতোম প্যাঁচার নকশা'র লেখক সম্বন্ধে যে সংশয় উত্থাপন করেছেন, এপর্যন্ত তথ্যানুসন্ধান ও যুক্তি বিচারের সাহায্যে সেই সংশয় নিরসনের বিশেষ কোন চেষ্টাই হয়নি। ডঃ সেন লিখেছেন, "কালীপ্রসন্ন সিংহ যে ইহা ছাপাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি যে লেখকও তাহাতে প্রচণ্ড সংশয় আছে।"[২] তাঁর মতে কালীপ্রসন্নের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র একজন লিপিকর ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র রচয়িতা। তাঁর এই অনুমানের পক্ষে তিনি যে যুক্তি নির্দেশ করেছেন, তা হল :—

"প্রথম। উপহার পত্রে আছে যে লেখক 'বিনয়াবনত দাস শ্রী হুতোম প্যাঁচা' তাঁহার এই 'প্রথম রচনা কুসুম' 'সহৃদয় কুলচূড় শ্রীল শ্রীযুক্ত মুলুকচাঁদ শর্মার বাঙ্গালী সাহিত্য ও সমাজের প্রিয় চিকীর্ষা নিবন্ধন' তাঁহার 'শ্রীচরণে অঞ্জলি' দিতেছেন। এখানে 'শ্রীহুতোম প্যাঁচা' কালীপ্রসন্ন সিংহ হইতে পারেন না। কেননা বইটি তাঁহার 'প্রথম রচনা কুসুম' নয়। নকশা বাহির হইবার বেশ কিছুকাল আগে ইনি স্বনামে কয়েকখানি নাটক বাহির করিয়াছিলেন। 'শ্রীল শ্রীযুক্ত মুলুকচাঁদ শর্মা' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে পারেন না, দুইটি কারণে। এক, আরবী 'মুলুক' সংস্কৃত 'ঈশ্বর' এর প্রতিশব্দ নয়। দুই, হুতোম প্যাঁচার নকশা বই হইয়া বাহির হইবার আগে প্রথম দুই চারটি নকশা পুস্তিকাকারে বাহির হইয়াছিল। তাহার প্রথম সংখ্যায় প্রথমেই একটি

ছবি ছিল—ভূমণ্ডলের উপরে বহুরূপীর সাজে টুপি মাথায় একজন বসিয়া আছে। ছবির তলায় পরিচিতি আছে—'মুলুকচাঁদ শর্মা আসমানে ঘুড়ি উড়াইতেছেন।' এই ছবি হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে মুলুকচাঁদ ঈশ্বরচন্দ্র হইতে পারেন না। মুলুকের প্রতিশব্দ ভুবন, সুতরাং মুলুকচাঁদ=ভুবনচন্দ্র। ভুবনচন্দ্র ব্রাহ্মণ সুতরাং তাঁহার শ্রীচরণ অবশ্যই। ভুবনচন্দ্রের বয়স তখন অল্প, এবং তিনি কালীপ্রসন্নের বয়স্য দলে ছিলেন। সুতরাং মুলুকচাঁদের সঙ সাজা কিছুতেই অস্বাভাবিক নয়। হুতোম প্যাঁচাই মুলুকচাঁদ, কেননা দুজনেই আশমানবাসী (ছবিতে মুলুকচাঁদ আশমানে রহিয়াছেন, গ্রন্থের ভূমিকায় হুতোম আশমানের ঠিকানা দিয়াছেন।) একই ব্যক্তি বেনামীতে দাতা ও গ্রহীতা হইয়াছেন।

দ্বিতীয়। কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর কিছুকাল পরে দেখি ভুবনচন্দ্র উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের হইয়া রেনলড্‌সের উপন্যাস-কাহিনীর অনুকরণে একটি বৃহৎ উপন্যাস লিখিতেছেন। এই বইটি দুই বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া (ডিসেম্বর ১৮৭১ হইতে এপ্রিল ১৮৭৩) মাসে মাসে খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইয়াছিল 'এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!! অতি আশ্চর্য!!!' নামে। নায়ক হরিদাসের নামে বইটি 'হরিদাসের গুপ্তকথা' নামে বহুমুদ্রিত এবং বহুপঠিত হয়। বৃহদাকার বইটি যে হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা লেখকেরই লেখা সে অনুমানের সমর্থন অনেক দিক দিয়া পাওয়া যায়। প্রথমত স্টাইল। দুইটি গ্রন্থেরই রচনারীতি মূলত এক এবং ইতিমধ্যে আর কোন রচনায় এ রীতি স্পষ্টভাবে লক্ষিত নয়। দ্বিতীয়ত, গুপ্তকথার লেখক যিনি নিজেকে 'সবজান্তা' বলিয়াছেন তাঁহার নিবাসও 'আশমান'। 'এই এক নূতন' এই শীর্ষকটিতে হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার প্রতিধ্বনি রহিয়াছে।"

এবার ডঃ সেনের উত্থাপিত সংশয়গুলি বিচার করে দেখা যেতে পারে। হুতোম প্যাঁচা যে কালীপ্রসন্নের ছদ্মনাম, এবিষয়ে ডঃ সেনের প্রথম আপত্তি 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র উপহার পত্রে 'প্রথম রচনা-কুসুম' কথাটি নিয়ে, যেহেতু-নক্‌শা প্রকাশের আগেই কালীপ্রসন্ন স্বনামে কয়েকখানি নাটক লিখে-ছিলেন। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কালীপ্রসন্ন নাটকগুলি প্রকাশ করেছিলেন স্বনামে; 'হুতোম প্যাঁচা'র ছদ্মনামে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' তাঁর 'প্রথম রচনাকুসুম' হতে বাধা কোথায়? শুধু যে বাধা নেই



'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত 'হুতোম প্যাঁচা আশ্‌মানে বসে নক্‌সা উড়াচ্চেন" শিরোনাম সম্বলিত ছবির আলোকচিত্র। (প্রথম প্রকাশ ১৭৮৩ শক)

চিত্র—১৫

তা নয়, বরং সেইটিই তো অধিক সঙ্গত মনে হয়। ডঃ সেনের দ্বিতীয় আপত্তি 'মুলুকচাঁদ শর্মা'কে কেন্দ্র করে। তাঁর মতে যে মুলুকচাঁদ শর্মাকে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' উৎসর্গ করা হয়েছে, সেই মুলুকচাঁদ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর নন, ভুবন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যেহেতু "আরবী 'মুলুক' সংস্কৃত 'ঈশ্বর'-এর প্রতিশব্দ নয়।" কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার, 'মুলুকচাঁদ' ও একটি ছদ্মনাম এবং ছদ্মনাম ব্যবহারে সর্বদা প্রতিশব্দ অন্বেষণ করা এবং প্রতিশব্দের সঙ্গে না মিললে ছদ্মনাম খারিজ করে দেওয়া কখনো যুক্তিসঙ্গত নয়। (বলাইচাঁদের সঙ্গে 'বনফুলে'র) রাজশেখর বসুর সঙ্গে 'পরশুরামে'র' চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে 'জরাসন্ধে'র কিংবা সমরেশ বসুর সঙ্গে 'কালকূটে'র প্রতিশব্দগত মিল না পেয়ে ভাবীকাল কি তা খারিজ করে দেবে?) দ্বিতীয়তঃ, ১৭৮৪ শকে প্রকাশিত, 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র প্রথম ভাগের উপহার পত্রে 'মুকুলচাঁদের' সঙ্গে অন্বয়যুক্ত "সহৃদয় কুলচূড় শ্রীল শ্রীযুক্ত মুকুলচাঁদ শর্মার বাঙ্গালী সাহিত্য ও সমাজের প্রিয় চিকীর্ষা নিবন্ধন" পদগুলির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। 'সহৃদয় কুলচূড়' এবং 'বাঙ্গালী সাহিত্য ও সমাজের প্রিয় চিকীর্ষা নিবন্ধন' পদগুলি লিপিকর ভুবনচন্দ্রের চেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পক্ষে প্রযোজ্য হওয়া কি অধিক যুক্তি সঙ্গত নয়? তথাপি যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে মুলুকচাঁদ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তাহলেও তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন নয় যে, যে মুলুকচাঁদকে হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা উৎসর্গ করা হয়েছে, তিনিই হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার রচয়িতা—যেহেতু ডঃ সেন যে বলেছেন, "একই ব্যক্তি বেনামীতে দাতাও গ্রহীতা হইয়াছেন" তা স্বাভাবিক রীতি-বহির্ভূত এবং সাহিত্যের ইতিহাসে নজিরবিহীন। তবু হয়তো এই যুক্তিগুলিকেও বলা যেতে পারে এক অনুমানের বিরুদ্ধে আর এক অনুমান।

এবার অনুমান ছেড়ে প্রমাণে আসা যাক্‌। ডঃ সেন যদিও লিখেছেন, প্রথম সংখ্যায় প্রথমেই একটি ছবি ছিল—ভূমণ্ডলের উপরে বহুরূপীর সাজে টুপি মাথায় একজন বসিয়া আছে। ছবির তলায় পরিচিতি আছে—'মুলুকচাঁদ শর্মা আস্‌মানে ঘুড়ি উড়াইতেছেন" এবং এজন্য সিদ্ধান্ত করেছেন, "একই ব্যক্তি বেনামীতে দাতা ও গ্রহীতা হইয়াছেন," কিন্তু তা যে সঠিক নয়, তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৭৮৩ শকে প্রকাশিত 'হুতোম্‌ প্যাঁচার নক্‌শা'র প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণের যে পুস্তিকাটি পাওয়া গেছে তাতে যে ছবি এবং ছবির পরিচিতি আছে, তাতে দেখা যায় ভূমণ্ডলের ওপরে

টুপি মাথায় যিনি বসে আছেন তিনি মুলুকচাঁদ নন, হুতোম প'্যাচা এবং তিনি কোন ঘুড়ি ওড়াচেছন না, কিছু নকশা ওড়াচেছন কারণ ঐ ছবিতে "মুলুকচাঁদ শর্ম্মা আসমানে ঘুড়ি উড়াইতেছেন" লেখা নেই, লেখা আছে, "হুতোম প'্যাচা আশমানে বসে নকশা উড়াচেচন।" ৩ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খণ্ডের ৬ষ্ঠ এবং ৭ম সংস্করণে ডঃ সেনও অবশ্য 'ঘুড়ি'র জায়গায় 'নকশা' কথাটি বসিয়েছেন কিন্তু 'মুলুকচাঁদ শর্ম্মা' অপরিবর্তিত রেখে গেছেন। সুতরাং "ভূমণ্ডলের উপরে বহুরূপীর সাজে টুপি মাথায় একজন বসিয়া আছে" ডঃ সেনের একথাটুকু সত্য হলেও তিনি ছবির তলায় যে লেখাটির কথা উল্লেখ করেছেন, তা যে ডঃ সেনের অনবধানতা (যদিও তা বিস্ময়কর) অথবা স্মৃতি থেকে উদ্ধারজনিত ত্রুটি সে বিষয়ে সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই। ডঃ সেন যে সংস্করণের কথা উল্লেখ করেছেন তার শকাব্দও খৃষ্টাব্দেও যে মিল নেই, তা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি।

তাছাড়া ডঃ সেনের অনুমান অনুযায়ী 'মুলুকচাঁদ শর্ম্মা' যে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নন, তার আরও প্রমাণ আছে। ২৫শে মার্চ ১৮৬৪ তাং 'সংবাদ প্রভাকরে' ১২৭০ সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্য থেকে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনার জন্য আহ্বান জানিয়ে যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয় তাতে দেখা যায়—

শ্রীযুত মুলুকচাঁদ শর্ম্মা প্রদত্ত।

প্রথম, ''ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা অপেক্ষা কি কি বিষয়ে এইক্ষণে উন্নতি হইয়াছে" যিনি লিখিবেন, তাঁহার এই লেখা অন্যূন বিংশতি পত্র হয়, পারিতোষিক ১০ টাকা মাত্র পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়।

দ্বিতীয়, 'বঙ্গদেশাধিপতি সুবিখ্যাত রাজা বল্লালসেনের 'জীবন বৃত্তান্ত' ১২ পেজি ফরমার একশত পৃষ্ঠার ন্যূন না হয়, পারিতোষিক ৪০ চল্লিশ টাকা। পরীক্ষক শ্রীযুত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ।

এই মুলুকচাঁদ শর্ম্মা কে? নিশ্চয়ই, লিপিকর ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নন, যেহেতু 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'য় যিনি বেতনভুক্ কর্মচারীরূপে নিযুক্ত, তিনি যে জনসাধারণের কাছ থেকে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র জন্য প্রবন্ধ

রচনার আহ্বান জানিয়ে পুরস্কার ঘোষণা করবেন, এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হয়।

তাছাড়া 'শ্রীযুত মুলুকচাঁদ শর্ম্মা' প্রদত্ত দ্বিতীয় পারিতোষিকের প্রস্তাবের বিষয়বস্তু 'বঙ্গদেশাধিপতি সুবিখ্যাত রাজা বল্লাল সেনের জীবন বৃত্তান্ত' এবং পরীক্ষক শ্রীযুত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ এই নামগুলির দিকে লক্ষ্য করলে এবং 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা স্মরণ রাখলে এই মুলুকচাঁদ শর্ম্মা (যাঁকে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' উৎসর্গ করা হয়েছে এবং যাঁর নামে সংবাদপত্রে পুরস্কার প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে) ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নয়, 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে দেওয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরই ছদ্মনাম বলে মনে হয়। আর তাহলে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র উৎসর্গপত্রে 'মুলুকচাঁদ শর্ম্মা'র সঙ্গে অন্বয়যুক্ত 'সহৃদয় কুলচূড়' এবং 'বাঙ্গালী সাহিত্য ও সমাজের প্রিয় চিকীর্ষা নিবন্ধন' পদগুলিরও কোন বিরোধ সৃষ্টি হয় না।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র লেখক নন, বরং 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র অনুকরণে তিনি যে 'নিশাচর' ছদ্মনামে 'সমাজ কুচিত্র' এবং পরে 'এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা' এই দুখানি সামাজিক নকশা রচনা করেন, সে বিষয়ে আরও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হল: "স্বয়ং ভুবনচন্দ্রের মুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহারই জীবিতকালে যতীন্দ্রনাথ দত্ত তৎসম্পাদিত 'জন্মভূমি'তে (ভাদ্র ১৩১০) তাঁহার যে জীবনী প্রকাশ করেন, তাহাতে প্রকাশ:— (১৮৭০—৭১ সনে খণ্ডশঃ প্রকাশিত) 'এই এক নূতন: আমার গুপ্তকথা' লিখিবার অগ্রে সমাজ কুচিত্র নামে তিনি একখানি সামাজিক নক্সা প্রণয়ন করেন. সেখানি হুতোমের ভাষার অনুকরণ, বিজ্ঞ লোকে তাহা পাঠ করিয়া প্রকৃত চিত্র বলেন. হুতোম নিজেও প্রশংসা করিয়াছিলেন।"[৪]

সুতরাং হুতোম প্যাঁচার নকশা'র সঙ্গে ভুবনচন্দ্রের 'এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা'র স্টাইল বা রচনারীতির কিছুটা মিল দেখে সুকুমার সেন যে অনুমান করেছিলেন ভুবনচন্দ্রই 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র রচয়িতা তা সঙ্গত নয়, যেহেতু এখানে খুব স্পষ্টভাবেই জানা গেল যে হুতোমের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভুবনচন্দ্র হুতোমের ভাষার এমন অনুকরণ করেছিলেন যে স্বয়ং হুতোম তার প্রশংসা করেছিলেন।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তাঁর 'সমাজকুচিত্র' রচনা করেন, সে প্রমাণ তাঁর ঐ পুস্তকের মধ্যেও আছে। 'সমাজ কুচিত্র' বইটি উপহার দেওয়া হয়েছে 'সাহসের অদ্বিতীয় আশ্রয় শ্রীযুক্ত হুতোমচাঁদ দাস মহোদয়েষু'। উপহার পত্রের নীচে ছদ্মনাম ব্যবহৃত হয়েছে 'চিড়িয়াখানার নিশাচর'।

এই 'নিশাচর' যে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যখন দেখি ঐ পুস্তকে 'গৌরচন্দ্রিমা'র শেষে দেওয়া আছে "শ্রী বি, মুক, পেন, কোং" এবং বইটির আখ্যাপত্রেও আছে "Published by B. K Mook, Pen and Co.।"

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায়, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাহিত্য ক্ষেত্রে যে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন, তা হল 'নিশাচর', 'হুতোম' নয়।

তাছাড়া মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির যে উক্তির সাক্ষ্য টেনে কেউ কেউ (জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেন 'দেশ' ২৮ মে, ১৯৮৩) মনে করেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র রচয়িতা. সেই উক্তিটিকেও সতর্কভাবে বিচার করলে দেখা যাবে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র মূল রচয়িতা কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার লিপিকর মাত্র, কারণ মহেন্দ্রনাথ প্রথমেই উল্লেখ করেছেন, "হুতোম প্যাঁচার নকশা' দ্বিতীয় খন্ড সংরচনকালে কালীপ্রসন্ন বাসদেব স্থানীয় ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় তদুপলক্ষ্যে শ্রী গণেশ জীউ।" সুতরাং কালীপ্রসন্ন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র রচয়িতা এবং ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার লিপিকর—এই মূল সত্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার পর মহেন্দ্রনাথ বলেছেন, "সময়ে সময়ে ভুবনচন্দ্র কিছু কিছু 'হুতোম' লিখিয়া দিতেন, স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্যগুণে সিংহ মহাশয় সেগুলি সমাদর সহকারে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত কি সঙ্কুচিত হইতেন না।" এখানে অবহিত হওয়া প্রয়োজন যে, ভুবনচন্দ্রই নকশা'র লেখক হতেন, তাহলে ভুবনচন্দ্রের "কিছু কিছু" লেখা "কালীপ্রসন্ন স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্যগুণে…গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত কি সংকুচিত হইতেন না" মহেন্দ্রনাথের এরূপে উক্তির অবকাশ কোথায়? তাই এখানেও স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র রচয়িতা স্বয়ং কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নন।

ভুবনচন্দ্র যে হুতোম প্যাঁচা' নন, তার সমর্থনে আরও একটি তথ্য হল—ভুবনচন্দ্র উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের হয়ে 'এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা !!' (ডিসেম্বর ১৮৭১ থেকে এপ্রিল ১৮৭৩—খণ্ডে খণ্ডে বেরোবার সময় লেখকের কোন নাম ছিল না) লিখে পরে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' নাম দিয়ে স্বনামে প্রকাশ করলে স্বত্বাধিকার নিয়ে উপেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গে বিবাদ হয় এবং ভুবনচন্দ্র গ্রন্থস্বত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র গ্রন্থস্বত্ব নিয়ে কালীপ্রসন্নের জীবদ্দশায় বা কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর ভুবনচন্দ্রের (১৮৪২-১৯১৬) দীর্ঘ জীবনকালে কোন সময়েই বিবাদ উপস্থিত হয়নি—এর কারণ কি এই নয় যে ভুবনচন্দ্র কোন ক্রমেই 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র রচয়িতা ছিলেন না? তাছাড়া ভুবনচন্দ্র 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র (১৮৬২-৬৪) লেখক হলে তৎপরবর্তী 'আমার গুপ্তকথা'য় (১৮৭১-৭৩) স্বাভাবিকভাবেই হয়তো আরো পরিণত শিল্পরীতির স্বাক্ষর থাকতো; কিন্তু তা না হয়ে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' একখানি অসাধারণ গ্রন্থরূপে আজও টিঁকে আছে, আর কালের বিচারে 'সমাজ কুচিত্র' এবং 'আমার গুপ্তকথা' পরিত্যক্ত হয়েছে।

তাছাড়া 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' এবং 'সমাজ কুচিত্রে'র ভাষারীতির তুলনামূলক বিচার করলেও দেখা যাবে 'নক্শা'য় আছে শিল্পীর স্টাইল এবং 'সমাজ কুচিত্রে' সেই স্টাইল অনুকরণের শিথিল প্রচেষ্টা। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় দেখি চলিত ভাষার ব্যবহারে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের নির্ভেজাল কথ্যরূপের প্রয়োগ; যেমন—"তাঁরা যে বাঙ্গালির ছেলে, ইটি স্বীকার কত্তে লজ্জিত হন ...সুতরাং যাতে বাঙ্গালির শ্রীবৃদ্ধি হয়, মান বাড়ে, সে সকল কাজ থেকে দূরে থাকেন।" অন্যদিকে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সমাজ কুচিত্রে' একই বাক্যের মধ্যে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সাধু ও কথ্যরূপের মিশ্রণ এবং পরিকল্পনাহীন শিথিল ব্যবহার—"তাঁহাদের অনেকে আজ আগমন করেছিলেন;" "তাহাতে অন্ততঃ বর্ম্মার তুল্য কল ও দেখাতে পারবেন;" "ইহাঁদের মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁরা .....;" "বণিক যাইবামাত্র 'আসতে আজ্ঞা হোক;" ইত্যাদি লক্ষ্য করলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে ১৮৬২ খৃস্টাব্দে 'হুতোম' ছদ্মনামে কালীপ্রসন্ন যে 'নক্শা' রচনা করেছিলেন, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভুবনচন্দ্র 'নিশাচর' ছদ্মনামে 'সমাজ কুচিত্র' রচনায় তারই অনুকরণ করেন এবং 'জন্মভূমি' পত্রিকায় এসম্বন্ধে তাঁর নিজের স্বীকারোক্তিও এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে।

প্রকৃতপক্ষে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র লেখক যে ভুবনচন্দ্র নন, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবিষয়ে আরও কিছু পারিপার্শ্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়। 'হুতোম প্যাচার নক্‌শা'য় নিন্দিত কোন কোন ব্যক্তির উৎসাহে ও সাহায্যে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন সিংহকে প্রচ্ছন্নভাবে আক্রমণ করে 'আপনার মুখ আপনি দেখ' (১৮৬৩) নামে যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাতে কালীপ্রসন্নের বাল্যশিক্ষা, ডিবেটিং ক্লাব, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, নাটক রচনা, সাময়িক পত্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কটাক্ষ আছে। ডঃ সুকুমার সেনও স্বীকার করেছেন, "অনেক জোড়াতাড়া থাকিলেও ভোলানাথের লক্ষ্য অর্থাৎ কেন্দ্রীয় চরিত্র যিনি তিনি যে কালীপ্রসন্ন সিংহই তাহা বইটি খুঁটিয়া পড়িলে বোঝা যায়।"[৫]

'আপনার মুখ আপনি দেখ' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় একখানি কপি কালীপ্রসন্নের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য (কিছুটা ব্ল্যাকমেলের ধরণে) অর্থসাহায্য চেয়ে পাঠালে কালীপ্রসন্ন 'শ্রী তালাহুল্‌ ব্ল্যাক্‌-ইয়ার। প্রকাশক' এই ছদ্মনামে 'হুতোম প্যঁাচার নক্‌শা'র দ্বিতীয়বারের গৌরচন্দ্রিকায় লেখেন ঃ—

"ফলে 'আপনার মুখ আপনি দেখ' গ্রন্থকার হুতোমের বসন অপহরণ করে বামনের চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় হুতোমের নক্‌শার উত্তর দিতে উদ্যত হন ও বই ছাপিয়ে ঐ বই হুতোমের উত্তর বলে কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে ব্যাচেন।...এমন কি, ঐ গ্রন্থকার খোদ হুতোমকেই তাঁরে সাহায্য কত্তে ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে প্রার্থনা করেন, সে পত্র এই—

মহাশয়!....আপনার দাতৃত্বতা পরোপকারিত্বতা ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির সুযশ সুরভ গৌরবে ধরণী সৌরভিনী হইয়াছে, ভারত আপনার যশরূপ যশ ধারণ করিয়াছে। দেশাচার সংশোধন পক্ষে মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গ্রন্থকর্তা, বর্তমানে মহাশয়ের মতানুসারে সকলেরই গ্রন্থলেখা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আপনার কৃপাবর্ত্মে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলাম (!) মহাশয় কিঞ্চিৎ কৃপানেত্রে চাহিয়া সাহায্য প্রদান করিলে সত্বরেই দ্বিতীয় খণ্ড 'আপনার মুখ আপনি দেখ' পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি। নিবেদন ইতি সন ১২৭৪ সাল তারিখ—২০ জ্যৈষ্ঠ।

... — ....

হুতোমের চির পরিচিত রীত্যনুসারে এই ভিক্ষুকের পত্রখানি অপ্রচারিত রাখা কর্তব্য ছিল, কিন্তু কতকগুলি স্কুলবয় ও আনাড়িতে বাস্তবিকই স্থির করে

রেখেছেন যে, 'আপনার মুখ আপনি দেখ' বইখানি হুতোমের প্রকৃত উত্তর, ও বটতলার পাইকেররাও ঐ কথা বলে হুতোমের নক্শার সঙ্গে ঐ বিচিত্র বইখানি বিক্রী করেন বলিয়াই ঐ হতভাগ্য ভিক্ষুকের পত্রখানি অবিকল ছাপান গেল।—এখন পাঠক! তুমি ঐ পত্রখানিই পাঠ করে জানতে পারবে, হুতোমের নক্শার সঙ্গে 'আপনার মুখ আপনি দেখ' গ্রন্থকারের কিরূপ সম্পর্ক।

শত্রুপুর } শ্রীতালাহুল্ ব্ল্যাক্-ইয়ার্।
১লা এপ্রেল } প্রকাশক।"

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র ঐ 'দ্বিতীয়বারের গৌরচন্দ্রিকা'তেই হুতোম যে কালীপ্রসন্নই সে বিষয়ে খুব স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে—"জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নক্শা প্রসব করেচে, সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের ...অনুবাদক।" এখানে একই কলম থেকে কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদের গৌরবের সঙ্গে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' রচনার কৃতিত্বটিও যুক্ত করা হয়েছে। মহাভারত অনুবাদে অন্যান্য পণ্ডিতদের কলমের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের কলমও যে যুক্ত হয়েছিল সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের সমকালীন বিখ্যাত ব্যক্তি কৃষ্ণদাস পালের মহাভারত সমালোচনা প্রসঙ্গে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—"...although different hands worked there is no discordance. All the Volumes attest the touches of the practised hand of the Editor in chief, we mean the Baboo himself." এবং "...Some of the finest specimens of Bengali in the translation of the Mahabharata were from his pen।" ১৭৮৪ শকে (১৮৬২ খৃষ্টাব্দে) 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র প্রথম ভাগের 'ভূমিকা উপলক্ষে একটি কথা'য় কালীপ্রসন্নই যে হুতোম সে বিষয়ে আরো স্পষ্ট নির্দেশ আছে—"কেবল এইমাত্র বলতে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমনকি স্বয়ংও নক্শার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।" নক্শার প্রথম ভাগে কালীপ্রসন্নের বাল্যশিক্ষা প্রভৃতির উপর যে সরস ব্যঙ্গাত্মক রচনা আছে তা হুতোমের এই প্রতিশ্রুতিরই সমর্থন করে এবং এ প্রসঙ্গে একথাও ধরে নেওয়া যেতে পারে যে স্বয়ং কালীপ্রসন্ন ছাড়া 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র লিপিকর ও কালীপ্রসন্নের কৃপাপ্রার্থী ভুবনচন্দ্রের পক্ষে কখনো কালীপ্রসন্নের বাল্যশিক্ষা ইত্যাদিকে এভাবে ব্যঙ্গ করা সম্ভব নয়।

আবার 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় কালীপ্রসন্ন যে তৎকালীন বহু আড়ম্বর প্রিয় ধনী ব্যক্তিকেও ব্যঙ্গ করেছেন, সে প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্নের সমবয়স্ক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আচার্য কৃষ্ণকমল 'পুরাতন প্রসঙ্গে' পুরাতন দিনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন, "পাথুরিয়াঘাটার কোনও ধনী প্রবীণ বয়সে নিজের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে স্বর্ণালংকারে ভূষিত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের বিদ্রূপবাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইল, 'নক্শা'য় পাথুরিয়াঘাটা 'নুড়িঘাটা'য় রূপান্তরিত হইল।"

কালীপ্রসন্নের সমকালীন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রও 'হুতোম পেঁচা' ছদ্মনামের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের অভিন্নত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় নির্দেশ করেছেন— "দয়াশীল কালীসিংহ বিজ্ঞ মহোদয় / সত্য সারস্বতাশ্রম যাঁহার আলয় / পাঁড়তে পালন করে। আপনি পণ্ডিত / ভারতের অনুবাদ পণ্ডিত সহিত / বিপুল বিভব যেন অবনী-ধনেশ / দেশের কল্যাণে প্রায় করিয়াছে শেষ / রহস্য কৌতুক-হাসি-রসিকতা ভরা / 'হুতোম পেঁচার ধাড়ী পড়েছেন ধরা।"— [দ্রঃ দীনবন্ধু মিত্র—'সুরধুনী কাব্য']

কালীপ্রসন্নের সমকালীন ব্যক্তিদের মধ্যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষ্য ও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর-বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র হুতোম সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন—"Kaliprosonno Singh, or 'Hutam', was one of the most successful writers in the style first introduced by Tekchand."[৬]

এবার মন্মথনাথ ঘোষের 'Memories of Kaliprossunno Singh' শীর্ষক ইংরেজি পুস্তিকার ভূমিকায় উল্লিখিত 'হুতোমে'র অংকুর স্বরূপ 'আন্দোলন পত্রে'র প্রসঙ্গটি তুলে ধরলে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র পূর্ব-প্রস্তুতির ইতিহাসটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে—"Babu Pratap Chandra Ghosh—the famous author of the Bangadhipa Parajaya, and a class-fellow of Kaliprossunno, has kindly sent us some reminiscences from which we gather that when a student of the Hindoo college, Kaliprossunno started a manuscript journal called the 'Andolan Patra' (Journal of Agitation) in which the conduct of students and teachers was freely criticised and received due castigation in the style of the future Hutum."

অছাড়া চৌদ্দ বছর বয়সে কালীপ্রসন্নের স্বনামে রচিত সমাজ প্রহসন-মূলক 'বাবু নাটক' যে প্রতিভার ক্রমবিকাশে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র মত ব্যঙ্গরচনায় পরিণতি লাভ করতে পারে সে কথাটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র ভাষা বিচারেও কালীপ্রসন্নই যে তার রচয়িতা সে বিষয়ে সমর্থন পাওয়া যায়—কারণ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের স্বনামে প্রকাশিত 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকে আংশিকভাবে স্ত্রী চরিত্রের সংলাপে এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মালতীমাধব' নাটকে (ঐ দুটি নাটক সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন "এখন লুপ্ত বলিয়া এগুলির সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই" বললেও ঐ দুটি নাটকেরই সন্ধান পেয়েছি এবং 'নাটকে কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি) প্রায় আগাগোড়া যে চলিত রীতি, এমন কি বানান পদ্ধতির মধ্যে যে প্রচলিত উচ্চারণের ঢং-টুকু তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, তাকে হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র ভাষার পূর্ব প্রস্তুতি বলেই মনে করা যেতে পারে।

এইসব তথ্য ও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে, আমাদের মনে হয়, কালীপ্রসন্ন সিংহই যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র রচয়িতা, এ বিষয়ে আর কোন সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে না।

(৩)

এবার আমাদের খুব সতর্কভাবে বাংলা গদ্যসাহিত্যের এক ক্রান্তি লগ্নে প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র কালানুক্রমিক প্রেক্ষাপট, সমাজচেতনা, হাস্যরস, ভাষা ব্যবহার, তথাকথিত অশ্লীলতা প্রসঙ্গ, পরবর্তী অনুকরণও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য হাস্যরসিকদের রচনারীতির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা ক'রে পর্যায়ক্রমে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র সামগ্রিক মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান শাখার সৃষ্টি হয় সমকালীন সমাজ-সমস্যা ও সামাজিক বিকৃতি অবলম্বনে ব্যঙ্গমূলক নক্শা, কবিতা, নাটক ও প্রহসন রচনায়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যানে' এই ধারার সূত্রপাত। অতঃপর ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫), 'দূতীবিলাস' (১৮২৫), 'নববিবি বিলাস' (১৮৩১ ?) রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল

সর্বস্ব' (১৮৫৪), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলী (১৮৩১-৫৯), মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১৮৬২)-তে নক্‌শায়, কবিতায়, নাটকে ও প্রহসনে এই ব্যঙ্গচিত্ররচনার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। তথাপি আমরা লক্ষ্য করব, কালীপ্রসন্ন সিংহই ব্যঙ্গমূলক সমাজচিত্র রচনায় প্রথম সচেতনভাবে 'নক্‌শা' কথাটি ব্যবহার করেছেন আর তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী তাঁর ব্যঙ্গরচনাকে প্রকৃত নক্‌শাধর্মী ক'রে (ইতিপূর্বে প্রকাশিত ব্যঙ্গরচনাগুলির মধ্যে কেবল 'কলিকাতা কমলালয়ে'ই কিছুটা নক্‌শার ধরণে খণ্ড খণ্ড সমাজচিত্র আঁকার চেষ্টা থাকলেও গদ্যে রচিত অন্য সমস্ত ব্যঙ্গরচনাতেই সুনির্দিষ্ট গল্পকাহিনী আছে এবং নক্‌শাধর্মিতার চেয়ে উপাখ্যান ধর্মিতাই প্রবল হয়ে উঠেছে) 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র ভূমিকায় বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন আঙ্গিক প্রবর্তনের দাবী করে লিখেছেন— "···আমরাও এই নক্‌শাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নূতন বলে দাঁড়ালেম—এখন আপনাদের স্বেচ্ছামত তিরস্কার বা পুরস্কার করুন।"

(৪)

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতার সমাজজীবনকে অবলম্বন করে রঙ্গেব্যঙ্গে, চিত্রণ নৈপুণ্যে ও বাস্তবতায় যে সমাজ সচেতনতা ফুটে উঠেছে তা বাংলা সাহিত্যের এক স্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়েছে। কালীপ্রসন্ন ব্যক্তিগত জীবনে শুধু যে সর্বপ্রকার কদাচার ও কপটতার ঘোর বিরোধী ছিলেন তাই নয়, সমস্ত প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কার আন্দোলনেও তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ অংশভাগী। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'তেও দেখি হুতোম তার বিদ্রূপ-কঠিন শাণিত চঞ্চু দিয়ে সমাজের সকল রকম কুপ্রথা, কুরীতি, দুর্নীতি ও হীনতার ওপর অব্যর্থ আঘাত করে চলেছে। ভবানীচরণ, প্যারীচাঁদ, রামনারায়ণ বা মধুসূদনের রচনায় সমাজের কদাচারের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ থাকলেও তা এমন ব্যাপক ও সমাজের সর্বস্তরে সঞ্চরণশীল হতে পারেনি। হঠাৎ-আবির্ভূত হওয়া অবতার, মোসাহেব-পরিবৃত জমিদার, মাতাল ও উমেদার, ব্রাহ্ম ও পাদরী, ইয়ংবেঙ্গল বাবু ও ফোঁটা-তিলক-কাটা বৈষ্ণব বাবাজী, ভিখারী, কেরাণী, দোকানী, ষ্টেশন মাষ্টার, বুকিং ক্লার্ক, চড়ক, গাজন, দুর্গোৎসব, মাহেশের রথ, কলকাতার পথ, যাত্রা, কবি, হাফ আখড়াইয়ের আসর শেরিশ্যাম্পেনের মজলিস, গঙ্গায় নৌকাবিলাস, নগরে

বারবিলাসিনী—হুতোমের সন্ধানী দৃষ্টি সর্বত্র পতিত হয়েছে। ঊনিশ শতকের কলকাতার সমাজজীবন যেন ফটোগ্রাফিক বাস্তবতায় হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলের পরস্পর বিরোধী অভিঘাতে সমাজ তখন ক্ষুব্ধ, চঞ্চল ও তরঙ্গিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সেই তরঙ্গের তলায় তলায় যেখানে কপটতা ও ভণ্ডামী ছিল হুতোম তাকে তীব্র বিদ্রূপের মর্মভেদী কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। এমনকি প্যারীচাঁদ যেখানে এই কপটতা ও ভণ্ডামীর মুখোস খুলতে সাহসী হননি, উচ্চনীতিবাগীশের মত নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থেকে চিত্রে ও চরিত্রে কেবল আংশিক সাফল্য অর্জন করেছেন, কালীপ্রসন্ন সেখানে নির্বিকার বাস্তববোধ ও অকপট আন্তরিকতায় যে চিত্রে হাত দিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ রূপটিই তুলে দিয়েছেন, তাঁর নক্শা হয়েছে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' কারণ অন্ধকারেও হুতোম প্যাঁচার চোখ জ্বলে। এদিক থেকে, এই চিত্র ও চরিত্রের সম্পূর্ণরূপ পরিস্ফুটনের দিক থেকে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র মতো নক্শাধর্মী না হলেও মধুসূদনের প্রহসন দুটি 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে, তথাপি প্রহসনগুলি এক একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে বলে বিশেষ বিশেষ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। কিন্তু হুতোম কোন বিশেষ কাহিনীতে আবদ্ধ না থেকে সমাজের যেখানেই কোন অসঙ্গতি বা বিকৃতি দেখেছেন, সেখানেই রঙ্গব্যঙ্গ করতে করতে একের পর এক ছবি এঁকে চলেছেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় সমাজজীবনের এই ফটোগ্রাফিক চিত্র ধর্মিতা সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থে লিখেছেন—"তেপায়া উচ্চটুলের উপর কাচের বাক্স বসাইয়া, দুপয়সা দাও, দুচক্ষু দিয়া দেখ বলিয়া যেমন মেলার মধ্যে নানাবিধ ফটো দেখায়, অপূর্ব ভাষার গাঁথুনিতে সেইরূপে কলিকাতার নানাবিধ নক্শা তুলিয়া প্যাঁচা দেখাইতে লাগিল, ইয়ে রাজবাড়ীকি নক্শা, বড় মজাদার হ্যায়, ইয়ে শোভাবাজারকি গাজন, বড় তামাশা হ্যায়, ইয়ে হাইকোর্টকা বিচার, আজব তাজ্জব হ্যায়।" কালীপ্রসন্নের সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তি আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'পুরাতন প্রসঙ্গে' পুরাতন দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, "হুতোম প্যাঁচার মধ্যে যথেষ্ট লোকজ্ঞতা ও পরিহাস রসিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকস্থলেই তখনকার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত আছে। পাথুরিয়াঘাটার কোনও ধনী প্রবীণ বয়সে নিজের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের

বিদ্রূপবাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইল ; নক্সায় পাথুরিয়াঘাটা 'নুড়িঘাটা'য় রূপান্তরিত হইল। মাহেশে রথের সময় বাচখেলা, মেয়েমানুষ সঙ্গে লইয়া দ্বাদশ গোপাল দেখিতে যাওয়া ইত্যাদি তিনি নিপুণ হস্তে চিত্রিত করিয়াছেন। ইংরাজেরা ঠাট্টা প্রসঙ্গে যাহাকে 'Arry' বলে, অর্থাৎ যেসকল সামান্য লোক ইয়ার্কির উপলক্ষে বেত্রিক্তিয়ার হইয়া নানাপ্রকার বাঁদরামি করিয়া থাকে, সস্তায় আমোদ করিবার চেষ্টা করে, নক্সায় সেই প্রকৃতির লোকদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও বঙ্গসমাজে এইরূপ লোক দেখিতে পাইবে।" ২৪শে জুলাই ১৮৭০ তারিখে 'ইন্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় 'নকশা' সম্বন্ধে লেখা হয়— His exquisite sketches of Calcutta society published under the humorous title of Hootum are inimitable, and would not, we advisedly say, dishonour the genius of a Swift or a Dickens.

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতিকে অবলম্বন করে সমাজচেতনা ও সমাজচিত্রের যে বিচিত্র প্রদর্শনী রঙ্গব্যঙ্গে দেখানো হয়েছে তা থেকে এখানে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

সেকালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যে অর্থনৈতিক পটপরিবর্তন শুরু হল তাকে হুতোম কত সহজে এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে নিপুণ রসিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন—

"পাঠক! নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠ্‌লো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুন্‌সি, ছিরে বেণে ও পুঁটে তেলি রাজা হলো।" ['কলিকাতার বারোইয়ারি পুজো'।]

বিধবা বিবাহের মতো উচ্চ আদর্শ এবং ইয়ংবেঙ্গল দলের সংস্কার বন্ধনহীন স্বাধীন চিন্তা সামাজিক অবক্ষয়ে যে উদ্ভটত্বের প্রান্তলগ্ন হতে থাকল পরিহাসরসিকতার সঙ্গে হুতোম তার ছবি এঁকেছেন—

"কর্তার বয়স অধিক হয়েছিল, বিশেষত ঘুঘোটি ইয়ংবেঙ্গালি (বাঁদুরের বাড়া), ঘুষি খেয়ে একেবারে ঘুরে পড়লেন। বাড়ির অন্য অন্য পরিবারেরা হাঁ! হাঁ! করে এসে পড়লো, গিন্নি বাড়ির ভেতর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলেন ও বাবুকে যথোচিত তিরস্কার কত্তে লাগলেন। তিরস্কার, কান্নাও গোলযোগের অবকাশে ফেন্ডেরা পুলিশের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন।

এদিকে বাবুর করুণা উপস্থিত হলো ও মার কাছে গিয়ে বল্লেন, 'মা, বিদ্দেসাগর বেঁচে থাক্। তোমার ভয় কি। ও ওল্ড ফুল মরে যাক্‌না কেন, ওকে আমরা চাইনি; এবারে মা এমন বাবা এনে দেবো যে, তুমি, বাবা ও আমি একত্রে তিনজনে বসে হেলথ্ [ড্রিঙ্ক] করবো, ও ওল্ড ফুল মরে য্যাক্, আমি কোয়াইট রিফর্মড বাবা চাই।" ['কলিকাতার বারোইয়ারি পুজো'।]

হুতোমের তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তথাকথিত প্রগতিশীলতার মধ্যে যেমন ভণ্ডামি ধরা পড়েছে, তেমনি শহরের রক্ষণশীল দলের অনেক সমাজনেতার কপটতা ও অপদার্থতার মুখোশও হুতোমের শ্লেষের আঘাতে একেবারে অনাবৃত হয়ে পড়েছে—

"একশ বেলেল্লা বামুন ও দুইশ মোসাহেব তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হতো—তাতেই পদ্মলোচনের বংশ মহান্ পবিত্র বলে সহরে বিখ্যাত হয়।...... তিনি যেমন হিন্দুধর্মের বাহ্যিক গোঁড়া ছিলেন, অন্যান্য সৎকর্মেও তাঁর তেমনি বিদ্বেষ ছিল ; বিধবা বিবাহের নাম শুনলে তিনি কানে হাত দিতেন— ইংরাজি পড়লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরিজি পড়ান নি—অথচ বিদ্দেসাগরের উপর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে ওঠে নাই—বিশেষত শূদ্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই এটিও তাঁর জানা ছিল, সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও 'বাপকা বেটা সেপাইকা ঘোড়া'র দলেই পড়ে"। ['হঠাৎ অবতার'।]

হুতোমের আপাতরঙ্গের অন্তরালে যে গভীর সমাজ চেতনা এবং সমাজের বিকারগ্রস্ত দুর্দশার জন্য হতাশা ও বেদনা ফল্গুধারার মত ক্রিয়াশীল ছিল নীচের অংশটিতে তার নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায়—

"হায়! যাদের জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে! আজ একশ বৎসর অতীত হলো, ইংরেজরা এদেশে এসেচেন, কিন্তু আমাদের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হয়েচে? সেই নবাবী আমলের বড়মানষী কেতা, সেই পাকানো কাছা, সেই কোঁচান চাদর, লপেটা জুতো ও বাবরি চুল আজও

দ্যাখা যাচ্চে, বরং গৃহস্থ মধ্যস্থ লোকের মধ্যে পরিবর্ত্তন দ্যাখা যায়, কিন্তু আমাদের হুজুরেরা য্যামন তেমনিই রয়েচেন! আমাদের ভরসা ছিল কেউ হঠাৎ বড় মানুষ হলে রিফাইন্ড গোছের বড় মানুষীর নজির হবে কিন্তু পদ্মলোচনের দৃষ্টান্তে আমাদের সে আশা সমূলে নির্ম্মূল হয়ে গ্যালো।" ['হঠাৎ অবতার'।]

এই বেদনার সঙ্গে যখন তীক্ষ্ন শ্লেষ ও বিদ্রূপের ঝাঁজ মিশ্রিত হয়, তখন হুতোমের মুখে শুনি—

"আমাদের এই প্রকার অধঃপতন হবে না কেন? আমরা হামা দিতে আরম্ভ করেই ঝুমঝুমি, চুষী ও সোলার পাখিতে বর্ণপরিচয় করে থাকি, কিছু পরে ঘুড়ি, লাটিম, লুকোচুরি ও বৌ বৌ খেলাই আমাদের যুবত্বের এনট্রান্স কোর্স হয়, শেষে তাস, পাশা ও বড়ে টিপে মাৎ করে ডিগ্রী নিয়ে বেরুই। সুতরাং ঐগুলি পুরনো পড়ার মত কেবল চিরকাল আউড়ে আসতে হয়; বেশীর ভাগ, বয়সের পরিমাণের সঙ্গে ক্রমশ কতকগুলি আনুষঙ্গিক উপসর্গ উপস্থিত হয়।" ['রামলীলা'।]

স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে হুতোমের মিঠেকড়া মন্তব্য তো অবিস্মরণীয়—"বাঙালির স্ত্রীরা কি দ্বিতীয়া 'মিস্ স্নেটা, মিস টমসন ও মিসেস বরকরলি ও লেডী লিটন' হতে পারে না? বিলিতী স্ত্রী হতে বরং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মশীলা—তবে ক্যান বড়ি দিয়ে, পুতুল খেলে, ঝক্‌ড়া ও হিংসায় কাল কাটায়? সীতা, সাবিত্রী, সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্ণা ও তো এই এক খনির মণি? তবে এঁরা যে কয়লা হয়ে চিরকাল ফর্‌নেসে বদ্ধ হয়ে পোড়েন, ও পোড়ান সে কেবল বাপ মা ও ভ্রাতারবর্গের চেষ্টা ও তদ্বিরের ত্রুটি মাত্র। বাঙ্গালী সমাজের এমনি এক চমৎকার রহস্য যে, প্রায় কোন বংশেই স্ত্রী পুরুষ উভয়ে কৃতবিদ্য দেখা যায় না। বিদ্দেসাগরের স্ত্রীর হয়ত বর্ণপরিচয় হয় নাই; গঙ্গাজলের ছড়া—সাফারদের মাদুলি ও বালুসির চন্নামেত্তো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত!" ['কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা'।]

খৃষ্ট ধর্মের প্রতি তৎকালীন লোকের মনোভাব এবং রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কি করে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করতেন তার সরস ব্যঙ্গচিত্র পাওয়া যায়—

"কোথাও পাদরি সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন—কাচে ক্যাটিকৃষ্ট ভায়া—সুবর্ণ চৌকিদারের মত পোষাক—পেনটুলুন টাংট্যাঙে চাপকান,

মাথায় কাল রঙের চোঙ্গাকাটা টুপি। আদালতী সুরে হাত মুখ নেড়ে খ্রীষ্ট ধর্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন্—হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন পুতুল নাচের নকীব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুটে, পাঠশালার ছেলে ও ফিৎওয়ালা একমনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকৃষ্ট কি বলচেন কিছুই বুঝতে পাচ্চে না! পূর্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপমার সঙ্গে ঝকড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রীষ্টান হতো, কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েছে-- আর দিশী খ্রীষ্টানদের দুর্দশা দেখে খ্রীষ্টান হতেও ভয় হয়।" ['কলিকাতার চড়ক পার্বণ'।]

ব্রাহ্মধর্মের কপটতার বিরুদ্ধেও হুতোম শাণিত আঘাত করেছেন—

"আজকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়াকান্না কাঁদতেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুজতে পারবেন না—আড্ডা থেকে না ডাকলে শুনতে পাবেন না; ক্রমে কৃশ্চানী ও ব্রাহ্মধর্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।" ['কলিকাতার চড়ক পার্বণ।']

আবার বৈষ্ণব গোস্বামীরাও হুতোমের তীক্ষ্ম চঞ্চুর আঘাত থেকে অব্যাহতি পান নি। প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম বা হিন্দুধর্ম যে কোন ধর্মই হোক্, যেখানেই ধর্মের আড়ালে কপটতা সেখানেই হুতোম তাঁর বিদ্রুপের নির্মম কশাঘাত করতে ইতস্তত করেননি। "হিন্দুধর্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দে (=দিয়ে) খাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখন একটা রোগা দুর্বল গোঁসাই দেখতে পাইনি। গোঁসাই বল্লেই একটা বিকটাকার ধুম্মলোচন হবে, ছেলেবেলা অবধি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার। গোঁসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোষ্টে আয়েস ও আহার বিহার চলে, বড় বড় বাবুদের পয়সা খরচ করেও সেরূপ জুটে ওঠবার জো নাই। গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান্ বলেই অনেক দুর্লভ বস্তু অক্লেশে ঘরে বসে পান ও কালিয়দমন পুতনাবধ গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি কটা বাজে কাজ ছাড়া বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, ব্রজবিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের গোছালো গোছালো লীলেগুলি করে থাকেন।" ['কলিকাতার বারোইয়ারি পুজো।']

গোস্বামীদের তৎকালপ্রচলিত গুরুপ্রসাদী প্রথার মধ্যে ধর্মের আড়ালে যে অসংযম ও পাপাচারের স্রোত চলেছিল, একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনীতে হুতোম তাকে তীব্র শ্লেষের আঘাতে বিদ্ধ করেছেন—

... ...

"প্রভু খাট থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধরে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানায় নিয়ে গেলেন, কন্যাটি কি করে! 'বংশপরম্পরানুগত ধর্মের অন্যথা কল্লে মহাপাপ' এটি চিত্তগত আছে, সুতরাং আর কোন আপত্তি কল্লে না—সুড়সুড় করে প্রভুর বিছানায় গিয়ে শুলো। প্রভু কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন, 'বল আমি রাধা, তুমি শ্যাম'; কন্যাটিও অনুমতি মত 'আমি রাধা তুমি শ্যাম' তিনবার বলেচে, এমন সময় হরহরি বাবু আর থাকতে পাল্লেন না, খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে এই 'কাঁদে বাড়ি বলরাম' বলে গোস্বামীকে রুলসই কত্তে লাগ্‌লেন; ঘরের বাইরে ন্যাড়া বষ্টুমরা খোল খত্তাল নিয়েছিল—প্রভু প্রসাদীকৃত্য সেরে ভিতর থেকে হরিবোল দিলে খোল খত্তাল বাজাবে; গোস্বামীর রুল সইয়ের চীৎকারে তারা হরিধ্বনি ভেবে দেদার খোল বাজাতে লাগ্‌লো, মেয়েরা উলু দিতে লাগ্‌লো, কাঁসর ঘণ্টা শাঁকের শব্দে হুলুস্থুল পড়ে গ্যালো।" ['কলিকাতার বারোইয়ারি পুজো'।]

হুতোম তাঁর নক্‌শায় শুধু সমাজ ও ধর্ম নয়, সমাজ ও রাজনীতির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার চিত্রটিও স্বকীয় ব্যঙ্গধর্মী স্টাইলে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'মিউটিনি' প্রসঙ্গে হুতোম লিখেছেন—

"পাঠকগণ! একদিন আমরা মিছেমিছি ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় শুনলেম, পশ্চিমের সেপাইরে ক্ষেপে উঠেচে, নানা সাহেবকে চাঁই করে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে, দিল্লীর নেড়ে চীফ্ আবার 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' হবেন—ভারি বিপদ! সহরে ক্রমে হুলস্থুল পড়ে গ্যালো।... ...

বাঙ্গালিরা ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে বড় পটু; খাঁটি হিন্দু (অনেকে দিনের বেলায় খাঁটি হিন্দু) দলে রটিয়ে দিলে যে, "বিধবা বিবাহের আইন পাস ও বিধবা বিবাহ হওয়াতেই সেপাইরে ক্ষেপেচে। গবর্ণমেন্ট বিধবাবিবাহের আইন তুলে দিয়েচেন—বিদ্যেসাগরের কর্ম গিয়েচে—প্রথম বিধবাবিবাহের বর শিরীশের ফাঁসি হবে!" ['মিউটিনি']

নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এবং নীল আন্দোলন সম্বন্ধে হুতোম তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে শুধু টীকাটিপ্পনিই করেননি, অভিনব সুর ও তাল সহযোগে একটি গানও রচনা করেছেন—

"হরিশ মলেন' লঙের মেয়াদ হলো, ওয়েল্‌স্‌ ধমক খেলেন, গ্রান্ট রিজাইন দিলেন, তবু হুজুক মিটলো না। চাসার ছেলেরা লাঙল ধরে মুড়ো ও মুড়ি খেতে খেতে ক্ষেতে ক্ষেতে—

গান

সুর 'হাঃ শালার গরু', তাল 'টিট্‌কিরি ও ল্যাজ মলা'।
উঠলো সে সুখ, ঘটলো অসুখ মনে, এত দিনে।
মহারাণীর পুণ্যে মোরা, ছিলাম সুখে এই স্থানে।।
উঠ্‌লো খামার ভিটে ধান, গ্যাল মানী লোকের মান,
হ্যান সোনার বাংলা খান, পোড়ালে নীল হনুমান।।"

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় ব্যঙ্গবিদ্রূপের শাণিত অস্ত্রপ্রয়োগে সমাজের দুর্নীতিবিচ্যুতি, কুরীতি ও কদাচার সংশোধনের যে মহৎ উদ্দেশ্য ছিল তা যে অনেকটা সফল হয়েছিল, নকশার 'দ্বিতীয়বারের গৌরচন্দ্রিকা'য় সেকথার উল্লেখ আছে—"যেগুলো হতভাগা, হুতোমের লক্ষ্য, লক্ষ্মীর বরযাত্র, পাজীর টেক্কা ও বজ্জাতের বাদ্‌শা, তারা 'দেখি হুতোম আমায় গাল দিয়েছে কিনা? কিম্বা কি গাল দিয়েছে' বলেও অন্তত লুকিয়ে পড়েচে; সুদু পড়া কি,—অনেকে সুদ্‌রেচেন' সমাজের উন্নতি হয়েচে ও প্রকাশ্য বেলেল্লাগিরি বদমাইশি ও বজ্জাতির অনেক লাঘব হয়েচে। একথা বলাতে আমাদের আপনা আপনি বড়াই করা হয় বটে, কিন্তু এটি সাধারণের ঘরকন্নার কথা Household Words."

শুধু লেখকের নিজের কথা নয়, অন্যান্য সাক্ষ্য থেকেও হুতোমের এই দাবীর সত্যতা প্রমানিত হয়। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় যে গভীর সমাজচেতনা প্রকাশিত হয়েছে এবং সমাজের যেখানেই দুর্বলতা ও বিকৃতি দেখা দিয়েছে সেখানেই হুতোমের তীব্র কশাঘাত এসে পড়েছে সেকথা স্বীকার করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা, হুতোম পেঁচার ন্যায় লেখক এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া বড়ই আবশ্যক।"[৭] কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর প্যারীমোহন কবিরত্ন একটি গান রচনা করে তাতে লিখেছিলেন—

"কম লিখেছে কি হুতোম পেঁচায়, টের পেয়েছেন অনেক বাছায়,
অনেকের দোষ শুধরে গেছে, যারা ছিল দোষের সাগর।"

এজন্য 'হ্তোম প‍্যাচার নক্শা'র সমাজ চেতনার কথা বলতে গিয়ে কালীপ্রসন্নের সমকালীন লেখক এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রথম পথিকৃৎ রূপে গণ্য রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে' লিখেছেন, "হ্তোম প‍্যাচার নক্সা বঙ্গভাষায় অপূর্ব সামগ্রী। ইহা পাঠে কলিকাতার তৎকালীন বাহ্য ও আভ্যন্তরীন অবস্থার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।" শুধু পূর্ববর্তী কালের সমালোচকেরাই নয়, শতাধিক বৎসরের দূরত্ব পেরিয়ে আসার পরে আধুনিক কালের সাহিত্য সমালোচক ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা ডঃ সুকুমার সেন ও তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খণ্ডে স্বীকার করেছেন, "ঐতিহাসিকের কাছে নক্শার বিবরণগুলি অতিশয় আদরণীয়।......কলিকাতা শহরের বাঙ্গালী অঞ্চলের জনযাত্রার যে ছবি আছে তাহার অনেক অংশই ফোটোগ্রাফের মত। যখন বইটি বাহির হয় তখন নক্শার ছবিগুলি পাঠকদের পরিচিত ছিল তাই ব্যঙ্গবিদ্ধ ব্যক্তিরাই তাহাদের দৃষ্টি অধিকার করিয়াছিল। এইজন্য সমসাময়িক সহৃদয় সমালোচকেরা হ্তোম প‍্যাচার নক্শাকে প্রশংসা করিতে পারেন নাই। (সমসাময়িক অনেক সমালোচকই যে 'হ্তোম প‍্যাচার নক্শা'র প্রশংসা করেছিলেন তা আমরা ওপরে দেখিয়েছি। এখানে ডঃ সেন সম্ভবতঃ বঙ্কিমের বিরুদ্ধ সমালোচনার ইঙ্গিত করেছেন; বিষয়টি পরে আলোচিত হবে।) কিন্তু আমাদের কাছে এখন হুতোমের কলিকাতা দূর-অতীতের কল্পনাদৃশ্যে পরিণত। ব্যঙ্গের যাঁহারা লক্ষ্য তাঁহাদের জেনারেশন কবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই হুতোমের নিন্দাপঙ্কে আজ গ্লানিগন্ধ নাই। শুধু পুরানো দিনের কলিকাতার ছবিই এখন আমাদের সামনে ফুটিয়া উঠে। এই ঐতিহাসিক রসটুকু হ্তোম পঁ্যাচার নক্শার স্থায়ী মূল্য।" ডঃ সেনের এই অভিমত আমরা যথার্থ বলে স্বীকার করি এবং সেই সঙ্গে একথাও বলি যে এই ঐতিহাসিক রস ছাড়াও এর আরও কিছু স্থায়ী মূল্য আছে।

(৫)

প্রকৃতপক্ষে এই সমাজচেতনা এবং ঐতিহাসিক রস ছাড়া 'হ্তোম প‍্যাচার নক্শা'য় পরিবেশিত হাস্যরসও তার স্থায়ীমূল্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। 'হ্তোম প‍্যাচার নক্শা'র শুরুতে স্বয়ং হ্তোমের ঘোষণাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

হে সজ্জন, স্বভাবের সুনির্মল পটে
রহস্যরসের রঙ্গে,
চিত্রিনু চরিত—দেবী সরস্বতী বরে।

'স্বভাবের সুনির্মল পটে'ই যে তিনি শুধু চিত্রাঙ্কন করেছেন তাই নয়, তাকে 'রহস্যরসের রঙ্গেও' রাঙিয়ে তুলেছেন। নক্শার মধ্যে সমাজের বিকৃতি ও দুষিতক্ষত সংশোধনের মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও হুতোম কখনো সোজাসুজি নীতির বেত্রদণ্ড হাতে সমাজ-শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শাসনের ভঙ্গিতে সেকথা বলেন নি; নীতিপ্রচার অপেক্ষা সমাজের বাস্তব অবস্থা চিত্রণের মধ্য দিয়ে রঙ্গরসিকতা করাই ছিল হুতোমের প্রধান উদ্দেশ্য। তাছাড়া নক্শার মধ্যে যেখানে প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্তিগত ইঙ্গিত ছিল, তাও আজ সাময়িকতার সীমা পেরিয়ে এসেছে বলে তার ভিতরকার হাস্যরসটুকুই প্রধান উপভোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছে আর তা যে হতে পেরেছে তার একটা বড় কারণই হল নক্শায় চিত্রিত ব্যক্তিগুলি প্রায়শঃই তাদের সংকীর্ণ ব্যক্তিসীমা ছাড়িয়ে গিয়ে শ্রেণী চরিত্রের প্রতীক হয়ে উঠতে পেরেছে। সামাজিক নক্শার মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টির এই কৌশল নিঃসন্দেহে আধুনিক কালের সৃষ্টি এবং পূর্ববর্তী ভবানীচরণ-প্যারীচাঁদধারার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সুইফ্ট্, ডিকেন্স্ এবং এডিসনের ব্যঙ্গসাহিত্যের সমন্বয়ে বাংলাসাহিত্যে কালীপ্রসন্নের হাতেই এর প্রথম সার্থক প্রতিষ্ঠা। এখানে একথাও স্মরণীয়, কালীপ্রসন্ন যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র, তখন হিন্দু কলেজের পাঠ্যতালিকায় এডিসনের স্থান ছিল; তাছাড়া কালীপ্রসন্নের গৃহ-শিক্ষক কার্কপ্যাট্রিক সাহেবের সান্নিধ্যেও সুইফ্ট্, ডিকেন্স্ এবং এডিসনের ব্যঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের পরিচয় হওয়া অসম্ভব নয়। কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পরবৎসর স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, "he is known to fame and familiar to almost every Bengali as the author of 'Hutam Pyancha' a collection of sketches of city life, something, after the manner of Dickens' 'Sketches by Boz' in which the follies and peculiarities of all classes…are described in racy vigorous language…"[৮] তথাপি একথাও এখানে বলা প্রয়োজন যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় এই পাশ্চাত্ত্য প্রভাব থাকলেও তৎকালীন কলকাতার বাঙালী সমাজের পটভূমিকায় এই নক্শা শুধুমাত্র অনুকরণ না হয়ে মৌলিক সৃষ্টির দ্যুতিতেই ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তবে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে এসেই বাংলা সাহিত্যের আদি মধ্যযুগীয় হাস্যরস যে (সামান্য কিছু

ব্যতিক্রম সত্ত্বেও) তার অশ্লীলতা এবং ভাঁড়ামির পর্যায় থেকে উন্নীত হয়ে হিউমার, উইট, স্যাটায়ার, ফান্ প্রভৃতি বৈচিত্র্য সৃষ্টি সন্ধানী হয় সেকথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা চলে। এখন হাস্যরসের প্রকারভেদ সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ বিশ্লেষণ করে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র হাস্যরসের রীতি-প্রকৃতি বিচার করে দেখা যেতে পারে।

হাস্যরসের উদ্ভব, বৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিভাগে যে দুটি মতবাদ সর্বাধিক প্রচলিত সেগুলি হল নিকৃষ্টতাবাদ (theory of degradation) এবং অসঙ্গতিবাদ (theory of incongruity)।

নিকৃষ্টতাবাদের আদি, প্রবর্তক এরিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্স' গ্রন্থে হাস্যরসে কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন—'some defect or ugliness which does not imply pain'। এই নিকৃষ্টতাবাদ বা নিজের তুলনায় অপরের ত্রুটি বা অধঃপতন যদি কিছুটা মজার দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়, সেকথা ফ্রয়েডও স্বীকার করেছেন—'our laughing is the expression of a pleasurably perceived superiority।' কিন্তু বার্গস' যখন বলেন, '....in laughter we always find an avowed intention to humiliate and consequently to correct our neighbour' তখন তাঁর মন্তব্যের অন্যান্য অংশ মেনে নিলেও ঐ 'always' কথাটি মেনে নেওয়া যায় না যেহেতু সবরকমের হাস্যরস সম্বন্ধে এ মতবাদ প্রযোজ্য হতে পারে না।

আবার বিপক্ষবাদীদের মধ্যে দার্শনিক কান্ট এবং সোপেনহাওয়ার 'অসঙ্গতিবাদ' বা theory of incongruityর উপর জোর দিয়েছেন। তাঁদের মতে শ্রেষ্ঠতাবোধ থেকে হাসির উৎপত্তি নয়, হাসির উৎপত্তি এমন এক ধরণের সহানুভূতি বা সমত্ববোধ থেকে যা হঠাৎ কোন একটি ঘটনা ও ধারণার ভিতর অসঙ্গতি আবিষ্কার করে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সোপেনহাওয়ার আবার বার্গস'র মতই ভুল করে বসেন যখন তিনি বলেন, 'In every instance the phenomenon of laughter indicates the sudden perception of an incongruity between a conception and a real object", কারণ ঘটনা ও ধারণার মধ্যে অসঙ্গতি হাসির সৃষ্টি করলেও তা সকল রকম হাস্যরসের কারণ হতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে নিকৃষ্টতাবাদ এবং অসঙ্গতিবাদের মধ্যে কোনটিই সব শ্রেণীর হাস্যরসের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। আমাদের মনে হয়, humour বা fun ধর্মী হাস্যরসের পক্ষে অসঙ্গতিবাদ (theory of incongruity) এবং wit বা Satire ধর্মী হাস্যরসের পক্ষে নিকৃষ্টতাবাদ (theory of degradation) বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এমন কি wit বা satire এর পিছনে কোথাও সূক্ষ্মভাবে অসঙ্গতিবোধ কাজ করলেও নিকৃষ্টতাবাদ বা theory of degradationই যে তার নিয়ামক শক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তবে অসঙ্গতিবাদই হোক্, আর নিকৃষ্টতাবাদই হোক্, উভয়ক্ষেত্রেই বার্গসঁর এই সিদ্ধান্তটি সমীচীন মনে হয়—'Indifference is its natural environment, for laughter has no greater foe, than emotion.' কিন্তু এই উদাসীনতাও সকল বিষয়ে উদাসীনতা নয়, যেহেতু উদাসীন ব্যক্তি কখনো হাস্যরসিক হতে পারে না ; এই উদাসীনতা কেবল হাস্যরসসৃষ্টির খণ্ড মুহূর্তটিতে ক্রোধ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, করুণা প্রভৃতি ভাবাবেগের তীব্রতার প্রতি উদাসীনতা। আমরা 'ভাবাবেগের তীব্রতার প্রতি উদাসীনতা' কথাটি খুব সচেতনভাবেই ব্যবহার করছি এইজন্য যে humour এর মধ্যে সহানুভূতি ও করুণা satire এর মধ্যে কোথাও ঘৃণা, কোথাও বিদ্বেষ খুব সূক্ষ্মভাবে বর্তমান থাকে যেহেতু humour এর জন্মই হচ্ছে সমত্ববোধ থেকে এবং satire-এর জন্ম শ্রেষ্ঠতাবোধ থেকে। এই জন্য হিউমারের মধ্যে হাস্যরসের স্রোতের তলায় থাকে সমবেদনার ফল্গুস্রোত ; এইজন্য হিউমারের হাসি শুধু হাসিতে উজ্জ্বল নয়, করুণায় আর্দ্র, হিউমারের হাসি মুখ থেকে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই চোখের কোণে জলের আভাস দিয়ে যায়। কিন্তু স্যাটায়ারের হাসিতে মধু এবং হুল একসঙ্গে থাকে। হাসির আবরণে সমাজের দোষ-ত্রুটি-অসঙ্গতি-বিকৃতি সংশোধনের প্রেরণাই স্যাটায়ারের প্রধান অবলম্বন। হিউমার এবং স্যাটায়ার ছাড়া হাস্যরসের আর একটি তীব্র, তীক্ষ্ম প্রকাশভঙ্গি হল উইট যা বিশেষভাবে শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের চমৎকারিত্বে বিদ্যুৎচমকের মত হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এইজন্য হিউমারের হাসিতে অনুভূতির প্রাধান্য, কিন্তু স্যাটায়ার এবং উইটের হাসিতে বুদ্ধির প্রাধান্য। তথাপি হিউমার, উইট এবং স্যাটায়ারের মধ্যে একটা চিন্তার শৃঙ্খলা এবং কার্যকারণের পারম্পর্য লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু ফান্ বা কৌতুকহাস্যের সৃষ্টি হয় এমন এক উদ্ভট অবস্থা, পরিবেশ ও চরিত্রের মধ্যে যেখানে আপাত অনিয়ম ও চিন্তার বিশৃঙ্খলার পিছনে

কোন একটি সত্যকার ত্রুটি বা অসঙ্গতির চেহারা আবিষ্কার করে আমরা হাসিতে হাসিতে উতরোল হয়ে উঠি।

কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় কিছু কিছু হিউমার এবং ফান্ থাকলেও উইট এবং স্যাটায়ারেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাবে। প্রকৃতপক্ষে উনিশশতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের কলকাতার নাগরিক সমাজের কপটতাশ্রয়ী ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল রকম হাস্যকর অসঙ্গতি এবং বিকৃতি হুতোমের সচেতন মনের শ্রেষ্ঠতাবোধ নিয়ন্ত্রিত অব্যর্থ ব্যঙ্গবিদ্রুপের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' গ্রন্থে প্রমথনাথ বিশী সাহিত্যে হাসির রূপকাশ্রয়ী শ্রেণীবিভাগ করে বলেছেন, "অনেকের হাসি শিউলিফুলের মতো, ওষ্ঠাশ্রয়ী, একটুতেই ঝরিয়া পড়ে। অনেকের হাসি রজনীগন্ধার মতো দু এক ফোঁটা শিশিরসম্পাত না হইলে ফুটিতে চায় না, সে হাসি সদ্যঃপাতী না হইলেও বড়ো ম্লান এবং করুণ, ধরিতে সাহস হয় না, কখন ঝরিয়া পড়িবে। অনেকের হাসি প্রস্ফুটিত রক্তগোলাপের জ্বলন্ত বুদ্বুদের মতো, কঠিন বৃন্তে বিধৃত এবং তীক্ষ্ন কাঁটায় সুরক্ষিত।" হুতোমের হাসি এই শেষোক্ত শ্রেণীর হাসি। তবে প্রকৃত হাস্যরসিক যেমন শুধু হাসির আঘাতে অপরকেই বিব্রত করেন না, নিজেকেও সেই হাসির লক্ষ্যীভূত করেন, হুতোমও তেমনি 'নকশা'র মধ্যে যেমন সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসঙ্গতি ও বিকৃতিকে ব্যঙ্গ করেছেন, তেমনি মাঝে মাঝে নিজেকেও সেই ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত করতে ছাড়েন নি। তাছাড়া নকশার মধ্যে যেখানে ছদ্মনামের আড়ালে কোন ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে সেখানেও সেই ব্যঙ্গ কেবল ব্যক্তিসীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে শ্রেণীচরিত্রের দ্যোতক হয়ে ওঠায় এবং সেইসব ব্যঙ্গবিদ্ধ ব্যক্তিরা সময়ের ব্যবধানে হারিয়ে যাওয়ায় ব্যক্তিগত প্রসঙ্গগুলিও আজ সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক হয়ে পড়েছে। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রথম খণ্ডের 'ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা'য় হুতোম ঘোষণা করেছেন—"সত্য বটে অনেকে নকশাখানিতে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এই মাত্র বলতে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ংও নকশার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।" প্রথমে হুতোম নিজেকে নিয়ে যে ব্যঙ্গরস সৃষ্টি করেছেন তার কিছুটা পরিচয় দেওয়া যাক্। "ক্রমে...গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠলো— কখন বোধ হতে লাগলো কিছুদিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হবো (ওঃ শ্রীবিষ্ণু, কালিদাস বড় লম্পট ছিলেন), তা হওয়া হবে না, তবে কি ব্রিটেনের

বিখ্যাত পণ্ডিত জনসন ? না (তিনি বড় গরিবের ছেলে ছিলেন) সেটি বড় অসঙ্গত হয়, তবে রামমোহন রায় ? হ্যাঁ, একদিন রামমোহন রায় হওয়া যায়—কিন্তু বিলেতে মত্তে পার্‌বো না।

ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচজনে চিনবে, সেই চেষ্টাই বলবতী হলো. তারই সার্থকতার জন্যই যেন আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজ্‌লেম—গ্রন্থকার হয়ে পড়লেম—সম্পাদক হতে ইচ্ছা হলো—সভা কল্লেম– ব্রাহ্ম হলেম—তত্ত্ববোধিনী সভায় যাই –বিধবাবিয়ের দালালি করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকেদের উপাসনা করি —আন্তরিক ইচ্ছে যে, লোকে জানুক যে, আমরাও ঐ দলের একজন ছোটখাট কেষ্টবিষ্টুর মধ্যে !"

['মরাফেরা']

এবার হুতোমের স্যাটায়ারধর্মী হাস্যরসে যেখানে সমাজের বিকৃতি ও অসঙ্গতি ব্যঙ্গবিদ্ধ হয়েছে তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্‌।

"মা দুর্গা খান বা না খান, লোকে দেখে প্রশংসা কল্লেই বাবুর দশটাকা খরচের সার্থকতা হবে।" ['দুর্গোৎসব'।]

কিংবা,

"ছোটলোক মাতালের ভাগ্যে চারি আনা জরিমানা—এক রাত্তির গারদে বাস—পাহারাওয়ালাদের ঝোলায় শোয়ার হয়ে যাওয়া ও জমাদারের দুই এক কোৎকামাত্র, কিন্তু বাঙ্গালি বড়মানুষ মাতালদের সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। পাকি হয়ে উড়্‌তে গিয়ে ছাত থেকে পড়ে মরা—বাবার প্রতিষ্ঠিত পুকুরে ডোবা, প্রতিমের নকল সিংগি ভেঙ্গে ফেলে আসল সিঙ্গি হয়ে বসা, ঢাকীরে মার সঙ্গে বিসর্জন দেওয়া, ক্যাণ্টনমেণ্ট ফোর্ট রেলওয়ে এণ্টেশন ও অক্‌সনে মদ খেয়ে মাতলামি করে চালান হওয়া।…" ['কলিকাতার বারোইয়ারি পুজো'।]

আবার স্যাটায়ারের সঙ্গে ফান্‌ মিশিয়ে হজরতকে লণ্ডনে পাঠিয়ে এবং কালী ও কেষ্টর মধ্যে কে বড় ময়ূরের ল্যাজ ধরে তার হিসাব করে হুতোম এক বিচিত্র হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন—"রামহরিবাবু কুটি থেকে এসে পাত্র টেনে গোলাপী রকম নেশায় তর্‌ হয়ে বসেছিলেন। এক মোসায়েব বাঁয়ার সঙ্গতে 'অব হজরত যাতে লণ্ডন কো' গাচ্চেন, আর একজন মাতায় চাদর দিয়ে বাইয়ানা নাচের উদ্‌জুগ্‌ কচ্চেন ; এমন সময় বোস্‌বাবুর পত্র নিয়ে গোস্বামী-মশাই উপস্থিত হলেন।

রামহরিবাবু গোস্বামীকে বল্লেন, 'প্রভু! বষ্টুমতন্ত্রের কটি বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ আছে, আপনাকে মীমাংসা করে দিতে হবে; প্রথম, কেষ্টর সঙ্গে রাধিকার মামী-সম্পর্ক, তবে ক্যামন করে কেষ্ট রাধারে গ্রহণ কল্লেন?'

দ্বিতীয়, 'একজন মানুষ (ভাল, দেবতাই হলো) যে ষোল শত স্ত্রীর মনোরথ পূর্ণ করেন, এ বা কি কথা?'

তৃতীয়, 'শুনেছি, কেষ্ট দোলের সময় মেড়া পুড়িয়ে খেয়েছিলেন, তবে আমাদের মটন চাপ্ খেতে দোষ কি? আর বষ্টুমদের মদ খেতে বিধি আছে; দেখুন, বলরাম দিনরাত মদ খেতেন, কৃষ্ণও বিলক্ষণ মাতাল ছিলেন।' প্রশ্ন শুনেই গোস্বামীর পিলে চম্‌কে গ্যালো, পালাবার পথ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন; এদিকে বাবুর দলে মুচকি হাসি, ইসারা ও রূপোর গেলাসে দাওয়াই চল্‌তে লাগলো। গোস্বামী মনের মত উত্তর দিতে পারলেন না বলে একজন মোসাহেব বলে উঠ্‌লো, 'হুজুর! কালীই বড়; দেখুন—কালীতে ও কেষ্টতে ক পুরুষের অন্তর, কালীর ছেলে কার্ত্তিক—তার বাহন ময়ূর—ময়ূরের যে ল্যাজ—তাই কেষ্টোর মাতার উপর, সুতরাং কালীই বড়।' একথায় হাসির তুফান উঠ্‌লো।"
['কলিকাতার বারোইয়ারি পুজো'।]

হুতোম তাঁর হাস্যরস পরিবেশনে মাঝে মাঝে বিশেষভাবে উইট্-এরও আশ্রয় নিয়েছেন, যেমন —"কলকেতায় কেরাঞ্চি গাড়ি বেতো রোগীর পক্ষে বড় উপকারক, (গ্যালবানিক শকের) কাজ করে। সেকেলে আসমানি দোলদার ছক্কড় যেন হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই কলকেতা থেকে গা ঢাকা হয়েচে—কেবল দুই এক খানা আজও খিদিরপুর ভবানীপুর, কালীঘাট আর বারাসতের মায়া ত্যাগ কত্তে পারেনি বলেই আমরা কখন কখন দেখতে পাই।" ['কলিকাতার বারোইয়ারি পুজো'।]

হুতোমের নক্‌শায় হিউমার খুব কম থাকলেও তা যে একেবারে নেই, তা নয়। একবার একচক্ষুকাণা এক সোনার বেণের কাছে বারোইয়ারি পুজোর চাঁদা আদায় করতে গিয়ে যখন চাঁদা আদায়কারীরা খুব বিব্রত হয়ে পড়েছেন এইজন্য যে সোনার বেণেটি কোন বাজে খরচ করেন না বলে চাঁদা হিসেবে একটি পয়সাও দেবেন না, তখন দেখা গেল—"কেবল বাজে খরচের মধ্যে একটা চক্ষু, কিন্তু চশমায় দুখানি পরকোলা বসান; তাই দেখে বারোইয়ারি অধ্যক্ষেরা ধরে বসলেন, 'মশাই। আপনার বাজে খরচ ধরা পড়েছে, হয় চশমাখানির একখানি পরকোলা খুলে ফেলুন, নয় আমাদের কিছু দিন।'

বেণেবাবু একথায় খুশি হলেন, শেষে অনেক কষ্টে দুটি সিকি পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হয়েছিলেন।" ['কলিকাতার বারোইয়ারি পুজো।']

এবার 'হুতোম পঁ্যাচার নক্‌শা' থেকে দুটি বিশুদ্ধ ফান্‌-এর উদাহরণ দিয়ে হুতোমের হাস্যরসের দৃষ্টান্ত দেওয়ার লোভ সংবরণ করব। প্রথম ফান্‌টি জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষ্যে

"ব্যালা আট্‌টার সময় যাত্রা ভাংলো, একজন বাবু পাত্র টেনে বিলক্ষণ পেঁ্যকে যাত্রা শুনছিলেন, যাত্রা ভেঙ্গে যাওয়াতে গলায় কাপড় দিয়ে প্রতিমে প্রণাম কত্তে গ্যালেন (প্রতিমে হিন্দুশাস্ত্র সম্মত জগদ্ধাত্রী মুর্ত্তি), কিন্তু প্রতিমার সিংগি হাতীকে কামড়াচ্চে দেখে বাবু মহাত্মার বড়ই রাগ হলো ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে করুণ সুরে—

"তারিণী গো মা কেন হাতীর উপর এত আড়ি।
মানুষ হলে টেড্‌টা পেতে তোমায় যেতে হতো হরিণ বাড়ি।
সুরকি কুটে সারা হতে, তোমার মুকুট যেতো গড়াগাড়ি।
পুলিসের বিচারে শেষে সঁপতো তোমায় গ্র্যান্‌যুড়ি।
সিঙ্গিমামা টেরটা পেতেন ছুটতে হতো উকীল বাড়ি।'

গান গেয়ে প্রণাম করে চলে গেলেন।" ['কলিকাতার বারোইয়ারি পুজো'।]

আবার রথের দিনে রথ দেখে একটি মাতালের মুখে হুতোম যে গান রচনা করেছেন, তাতেও ফান্‌ বা কৌতুকরস উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছে! "ক্রমে রথ এসে পড়ল।...দর্শকদের ভিড়ের ভিতর একটা মাতাল ছিল, সে রথ দর্শন করে ভক্তি ভরে মাত্‌লাম সুরে—

কে মা রথ এলি ?
সর্বাঙ্গে পেরেক মারা চাকা ঘুরঘুরালি।
মা তোর সামনে দুটো ক্যেটো ঘোড়া,
চুড়োর ওপর মুক্‌ পোড়া,
চাঁদ চামুরে ঘন্টা নাড়া,
মধ্যে বনমালী।
মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা
লোকের টানে চলচে চাকা,

আগে পাছে ছাতা পাখা,
বেহদ্দ ছেনালি।
গানটি গেয়ে 'মা রথ! প্রণাম হই মা' বলে প্রণাম কল্লে।"

(৬)

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল এর ভাষা। কালীপ্রসন্ন তাঁর নকশায় এবং প্যারীচাঁদ তাঁর আলালের ঘরের দুলালে যে সংস্কৃতবিদ্যাভিমানী পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ভাষার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সেই সম্প্রদায়ের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন—"আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না,—'খদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ 'ঘৃতে' নামিতেন।...আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ, শিশুমার অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ংকর ছিল তাহা বলা বাহুল্য।"[৯] এই সংস্কৃতগন্ধী কৃত্রিম ভাষা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছুটা সংস্কার প্রাপ্ত হয়ে প্রথম সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠলেও অক্ষয়কুমার দত্তের সংস্কৃতানুসারী ভাষার দুরূহতা ও কৃত্রিমতা সাধারণ শিক্ষিত সমাজে কিরূপ পরিহাসের বিষয় ছিল, শিবনাথ শাস্ত্রী তার পরিচয় দিয়েছেন—"অক্ষয়বাবু যখন সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়া 'জিগীষা', 'জিজীবিষা' প্রভৃতি শব্দ প্রণয়ন করিলেন, তখন আমরা কলিকাতার যে কোনও শিক্ষিত লোকের বাটীতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম, 'জিগীষা' 'জিজীবিষা' প্রভৃতি শব্দের সহিত 'চিচ্‌চীমিষা' শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইতেছে।"[১০]

বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত মুখিনতার এই বন্ধন থেকে উদ্ধার করার জন্য প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে'র মূল্যায়ণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর

'বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' নিবন্ধে লিখেছেন—"উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়।"

বঙ্কিমের এই সমালোচনার সূত্র ধরে প্যারীচাঁদ বাংলা সাহিত্যে কথ্যরীতির প্রবর্তক রূপে এ পর্যন্ত অতিমূল্যায়িত হয়ে এসেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাষার কঠিন গাম্ভীর্যের পরিবর্তে একটা হালকা চাল আনার কৃতিত্ব 'আলালে' থাকলেও একটু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখা যাবে 'আলালে' খাঁটি কথ্যরীতি নেই। সাধু গদ্যরীতির আধারে কিছু লঘু চলিত শব্দ ব্যবহারই আলালীভাষার বৈশিষ্ট্য, যেমন—"বটতলার বক্রেশ্বরবাবু...যাবতীয় বড়মানুষের বাটিতে যাইতেন ও সকলকেই বলিতেন—আপনার ছেলের আমি সর্বদা তদারক করিয়া থাকি—মহাশয়ের ছেলে, না হবে কেন ? সে তো ছেলে নয়, পরশপাথর ! স্কুলের উপর ক্লাসের ছেলেদিগকে পড়াইবার ভার ছিল, কিন্তু যাহা পড়াইতেন তাহা নিজে বুঝিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।" সে তুলনায় 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় যে বিশুদ্ধ চলিতরীতি ব্যবহৃত হয়েছে পূর্বে সংকলিত বিস্তৃত উদাহরণমালা থেকে যে কোন দু'একটি পংক্তি তুলে ধরলেই তার পরিচয় মেলে। যেমন—"আমরা হামা দিতে আরম্ভ করেই ঝুমঝুমি, চুষি ও সোনার পাখিতে বর্ণপরিচয় করে থাকি, কিছু পরে ঘুড়ি, লাটিম, লুকোচুরি ও বৌ বৌ খেলাই আমাদের যুবত্বের এনট্রান্স কোর্স হয়, শেষে তাস, পাসা ও বড়ে টিপে মাৎ করে ডিগ্রী নিয়ে বেরুই।" আলালের ভাষায় সাধুরীতি ও চলিতরীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে, কিন্তু হুতোমের নকশায় শব্দ ব্যবহারে, ক্রিয়াপদও সর্বনাম পদের চলিত রূপপ্রয়োগে, বাচনভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে, এমনকি বানান পদ্ধতির মধ্যেও চলিত ভাষা তার উদ্ভবলগ্নেই স্বকীয় স্বভাবের প্রায় পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পেরেছে। অবশ্য এখানে একথাও স্মরণ করা প্রয়োজন, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রামনারায়ণের 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকের স্ত্রীচরিত্রগুলির সংলাপে এবং কোথাও নিম্নজাতীয় পুরুষ চরিত্রের সংলাপে যে কথ্যভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, এবং বানান পদ্ধতির মধ্যে যে কথ্য ঢংটুকু তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, তাতে হুতোমী ভাষার কিছুটা পূর্বাভাষ লক্ষ্য করা যায়। তবে 'কুলীন কুল সর্বস্বে'র কথ্য ভাষা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র কথ্য ভাষার মতো সার্বিক নয়, কয়েকটি মাত্র চরিত্রের কিছু সংলাপ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত

কালীপ্রসন্নের 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকে আংশিকভাবে স্ত্রীচরিত্রের সংলাপে এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মালতীমাধব' নাটকের প্রায় আগাগোড়া যে চলিত রীতি ব্যবহৃত হয়েছে এবং বানানে যে চলিত উচ্চারণের ঢং বজায় রাখা হয়েছে তাকে কালীপ্রসন্নের চলিতরীতি রচনার ক্রমবিকাশের পথে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র ভাষার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যাই হোক্ ভাষা-শিল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র এই অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের সম্যক বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

এই হুতোমী ভাষার ওপরেই 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র সাহিত্যিক মূল্য বিশেষভাবে নির্ভরশীল। হুতোমী ভাষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—

১। কলকাতার চলতি মুখের বুলি (তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশী-বিদেশী শব্দ) এবং বাংলার নিজস্ব প্রবাদ প্রবচন ব্যবহারের প্রাধান্য।

২। শব্দরূপ, ধাতুরূপ এবং সর্বনাম পদের চলিত রূপের ব্যবহার।

৩। শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার।

৪। চলিত রীতির আধারে ভাষার স্বচ্ছতা ও সংক্ষিপ্তি।

৫। বর্ণনীয় বিষয়ের নিপুণ চিত্রধর্মিতা।

৬। বাক্যগঠনরীতি কথনভঙ্গিমায় স্বচ্ছন্দ এবং প্রাণের প্রবাহে গতিময় ও চঞ্চল।

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় তদ্ভব-অর্ধতৎসম-দেশী-বিদেশী মিশ্রিত কলকাতার চলতি মুখের বুলি, যেমন—

"কলকেতা সহর বড়ই গুলজার, গাড়ির হর্‌রা, সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে (=তাপেতে=গর্বে) রাস্তা কেঁপে উঠ্‌চে– বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়।"

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দের মধ্যে তৎকালপ্রচলিত কথ্য ভাষায় অধিক ব্যবহৃত আরবী-ফারসী এবং ইংরেজী শব্দের ব্যবহারই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথমে নক্শায় ব্যবহৃত এই ধরণের কিছু বিশেষ আরবী-ফারসী শব্দপ্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া যাক্—

"..কাল সকালেই একজন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি ক্যাপ্দানি ও ক্যারামত জাহির করবেন।" "কলকেতায় কেরাঞ্চি গাড়ি বেতো রোগীর পক্ষে

বড় উপকারক,…সেকেলে আসমানি দোলদার ছক্কড় যেন হিন্দুধর্মের সঙ্গেসঙ্গেই কলকেতা থেকে গা-ঢাকা হয়েচে।"

ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক বেশি হওয়ায় এবং ইংরেজী রাজভাষা হওয়ায় কালীপ্রসন্নের সময়ে বাংলা কথাভাষায়, বিশেষতঃ নাগরিক সমাজের কথাভাষায় ইংরেজী শব্দের ব্যবহার অন্য যে কোন বিদেশী শব্দের তুলনায়, এমনকি আরবী-ফারসী শব্দের চেয়েও অনেক বেশি হয়েছে। হুতোম যেহেতু কলকাতার কথাভাষাকেই অবলম্বন করেছেন, সেজন্য তাঁর ভাষাতেও ইংরেজি শব্দের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে এখানে একটি কথা স্মরণীয় যে হুতোম কেবল তাঁর ভাষাকে ইস্পাতের মতো শাণিত ও ঝক্‌ঝকে করার জন্যই প্রয়োজন মত বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং প্রায় সর্বদাই তার একটা সীমা রক্ষা করেছেন, বিদেশী শব্দ ব্যবহারের অহেতুক বাড়াবাড়িতে ভাষাকে ভারাক্রান্ত করেন নি। এখন নক্‌শা থেকে কিছু ইংরেজী শব্দ ব্যবহারের নমুনা দেওয়া যাক্‌—

"হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ বাসি না হলে গ্রাহকরা পান না—ইংরাজি কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেকফাস্টের সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যক।"

কিংবা, "পাঁঠারা রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট বাজারে প্যারেড কত্তে লাগ্‌লো।" কিংবা "আজকাল দুচার এজুকেটেড ইয়ংবেঙ্গালও পৌত্তলিকতার দাস হয়ে পুজো আচ্ছা করে থাকেন…আলাপী ফিমেল ফ্রেণ্ডরাও নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন।"

এই রকম আরও কিছু ইংরেজী শব্দের ব্যবহার যেমন—

"আদবুড়ো বেতোরা মর্ণিংওয়াকে বেরুচ্চেন", "কেউ সিভিলিজেসনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন," "কারো ইণ্ডিয়া রবর আর চাইনা কোট, হাতে ইষ্টিক," "তিন চারটি ইকুটি, দুটো কমন লা আদালতে ঝুলছে।"

এই বিদেশী শব্দ ব্যবহারে বাড়াবাড়ি কখনো কখনো হলেও, যেমন, "বাবুর বুজরুকি ও কেরামতের অনিয়ত এন্‌সাফ্‌ করে থাকেন" তা এত কম ক্ষেত্রে হয়েছে যে তাকে ব্যতিক্রমের পর্যায়ে ফেলতে হয়।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় বেশকিছু প্রবাদপ্রবচনও ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রবাদপ্রবচন চলিত রীতির ভাষার একটি মূল্যবান সম্পদ, কারণ এর মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন কথাবার্তা, ভাষা ও ভাবভঙ্গি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। শুধু

তাই নয়, এই প্রবাদপ্রবচনগুলির অধিকাংশের উৎপত্তি বাংলার নিজস্ব মাটিতে এবং সেজন্য বাংলা প্রবাদপ্রবচন বাঙালীর খাঁটি প্রাণের জিনিস। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় ব্যবহৃত কিছু প্রবাদপ্রবচনের নমুনা হল—

"যদি পরমেশ্বরের কিছুমাত্র বিষয়জ্ঞান থাকতো, তা হলে সাধ করে ঘোড়ার ডিম ও আকাশকুসুমের দলে গণ্য হতেন না।"

"তিনি আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে দিতে পারেন, হয়কে নয় করেন, নয়কে হয় করেন।"

"শাশুড়ী বরের হাতে মাকু দিয়ে বল্লেন, 'হাতে দিলাম মাকু. একবার ভ্যা করত বাপু!"

শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার কথ্যভাষার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' থেকে এই বৈশিষ্ট্যের কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক্—

চড়কীর পিঠ সড়্সড়্ কচ্চে; ঢাকের পেছনটা দুম দুম্ করে বাজাচ্চে; ধুঁকতে ধুঁকতে বৈঠকখানায় উপস্থিত হলো; ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেল-ফুলের গন্ধ ভুরভুর করে বেরিয়ে যেন সহর মাতিয়ে তুলচে; গরিবের যমেরা রোঁদ সেরে মস্মস্ করে থানায় ফিরে যাচ্চেন; সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ; রেলওয়ের চাপরাসীরা সপাসপ্ বেত মাচ্চে; এদিকে হস্ হস্ হস্ করে ট্রেন টরমিনসে উপস্থিত হলো, টুনুনাংটাং টুনুনাংটাং করে পুনরায় ঘণ্টা বাজলো, ইত্যাদি।

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় উপমাপ্রয়োগ ও শব্দ নির্বাচনে এক ধরণের মৌলিকত্বের দ্বারা ভাষার স্বচ্ছতা ও সংক্ষিপ্ত এবং বর্ণনীয় বিষয়ের নিপুণ চিত্রধর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

"আমরা ছেলেবেলাতেই জ্যাটার শিরোমণি ছিলেম, স্কুল ছাড়াতে জ্যাটামি ভাতের ফ্যানের মত উথ্লে উঠ্লো"।

"তাঁর অদৃষ্ট শীঘ্রই লুচির ফোস্কার মত ফুলে উঠলো—বের জল পেলে কনেরা য্যামন ফেঁপে ওটে, তিনিও তেমনি ফাঁপতে লাগলেন।"

"বাণের মুখে জেলেডিঙ্গীর মত তাঁদের কথা তল্ হয়ে যাচ্চে।"

চলিত ভাষার উৎপত্তি থেকে অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ক্রমবিবর্তনের ধারায় একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলে চলিত ভাষার দুটি ভিন্নরূপ

চোখে পড়বে—(১) একটিতে তদ্ভব, অর্দ্ধতৎসম (মুখে মুখে প্রচলিত শব্দ) এবং দেশী-বিদেশী শব্দের প্রাধান্য এবং (২) অপরটিতে সর্বনাম ও ক্রিয়া-পদের চলিত রূপের আধারে তৎসম শব্দের প্রাধান্য। চলিত ভাষার উদ্ভবলগ্নে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় প্রথমশ্রেণীর বিশুদ্ধ চলিত রীতিরই ব্যাপক প্রয়োগ হলেও দ্বিতীয়শ্রেণীর চলিত রীতিরও যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল তার কিছু কিছু উদাহরণ পাওয়া যাবে। যেমন—

"কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান কত্তে সাধুরা কোন বাধাই মানেন না বলেই যেন দিনমণি কমলিনীর মনোব্যথায় উপেক্ষা করে অস্তে গ্যালেন। সন্ধ্যাবধূ শাঁক ঘণ্টা ও ঝিঁঝিঁপোকার মঙ্গল শব্দের সঙ্গে স্বামীর অপেক্ষা কত্তে লাগলেন। প্রিয়সখী প্রদোষ দূতীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিশানাথকে সম্বাদ দিতে গেলেন। নববধূর বাসরে আমোদ করবার জন্য তারাদল একে একে উদয় হলেন. কুমুদিনী স্বচ্ছ সরোবরে ফুটলেন—হৃদয়রঞ্জনকে পরকীয় রসাস্বাদনে গমনোদ্যত দেখেও তাঁর মনে কিছুমাত্র বিরাগ হয় নাই—কারণ, চন্দ্রের সহস্র কুমুদিনী আছে, কিন্তু কুমুদিনীর একমাত্র তিনিই অনন্যগতি।"

দেখা গেল, বিশুদ্ধ চলিত রীতি এবং সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের চলিতরূপের আধারে তৎসম-শব্দ-প্রধান সাহিত্যিক চলিত রীতি—বিষয়ভেদে এই উভয়রীতির চলিত রীতি আজ থেকে প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে চলিত ভাষার আবির্ভাব মুহূর্তেই 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় ব্যবহৃত হয়েছে।

আবার যাঁরা মনে করেন হুতোমি ভাষা রঙ্গব্যঙ্গের উপযুক্ত হলেও চিন্তাশীল সিরিয়াস ধরণের গদ্যরচনার উপযোগী নয়, তাঁদের সে ধারণা যে যথার্থ নয়, তার প্রমাণও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় আছে—

"হায়! যাদের জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে!..."

প্রকৃতপক্ষে কি শাণিত ব্যঙ্গরচনায়, কি কৌতুক-তরল পরিহাস রসিকতায় এবং গভীর গম্ভীর বিষয়ের উপস্থাপনায় হুতোমী ভাষার চলিত রূপ প্রয়োগে আশ্চর্য সাবলীলতা এবং সজীবতা দেখে এ ভাষাকে বিদ্যাসাগর অক্ষয়দত্তের সাধু

গদ্যযুগের, এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র নিকটবর্তী কালের (অবশ্য তখনও 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় নি এবং বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গাত্মক রচনা তো আরও অনেক পরে ১৮৭৩-৮৬) ভাষা বলেও মনে হয় না; সামান্য কিছু সেকালের কলকাতায় প্রচলিত উগ্র মৌখিক শব্দকে ব্যতিক্রম হিসাবে ধরে নিলে আজ শতাধিক বৎসর পরেও এভাষাকে আধুনিক কথ্যভাষা বলেই মনে হয়। অথচ এই প্রবল প্রাণশক্তিসম্পন্ন এবং জন্ম লগ্নেই আধুনিকতার বৈশিষ্টাযুক্ত হুতোমী ভাষাকে বঙ্কিমচন্দ্র যখন "হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দ ধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ. ইহার তেমন বাঁধন নাই;" বলে বর্ণনা করেন, তখন স্বভাবতঃই আমাদের মনে হয়. কালীপ্রসন্ন তাঁর যুগও সাহিত্যের চেয়ে এত বেশি অগ্রগামী ছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের মত মনস্বী এবং দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন সমালোচকও এবিষয়ে সুবিচার করতে পারেন নি। বঙ্কিম তাঁর পূর্বসূরীদের তুলনায় বাংলা ভাষাকে আরও অনেকটা প্রাঞ্জল করলেও মূলতঃ বিদ্যাসাগরী সাধু গদ্য কাঠামোকেই অনুসরণ করেছেন এবং হুতোমের চলিত ভাষার সমালোচনায় কিছুটা রক্ষণশীল মনোভাবেরই যে পরিচয় দিয়েছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এখানে একথাও স্মরণীয় যে, বঙ্কিম আলালী ভাষার প্রশংসা করলেও তা যে খাঁটি চলিত ভাষা নয়, সাধু গদ্যরীতির আধারে কিছু চলিত শব্দের মিশ্রণ মাত্র, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। অবশ্য আরও পরবর্তীকালে বাংলা ১৩০৬ সালে বিবেকানন্দ এবং ১৩২১ সালে 'সবুজপত্র' প্রকাশক প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে চলিত ভাষা চালাতে গিয়ে যে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেকথা স্মরণ করলে বঙ্কিমচন্দ্রের এই রক্ষণশীল মনোভাব-জাত বিরোধিতার কিছুটা কারণ অনুমান করা যেতে পারে। বিবেকানন্দের 'বিলাতযাত্রীর পত্র' অর্থাৎ 'পরিব্রাজক' 'উদ্বোধনে' বাংলা ১৩০৬ সালে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশ লাভ করলে সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে এর ভাষা সম্পর্কে যে বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল স্বামী প্রেমঘনানন্দ তার পরিচয় দিয়ে লিখেছেন: "স্বামীজীর পরিব্রাজক অতি সুন্দর জোরালো চলিত ভাষায় লেখা। চলিত ভাষা লিখে বর্তমানে যাঁরা যশস্বী হয়েছেন তাঁরাও স্বামীজীর প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার এই লেখা পড়ে আশ্চর্য না হয়ে পারবেন না। কিন্তু ১৩০৬ সালের পয়লা ভাদ্র থেকে 'পরিব্রাজক' 'উদ্বোধনে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হবার পর তদানীন্তন বাঙলা সাহিত্যিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিরুদ্ধ সমালোচনা আরম্ভ হয়।"[১১]

যাই হোক, ১৮৬২-৬৪ খৃষ্টাব্দে হুতোমি ভাষার আবির্ভাবে সাহিত্যে খাঁটি চলিত ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হলেও এবিষয়ে বিবেকানন্দের দৃষ্টি কত স্বচ্ছ এবং সংস্কার মুক্ত ছিল তা দেখা যাবে ১৩০৬ সালে 'উদ্বোধন' সম্পাদক স্বামী—ত্রিগুণাতীনন্দকে লিখিত তাঁর 'বাঙ্‌লা ভাষা' পত্রে। পরে পত্রটি 'ভাববার কথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। পত্রটির অংশবিশেষ হল ঃ

"পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃত, যা কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে?···স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি···তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না। সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈয়ারি ভাষা কোনোও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে, যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাই লস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচেছ।"[১২]

ঐ পত্রে তিনি আরও বলেছেন, "যদি বল···বাঙলা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোনটি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকাতার ভাষা।"

দেখা যায় ১৩০৬ সালে চলিত ভাষার শক্তি ও মর্যাদা সম্পর্কে বিবেকানন্দ যখন তাঁর স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন এবং 'বিলাত যাত্রীর পত্র' বা 'পরিব্রাজক' চলিত ভাষায় রচনা করেন, তখনও বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষা প্রয়োগকে নির্দ্ধিধায় স্বীকার করে নেওয়ার মানসিকতা তৈরী হয়নি; আরও পরবর্তীকালে ১৩২১ সালে 'সবুজ পত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে এজন্য আরও অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাঁকে তাঁর স্বভাব সুলভ শ্লেষের ভঙ্গিতে বলতে হয়েছে, "আমার ভাষা নাকি কলকাত্তাই ভাষা? সুতরাং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে তা আক্রমণ করা সহজ। অপরপক্ষে সাধুভাষার জন্মস্থান হচ্চে ফোর্ট উইলিয়ামে, সুতরাং তাকে আর আক্রমণ করা চলে না—সে যে কেল্লার ভিতরে বসে আছে।" ঐ সময়ে চলিতভাষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন, তা হল :—

"বাংলা ভাষাকে চিনতে হবে ভালো করে; কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার দুর্বলতা, দুইই আমাদের জানা চাই।

রূপকথায় বলে, এক যে ছিল রাজা, তার ছিল দুই রাণী, সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী। তেমনি বাংলা বাক্যাধিপেরও আছে দুই রাণী—একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা; আর একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চলতি ভাষা।... রূপকথায় শুনেছি সুয়োরাণী ঠাঁই দেয় দুয়োরাণীকে গোয়াল ঘরে। কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরাণী যায় নির্বাসনে, টিকে থাকে একলা দুয়োরাণী রাণীর পদে।"[১৩] ঐ প্রবন্ধে চলতি ভাষার একটি প্রধান শক্তি যে শব্দনির্বাচনে আশ্চর্য প্রসারণ ক্ষমতা, অর্থাৎ সাধু ভাষায় যাদের পাসপোর্ট মেলা শক্ত এমন সব স্বদেশী বিদেশী হাল্কা ভারী শব্দ যে চলতি ভাষার আঙিনায় একেবারে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বসতে পারে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আবার সাহিত্যে চলিতরীতি ব্যবহারের ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রসতাত্ত্বিক বিচার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, " 'করিতেছি' শব্দটা ভোঁতা। ওতে কোন সুর বাজে না; কিন্তু 'করচি' শব্দে একটা সুর আছে। 'যাহা হইবার তাহা হইবে' এই বাক্যের ধ্বনিটা অত্যন্ত ঢিলে; সেইজন্যে এর অর্থের মধ্যেও একটা আলস্য প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন বলা যায় 'যা হবার তাই হবে' তখন 'হবার' হসন্ত 'র' 'তাই' শব্দের উপর আছাড় খেয়ে একটা জোর জাগিয়ে তোলে; তখন ওর নাকি সুর ঘুচে গিয়ে ওর থেকে একটা 'মরিয়া' ভাবের আওয়াজ বেরোয়। বাঙলার হসন্তবর্জিত সাধু ভাষাটা বাবুদের আদুরে ছেলেটার মতো মোটাসোটা গোলগাল, চর্বির স্তরে তার চেহারাটা একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে, এবং তার চিক্কণতা যতই থাক্, তার জোর অতি অল্পই।"[১৪] এই জন্যই সাধু চলিতের দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত চলিতের পক্ষ সমর্থন করেই বলেন— " সংস্কৃত ভাষার জরি-জহরতের ঝালরওয়ালা দেড় হাত দুহাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষাবধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা পড়ে গেছে, তার কালো চোখের কটাক্ষে যে কতো তীক্ষ্ণতা তা আমরা ভুলে গেছি। আমি তার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলে দেবার কিছু সাধনা করেছি, তাতে সাধু লোকেরা ছি ছি করেছে। সাধু লোকেরা জরির আঁচলটা দেখে তার দর যাচাই করুক; আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তার চেয়ে অনেক বেশি; সে যে বিনামূল্যের ধন, সে ভটচাজ পাড়ার হাটে বাজারে মেলে না।"

এই সংস্কৃত ঘোমটা খুলে দেবার সাধনা রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, বিবেকানন্দেরও পূর্বে করেছিলেন কালীপ্রসন্ন এবং তা কালের বিচারে এত বেশি প্রাগ্রসর ছিল যে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষেও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তার মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃত পক্ষে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় খাঁটি চলিত ভাষার প্রবর্তন করে কালীপ্রসন্ন বাংলা সাহিত্যে যে যুগান্তরের সূচনা করলেন, তা দীর্ঘদিনের বহু বাধা বিরোধিতা অতিক্রম করে এবং সংস্কার প্রাপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত আজ কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাসে, রম্যরচনায় বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত আঙিনা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছে।

সুতরাং প্যারীচাঁদের ভাষা সম্বন্ধে মধুসূদনের অবজ্ঞাসূচক মন্তব্যের মত হুতোম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যও যে অযথার্থ প্রমাণিত হয়েছে, পরবর্তী সাহিত্যেতিহাসই তার সাক্ষ্য দেবে।

(৭)

আবার শুধু ভাষা নয়, নূতন ছন্দের দিক থেকেও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রথমভাগ (১৮৬২) এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে (১৮৬৪) প্রকাশিত হলে দেখা যায়, তার মাত্র দুবছর পূর্বে আবিষ্কৃত মধুসূদনের ('পদ্মাবতী' নাটকের সামান্য কিছু অংশ ও 'তিলোত্তমা সম্ভব' ১৮৬০ এবং 'মেঘনাদবধ' ১৮৬১) অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণে 'নকশা'র প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের প্রারম্ভে কালীপ্রসন্ন যে দুটি কবিতা রচনা করেন তাতেই পরবর্তীকালে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে চিহ্নিত বাংলা ছন্দের প্রথম সূচনা হয়। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে অন্ত্য অমিল এবং প্রবহমানতা থাকলেও প্রতি পংক্তিতে চৌদ্দ অক্ষরের বাঁধনটুকু বজায় ছিল। তবুও মধুসূদনের এই দুঃসাহসিক ছন্দগ্রহণ করার মত যখন উপযুক্ত পাঠকসম্প্রদায়ই গড়ে ওঠেনি, তখন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কালীপ্রসন্ন তাঁর 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচয়িতা মধুসূদনকে শুধু যে একটি মূল্যবান রজতপাত্র এবং একটি মানপত্র দিয়ে সম্বর্ধিত করেছেন তাই নয়, তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের কবিতাদুটিতে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণ করে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতি পংক্তিতে আবশ্যিক ভাবে চৌদ্দ অক্ষর থাকার শেষ পয়ারধর্মী বেড়াটুকুও ভেঙে দিয়ে

ছন্দের বন্ধনমুক্তিতে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

হে শারদে! কোন্ দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে ?—১৮
কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান ?—১৪
এ কুৎসিতে! কোন্ লাজে সপত্নীসমাজে পাঠাইব,—১৯
হেরিলে মা এ কুরূপে—দুষিবে জগৎ—হাসিবে—১৭
সতিনী পোড়া ; অপমানে উভরায়ে কাঁদিবে—১৬
কুমার—সে সময়ে মনে যান থাকে ; চির অনুগত লেখনীরে!—২৩

এবং দ্বিতীয়ভাগের প্রারম্ভে—

হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্মল পটে,—১৪
রহস্যরসের রঙ্গে,—৮
চিত্রিনু চরিত্র—দেবী সরস্বতী বরে।—১৪
কৃপাচক্ষে হের একবার, শেষে বিবেচনা মতে—১৮
যার যা অধিক আছে 'তিরস্কার' কিম্বা 'পুরস্কার'—১৮
দিও তাহা মোরে—বহুমানে লব শির পাতি।—১৬

কালীপ্রসন্নের পর ব্রজমোহন রায়ের 'দানব বিজয়' নাটকের অল্প কিছু অংশে এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুভঙ্গ' নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ হলেও, কালীপ্রসন্নই যে এই ছন্দের প্রথম প্রবর্তক এবং গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত গৈরিশ ছন্দের জন্ম যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র প্রবর্তিত প্রারম্ভিক কবিতা থেকে সেকথা গিরিশচন্দ্র গোপন রাখেন নি। অমৃতলাল বসু তাঁর পুরাতন স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন, "আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল। বাঙ্গালী সাহিত্যসেবিগণ বোধহয় অনেকে তাহা জানেন না। গিরিশ-বাবুর পদ্যের ছন্দ গিরিশবাবুর নিজের আবিষ্কৃত নহে। ঐ ছন্দের আবিষ্কর্তা আর কেহ নহেন—স্বয়ং কালীপ্রসন্ন সিংহ। সত্যপ্রিয় কৃতজ্ঞ গিরিশবাবু তাঁহার প্রথম নাটক 'রাবণবধ'—এর title page-এ হুতোম প্যাঁচার ঐ ছন্দে রচিত লাইন কয়টি তুলিয়া দিয়াছিলেন ; ছন্দ হিসাবে তাঁহারই প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন।"[১৩] প্রিয়রঞ্জন সেনও তাঁর 'Western Influence in Bengali Literature' গ্রন্থে লিখেছেন, "Girish Chandra…had felt the need of a suitable medium for emotional

expression, and to him the chance of reading of a few dedicatory lines in 'Hutom Pyanchar Naksa' by Kaliprasanna Sinha seemed a veritable god-send. Taking the hint he moulded it to his own needs and used it for dramatic purpose."

(৮)

এবার একটি পরম বিস্ময়! বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র যাকে বলেছেন 'অশ্লীল', ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাকেই বলেছেন 'বড়ই আবশ্যক'। বাংলা সাহিত্যে নীতির রক্ষক হিসাবে কাকে বড় আসন দেব? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে, না বঙ্কিমচন্দ্রকে? সুতরাং যদিও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (দ্রঃ 'ভারতী' ১৩০৪ বৈশাখ) বলেছিলেন, "বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা, হুতুম পেঁচার ন্যায় লেখক এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া বড়ই আবশ্যক" তবু 'বঙ্গদর্শনে' 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার সূত্র—("হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য")—ধরে পরবর্তীকাল পর্যন্ত যে অশ্লীলতার অভিযোগ আছে তা সতর্কভাবে বিচার করা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও 'বঙ্গদর্শন' জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ তে শব্দ নির্বাচনে উদারদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে লিখেছিলেন, "বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে সবটুকুই বলিবে, তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।" দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমের প্রধান আপত্তি অশ্লীল শব্দ সম্বন্ধে। কিন্তু এখানে দুটি কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য। প্রথমতঃ এই তথাকথিত অশ্লীলতা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র 'কলিকাতার চড়ক পার্বণ', 'কলিকাতার বারোইয়ারি পুজো', 'হুজুক', 'হঠাৎ অবতার', 'মাহেশের স্নানযাত্রা', 'রথ', 'দুর্গোৎসব', 'রামলীলা' ও 'রেলওয়ে'—এই নয়টি অধ্যায়ের মধ্যে কেবল 'কলিকাতার বারোইয়ারি পুজো', 'হঠাৎ অবতার' এবং 'মাহেশের স্নানযাত্রা'র সামান্য কিছু অংশেই আছে; গোটা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' সম্বন্ধে এ অভিযোগ প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ অশ্লীলতা সম্বন্ধে বঙ্কিমের ধারণার সঙ্গে আধুনিক কালের ধারণার মিল নাও হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে নীতির দোহাই দিয়ে অশ্লীল বলেছেন, আধুনিক

পাঠকের কাছে সেগুলি সবই অশ্লীল মনে হবে না, কারণ তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ত তথাকথিত অশ্লীলতার বাইরের আবরণটুকু ভেদ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের একটি অত্যন্ত নিখুঁত বাস্তব সমাজচিত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে। তাছাড়া চিকিৎসক যেমন প্রয়োজন হলে কোন পীড়িতা গণিকারও চিকিৎসার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না, তেমনি হুতোম যখন সমাজের বিকৃতি সংশোধনের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই সমাজের নক্শা আঁকতে বসেছেন, তখন পিউরিটান মনোভাব নিয়ে সমাজের নৈতিক অধঃপতনের দিকগুলি এড়িয়ে গেলে শুধু যে তৎকালীন সমাজের সত্যপরিচয় থেকে পাঠকদের বঞ্চিত করতেন তাই নয়, তিনি নিজেও তাঁর ঐতিহাসিক কর্তব্য ও নিরপেক্ষতা থেকে বিচ্যুত হতেন। যেমন, 'কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা' অধ্যায়ে তৎকাল প্রচলিত গুরুপ্রসাদী রীতির যে বর্ণনা আছে (যা আমরা পূর্বেই হুতোমের সমাজ-চেতনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি) তাতে আধুনিক পাঠক অশ্লীলতা অপেক্ষা একটি সামাজিক কদাচারের ওপর হুতোমের শাণিত ব্যঙ্গরচনারই নিদর্শন পাবেন। আবার 'হঠাৎ অবতার' অধ্যায়ে হুতোম যেখানে শহরের হঠাৎ-বাবুদের নৈতিক অবনতির বাস্তব চেহারাটি রঙ্গে ব্যঙ্গে তুলে ধরেছেন, (সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র এইসব অংশের জন্যই হুতোমকে কুরুচিপূর্ণ এবং অশ্লীল বলেছিলেন) তার সবটাই যে অশ্লীল নয়, বরং দু একটি তথাকথিত অশ্লীল শব্দপ্রয়োগে তৎকালীন নগর-কলকাতার সমাজচিত্রটি অত্যন্ত নিপুণ পরিহাস রসিকতার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, সামান্য কিছু উদাহরণ তুলে দিয়ে তা দেখানো যাক্—

"বেশ্যাবাজিটি আজকাল এ সহরে বাহাদুরির কাজ ও বড় মানুষের এলবাত্ পোষাকের মধ্যে গণ্য, অনেক বড়মানুষ বহুকাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়িগুলো আজও মনিমেন্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েছে—সেই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর এমন কিছু কাজ হয় নি, যা দেখে সাধারণে তাঁরে স্মরণ করে।" (কিন্তু এর পরবর্তী অংশটি হয়ত কিছুটা অশ্লীল।)

'হুতোম পঁ্যাচার নক্শা'য় এই ধরণের কিছু অংশকে অশ্লীল বলা যায় কিনা তা বিতর্কযোগ্য বিষয়, কারণ এতে যে তৎকালীন শহর কলকাতার বিত্তশালী সমাজের খাঁটি পরিচয় ফুটে উঠেছে তার মূল্য কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। আমাদের মনে হয়, কোন বিষয়ের অশ্লীলতা বিচারে একটি

প্রধান নীতি এই হওয়া উচিত যে জীবনও সমাজের প্রকৃত রূপটিকে ফুটিয়ে তোলার নির্বিকার আগ্রহে যদি কিছু চিত্রিত হয় তবে তার মধ্যে সত্যকার অশ্লীলতার পরিচয় নেই কিন্তু যখন সচেতনভাবে অকারণে, অপ্রয়োজনে বা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে নীচ প্রবৃত্তির উত্তেজনা সৃষ্টিই লক্ষ্য হয়, তখনই তাতে অশ্লীলতা ফুটে ওঠে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমালোচনা প্রসঙ্গে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এই কথাই বলেছেন, "ইহাও জানি যে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা, প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তি জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সত্যভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে।... তাহা ছাড়া অন্যবিধ অশ্লীলতাও তাঁহার কবিতায় আছে। কেবল রঙ্গদারির জন্য, শুধু ইয়ারকির জন্য এক আধটু অশ্লীলতাও আছে। কিন্তু দেশকাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়।" একই দোষে, একই দেশকালে (ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাব ১৮৫৯, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ১৮৬২-৬৪) বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তকে ক্ষমা করার জন্য ওকালতি করলেও কালীপ্রসন্নকে যে কেন ক্ষমা করতে পারেন নি তা বিস্ময়ের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমের কথামত 'পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতা বিরুদ্ধ হইলেও' যদি অশ্লীল না হয়, তাহলে সেই বঙ্কিমের পক্ষেই হুতোমের নকশাকে কি করে অশ্লীল বলা সম্ভব? কারণ এই নকশারও তো প্রধান উদ্দেশ্য তাই। সুতরাং হুতোম প্যাঁচার নকশা'র সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে আকাঙ্ক্ষিত নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারেন নি, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাছাড়া হুতোমের নকশায় এধরণের অশ্লীল বিষয় যে কয়েকটি মাত্র অধ্যায়ের অল্প কিছু অংশেই আছে, তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আবার বিষয় বর্ণনা ছাড়া যদি শব্দপ্রয়োগের দিক থেকে হিসাব করা যায়, তাহলেও দেখা যাবে, সমগ্র 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় তথাকথিত অশ্লীল শব্দের সংখ্যাও খুব সামান্যই। এখানে একথাও বলা প্রয়োজন যে এধরণের দুএকটি অশ্লীল শব্দপ্রয়োগে সবক্ষেত্রেই ব্যাপারটা অশ্লীল হয়ে ওঠে না, যেমন 'কলিকাতার চড়ক পার্বণ' অধ্যায়ে একটি প্যারাগ্রাফের একটি বাক্যে যখন লেখা হয়, "কেউ লোকাপবাদ তৃণ জ্ঞান, বেশ্যাবাজী বাহাদুরির কাজ মনে করেন" তখন তাকে অশ্লীল বলা চলে না। যাইহোক, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রথমভাগ ও

দ্বিতীয় ভাগের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিতর্কযোগ্য অশ্লীল শব্দপ্রয়োগের পরিসংখ্যান তুলে দিয়ে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করা যাক্ :—

[কালীপ্রসন্নের জীবদ্দশায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র প্রথম সংস্করণের পর আরও কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং তাতে কিছু কিছু পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধনও হয় ; ফলে বিভিন্ন সংস্করণে দু'পাঁচটি অশ্লীল শব্দের তফাৎ হওয়া বিচিত্র নয়। আমরা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণকে অবলম্বন করেই মোটামুটি হিসাব তৈরী করেছি।]

হুতোম প্যাঁচার নক্শা (প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগ)

অধ্যায়।	মোট শব্দ সংখ্যা।	বিতর্কযোগ্য অশ্লীল শব্দসংখ্যা
'কালকাতার চড়ক পার্ব্বণ' —	৩৯০০	৫
'কলিকাতার বারোইয়ারি পূজো'—	১০,০০০	৭
'হুজুক'—	৭৭২০	৪
'হঠাৎ অবতার'—	৪০০০	১৪
'মাহেশের স্নানযাত্রা'—	৩১৫০	৮
'রথ'—	৩৮০	২
'দুর্গোৎসব'—	২৯৫০	৪
'রামলীলা'—	২৮৮০	৫
'রেলওয়ে'—	৩৬৭০	৬
	৩৮৬৫০	৫৫

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে বিতর্কযোগ্য অশ্লীল শব্দসংখ্যায় যদি আরও সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটে তাহলেও মোট শব্দসংখ্যা ও বিতর্কযোগ্য অশ্লীল শব্দসংখ্যার আনুপাতিক হারের এই বিরাট ব্যবধানে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে না। সুতরাং এই পরিসংখ্যানগত বিশেষণেও এই সত্যই প্রকাশিত হল যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র সামান্য কিছু অংশের অশ্লীলতার জন্য সমগ্র 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'কে দায়ী করা বা সেই কারণে সমগ্র নক্শার বিরূপ সমালোচনা করা কিছুতেই নিরপেক্ষ সমালোচনার পরিচয় হতে পারে না।

আবার বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমের নক্শাকে শুধু যে অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন তাই নয়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু' উপন্যাসের

সমালোচনা প্রসঙ্গে হুতোমকে "পরদ্বেষী, পরনিন্দক, সুনীতির শত্রু এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত'' বলেও তীব্র নিন্দা বর্ষণ করেছেন। ১২৮১ সালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন এলেখা লেখেন তার চার বছর পূর্বেই কালীপ্রসন্নের মৃত্যু হয়েছে ; সুতরাং তখন আর কালীপ্রসন্নের পক্ষে বঙ্কিমের এই সমালোচনার উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। তবু, মৃত্যুর পূর্বেই কালীপ্রসন্ন 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র 'দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা'য় লিখেছিলেন, "পাঠক! কতকগুলি আনাড়িতে রটান, হুতোমের নক্শা অতি কদর্য্য বই, কেবল পরনিন্দা পরচর্চা…ও শুদ্ধ গায়ের জ্বালা নিবারণার্থ কতিপয় ভদ্রলোককে গাল দেওয়া হয়েচে। এটি বাস্তবিক ঐ মহাপুরুষদের ভ্রম। হুতোমের তা উদ্দেশ্য নয়, তা অভিসন্ধি নয়, হুতোম তত দূর নীচ নন যে, দাদ তোলা কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন। জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নক্শা প্রসব করেচে, সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের….অনুবাদক ; সুতরাং এটা আপনি বিলক্ষণ জানবেন যে, অজাগর ক্ষুধিত হলে আরসুলা খায় না ও গায়ে পিঁপড়ে কামড়ালে ভঙ্ক ধরে না।"

শুধু তাই নয়, "হুতোম প্যাঁচার নকশা'র ভূমিকাতেও কালীপ্রসন্ন লিখেছিলেন, "সত্য বটে অনেকে নক্শা খানিতে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এই মাত্র বলতে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করেচি, এমনকি স্বয়ংও নক্শার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।" 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপনেও লিখিত হয়েছিল, "হুতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে মধ্যে ঐরূপ নক্শা প্রস্তুত করবেন। এতে ক উপকার দর্শিবে, তা আপনারা এখন টের পাবেন না ; কিন্তু কিছুদিন পরে বুজ্তে পারবেন, হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল।" সুতরাং হুতোমের নক্শাকে বঙ্কিমচন্দ্র যে ঈর্ষা-বিদ্বেষ-তাড়িত বলে মনে করেছেন, তা সত্য নয়। বরং ব্যক্তি পরিচয়ের সাধারণীকৃতিতে হুতোমের নক্শা যে সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেছে, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। তবুও নক্শার মাঝেমাঝে ব্যক্তিগত আক্রমণের জন্যই কি বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমকে 'পরদ্বেষী' এবং 'পরনিন্দক' বলেছেন? কিন্তু তাও কি করে সম্ভব? ব্যক্তিগত আক্রমণ থাকলেই যে তা ঈর্ষাবিদ্বেষ-প্রসূত হবে, একথা সর্বদা বলা যায় না। দোষোদ্‌ঘোষণ যখন অহেতুক এবং ভিত্তিহীন হয় এবং কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়েই আবদ্ধ থাকে, তখন তা পরদ্বেষ বা পরনিন্দা হয়। কিন্তু যখন তা বাস্তব ভিত্তির

উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজ সংস্কারের শুভ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, তখন তাকে আর পরদ্বেষ বা পরনিন্দা বলা যায় না। প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থেকে অসঙ্গতি ও বিকৃতি যদি এমনভাবে বেছে নেওয়া হয় যে সেগুলি সেই বিশেষ সমাজ-শ্রেণীর সাধারণ পরিচয় হয়ে ওঠে, তবে তা দূষণীয় হয় না, বরং স্যাটায়ারধর্মী সাহিত্যে যে প্রায়শঃই এধরণের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের প্রেরণা বর্তমান থাকে সেকথা অস্বীকার করা যায় না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের অনেক রচনাতেই এধরণের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উপাদান ছিল। মধুসূদনের প্রহসন দুটিতে এত বেশি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছিল যে পাইকপাড়ার রঙ্গমঞ্চে প্রহসন দুটিকে মঞ্চস্থ করা যায় নি। দীনবন্ধু মিত্রের ব্যঙ্গের উপকরণ-গুলি যে প্রায় সবক্ষেত্রেই বাস্তবচরিত্রকে অবলম্বন করে লেখা, সেকথা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই স্বীকার করেছেন। হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গকবিতাতেও প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত আক্রমণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে'ও যে ব্যক্তিগত পটভূমিকা ছিল তা তো অক্ষয় দত্তগুপ্তের কথা থেকেই জানা যায়। এমনকি যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমকে পরদ্বেষী বলেছেন, সেই ইন্দ্রনাথই তাঁর বহু রচনায় ব্যক্তিগত আক্রমণের ব্যাপারে অনেক অশোভন আগ্রহ দেখিয়েছেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলীর 'গ্রন্থপরিচয়ে' হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ইন্দ্রনাথের গ্রন্থে এই ব্যক্তিগত আক্রমণ সম্বন্ধে লিখেছেন, "ইহার স্থলে স্থলে ব্যক্তিগত ইঙ্গিত থাকিলেও এই ব্যঙ্গকাব্য-খানি একেবারেই ব্যক্তিগত নয়। যেখানে বিষয় ব্যক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সেখানে বিষয়ের কথায় ব্যক্তির ইঙ্গিত না থাকিয়াই পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে ব্যক্তিগত বলিলে চলিবে না।"[১৬] দেখা গেল উনিশ শতকের ব্যঙ্গরচয়িতাদের অধিকাংশ ব্যঙ্গ রচনায়, এমনকি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের ,মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিতে'ও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছিল। অথচ ঐ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কেবল হুতোমকেই যখন 'পরদ্বেষী' এবং 'পরনিন্দক' বলেন তখন খুবই বিস্মিত হতে হয়। অন্যান্য লেখকের ব্যঙ্গরচনার তুলনায় হুতোমে ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতা এত বেশি ছিল যে কিছুটা রক্ষণশীল রুচিবোধ পুষ্ট বঙ্কিমচন্দ্র তা সহ্য করতে পারেন নি এবং সেজন্যই কিছুটা উষ্মা এবং উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গরচনার সমালোচনা করতে গিয়ে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে হুতোমকে "পরদ্বেষী,

পরনিন্দক, সুনীতির শত্রু এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত' বলে বর্ণনা করেছেন।

তবে হুতোম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যে হুতোম সম্পর্কে যে সুবিচার হয় নি সে কথা আলোচনা করতে গিয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র 'হুতোম'কে বিদ্বেষ পরিপূর্ণ বলিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, ইহাতে 'হুতোমে'র প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। পরের ভাল দেখিলে হুতোম দুঃখিত হয় নাই। যে ধনিগণ কোন প্রকার সৎকার্যে যোগ না দিয়া কেবল বিলাসে ব্যসনে অর্থব্যয় করিতেন—নবভাবের স্রোত যাঁহাদের গৃহের ও হৃদয়ের প্রাচীরে প্রহৃত হইয়া ফিরিয়া আসিত; যাঁহাদের ব্যবহারে আন্তরিকতার একান্ত অভাব ও কৃত্রিমতার পূর্ণ পরিচয় প্রস্ফুটিত ছিল; যাঁহারা কপটতার আবরণে হীনতা আবৃত করিয়া লোককে প্রতারিত করিতে চাহিতেন—'হুতোম' তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিত।......কালীপ্রসন্ন যে ধনীসম্প্রদায়ের কপটতার পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়াছিলেন, তিনি সেই সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সমাজেই বর্ধিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সেই সমাজস্থ তাঁহার আঘাতের লক্ষ্য ব্যক্তিবর্গের আচার ব্যবহার তাঁহার নিকট সুপরিচিত ছিল, তাঁহাদের প্রকৃতি তিনি নখদর্পণে দেখিতেন। এ অবস্থায় আক্রমণ একটু অতিমাত্রায় তীব্র হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। যুদ্ধঘোষণা করিয়া সমরের উত্তেজনার মধ্যে তীক্ষ্ণ বাণগুলি তুণীরে রাখিয়া যুদ্ধ করা সকল সময় সম্ভব হয় না। সুতরাং আক্রমণের তীব্রতার জন্য কালীপ্রসন্নকে নিন্দা করা যায় না।"[১৭]

কিন্তু এই আক্রমণে তীব্রতা যতই থাক্, হুতোম কি তাঁর নক্শায় কোথাও বঙ্কিমের অভিযোগ মত 'সুনীতির সঙ্গে শত্রুতা' করেছেন এবং 'বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত' হয়েছেন? হুতোম প্যাঁচার নক্শা থেকে আমরা ইতিপূর্বেই যে বিস্তারিত উদাহরণমালা সংকলন করেছি, তা থেকে তো এর ঠিক বিপরীত উত্তরই মেলে। প্রকৃতপক্ষে হুতোম সমাজের হীনতা, ক্ষুদ্রতা, অনুদারতা, স্বার্থপরতা, দুর্নীতি ও কুরুচির ওপরেই তাঁর শাণিত ব্যঙ্গের নির্মম কশাঘাত করেছেন। হুতোম নিজে ছিলেন উদার, প্রগতিবাদী ও পরোপকারী; সেজন্য সমাজের দুর্নীতিগ্রস্ত অধঃপতনের উপর তাঁর মর্মভেদী আঘাত এমন অব্যর্থভাবে এসে পড়েছে। তিনি নিজে কপটতা ও কৃত্রিমতাকে ঘৃণা করতেন, সেজন্য সমাজের যেখানেই কপটতা ও কৃত্রিমতার প্রকাশ হয়েছে, সেখানেই তাঁর আক্রমণ এত তীব্র হয়েছে। এজন্য স্বয়ং বিদ্যাসাগরও বাংলা

দেশের সমাজকে সজীব' রাখার ব্যাপারে রামগোপাল ঘোষের মত বক্তার সঙ্গে তুলনা করে 'হুতোম প'্যাচার নক্‌শা'র লেখকের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।[১৮] নীতিবাগীশ শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছেও হুতোমের নক্‌শা সুনীতি ও সুরুচির বিরোধী মনে হয়নি, বরং হুতোমকে সরস, মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী মনে হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "আলালী ভাষার উৎকৃষ্ট নমুনা 'হুতোমের নক্সা'। যাঁহার ইচ্ছা হয় পাঠ করিয়া দেখিবেন তাহা কেমন সরস, মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী।"[১৯] আধুনিক কালের নিরপেক্ষ পাঠকও 'হুতোম প'্যাচার নক্‌শা'য় হুতোমের সকল রকম গোঁড়ামি ও কুসংস্কারমুক্ত, সকল রকম সামাজিক হীনতা ও কদাচার-বিরোধী এক উদার, প্রগতিবাদী মনের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হবেন।

প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র বিরূপ সমালোচনা করলেও 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' যে বাংলা সাহিত্যে নানা দিক থেকে অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করার যোগ্য, সেকথা তৎকালীন বহু বিশিষ্ট সমালোচকই স্বীকার করেছেন। আমরা আগেই বলেছি, হুতোমই প্রথম এই গ্রন্থে 'নক্‌শা' কথাটি ব্যবহার করে বাংলা সাহিত্যে এক নূতন আঙ্গিক প্রবর্তনের দাবী করেছেন। হুতোমের পূর্বে কিংবা পরেও সমাজজীবনের এমন সর্বত্রসঞ্চারী ফটোগ্রাফিক বাস্তবতাধর্মী নক্‌শা আর কারো কলমেই ফুটে ওঠেনি; হুতোমের এই নক্‌শাগুলি রঙ্গরসিকতার আধারে উনিশ শতকের কলকাতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এমন এক মূল্যবান দলিল যা একাধারে ইতিহাস এবং শিল্প।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব তাঁর বিখ্যাত 'কলিকাতার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, "It is a masterpiece of it kind and has never been eclipsed by the latter day productions in the line. Time may come when one may not read 'Hutum Pancha', but the time will never come when it will fail to give pleasure and profit to its readers." কালীপ্রসন্নের সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তি কৃষ্ণদাস পালও 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র অসাধারণ গুরুত্ব সম্বন্ধে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' লিখেছেন, "His Hutum Pancha' marks an era in the history of fiction writing in Bengali. He has introduced a familiar and graphic style in drawing sketches from real life hitherto unknown among Bengalee writers."

এই 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র শিল্পমূল্য সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের সভাপতি অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন, "বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালায় সুন্দর গদ্য হয়, প্যারীচাঁদ হইতে ইহা শিখিয়াছিলাম। সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র মিত্রজার গ্রন্থ দেখাইয়া 'রত্নোদ্ধার' করিতেছিলেন। তখন তাঁহার কালীপ্রসন্নের কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই, আমাদিগকে এখন বলিতে হইবে। আমরা যখন নিতান্ত বালক, তখন 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রকাশিত হইল। তাহার ভাষার ভঙ্গীতে, রচনার রঙ্গেতে একেবারে মোহিত হইয়াছিলাম। তখন হইতে বুঝিয়াছি, আমাদের মাতৃভাষায় বাজী খেলান যায়, তুবড়ি ফুটান যায়, ফুল কাটান যায়, ফুয়ারা ছোটান যায়। আমাদের মাতৃভাষা সর্বাঙ্গে রঙ্গময়ী।"[২০] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও ১২৮৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'বাঙ্গালা সাহিত্য' প্রবন্ধে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন,"হুতোম পেঁচা এই পরিবর্তন সময়ের একটি মহার্ঘ রত্ন।··· বোধ হয় মৌলিকতায় তৎকালীন সমস্ত পুস্তকের শিরঃস্থানীয়।"

বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক নক্শারচনার নূতন আঙ্গিক সৃষ্টি, সমাজ-চেতনা, হাস্যরসসৃষ্টি, সংস্কারমুক্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, সাহিত্যে আধুনিক চলিত ভাষার প্রবর্তন, বিষয়বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণে বাস্তবতা ও সরসতার অপূর্ব সমন্বয়ে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' বাংলাসাহিত্যে এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাষা আজ শতাধিক বৎসর পরেও আমাদের কাছে আধুনিক মনে হয়। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে আমরা লক্ষ্য করব যে পূর্ব থেকেই ভবানীচরণ এবং প্যারীচাঁদের দ্বারা ব্যঙ্গাত্মক রস-রচনার একটি ধারা সৃষ্টি হলেও চলিত রীতির আধারে ব্যঙ্গরচনার বৈঠকি ভঙ্গিটি উভয়েরই অনায়ত্ত ছিল।

এই মেজাজ প্রথমে দেখা গেল কালীপ্রসন্নে এবং তার অনেক পরে বীরবলের রচনায়। সুতরাং কালীপ্রসন্নের হাতেই এ জাতীয় শিল্পকর্মের প্রথম পূর্ণতা লাভ। সেজন্য প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের রচনারীতির সঙ্গে তুলনা করে হুতোমের নক্শাকে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে উত্তম শ্রেণীর বা মধ্যম শ্রেণীর রচনা বলারও কোন মানে হয় না, কারণ কোন বিশেষ ধরনের শিল্পকর্মে যিনি প্রথম সফল পথিকৃৎ তিনি সকল রকম শ্রেণী বিচারের বাহিরে।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ছাড়া 'কলকেতার হাটহুদ্দ' এবং 'বাবুদের দুর্গোৎসব' দুটিকেও কেউ কেউ হুতোমের রচনা বলে মনে করেন। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর পুস্তকাগারে সংরক্ষিত একখণ্ড 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ১ম ভাগ (১ম সং)-এর সঙ্গে একত্রে গ্রথিত আখ্যাপত্রহীন ৬৮ পৃষ্ঠার একখানি গ্রন্থের প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ব্রজেন্দ্রনাথ 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' ১৩৪৪ ২য় সংখ্যায় গ্রন্থটিকে হুতোম রচিত 'কলকেতার হাটহুদ্দ' বলে অনুমান করেছিলেন। কিন্তু পরে বিলাতে সংরক্ষিত ঐ পুস্তকের আখ্যাপত্রযুক্ত দুটি খণ্ডের কথা জানতে পেরে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রম সংশোধন করেন এবং জানান যে পূর্বে যে পুস্তকটিকে তিনি হুতোম প্রণীত 'কলকেতার হাটহুদ্দ' মনে করেছিলেন, সেখানি প্রকৃতপক্ষে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এবং হুতোমকে উৎসর্গীকৃত 'নিশাচর' প্রণীত 'সমাজ কুচিত্র'। অথচ ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত তাঁর 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ' নামক গবেষণাগ্রন্থে এই ভ্রমেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং ঐ 'সমাজ কুচিত্র' থেকে উদ্ধৃতি তুলে তাকে কালীপ্রসন্ন রচিত 'কলকেতার হাটহুদ্দে'র রচনার নমুনা হিসাবে প্রমাদপূর্ণ সিদ্ধান্ত করেছেন। তবে ঐ 'সমাজ কুচিত্র' পুস্তকটিকে 'কলকেতার হাটহুদ্দ' রূপে অনুমান করা ভ্রমাত্মক হলেও হুতোম যে 'কলকেতার হাটহুদ্দ' নামে একখানি গ্রন্থরচনা করতে চেয়েছিলেন সে বিষয়ে একটি অভ্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ১ম ভাগ (১ম সং)-এর শেষে 'কলকেতার হাটহুদ্দ' সম্বন্ধে এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয়েছিল ঃ—

"যদি হুতোমের নক্‌শার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সহৃদয় সমাজে গ্রাহ্য হয় তবে হুতোম প্যাঁচা লিখিত 'কলকেতার হাটহুদ্দ' অর্থাৎ Mysteries of Calcutta পুস্তকের ছাপা আরম্ভ করা যাইবে।"

কিন্তু 'ছাপা আরম্ভ করা যাইবে' লিখলেও ঐ নামে এখনও কোন গ্রন্থ না পাওয়ায় গ্রন্থটি প্রকৃতই প্রকাশিত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। আবার 'বাবুদের দুর্গোৎসব' নামে কালীপ্রসন্ন আর একখানি নক্‌শা রচনা করেছিলেন বলে কেউ কেউ অনুমান করলেও আমাদের মনে হয় এরূপ অনুমান সঠিক নয়, কারণ একদিকে কালীপ্রসন্ন রচিত 'বাবুদের দুর্গোৎসব' নামে কোন গ্রন্থ পাওয়া যায়নি, অন্যদিকে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' নামে যে গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে তার রচয়িতা

কালীপ্রসন্ন নন, 'শ্রীযুত দশ অবতারের এক অবতার' ছদ্মনামে রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ। প্রকৃতপক্ষে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুতোমের রচনারীতি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় একে অনুকরণ করার যেন সাড়া পড়ে যায়। মনে হয়, 'পল্লীগ্রামস্থ দুর্গোৎসব' সেই অনুকরণের ফল।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় বাংলা সাহিত্যে যে নূতন ধারার প্রবর্তন হয়, বহু অনুকরণের মধ্য দিয়ে তা আজও প্রবাহিত। উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে বাংলা গদ্যে এধরণের যে সব সামাজিক নক্‌শা রচিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ' (১৮৬৩), ক্ষেত্রমোহন ঘোষের 'কাকভুষুণ্ডীর কাহিনী' (১৮৬৫), 'নিশাচর' (ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)-এর 'সমাজ কুচিত্র' (১৮৬৫), 'শ্রীযুত দশঅবতারের এক অবতার' (রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ)-এর 'পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' (১৮৬৮), 'ভাঁড়'-এর 'সচিত্র গুলজার নগর' (১৮৭৮) এবং এ. সি. লা (অবতার চন্দ্র লাহা)-এর 'আনন্দলহরী' (১৮৮৯)। এঁদের মধ্যে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় যে কালীপ্রসন্নকে 'ব্ল্যাকমেল' করার জন্য 'আপনার মুখ আপনি দেখ' লিখেছিলেন তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আবার অন্যদিকে 'নিশাচর' ছদ্মনামে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'সমাজ কুচিত্র' বইটি লিখে সেটির উপহার পত্রে হুতোমের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করে লিখেছেন—"অনারেবল হুতোম! আপনি বাঙ্গালী সমাজকে যে স্বভাব পটে এঁকে, নূতন রকম চিত্রকাব্যে সাজ্‌য়ে বার কোরেচেন, এতে কোরে ছোট বড় সকলেই আপনাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের পেট্রন বোলে তারিফ কোচ্চেন।"

এই উপহার পত্রে একথাও জানা গেল, "একজন বাঙ্গালী পাদরী (=রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন?) তাহার এক পার্ট বেচে নিয়ে তর্জ্জমা কোরে, ইংরেজ মহলেও আদর বাড়িয়েচেন।" আবার ঐ পুস্তকেরই 'আমাদের গৌরচন্দ্রিমা' অংশে নিশাচর লিখেছেন, "বাজারে হুতোম প্যাঁচা বেরুলো, বদ্‌মায়েসদের তাক্‌ লেগে গ্যালো, ছেলেরা চোম্‌কে উঠ্‌লো, আমরা জেগে উঠলুম,...'আপনার মুখ আপনি দেখ' এগিয়ে এলো। আমরা তারে চেনো চেনো কোরে ধোরে ফেল্লেম, সেটা পাখী নয়, সুতরাং উড়তে পাল্লে না, আপনার ফাঁদে আপনিই ধরা পোড়্‌লো।" 'সমাজ কুচিত্রে' হুতোমের উক্তি উদ্ধৃত করার মধ্যেও হুতোমের প্রভাব ধরা পড়ে—যেমন, "হুতোমের বাক্য সার্থক কর্‌বার

নিমিত্তই যেন, সময় 'নদীর জলের ন্যায়, বেশ্যার যৌবনের ন্যায় ও জীবের পরমায়ুর ন্যায়, সৌখীন দলের হাত ছাড়িয়ে চলে যেতে লাগলো।" শ্রীযুত দশ অবতারের এক অবতার ছদ্মনামে রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ যে 'পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' লেখেন তাতেও হুতোম থেকে উদ্ধৃতি দেখা যায়—"আমাদের হুতোম দাদা বলে গিয়েছেন, 'ব্রাহ্ম হয়েও কেউ কেউ কালীপূজা করেন, কেউ বা ভূতচতুর্দশীর দিন বাড়ীতে প্রদীপ দেন।"

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে (বৈশাখ ১২৮২) 'হুতম' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক রাধামাধব হালদার পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় 'হুতমের নিবেদনে' লেখেন— "সামাজিক দোষাদোষ উল্লেখ করাই আমার প্রধান কর্ম। এভারটি নিতান্ত সহজ নহে। আমি প্রতি সপ্তাহে ক্ষুদ্র পক্ষদ্বয় বিস্তার পূর্বক এক একবার আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। কি রাজা, কি প্রজা, কি ঐশ্বর্য্যশালী, কি নির্দ্ধন, কি কৃতবিদ্য, কি মূর্খ, যে কোন ব্যক্তির দ্বারা দেশের বা সমাজের উন্নতি বা অবনতি হইবে, তাহার কার্য্য, তাহার চরিত্র, তাহার ব্যবহার আমি বাক্‌দেবী সরস্বতীর সাহায্যে নিজ পক্ষপুটে অংকিত করিয়া সমাজের নয়নাগ্রে উপস্থিত করিব।"

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছদ্মনামে যে 'হুতোম প্যাঁচার গান' রচনা করেন, তাতে তিনি তৎকালীন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতিকে নিয়ে অনেক রসিকতা করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বর্ণনায় হয়েছেন—"ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত ডিস, টোল-স্কুলী অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিস।" রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনকে তিনি বললেন, "দ্বাপরে ভূষণ্ডী বুড়ো সবেতে মহৎ, বাঙ্গালীর মাঝে যেন ধবলা পর্বত।" রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে লিখেছেন, "ইংরিজি বিদ্যাবাগানে ফাস্টরেট মালী, ইউরোপের কালীঘাটে পড়ে যার ডালি।" তবু 'হুতোম প্যাঁচার গানে'র নামকরণে ও কৌতুকসৃষ্টিতে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র কিছু প্রভাব থাকলে ও একটি মূল পার্থক্য এই যে 'হুতোম প্যাঁচার গানে' দেশবিখ্যাত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কৌতুক করা হয়েছে, আর 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় দেশের অধঃপতিত ধনী সমাজের

যে বিদ্রূপ করা হয়েছে তাতে তাদের ব্যক্তিপরিচয় অপেক্ষা শ্রেণীপরিচয়ই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। আবার শুধু উনিশ শতকের শেষার্দ্ধ জুড়ে নয়, বিংশ শতাব্দীতেও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র অনুকরণ অব্যাহত আছে। ১৩৫৭-৫৮ সালে (ইং ১৯৫০-৫১) 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র অনুকরণে 'কালপেঁচা' ছদ্মনামে যে 'কালপেঁচার নকশা' প্রকাশিত হয়, তার 'থ্যাঙ্ক ইউ' অধ্যায়ে লেখা হয়েছে, "বার্নার্ড শ'য়ের ভাষায় বলব যে হিউমারিস্ট বা স্যাটায়ারিস্টের কাজ অনেকটা ডেন্টিস্টের মতন ; খারাপ দাঁত তুলে দেওয়াই যেমন ডেন্টিস্টের কাজ, তা না হলে অনেক কঠিন ব্যাধির সূত্রপাত হতে পারে, কিন্তু তবু তা তোলাই দরকার। 'হুতোম পেঁচার নকশা'র যখন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন তার গৌরচন্দ্রিকায় হুতোম লেখেন যে, তাঁর নকশা পড়ে 'অনেকে শুধরেচেন, সমাজের উন্নতি হয়েচে ও প্রকাশ্যে বেলেল্লাগিরি বদমাইশি ও বজ্জাতির অনেক লাঘব হয়েছে।' 'কালপেঁচার নকশা' পড়ে সেরকম কিছু সুফল ফলবে কিনা সন্দেহ আছে, তবু হয়ত ফলতে পারে মনে করে লিখেছি।"

(১০)

এবার 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র রচনারীতির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের আর কয়েকজন প্রখ্যাত হাস্যরসিকের রচনারীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করব। আমরা আগেই বলেছি 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে'র উপন্যাসোপম সামাজিক নকশার আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই লিখিত হয়েছে বলে এযাবৎ বলা হলেও ও তা কিন্তু যথার্থ নয়। উভয় গ্রন্থের মধ্যে সামান্য কিছু সাদৃশ্য থাকলেও ভাষা, ভঙ্গি, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা কোন দিক থেকেই 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' 'আলালের ঘরের দুলালে'র সগোত্র নয়। 'আলালের ঘরের দুলালে' সাধু গদ্যরীতির আধারে হয়েছে কিছু লঘু চলিত শব্দের মিশ্রণ, কিন্তু হুতোম বিশুদ্ধ কথ্যভাষাশ্রিত। আলালে আছে উপন্যাস ধর্মী গল্পকথনের এলায়িত ভঙ্গি আর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় আছে রঙ্গেব্যঙ্গে শাণিত ও সুচতুর বৈঠকি-ভঙ্গি। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে' আছে ডিকেন্সের 'পিকউইক পেপার্সে'র' মতো চিত্রোপন্যাসের প্রভাব, আর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় আছে ডিকেন্সের 'স্কেচেজ বাই বজ' এর মতো নকশা-শিল্পের প্রভাব। অবশ্য বাংলা সাহিত্যের অভিনব এই দুই গ্রন্থের পরিকল্পনায় কিছুটা পাশ্চাত্য প্রভাব

থাকলেও এদেশের সমাজজীবনকে অবলম্বন করে রচিত হওয়ায় উভয় গ্রন্থে মৌলিকতার কোন অভাব ঘটেনি।

তবু কেবল ব্যঙ্গরস সৃষ্টির দিক থেকে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র উপর পূর্ববর্তী ব্যঙ্গোপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলালে'র সামান্য কিছু প্রভাব স্বীকার করে নিলেও আমাদের মনে হয় ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে হুতোমের নকশার উপর মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)—এই প্রহসন দুটির প্রভাব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। আলালে সাধু ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের সঙ্গে কিছু চলিত শব্দ মিশ্রিত হলেও মধুসূদনের প্রহসনে ক্রিয়াপদের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বানান, প্রয়োজন মত দেশী-বিদেশী শব্দের সহজ সাবলীল মিশ্রণ, যেমন, "ও পুঁটী দেক্ তো লা, কোন্ বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় ঘা মাচ্চে?" কিংবা "জেন্টলমেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রী হয়েছি" ইত্যাদি আমাদের যেন হুতোমী ভাষাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার বিষয়বস্তুর দিক থেকেও আলালের তুলনায় মধুসূদনের প্রহসন দুটির সঙ্গেই হুতোমের সাদৃশ্য বেশি, যদিও হুতোমের নকশার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্র আরও অনেক ব্যাপকতর। আবার 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২)-রচনার বাস্তব ও ব্যক্তিগত পটভূমিকার মধ্যেও সাদৃশ্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'একেই কি বলে সভ্যতা' সম্বন্ধে বলেন, 'ইয়ংবেঙ্গল অভিধেয় নববাবুদিগের দোষোদ্‌ঘোষণই বর্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে, ইহার প্রমাণার্থে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত, প্রায় তৎসমুদায়ই আমাদিগের জানিত কোনও না কোনও নববাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।"[২১] এই ব্যক্তিগত পটভূমিকার জন্য প্রহসনদুটি পাইকপাড়ার রঙ্গমঞ্চেও অভিনীত হতে পারে নি। [অথচ ব্যক্তিগত পটভূমিকার জন্য কেবল হুতোমকেই 'পরদ্বেষী' এবং 'পরনিন্দক' বলায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে নিরপেক্ষতা রক্ষিত হয়নি, তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।] আবার হুতোমের নকশার মত মধুসূদনের প্রহসনদুটিও ছিল তীব্র বিদ্রূপাত্মক। কিন্তু সে যুগের গ্লানিকর সামাজিক পরিবেশ যে এধরণের তীব্র বিদ্রূপেরই উপযোগী ছিল, তা মধুসূদন নিজে ইয়ং বেঙ্গল এবং কালীপ্রসন্ন নিজে ধনী জমিদার-সন্তান হয়েও মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন।

সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক সমাজ-সমালোচনার ধারায় 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র পরবর্তী কালে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) এবং 'জামাইবারিক (১৮৭২) প্রহসন তিনখানিও যে শুধু ব্যক্তিগত পটভূমিকায় রচিত তাই নয়, প্রহসনগুলির হাস্যরসও একটি বিশেষ দিক থেকে হুতোমের সমশ্রেণীভুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "সধবার একাদশীর প্রায় সকল নায়ক-নায়িকাগুলিন জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি,·· জামাই বারিকের দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। বিয়ে পাগলা বুড়োও জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।" তিনি 'সধবার একাদশী' প্রসঙ্গে পুনরায় লিখেছেন, "এই প্রহসন বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে, এই জন্য আমি দীনবন্ধুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, ইহার বিশেষ পরিবর্তন ব্যতীত প্রচার না হয়।...অনেকে বলিবেন, এ অনুরোধ রক্ষা হয় নাই ভালই হইয়াছে, আমরা নিমচাঁদকে দেখিতে পাইয়াছি।" এই তথাকথিত রুচির খাতিরে বাস্তবতাকে বিসর্জন না দেওয়া হুতোমের নকশা ও দীনবন্ধুর প্রহসন উভয়েরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই রুচির জন্য বঙ্কিম এক সময় 'সধবার একাদশী'র প্রচার নিষেধ করলেও তিনিই আবার তাঁর নিজমতের পুনর্মূল্যায়ণ করে বলেছেন, "রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটাআদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।" প্রকৃতপক্ষে অহেতুকভাবে রুচিবিকৃতি না ঘটালে সাহিত্যে রুচি অপেক্ষা বাস্তবতার মূল্য যে বেশি তা হুতোমের নকশায়, মধুসূদন ও দীনবন্ধুর প্রহসনে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিম যে দীনবন্ধুর সাহিত্যসমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "দীনবন্ধু জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন," তা দীনবন্ধুর প্রহসনের পক্ষে যেমন প্রযোজ্য হুতোমের নকশার পক্ষেও তেমনি সমভাবে প্রযোজ্য। তবে হুতোমের নকশার সঙ্গে দীনবন্ধুর প্রহসনের একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে, হুতোম সমাজের কপটতা ও কদাচার সংশোধন করতে চেয়েছিলেন বলে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ উইট এবং স্যাটায়ারই বেশি; অন্যদিকে সর্বশ্রেণীর চরিত্রের প্রতি দীনবন্ধুর সহানুভূতি-বোধ অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় তাঁর প্রহসনগুলিতে আঘাতধর্মী স্যাটায়ারের চেয়ে হিউমারের করুণ হাস্যরসই বেশি।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরস তাঁর 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে'র উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করে। এর মধ্যে

'লোকরহস্যে' (১৮৭৪) বাঙালী সমাজের নানা বিকৃতিকে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তীব্র স্যাটায়ারধর্মী হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র মত বঙ্কিমের 'লোকরহস্য'ও একটি সামাজিক নক্শা ; কিন্তু এতে বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমের মত তৎকালীন কলকাতার নাগরিক সমাজের প্রায় সর্বত্র সঞ্চরণ না করে কোথাও বাঘ, হনুমান, গর্দভ প্রভৃতি পশুজীবনের রূপক রচনা ক'রে, কোথাও বাঙালী বাবু সম্প্রদায়ের প্রকৃতি বর্ণনা ক'রে, কোথাও ইংরাজস্তোত্র বা দাম্পত্যদণ্ডবিধির আইন রচনা ক'রে সাধারণ বাঙালী সমাজের কয়েকটি বিশেষ দুর্বলতার উপরেই তাঁর ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছেন। তাছাড়া হুতোমের সঙ্গে আরও একটা পার্থক্য এই যে হুতোমের নক্শায় একটা বৈঠকি ভঙ্গির মধ্যে স্যাটায়ার করা হয়েছে, কিন্তু বঙ্কিম 'লোকরহস্যে' ভাষা ও বর্ণনারীতিতে একটি ছদ্ম গাম্ভীর্য ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে স্যাটায়ারধর্মী বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে'র পূর্বাভাষ পাওয়া যায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র প্রথমভাগে 'বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতারে', কারণ অবহিত হয়ে দেখলে বঙ্কিমের মুচিরাম গুড় এবং হুতোমের হঠাৎ অবতার ওরফে পদ্মলোচন দত্তের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আবিষ্কার করা যাবে। উভয় ক্ষেত্রেই কিছুটা ভাগ্যগুণে এবং কিছুটা ইংরেজের তাঁবেদারি করে অপদার্থ ব্যক্তির পদোন্নতি ও হঠাৎ বড়লোক হওয়ার ফলস্বরূপ নানারকম বাহাদুরি করার চেষ্টার ওপর তীব্র স্যাটায়ার করা হয়েছে। হুতোমের নক্শায় 'হঠাৎ অবতার' অধ্যায়ে পদ্মলোচনের জন্মবৃত্তান্ত ও বাল্যজীবনের সঙ্গে মুচিরামের জন্মবৃত্তান্ত ও বাল্যজীবনেও অনেক সাদৃশ্য আছে। হুতোম লিখেছেন. "ক্রমে পদ্মলোচন তিথিগত চাঁদের মতন বাড়তে লাগলেন।·· পাঁচ বছরে হাতে খড়ি হলো, গুরুমশায়ের ভয়ে পদ্মলোচন পুকুর পাড়ে, নলবনে ও বাঁশবাগানে লুকিয়ে থাকেন।" 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে' আছে "জন্মগ্রহণের পর মুচিরাম দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন দেখিয়া যশোদা, সেটা বালকের অসাধারণ পৌরুষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া, অতিশয় গর্বান্বিতা হইলেন।······পাঁচ বৎসরে সাফলরাম গুড় মহাশয় কিছু গোলে পড়িলেন। যশোদা ঠাকুরাণীর সাধ, পাঁচ বৎসরে পুত্রের হাতেখড়ি হয়। সর্বনাশ! সাফলরামের তিন পুরুষের মধ্যে সে কাজ হয় নাই।······অগত্যা মুচিরাম অন্যান্য বিদ্যা অভ্যাসে সানুরাগ হইলেন। অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে 'পরা অপরা চ' গাছে ওঠা, জলে ডোবা এবং সন্দেশ চুরি।" মুচিরাম গুড়ের

বাল্যকালে যাত্রার দলে কষ্ট স্বীকারের মত "পদ্মলোচনকে অতি অল্পবয়সে পেটের জন্য অদৃষ্ট ও হাতযশের ওপর নির্ভর কত্তে হলো। পদ্মলোচন কল্‌কেতায় এসে এক বাঁসাড়েদের বাসায় পেটভাতে ফাইফরমাস্‌, কাপড় কোঁচানো ও লুচি ভাজা প্রভৃতি কর্মে ভর্তি হলেন।" কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন থাকলো না। মুচিরামের যেমন অল্পদিনের মধ্যেই তাঁবেদারির গুণে এবং ভাগ্যের জোরে মুহুরিগিরি থেকে মীর মুন্সীগিরি, মীর মুন্সীগিরি থেকে পেস্কারি, পেস্কারি থেকে ডেপুটিগিরিতে পদোন্নতি হয়েছিল পদ্মলোচনেরও তেমনি অবস্থার পরিবর্তন হলো। "ভাষাকথায় বলে যখন যার কপালে ধরে...., যখন পড়তা পড়তে আরম্ভ হয়, তখন ছাইমুটো ধল্লে সোনামুটো হয়ে যায়। ক্রমে পদ্মলোচন দত্তের শুভাদৃষ্ট ফল্‌তে আরম্ভ হলো—মুচ্ছুদ্দী অনুগ্রহ করে সিপসরকারী কর্ম দিলেন। সায়েবরাও দত্তজার চালাকি ও কাজের হুঁশিয়ারিতে সন্তুষ্ট হতে লাগলেন—পদ্মলোচন ততই সায়েবদের সন্তুষ্ট করবার অবসর খুঁজতে লাগলেন—একমনে সেবা কল্লে ভয়ংকর সাপও সদয় হয়, ক্রমে সায়েবরাও পদ্মলোচনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভাল করবার চেষ্টায় রইলেন; একদিন হউসের সদরমেট কর্মে জবাব দিলে—সায়েবরা মুচ্ছুদ্দীকে অনুরোধ করে পদ্মলোচনকে সেই কর্মে ভর্তি কল্লেন।...কিন্তু এ অবস্থায় তাঁরে অধিক দিন থাকতে হলো না। তাঁর অদৃষ্ট শীঘ্রই লুচির ফোস্‌কার মত ফুলে উঠলো...। ক্রমে মুচ্ছুদ্দীর সঙ্গে সায়েবদের বড় একটা বনিবনা না হওয়ায় মুচ্ছুদ্দী কর্ম ছেড়ে দিলেন, সুতরাং সাহেবদের অনুগ্রহধর পদ্মলোচন বিনা টাকায় মুচ্ছুদ্দি হলেন।" মুচিরামের কলকাতা-বাসের সঙ্গে হঠাৎ অবতার পদ্মলোচনের কলকাতা-বাস এবং সেখানকার একজন কেষ্টবিষ্টুর মধ্যে গণ্য হয়ে ওঠার মধ্যেও সাদৃশ্য আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র (১৮৭৫) হাস্যরস যে হিউমারধর্মী সেকথা সকলেই স্বীকার করেছেন, কিন্তু এখানেও যে স্যাটায়ার আছে তা অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অন্ততঃ দুটি অধ্যায় 'মনুষ্যফল' এবং 'ইউটিলিটি বা উদরদর্শন' পুরোপুরি স্যাটায়ারেরই নিদর্শন। আবার 'বসন্তের কোকিল,' 'স্ত্রীলোকের রূপ,' 'বড়বাজার', 'বিড়াল', 'ঢেঁকি', 'কমলাকান্তের পত্র', 'পলিটিক্স' ও 'বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব' হিউমারের সঙ্গে স্যাটায়ার মিশ্রিত হয়েছে; আর হিউমার, স্যাটায়ার এবং ফান্‌ এই তিন শ্রেণীর হাস্যরসের মিশ্রণ হয়েছে 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'তে। তবে 'একা—কে

গায় ওই ?', 'পতঙ্গ', 'আমার মন', 'আমার দুর্গোৎসব', 'একটি গীত', 'বুড়া বয়সের কথা' ও 'কমলাকান্তের বিদায়' বাংলা সাহিত্যে হাসি-অশ্রুর সমন্বয়ে হিউমার সৃষ্টির এক অপূর্ব উদাহরণ। এই হিউমারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "উইট ও হিউমার, দুয়েরই পরিণাম হাসি— কিন্তু হাসির প্রকৃতি স্বতন্ত্র। উইটে হাসির তীক্ষ্ণতা, হিউমারে হাসির বিদ্যুৎ, অপরটি হাসির আকাশভরা রৌদ্র, একটি অতর্কিতে মস্তকে আঘাত করে, অপরটি সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম অভিভূত করিয়া মনকে অভিষিক্ত ও উদার করিয়া দেয়।....হিউমারের রৌদ্রকিরণে তুষার গলে, ঝরণা চলে, চলন্ত ঝরণায় একসঙ্গে হাসির দীপ্তি এবং অশ্রুর ছলছল উঠিতে থাকে।...ইহাই কমলাকান্তের হাসির স্বরূপ।...এছাড়া একপ্রকার বিষাদের বৈরাগ্য তাহার চরিত্রে আছে।... 'কমলাকান্তের বিদায়' নিবন্ধ বিষাদে বৈরাগ্যে মিশ্রিত একটি অশ্রুর বিন্দু।" কিন্তু হুতোমের নক্শায় এই বিষাদ ও বৈরাগ্য নেই এবং হাসি-অশ্রুর সমন্বয়ে হিউমারও বিরল ব্যতিক্রম। তবে কমলাকান্তের কিছু কিছু স্যাটায়ারের পূর্বাভাষ পাই হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় যেমন—"কোথাও এক জন বড় মানুষের ছেলে অল্প বয়সে বিষয় পেয়ে কান্নে-খেকো খুঁড়ির মত ঘুচ্চেন। ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেরাও ছোঁ মারে, মানুষ তো কোন্ ছার,— কেউ 'স্বর্গীয় কর্তার পরম বন্ধু' কেউ স্বর্গীয় কর্তার 'মেজো পিসের মামার খুড়োর পিস্তুতো ভেয়ের মাস্তুতো ভাই' পরিচয় দিয়ে পেশ হচ্চেন, 'উমেদার' 'কন্যাদায়' (হয়ত ঐ কন্যাদায়ের বিবাহ হয় নাই) নানারকম লোক এসে জুটচেন ; আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবান রয়েচে—সময়ে আসলে আসবে।" ['কলিকাতার চড়ক পার্বণ'] কিংবা, "এতে বড় মানুষদেরো বড় দোষ নাই, 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, 'উমেদার' 'কন্যাদায়' 'আইবুড়ো' ও 'বিদেশী ব্রাহ্মণ' ভিক্ষুক-দের জ্বালায় সহরে বড় মানুষদের স্থির হওয়া ভার। এঁদের মধ্যে কে মৌতাতের টানাটানির জ্বালায় বিব্রত, কে যথার্থ দায়গ্রস্ত, এপিডেপিট্ কল্লেও বিশ্বাস হয় না।" আবার একই উপাদান হুতোমে যা স্যাটায়ার, কমলাকান্তে তা অশ্রুভারাক্রান্ত হিউমার, যেমন, হুতোমে—"শরীর ত্রিভঙ্গ হয়ে গিয়েচে, চস্মা ভিন্ন দেখতে পাইনে, কিন্তু আশা ও তৃষ্ণা তেমনি রয়েচে, বরং ক্রমে বাড়চে বই কম্‌চে না।" আর কমলাকান্তে "সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন ?... কেবল রঙ্গিল কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিল কাচ। যৌবনে অর্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অর্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায় ?" ফলারের সঙ্গে কমলাকান্তের হিউমারের

অনেক সম্পর্ক, কিন্তু হুতোম সেই ফলারের ওপর যে স্যাটায়ার করেছেন তা উল্লেখযোগ্য—"পাঠক! আমরা প্রকৃত ফলারদাস! লোহার সঙ্গে চুম্বুক পাথরের যে সম্পর্ক, আমাদের সহিত লুচিরও সেইরূপ- তোমার বাড়িতে ফলারটা আসটা জমূলে অনুগ্রহ করে আমাদের ভুলো না—আমরা মুনকে রঘুর ভাই! ফলারের নাম শুনে আমরা নরক ও জেলে পর্যন্ত যাই!" 'কমলাকান্তের দপ্তর' হিউমার প্রধান, স্যাটায়ার বেশ কিছু আছে, সেইসঙ্গে কোথাও কোথাও ফান্‌ও কিছু মিশেছে; কিন্তু হুতোম স্যাটায়ারই প্রধান, হিউমার প্রায় নেই বললেই চলে, তবে ফান্ আছে বেশ কিছু কোথাও বিশুদ্ধ-ভাবে, কোথাও স্যাটায়ারের সঙ্গে জড়িত হয়ে। হুতোম এবং কমলাকান্ত সম্বন্ধে আর একটি কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে উভয়েই নিজ নিজ স্টাইলে অর্থাৎ হুতোম স্যাটায়ারের মাধ্যমে এবং কমলাকান্ত হিউমারের মাধ্যমে নিজ ব্যক্তিত্বের এমন একটি যথার্থ পরিচয় রেখে গেছেন যা শিল্পীযুগলের অন্যকোন শিল্পকর্মে দুর্লভ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যাসাগরের লেখনী চলতে শুরু করলেও তাঁর বেনামী ব্যঙ্গরচনার সূত্রপাত হয়েছে হুতোমের নক্শার এগার বছর পরে এবং কমলাকান্তের দপ্তরের মাত্র দুবছর পূর্বে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে, এবং ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত তের বছর ধরে কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য ছদ্মনামে 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'ব্রজবিলাস' (১৮৭৪), কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ ছদ্মনামে প্রণীত বিনয়পত্রিকা' (১৮৮৪) এবং কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য ছদ্মনামে 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬) এইপাঁচখানি বেনামী ব্যঙ্গ-পুস্তিকায় চলেছে তাঁর সেই ব্যঙ্গরচনার ধারা। ইতিপূর্বে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে বিধবা বিবাহ এবং বহু বিবাহের উপর তিনি যে বিতর্ক-পুস্তিকা বা 'পলেমিক' রচনা করেছিলেন, তা পূর্ববর্তী রামমোহনের 'পলেমিকে'র তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল হলেও উভয়ের রচনাতেই লেখকের নিজ নিজ ব্যক্তিসত্তার সংযোগ ঘটেছিল অত্যন্ত তীব্র এবং প্রত্যক্ষভাবে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই শেষ বয়সের ফসলস্বরূপ বেনামী ব্যঙ্গ রচনাগুলিতে পূর্ববর্তী 'পলেমিকে'র ব্যক্তিসত্তার প্রত্যক্ষ অভিযোজন কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে হুতোম বা কমলাকান্তের মত ব্যক্তিসত্তার পরিস্রবণ। সেই সঙ্গে এই ব্যঙ্গরচনাগুলির ভাষাও পূর্ববর্তী বিদ্যাসাগরী ভাষার তৎসম

আড়ম্বরবাহুল্য ত্যাগ ক'রে এবং প্রয়োজনমত হুতোমী ভাষার মত অনেক দেশী-বিদেশী এবং চলিত শব্দ আত্মসাৎ ক'রে (অবশ্য ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের সাধুরূপ বজায় রেখে) অনেক সহজ, ক্ষিপ্র এবং লঘুভার হয়ে উঠেছে, যেমন—"প্রশ্নের উত্তর পাইলে, হাঙ্গাম ও ফেসাৎ উপস্থিত করিবেক, এমন স্থলে উত্তর না দেওয়াই ভাল, এই ভাবিয়া, চালাকি করিয়া, লেজ গুটাইয়া, বসিয়া থাকিলে, আমি ছাড়িব না। আমি খুড়ের বড় খাতির রাখি, এজন্য প্রসন্ন মনে তাঁহাকে এক মাস মিয়াদ দিয়াছি।" ['ব্রজবিলাস']। তবে হুতোমের ব্যঙ্গের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গরচনার একটা প্রধান পার্থক্য এই যে বিদ্যাসাগরের বেনামী ব্যঙ্গপুস্তিকার ব্যঙ্গ তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ভুবন-মোহন বিদ্যারত্ন, প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও মধুসূদন স্মৃতিরত্ন এই পাঁচজন পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রীয় তর্কযুদ্ধ উপলক্ষ্য করে অনেকটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে আবদ্ধ, কিন্তু হুতোমের ব্যঙ্গ কখনো কখনো ব্যক্তিগত পটভূমিকায় বিধৃত হলেও প্রায়শঃই তা ব্যক্তিচরিত্রের সীমা পেরিয়ে শ্রেণীচরিত্রের প্রতীকরূপে সামাজিক বিদ্রূপে পরিণত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ-প্রবণ হাস্যরসের ধারায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা 'পঞ্চানন্দ' একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এই ইন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্ববর্তী হুতোমের প্রধান সাদৃশ্য হল উভয়ের রচনাতেই ব্যঙ্গের ঝাঁজ অত্যন্ত তীব্র কিন্তু প্রধান পার্থক্য হল হুতোম পরিচালিত হয়েছেন মূলতঃ প্রগতিশীল মনোভাবের দ্বারা, আর ইন্দ্রনাথ পরিচালিত হয়েছেন মূলতঃ রক্ষণশীল মনোভাবের দ্বারা। বঙ্কিমচন্দ্র এই ইন্দ্রনাথের হাস্যরসের সঙ্গে তুলনা করে হুতোমকে 'পরদ্বেষী' এবং 'পরনিন্দক' বললেও ইন্দ্রনাথ শুধু যে স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত আক্রমণেই বিশেষ আনন্দ পেতেন তাই নয়, তাঁর প্রায় সকল রচনায় ব্রাহ্মবিদ্বেষ, নারী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রায় সকল প্রকার প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারের বিরোধিতা অতি প্রকট। এখানে ইন্দ্রনাথের (পঞ্চানন্দের) ব্রাহ্মবিদ্বেষপ্রসূত বিদ্রূপের একটু উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। "কতকগুলি ব্রাহ্ম 'ভ্রাতা' প্রস্তাব করিতেছেন যে, মৃতদেহ পোড়াইলে আত্মার অতিশয় যন্ত্রণা হয়, অতএব না পোড়াইয়া গোর দিবার নিয়ম প্রচলিত হউক। প্রস্তাব অতি সৎ এবং সুবুদ্ধির পরিচায়ক। পঞ্চানন্দ ইহাতে সম্মত আছেন। তবে মৃত্যুর পূর্বে 'ভ্রাতা' সকলকে পুঁতিতে পারিলে আরও ভালো হয়। কেন না, তাহা হইলে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তির পক্ষে আর সংশয় থাকিবে

না।" ['আর একটু'] ইন্দ্রনাথের বিদ্রূপগুলি পড়লে স্বভাবতঃই মনে হবে, কালীপ্রসন্ন নয়, ইন্দ্রনাথই পরদ্বেষী এবং পরনিন্দক। কালীপ্রসন্ন তাঁর নক্শায় সামাজিক হীনতার প্রতি বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু ইন্দ্রনাথের মত বিদ্বেষতাড়িত হয়ে কোন একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি এমন নগ্ন আক্রমণ কোথাও করেন নি; বরং তিনি হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান নির্বিশেষে সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যেখানে কপটতা ও ভণ্ডামি সেখানেই ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছেন; তাছাড়া সমাজ সংস্কার প্রসঙ্গেও ইন্দ্রনাথ যেখানে অগ্রগতির বিরোধী, হুতোম সেখানে অগ্রগতির সহায়ক। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুতোমকে 'পরদ্বেষী' এবং 'পরনিন্দক' বলেন এবং ইন্দ্রনাথের হাস্যরসকে প্যারীচাঁদ এবং কালীপ্রসন্নের হাস্যরসের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বলেন, তখন খুবই বিস্মিত হতে হয়। তবে কি ইন্দ্রনাথের ব্রাহ্মবিদ্বেষ এবং বিধবা বিবাহবিরোধী রক্ষণশীল মনোভাব-প্রসূত প্রতিপক্ষ আক্রমণের তীব্রতা যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রেরও কিছুটা মোহ সৃষ্টি ক'রে তাঁর স্নেহশীল পক্ষপাতিত্ব লাভের একটি কারণ হয়ে উঠেছিল? বিধবা বিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বঙ্কিমের মতভেদ এবং হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমের (ব্যক্তিগত স্নেহ-প্রীতি সত্ত্বেও) মসীযুদ্ধও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গে অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন রুচির হাস্যরসও কিছু কিছু আছে। তবু প্রগতি-বিরোধিতা এবং বিদ্বেষ-প্রবণতাই যে তাঁর ব্যঙ্গসাহিত্যের প্রধান অংশ জুড়ে আছে, সেকথা স্বীকার না করে উপায় নেই। ফলে ইন্দ্রনাথের হাস্যরস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি সাময়িক উত্তেজনার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে এবং সাময়িকতার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের হাস্যরসে যে কালাতিশায়ী সাধারণীকৃতি আছে, ইন্দ্রনাথের হাস্যরসে তা নেই।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাস্যরসে উদ্ভটরসই বেশি। কিন্তু এই উদ্ভটরস বা গ্রটেস্কধর্মী ফান্ এর তলায় কোথাও অশ্রু ছলছল করুণ হাস্যরস বা হিউমার, কোথাও সমাজসমালোচনার তীব্র ব্যঙ্গরস বা স্যাটায়ারের প্রবাহ বয়ে চলেছে। তাঁর হাস্যরসের কাহিনীগুলিরও আবার দুটি ধারা—একটি 'চাঁদের শিকড়', 'একটাকার ভূমিকম্প' জাতীয় উদ্ভট কাহিনীর ধারা, আর একটি বাস্তব কাহিনীর ধারা। এই বাস্তব কাহিনীতে যেখানে স্বভাবতঃই উদ্ভটত্ব কম কিন্তু শ্লেষ ও বিদ্রূপের অব্যর্থ আঘাতে সমাজের লোভ, স্বার্থপরতা, ভণ্ডামি ও হৃদয়হীনতা একেবারে অনাবৃত হয়ে পড়েছে. সেখানে পূর্বজ হুতোমের স্যাটায়ারের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য এবং সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দও ১৩০৬ সালে 'বিলাত যাত্রীর পত্র' বা পরিব্রাজক' এবং ১৩০৭ সালে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থে এবং বিভিন্ন সময়ে লেখা 'পত্রাবলী'তে সমাজের নানা অসঙ্গতি ও বিকৃতির ওপর তীব্র স্যাটায়ার বর্ষণ করেছেন। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে জাহাজে নেটিভদের প্রতি ইংরেজ সাহেবদের ব্যবহার দেখে নেটিভদের সর্ববিষয়ে সাহেবদের অনুকরণ করার স্পৃহার ওপর তিনি তীব্র ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, "দিশি আপড় ছাড়লেই, দিশি ধর্ম ছাড়লেই, দিশি চালচলন ছাড়লেই ইংরেজ রাজা মাথায় করে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ্! পালা, পালা, সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ কবলা। 'সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত।" এখানে ভাষার বিষয়টিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৮৬২-৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় খাঁটি চলিতভাষা ব্যবহারের পর অনেক যশোলিপ্সু, অল্প শক্তিসম্পন্ন লেখক নকশাজাতীয় রচনায় হুতোমী ভাষার অক্ষম অনুকরণের চেষ্টা করলেও প্রখ্যাত লেখকদের মধ্যে (বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, ইন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ, সকলেই তাঁদের ব্যঙ্গসাহিত্যেও ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের সাধুরূপ ব্যবহার করেছেন) এই প্রথম স্বামী বিবেকানন্দের মত একজন অদ্ভুত প্রতিভাবান সন্ন্যাসী ও সাহিত্যিকের হাতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের কথ্যরূপ সমন্বিত, প্রয়োজন মত দেশী-বিদেশী সর্ববিধ শব্দের স্বীকরণযুক্ত হুতোমী ভাষার মত তীব্র গতিবেগ সম্পন্ন খাঁটি চলিত ভাষার প্রয়োগ দেখা গেল। এখানে একথাও স্মরণীয় যে ইতিপূর্বে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় পত্রাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের চলিত ভাষায় লেখা একমাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে'র ভাষাও বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজকে'র ভাষার মত সত্যকার কথ্যভাষার এত কাছাকাছি নয়, এত ক্ষিপ্রগতিবেগযুক্ত নয় এবং এমন প্রাণস্পন্দিতও নয়। চলিতভাষা রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার স্পর্শরঞ্জিত অসামান্য সাফল্য দেখিয়েছেন, কিন্তু সে হল তাঁর প্রৌঢ়ী ফসল; সে ইতিহাস আরো অনেক পরে।

তার পূর্বে ১৩২১ সালের (ইং ১৯১৪) 'সবুজপত্র' আন্দোলনের নেতা প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের সঙ্গে হুতোমের তুলনামূলক আলোচনা করে আমরা এ অধ্যায় শেষ করব। বীরবল ও হুতোমের মধ্যে সর্বপ্রধান সাদৃশ্য হল উভয়েই চতুর, বুদ্ধিদীপ্ত, নাগরিক শব্দ প্রয়োগ করে বাংলা সাহিত্যকে তার 'আবেগব্যাকুল, করুণ রসার্দ্র আবহাওয়া' থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর সনেট সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা বোধ হয় হুতোম এবং বীর বল এই উভয়ের গদ্যরীতি সম্বন্ধে আরও বেশি প্রযোজ্য—"এ-যেন ইস্পাতের ছুরি…তীক্ষ্ণধার হাস্যে ঝক্‌ঝক্‌ করচে, কোথাও অশ্রুর বাষ্পে ঝাপসা হয় নি—কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেছে।" এই আঙ্গিকগত দক্ষতার সঙ্গে অব্যর্থ আঘাতপ্রবণতা, এমনকি রক্তের ছোপও যাতে দুর্লক্ষ্য নয়—এইখানেই হুতোমের সঙ্গে বীরবলের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য। আবার হুতোম যেমন নির্বিকার ভাবে সমাজের চলমান জীবন যাত্রাটি দেখেছেন এবং ভূমণ্ডলের ওপর বসে টুপি মাথায় দিয়ে নকশা উড়িয়েছেন, বীরবলও তেমনি নিরাসক্ত চিত্তে অনেক হাসির ফানুস উড়িয়েছেন। উভয় লেখকের প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের স্বরূপটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে প্রমথ চৌধুরীর একটি সনেটের দুটি পংক্তিতে—

হাসিতে উড়ায় তারা নিষ্ঠুর ক্ষমতা,
মনে জেনে বিশ্ব শুধু রঙীন ফানুষ ॥

কিন্তু হুতোমের সঙ্গে বীরবলের প্রথম লক্ষণীয় পার্থক্য হল হুতোমে কিছু কিছু অশ্লীল শব্দের ব্যবহার থাকলেও বীরবলে তা একেবারেই নেই। দ্বিতীয়তঃ হুতোম এবং বীরবল উভয়েই স্যাটায়ার-প্রধান হলেও হুতোমের তুলনায় বীরবলে উইটের অনেক বেশি প্রাধান্য। বীরবলের সাহিত্যে এই উইটের ব্যবহার এমন একটি বুদ্ধিদীপ্ত চমকে সৃষ্টি করেছে যা বাংলা গদ্যসাহিত্যে ইতিপূর্বে এমন প্রবলভাবে আর কখনো দেখা যায় নি। ১৩২১ সালের 'সবুজপত্র' প্রকাশের পূর্বেও কোন কোন লেখায় বীরবলের এই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। ১৩০৯ সালে-প্রকাশিত 'আমরা ও তোমরা' প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচনায় উইটের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে বীরবল লিখেছেন, "তোমরা চাও দুনিয়াকে জয় করবার বল, আমরা চাই দুনিয়াকে ফাঁকি দেবার ছল। তোমাদের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বিরাম। তোমাদের নীতির শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম।" ['বীরবলের হালখাতা'।] কিন্তু এই উইটের অতিরিক্ত এবং অহেতুক ব্যবহার কখনো কখনো বীরবলের সাহিত্যে জন্ম দিয়েছে ভাব অপেক্ষা ভঙ্গির অধিকতর প্রাধান্য। মাঝে মাঝে মনে হয় বীরবল যেন বিশেষভাবে শব্দসংস্থাপনার মোহে পড়ে গেছেন, ভাব এবং বিষয়বস্তু গৌন হয়ে গেছে, শব্দের সঙ্গে শব্দের সংঘাতসৃষ্টি করে এক ধরণের সাহিত্যিক ক্রীড়াকৌশলের চেষ্টাই মুখ্য হয়ে উঠেছে, যেমন—"তোমরা ও আমরা বিভিন্ন।

কারণ তোমরা তোমরা, এবং আমরা আমরা। তা যদি না হত, তাহলে ইউরোপ ও এসিয়া এ দুই, দুই হত না,—এক হত। আমি ও তুমির প্রভেদ থাকত না। আমরা ও তোমরা উভয়ে মিলে, হয় শুধু আমরা হতুম, না হয় শুধু তোমরা হতে।" ['বীরবলের হালখাতা' : 'আমরা ও তোমরা'।]। হুতোম কিন্তু এই ভঙ্গিপ্রাধান্যের ত্রুটি থেকে অনেকটা মুক্ত, কারণ যদিও হুতোমেও চতুরতা আছে, তবু সেখানে কোথাও শব্দ-যোজনা-কৌশলই লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তু উপলক্ষ্য হয়ে ওঠে নি। তাছাড়া সর্বনাম পদ ও ক্রিয়াপদের চলিত রূপটুকু বাদ দিলে বীরবলের তথাকথিত চলিত ভাষাও কখনো কখনো সাধুভাষার মতই কৃত্রিম মনে হয় (যদিও তিনি নিজে সাধুভাষার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন)। প্রকৃতপক্ষে তিনি যা চেয়েছিলেন অর্থাৎ মুখের ভাষাকেই সাহিত্যকর্মে প্রয়োগ করতে হবে, সেই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার পরিচয় দিয়েছিলেন হুতোম বীরবলের চলিত-ভাষা-নির্মিতিরও প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে। আমরা আগেই দেখেছি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে এবং বিশ শতকেও অনেক অক্ষম নক্শা রচয়িতার হাতে এ ভাষার অনেক নকল হয়েছে, কিন্তু এখনও হুতোম তাঁর সুক্ষেত্রে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। স্বয়ং প্রমথ চৌধুরীই তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' প্রবন্ধে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র এই বিশেষত্ব স্বীকার করে লিখেছেন, "হুতোম প্যাঁচার নক্শা··· তখনকার সমাজের আগাগোড়া বিদ্রূপ এবং অতি চমৎকার আলেখ্য। এ বই সেকালের কলিকাতা সহরের চল্তি ভাষায় লেখা। এ রকম চতুর গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় আর দ্বিতীয় নেই। ·· যাঁরা এ পুস্তক পড়েন নি, তাঁদের তা পড়তে অনুরোধ করি।" এ প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের চতুরতার সঙ্গে হুতোম এবং বীরবলের চতুরতাশ্রিত শিল্পকর্মের একটা রীতি ও ভঙ্গিগত সাধর্ম্যের কথাও মনে হতে পারে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সঙ্গে হুতোম ও বীরবলের একটা মূলগত তফাৎ হল এই যে, ভারতচন্দ্রকে কলম ধরতে হয়েছিল ধর্মের ছদ্মবেশে বিশেষভাবে তৎকালীন ইন্দ্রিয়লোলুপ, বিলাসী, বিত্তশালী সমাজের সাহিত্যিক ইন্দ্রিয় বিলাসের উপাদান সৃষ্টির জন্য, কিন্তু হুতোম এবং বীরবল কলম ধরেছেন নিজ নিজ অন্তরের প্রেরণাবশে ; তাছাড়া ভারতচন্দ্র যেখানে কপটতাশ্রয়ী, নৈতিকতায় অধঃপতিত বিত্তবানদের মনোরঞ্জন করেছেন, অবশ্য রাজসভায় বসে ভারতচন্দ্রের তা না করে উপায়ও ছিল না, হুতোম সেখানে তাদেরই উপর ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীব্র কশাঘাত করেছেন। হুতোমের এই স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় পরবর্তীকালে ফরাসী

সাহিত্যের মোপাসার মধ্যে। প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে মোপাসার সঙ্গে তুলনা করলেও কোথাও কোথাও আঙ্গিকগত precision গুণের সাদৃশ্যটুকু ছাড়া প্রভাতকুমারের সঙ্গে মোপাসাঁর আর কোন সাদৃশ্যই নেই, বরং বিষয়বস্তু ও মেজাজের দিক থেকে দুজনে দুই বিপরীত প্রান্তবাসী। কিন্তু কি আঙ্গিকগত precision, কি রচনাভঙ্গির তীব্র, তীক্ষ্ম তির্যকতা, কি বিষয়বস্তু—বহু দিক থেকেই হুতোমকে সার্থকভাবে বাংলার মোপাঁসা বলা যায়, কারণ মোপাঁসা যেমন তাঁর সমকালীন ক্ষয়িষ্ণু ফ্রান্সের অন্তর বাহিরের গ্লানিকে প্রকাশ করার ব্রত নিয়েছিলেন (কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর ছ'বছর পর ১৮৭৬ থেকে ছদ্মনামে এবং ১৮৮০ থেকে স্বনামে), হুতোমও তেমনি তাঁর সমকালীন ক্ষয়িষ্ণু সমাজের হীনতা, দুর্নীতি ও কপটতাকে উদ্ঘাটিত করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এইভাবে বাংলা সাহিত্যেতিহাসের ভূমি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, ভাবী ফরাসী সাহিত্যিক মোপাঁসার মেজাজ নিয়ে ডিকেন্সের 'স্কেচেজ বাই বজ'এর নক্শাধর্মী আধারে উনিশশতকের নাগরিক বাঙালী সমাজের বাস্তব পটভূমিকায় সাহিত্যে সর্বপ্রথম পুরোপুরি খাঁটি চলিত ভাষা অবলম্বন করে চিত্র ও চরিত্রের রঙ্গব্যঙ্গময় নিপুণ প্রদর্শনীতে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' বাংলা সাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ, অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৮৪ঃ ভূমিকা।

২। ডঃ সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খন্ড, ৭ম সং পৃঃ, ২০২।

৩। হুতোম প্যাঁচার নক্শা ঃ ১ম ভাগ, ১ম খন্ড, ১ম সংস্করণ; এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং।

৪। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং ঃ ভূমিকা যতীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'জন্মভূমি' (ভাদ্র ১৩১০)।

৫। সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খন্ড, ৭ম সং পৃঃ, ২০৭।

৬। The Calcutta Review 1871 : Bengali Literature.

৭। 'ভারতী' ১৩০৪ বৈশাখ। গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী ঃ ভোলা

মন্নরা। ভবতোষ দত্ত : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী : কবিওয়ালা অধ্যায়ে ফুটনোট।

৮। The Calcutta Review 1871.

৯। বঙ্কিমচন্দ্র : বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান (বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন, প্রবন্ধ খন্ড শেষ অংশ)।

১০। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নিউ এজ সং ১৩৬২) পৃ. ১৩০।

১১। স্বামী প্রেমঘনানন্দ : স্বামীজীর বাঙ্গালা রচনা ('উদ্বোধন' ফাল্গুন, ১৩৪৪)।

১২। তদেব।

১৩। রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সং : বাংলা ভাষা পরিচয়।

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছন্দ।

১৫। বিপিনবিহারী গুপ্ত সংগৃহীত 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (বিদ্যাভারতী সং, ১৩৭৩) পৃ. ২৩৭।

১৬। অজিত দত্ত : বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস।
পৃ. ২০৯।

১৭। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ : ভূমিকা (মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—মন্মথনাথ ঘোষ)।

১৮। ভারতী, ১৩০৪ বৈশাখ।

১৯। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নিউ এজ সং) পৃ, ১৩১।

২০। মন্মথনাথ ঘোষ : মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৩২২) পৃঃ ৬৬।

২১। যোগীন্দ্রনাথ বসু : মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত (অশোক পুস্তকালয় সং) পৃঃ ২৩৫।

অষ্টম অধ্যায়

অনুবাদ সাহিত্য ও কালীপ্রসন্ন

(১)

শিল্পী কালীপ্রসন্নের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' হলেও ব্যক্তি কালীপ্রসন্নের সবচেয়ে বড় গৌরব মূল মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় এবং "৭ জন কৃতবিদ্য সদস্য" পণ্ডিতের সহযোগিতায় কালীপ্রসন্ন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মূল সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদে প্রবৃত্ত হন এবং ১৮৫৮ থেকে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে ব্যাসের আদ্যন্ত মহাভারত অনুবাদ করে ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খণ্ডশঃ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এইরূপে খণ্ডশঃ প্রকাশ করার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন ১৭৮১ শকে অর্থাৎ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে মহাভারতের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লেখেন—"অষ্টাদশ পর্ব্ব সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করত একত্রে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে হইলে, দীর্ঘ কালের মধ্যেও সম্পন্ন হওয়া কঠিন। অতএব ইহা ক্রমশ খণ্ড খণ্ড করিয়া মুদ্রিত করাই উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, ইহার দোষগুণ অবগত হইবার জন্য আপাততঃ আদি পর্ব্বের প্রথমাবধি পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক পর্ব্বাধ্যায়ের শকুন্তলোপাখ্যান পর্য্যন্ত প্রথম খন্ড সাধারণ সমীপে অর্পণ করিতেছি, করুণাশীল সুধীগণ ইহার অবশ্যম্ভাবী অপেক্ষিত দোষরাশি মার্জনা করিয়া উৎসাহ প্রদান করিলে অচিরে অপর খণ্ড প্রকাশ করিতে উৎসাহান্বিত হইব।" কালীপ্রসন্নের মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের একত্রে গ্রথিত আদিপর্ব্বের আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

পুরাণ সংগ্রহ

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

মহাভারত

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

আদি পর্ব্ব।

শ্রী যুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

কলিকাতা।

পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্র

শকাব্দা ১৭৮২।

বহু অর্থব্যয়ে বহু পণ্ডিতের সহযোগিতায় মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত মূল সংস্কৃত মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের ১৭টি পৃথক খণ্ডে আদ্যন্ত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ এবং বিনামূল্যে প্রত্যেক খণ্ডের তিন হাজার কপি বিতরণ মহাত্মা কালীপ্রসন্নের এক অক্ষয় কীর্তি। কালীপ্রসন্নের পূর্বে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের 'শব্দ কল্পদ্রুম' বিতরণ এবং কালীপ্রসন্নের পরে বর্দ্ধমানের মহারাজার মহাভারতের গদ্যানুবাদ বিতরণ ছাড়া এমন বিরাট ব্যয়সাধ্য গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে আর কখনো দেখা যায় নি। এই মহাভারতের আদিপর্ব মুদ্রণের কাজ শুরু হলে দূরবর্তী গ্রাহকদের ডাক মাশুলের ব্যয়টুকু থেকেও অব্যাহতি দিয়ে এবং জেলায় জেলায় পুস্তক বন্টনের জন্য এজেন্ট নিয়োগ করে কালীপ্রসন্ন এই মহাগ্রন্থের যে সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থা করেছিলেন, ১৭৮০ শকাব্দের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক গদ্যে অনুবাদিত

বাঙ্গালা মহাভারত।

মহাভারতের আদিপর্ব তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে, অতি ত্বরায় মুদ্রিত হইয়া সাধারণে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। অতএব যাঁহারা বিনামূল্যে প্রথমাবধি শেষ খণ্ড পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ফাল্গুন মাসের মধ্যেই শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের নামে পত্র লিখিবেন, তাহা হইলে পুস্তক প্রস্তুত হইলেই পত্রলেখক মহাশয়দিগের নিকট প্রেরিত হইবে। ভিন্ন প্রদেশীয় মহাত্মারা পুস্তক প্রেরণ জন্য নিজ নিজ পত্রের সহিত ডাক ষ্ট্যাম্প প্রেরণ করিবেন না। কারণ পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ভিন্ন প্রদেশে পুস্তক প্রেরণের মাশুল গ্রহণ করা যাইবে না. প্রত্যেক জিলায় পুস্তক বন্টন জন্য এক এক এজেন্ট নিযুক্ত করা যাইবে।

পুরাণসংগ্রহ।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।

মহাভারত।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত।

আদি পর্ব্ব।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল
সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত।

কলিকাতা।

পুরাণসংগ্রহ যন্ত্রে।

শকাব্দা ১৭৮২।

মহাভারত (পুরাণ সংগ্রহ) প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্র।



মহাভারত অনুবাদ সভা

(কালীপ্রসন্ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ)

চিত্র—১৭

তাহা হইলে সর্বপ্রদেশীয় মহাশয়েরা বিনা ব্যয়ে আনুপূর্বিক সমুদায় খণ্ড সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন।

শ্রী রাধানাথ বিদ্যারত্ন
বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদক।

এই মহাভারত অনুবাদ, মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণের জন্য কালীপ্রসন্নের সেকালের বাজারে প্রায় আড়াই লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয় এবং এজন্য তাঁর উড়িষ্যার বিস্তৃত জমিদারী এবং কলকাতার বেঙ্গল ক্লাব প্রভৃতি মূল্যবান সম্পত্তিও হস্তান্তরিত হয়।' তৎকালীন নগর বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়ে সাহেবিয়ানার অন্ধ অনুকরণও যখন প্রায় অবাধ হয়ে উঠেছিল, তখন জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণই ছিল কালীপ্রসন্নের এই বিরাট ব্যয় ও শ্রম সাপেক্ষ প্রচেষ্টার লক্ষ্য। এখানে এও লক্ষণীয় যে, যদিও ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতো চিন্তাশীল মনীষী উনিশ শতকের শেষভাগে বলেছিলেন, "সংস্কৃত সাহিত্যের আবিষ্কারের ফলে পরবর্তী বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের রেনেসাঁস বা পুনর্জন্ম লাভ হবে" এবং স্যার উইলিয়াম জোন্সের মতো পন্ডিত ব্যক্তির মতে "সংস্কৃত ভাষা গ্রীক ভাষার চেয়েও উন্নত, ল্যাটিনের চেয়ে অধিকতর শব্দ সম্পদযুক্ত এবং দুই অপেক্ষা অধিক মার্জিত", তবু উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে রাজকীয় সম্মান ও দাক্ষিণ্যযুক্ত ইংরেজি চর্চার প্রতিযোগিতায় আমাদের জাতীয় জীবনে সংস্কৃত চর্চার আগ্রহ ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠেছিল এবং আমরাও ক্রমে আমাদের নিজস্ব জাতীয় ঐতিহ্য ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পথে বেশ দ্রুত গতিতেই এগিয়ে চলেছিলাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে কালীপ্রসন্ন মূল সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন, "এক্ষণে এদেশে দিন দিন সংস্কৃত ভাষার যে প্রকার অননুশীলন এবং অনাদর হইয়া আসিতেছে, তাহাতে বরং সংস্কৃত গ্রন্থসকল ক্রমে এদেশীয় লোকের নিকট হইতে তিরোহিত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বোধ হয়। অতএব যাহাতে এদেশীয় লোকে অতীব আদরণীয় ভারত গ্রন্থের সমস্ত মর্ম প্রকৃত রূপে অবগত হইয়া সুখী হইতে পারেন এবং যাহাতে ভারতবর্ষের গৌরব স্বরূপ মহাভারতের অবশ্যম্ভব মর্য্যাদা চিরদিন বর্তমান থাকে, তাহার উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশে আমি এই দুঃসাধ্য ও চির সংকল্পিত ব্রতে ব্রতী হইয়াছি।" অবশ্য কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদের কিছু পূর্ব থেকেই বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপ চাঁদ রামায়ণ-মহাভারত এবং অন্যান্য

কিছু শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এই মহাভারত অনুবাদ সম্বন্ধে যদিও প্রচলিত ধারণা এই যে কালীপ্রসন্নের মহাভারতানুবাদ আরম্ভের কয়েক বৎসর পূর্ব থেকেই বর্দ্ধমানের মহাভারত অনুবাদের কাজ শুরু হয়েছিল এবং এই প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী যদিও ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তও তাঁর 'Literature of Bengal' গ্রন্থে লিখেছেন "The work had been translated into Bengali by the Pundits of the Maharaja of Burdwan some years befor" তবু এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য এই যে বর্দ্ধমানের মহাভারত অনুবাদ শুরু হয়েছিল কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ হওয়ার কয়েক বৎসর পূর্বে নয়, মাত্র দু মাস পূর্বে—কারণ বর্দ্ধমানের মহাভারতের 'রাজবাটীর ভূমিকা' অংশের বিজ্ঞাপনে দেখি এই মহাভারতের গদ্যানুবাদ আরম্ভ হয় ১২৬৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে এবং কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদ কার্যারম্ভের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' এবং তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে এই মহাভারতের আদি পর্ব মুদ্রাঙ্কনের সংবাদ পাওয়া যায় ১৭৮০ শকাব্দের (১৮৫৮ খৃ) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ফাল্গুন সংখ্যায়। কালীপ্রসন্নের মহাভারতের ১ম খণ্ড ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হলেও ১৭৮০ শকে অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দেই যে এই মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ হয়, মহাভারতের 'উপসংহারে'ও সে তথ্য স্বীকৃত হয়েছে। যাই হোক্, কালীপ্রসন্নের মহাভারতানুবাদারম্ভের দুমাস পূর্ব থেকে শুরু হলেও বর্দ্ধমানের মহাভারত অনুবাদের কাজ শেষ হয় কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদ প্রকাশের (১৮৬০ ৬৬) চব্বিশ বছর পরে এবং কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর চোদ্দ বছর পরে ১২৯১ বঙ্গাব্দের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ; এবং তারও কয়েক বৎসর পরে ১২৯৬ বঙ্গাব্দে (১৮৮৯ খৃ) বর্দ্ধমানের মহাভারত সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন, বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদকে "টেক্কা দিবার জন্যই কালীপ্রসন্ন মহাভারত অনুবাদ করাইয়াছিলেন বলিয়া মনে করি।"[২]

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করব, "টেক্কা দিবার" চেষ্টা অপেক্ষা মহাতাপচাঁদের রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য কিছু শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদকর্মের উদ্যোগে কালীপ্রসন্নের অনুপ্রাণিত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক ছিল। দুটি কারণেই এই সম্ভাবনাই আমাদের মনে দৃঢ় হয়। প্রথমত, যে তরুণ কালীপ্রসন্ন

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনে এবং বিধবা বিবাহ ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করে বিদ্যাসাগরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশনার অপরাধে দণ্ডিত রেভারেন্ড লঙ্ সাহেবের জরিমানার এক হাজার টাকা আদালত গৃহেই দিয়ে দিয়েছেন, 'মেঘনাদ বধ কাব্য' প্রণেতা মধুসূদনকে স্বপ্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'য় এনে সংবর্দ্ধিত করেছেন তাঁর মত উদারচেতা, দেশাত্মবোধসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে টেক্কা দিবার চেষ্টা অপেক্ষা সৎকর্মে অনুপ্রাণিত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। দ্বিতীয়ত, যে মহাতাপচাঁদকে "টেক্কা দিবার জন্যই কালীপ্রসন্ন মহাভারত অনুবাদ করাইয়াছিলেন" বলে ডঃ সেন মনে করেছেন, সেই বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপ-চাঁদের প্রতি কালীপ্রসন্ন যে কোনরকম বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন না, বরং বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তারও প্রমাণ আছে। আমরা পূর্বেই 'নাটকে কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন "বিদ্যোৎসাহিনী সভার কারণ" যে 'বিক্রমোর্বশী' নাটক রচনা করেন, সেটি বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুরকে উৎসর্গ করেন। ডঃ সুকুমার সেন অবশ্য তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসের নাটক অধ্যায়ে কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের নামোল্লেখ ক'রে পাদটীকায় লিখেছেন, "বোঝা গেল তখনও কালীপ্রসন্ন বর্দ্ধমানের মহারাজার প্রতি বিদ্বিষ্ট হন নাই।"[৩] কিন্তু তার মাত্র এক বছর পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহাভারত অনুবাদারম্ভের সময়ে যে কালীপ্রসন্ন বর্দ্ধমানের মহারাজার প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন তার কোন প্রমাণ ডঃ সেন উত্থাপিত করেন নি। আবার ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বিচারপতি কালীপ্রসন্ন চৌরিটির বাজার অপরিষ্কৃত রাখার জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজাকে যে দৈনিক পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করেন সে ঘটনাকেও এ ক্ষেত্রে মহারাজার প্রতি বিদ্বেষ বা তাঁকে টেক্কা দেওয়ার জন্য কালীপ্রসন্ন মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এরূপ ধারণার সমর্থনে ব্যবহার করা যায় না প্রধানতঃ দুটি কারণে—প্রথমতঃ, ঘটনাটিকে বিদ্বেষের ঘটনা না বলে কালীপ্রসন্নের পক্ষপাতিত্বহীন সুবিচারের দৃষ্টান্তরূপেই গণ্য করা উচিত; দ্বিতীয়তঃ, যদি কেউ এটিকে বিদ্বেষের ঘটনা বলেও মনে করেন, তাহলেও মনে রাখতে হবে যে ঘটনাটির সঙ্গে মহাভারত অনুবাদে টেক্কা দেওয়ার কোন সম্পর্ক নেই, কারণ এই ঘটনা ঘটে কালীপ্রসন্নের চব্বিশ বছর বয়সে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। আর কালীপ্রসন্ন মহাভারত অনুবাদ শুরু করেন তার ছ'বছর পূর্বে আঠারো বছর বয়সে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট প্রমাণের

অভাবে শুধু অনুমানের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির প্রকৃতিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অনুকূল প্রমাণপুষ্ট এবং সেই ব্যক্তির স্বভাবধর্মের অনুকূল সিদ্ধান্ত করাই অধিকতর সঙ্গত মনে করি। মহাভারতের প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতেও কালী-প্রসন্ন স্বয়ং টেক্কা দেওয়ার পরিবর্তে অনুপ্রেরণা লাভের সাক্ষ্য রেখে গেছেন, "এক্ষণে আমাদিগের দেশের মধ্যে নানাস্থানে নানা বিদ্যোৎসাহী ও স্বদেশ হিতানুরাগী মহানুভবগণ ইংরাজী ভাষার বিবিধ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেশের হিতসাধনে তৎপর হইয়াছেন। কেহ বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুবাদ করিতেছেন, কেহ সাহিত্যের অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতেছেন, কেহ পুরাবৃত্তাদি গ্রন্থের অনুবাদ প্রসঙ্গেও আমোদিত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়াও আমার মনে হইল যে, যেমন অনুবাদ দ্বারা ভিন্ন দেশের গ্রন্থান্তর্গত অমূল্য জ্ঞানরত্ন সকল সঞ্চয় করিয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করা উচিত, সেইরূপ স্বদেশীয় মহানুভব পুরুষদিগের মানোসোদিত আশ্চর্য তত্ত্বসকল স্থায়ী হইবার উপায় বিধান করাও একান্ত কর্ত্তব্য।" এই সকল দিক বিবেচনা করলে এ প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মন্তব্যই যথার্থ বলে মনে হয়—"কালীপ্রসন্ন যখন এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তখন বর্দ্ধমান রাজবাটীতে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। তবে তিনি কেন এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন তাহা লইয়া নানা কল্পনা কালক্রমে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু মানুষের কার্য্যে অধিকাংশস্থলে সর্বাপেক্ষা সরল উদ্দেশ্যই প্রকৃত উদ্দেশ্য; আমরা তাহার সরলতা হেতু তাহা পরিহার করিয়া দুজ্ঞের্য় উদ্দেশ্যের কল্পনা করিয়া তাহার সন্ধানে ব্যাপৃত হই। মহাভারতের উৎকৃষ্ট বা উৎকৃষ্টতর বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গদেশে সুপরিচিত হওয়াই তাঁহার কার্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে। তিনি স্বয়ং বিদ্যানুরাগীর স্বাভাবিক বিনয় সহকারে বলিয়াছেন, ক্ষুদ্র কীট যেমন পুষ্প সহবাসে দেবশিরে আরোহণ করে, মহাভারতের অনুবাদে সেইরূপ আমি অনেকানেক মহাত্মা সাধুজনের সহবাসলাভে চরিতার্থ হইলাম। ইহাই আমার অসামান্য সৌভাগ্য ও ইহাই আমার পরম লাভ'।" প্রকৃতপক্ষে আমরা কখনো কখনো স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হলেও মানুষের কাজে অধিকাংশ স্থলে সরল উদ্দেশ্যই প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাছাড়া বর্দ্ধমানের মহারাজাকে কেবল টেক্কা দেওয়ার জন্য কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদ হয়ে থাকলে তাঁর দীর্ঘ ভূমিকা এবং উপসংহারে তাঁর ঈর্ষা বা বিদ্বেষের কিছুটা আভাস থাকতো। কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁর এই কাজের সরল উদ্দেশ্য তাঁর নিজের ভাষাতেই মহাভারতের ভূমিকায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে—"আমি যে দুঃসাধ্য ও

চিরজীবনসেব্য কঠিন ব্রতে কৃতসংকল্প হইয়াছি তাহা যে নির্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব, আমার এ প্রকার ভরসা নাই। মহাভারত অনুবাদ করিয়া যে, লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমত প্রত্যাশা করিয়াও এবিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই। যদি জগদীশ্বর-প্রসাদে পৃথিবী মধ্যে কুত্রাপি বাঙ্গালা প্রচলিত থাকে, আর কোন কালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত হওয়ায় সে ইহার মর্মানুধাবন করত হিন্দুকুলের কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ ভারতের মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে।" সুতরাং "টেক্কা দিবার জন্য" নয়, বর্দ্ধমানের মহারাজার দৃষ্টান্ত এবং তারও পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগ অনুবাদের দৃষ্টান্তের দ্বারা উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত হয়ে কালীপ্রসন্ন মহাভারত অনুবাদের চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের মনে হয়। আবার এই বর্দ্ধমান প্রসঙ্গ, যা নিয়ে এত জল্পনা-কল্পনা, সে বিষয়ে একেবারে গোড়া ধরে আমাদের মনে আরও একটি সংশয় উপস্থিত হয় যে, কালীপ্রসন্ন মহাভারত আরম্ভ করার সময় বর্দ্ধমানের মহাভারত অনুবাদ আরম্ভের কথা আদৌ জানতেন কিনা, কারণ আমরা পূর্বেই বর্দ্ধমানের মহাভারতের 'রাজবাটীর ভূমিকা' থেকে মহাভারত আরম্ভের সময় এবং কালীপ্রসন্নের মহাভারত আরম্ভের বিজ্ঞাপনের তারিখ উদ্ধার করে দেখিয়েছি কালীপ্রসন্নের অনুবাদ আরম্ভের মাত্র দুমাস পূর্বে বর্দ্ধমানের অনুবাদ আরম্ভ হয় এবং ঐ দুমাসের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহাভারতের কোন খন্ডও প্রকাশিত হয়নি ; প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসন্নের মহাভারত প্রকাশ আরম্ভের (১৮৬০) উনত্রিশ বছর পরে ১২৯৬ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৮৯) বর্দ্ধমানের মহাভারত সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং অনুবাদ চলাকালে কালীপ্রসন্ন বর্দ্ধমানের মহাভারত প্রচেষ্টার কথা জ্ঞাত হলেও অনুবাদ আরম্ভের সময় কালীপ্রসন্ন তা জানতেন কিনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়ার কোনও উপায় নেই। তবে কালীপ্রসন্ন যে মহাভারতের অনুবাদকর্মে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন, 'পুরাতন প্রসঙ্গে' আচার্য কৃষ্ণকমল পুরাতন স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সে সাক্ষ্য দিয়েছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। মহাভারতের অনুবাদ বিদ্যাসাগরের প্ররোচনায় হইয়াছিল। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে বিদ্যাসাগর এই কার্যে ব্রতী করিয়াছিলেন। যে পন্ডিতমন্ডলীর দ্বারা মহাভারত অনূদিত হইয়াছিল, তাঁহারাও বিদ্যাসাগরের লোক।" আচার্য কৃষ্ণকমল পুরাতন দিনের কথা বলতে গিয়ে কালীপ্রসন্ন প্রসঙ্গে আবার একবার বলেছিলেন, "মহাভারত তাঁহার কীর্তিস্তম্ভ।

…বলিয়াছি তিনি বিদ্যাসাগরের কথায় এই বিরাট কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিজেরও higher, nobler sympathies যথেষ্ট ছিল।" ১২৭৭ সালের ১০ই শ্রাবণ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাতেও লেখা হয়, "তাঁহার সংস্কৃতের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। এই অনুরাগবশতঃ মহাভারতের অনুবাদে প্রবৃত্তি জন্মে।" আমরা পূর্বেই বলেছি, কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদ শুরু হওয়ার মাত্র দুমাস পূর্বে বর্দ্ধমানের মহাভারত অনুবাদ শুরু হলেও কালীপ্রসন্নের জীবদ্দশায় বর্দ্ধমানের গদ্য-মহাভারত প্রকাশিত হয়নি। কালীপ্রসন্নের পূর্বে একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ থেকে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় মহাভারতের কিছু কিছু গদ্যানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন মহাভারত অনুবাদের ভার গ্রহণ করায় বিদ্যাসাগর মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগ অর্থাৎ আদি পর্বের প্রথম বাষট্টি অধ্যায় পর্যন্ত অনুবাদ করে ছেড়ে দেন এবং কালীপ্রসন্নকেই এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রারম্ভিক প্রচেষ্টার পর ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে মুদ্রিত কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতই বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্য মহাভারত।

(২)

এখন কালীপ্রসন্নের নামে প্রচলিত মূল মহাভারতের এই গদ্যানুবাদে পণ্ডিতদের সহযোগিতা ও কালীপ্রসন্নের নিজস্ব অবদান কতটা তা নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন, "মহাভারত (পুরাণ সংগ্রহ) অনুবাদ একদল পণ্ডিতকে দিয়া করানো, এবং মুদ্রিত গ্রন্থে অনুবাদক বলিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম নাই।"[৪] কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ তথ্য সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলে আমরা মেনে নিতে পারি না। কারণ আমরা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডের যে আখ্যাপত্রের পরিচয় দিয়েছি তাতে এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যসাধক চরিত মালা'য় উদ্ধৃত আখ্যাপত্রেই যে শুধু "শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষায় অনুবাদিত" কথাগুলি মুদ্রিত আছে তাই নয়, ১৭৮০ শকাব্দের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত মহাভারত বিতরণের একটি বিজ্ঞাপনেও "শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক গদ্যে অনুবাদিত বাংলা মহাভারত" কথাগুলি উল্লিখিত আছে দেখা যায়। মহাভারতের 'অষ্টাদশ পর্ব অনুবাদের উপসংহারে'ও কালীপ্রসন্ন স্পষ্টভাবে লিখেছেন, "১৭৮০ শকে

সংকীর্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া সাতজন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আটবর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের কৃপায় অদ্য সেই চিরসঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপনস্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম।" কালীপ্রসন্নের এই স্বীকারোক্তিতে পন্ডিতদের সহযোগিতার কথাও যেমন গোপন থাকেনি, তেমনি তিনি নিজেও যে এই অনুবাদকর্মে লিপ্ত ছিলেন সেকথাও অপ্রকাশিত থাকে নি। উপসংহারের এই স্বীকারোক্তি ছাড়াও কালীপ্রসন্ন তাঁর মহাভারতের ভূমিকায় তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয় ও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট করে লিখেছেন, "...আমি স্বীয় যৎসামান্য পরিমিত শক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিস্তীর্ণ মহাভারতের অনুবাদ করত স্বদেশের হিতসাধন করিতে সাহসী হইয়াছি। মহাভারত যেরূপ দুরূহ গ্রন্থ, মাদৃশ অল্পবুদ্ধিজন কর্তৃক ইহা সম্যকরূপে অনুবাদিত হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। এই নিমিত্ত ইহার অনুবাদ সময়ে অনেক কৃতবিদ্য মহোদয়গণের ভূরিষ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এমনকি তাঁহাদের পরামর্শ ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই গুরুতর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তন্নিমিত্ত, ঐ সকল মহানুভবদের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।" সুতরাং কালীপ্রসন্নের মহাভারত যে পন্ডিতগণের সহযোগিতার সঙ্গে কালীপ্রসন্নের স্বকীয় প্রচেষ্টারও সম্মিলিত ফল সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। যে সব বিভিন্ন পন্ডিত এই অনুবাদকর্মে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন কালীপ্রসন্ন 'অষ্টাদশ পর্ব অনুবাদের উপসংহারে' তাঁদের নাম ও তাঁদের সাহায্যের প্রকৃতির কথা সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রথমে 'সাতজন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত' কালীপ্রসন্ন মূল সংস্কৃত মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত হলেও পরে ঐ সদস্য পণ্ডিতদের যে আরও সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সে কথা ঐ উপসংহারেই উল্লিখিত হয়েছে। ঐ সকল পন্ডিত ব্যক্তির নিকট প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন 'উপসংহারে' লিখেছেন—মহাভারতের "বহু-স্থলের বিরুদ্ধভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ...বিষয়ে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর "অবকাশা-নুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্যোপলক্ষে যখন

আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন।" তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশিষ্ট সাহায্য ছাড়া "যে সকল মহাত্মারা সময়ে সময়ে আমার সদস্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের ব্যাকরণের অধ্যাপক ও সংস্কৃত রঘুবংশের বাংলা অনুবাদক মৃত চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, মৃত কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, মৃত ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরমাত্মীয় মৃত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মৃত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও মৃত অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি দশজন অনুবাদ শেষের পূর্বেই অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণকার বর্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রামসেবক বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সদস্যাদিগকে মনের সহিত সকৃতজ্ঞচিত্তে বার বার নমস্কার করিতেছি। এই সমস্ত সুবিচক্ষণ কর্ণধারদিগের কৃপাবলেই আমি অনায়াসে মহাভারত স্বরূপ সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম।"

এখন এই মহাভারত অনুবাদে পণ্ডিতদের সহযোগিতার সঙ্গে কালীপ্রসন্নের নিজস্ব অবদান কতটা তা সতর্কভাবে বিচার্য।

'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' গ্রন্থে মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন, "শুনা যায়, কালীপ্রসন্ন স্বয়ং মহাভারতের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হরচন্দ্র তাঁহাকে উৎসাহিত করেন, কিন্তু একাকী এরূপ বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে বলিয়া পণ্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ করিতে উপদেশ প্রদান করেন।" অতঃপর কালীপ্রসন্ন কিভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতি, চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রমুখ পণ্ডিতদের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন, সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বিনয় ও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে মহাভারতের ভূমিকা ও উপসংহারে এই সব সাহায্য ও সহযোগিতার কথা বিশদভাবে উল্লেখ করায় পরবর্তীকালে অনেকেই মনে করেন যে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং মহাভারতের কোন অংশ অনুবাদ করেন নি। কিন্তু এ ধারণা যে যথার্থ নয়, তার প্রমাণ পাই কালীপ্রসন্নের সমকালীন বিখ্যাত ব্যক্তি কৃষ্ণদাস পালের লেখায়। কৃষ্ণদাস পাল লিখেছেন, "We have been assured by friends who were in his confidence, that some of the finest specimens of Bengali in the translation of the

Mahabharata were from his pen."[৫] মহাভারতের এই গদ্যানুবাদে যে কালীপ্রসন্নের নিজের লেখাও আছে, 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' থেকেও তার প্রমাণ পাই। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র 'দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা'য় হুতোম (হুতোম যে কালীপ্রসন্নই পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে) বলেছিলেন, "জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নক্শা প্রসব করেচে, সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম নীতি শাস্ত্রের···অনুবাদক।" কালীপ্রসন্নের দ্বারা মহাভারতের কোন কোন অংশের অনুবাদ ছাড়াও এই মহাভারতানুবাদে কালীপ্রসন্নের আরও বড় কৃতিত্বের কথা প্রকাশিত হয়েছে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত কৃষ্ণদাস পালের সুদীর্ঘ সমালোচনার একটি অংশে। কৃষ্ণদাস লিখেছেন, "All the volumes attest the touches of the practised hand of the Editor in chief, we mean the Baboo himself." প্রকৃত পক্ষে কালীপ্রসন্নের মহাভারতের বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন ধরণের ভাষার পরিবর্তে এমন একটি ভাষাগত ঐক্য (uniformity) লক্ষ্য করা যায় যাতে খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন পণ্ডিতের ভাষার উপর একটি একক হস্তের স্পর্শ অনুমিত হয়। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র 'বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' নিবন্ধে তৎকালীন পণ্ডিতদের ভাষার যে নমুনা দিয়েছেন, কালীপ্রসন্নের মহাভারতে সে ধরণের অতি উৎকট পণ্ডিতী ভাষা নেই; এই মহাভারতের ভাষা অনেকটা বিদ্যাসাগরীয় সাধু গদ্যের মত কিছুটা ক্লাসিক ধর্মী এবং তৎসম শব্দ বহুল হলেও প্রাঞ্জল। অথচ কালীপ্রসন্নের গদ্য মহাভারতের সর্বত্র বিদ্যাসাগরের হস্তের স্পর্শ ছিল বলেও মনে হয় না এই কারণে যে তিনি স্বয়ং মহাভারতের গদ্যানুবাদ আরম্ভ করেও উপক্রমণিকা-ভাগ পর্যন্ত অনুবাদের পর অনবসর বশতঃ সেই আরব্ধ কাজ পরিত্যাগ করেন এবং কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদের মহৎ সঙ্কল্পকে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করেন। তাছাড়া বিদ্যাসাগর তাঁর মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগ পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সময় ঐ পুস্তকের 'বিজ্ঞাপনে'ও উল্লেখ করেন, "পুস্তকাকারে প্রচারিত করিতে গেলে পরিশ্রম সহকারে সংশোধনাদি করা আবশ্যক, কিন্তু অবকাশবিরহাদি কারণ বশতঃ তাহা সম্যক সমাহিত হইয়া উঠে নাই।" বস্তুতঃ কালীপ্রসন্নের মহাভারতের স্থানে স্থানে বিদ্যাসাগরের ভাষা সংস্কারের স্পর্শ থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বয়ং কালীপ্রসন্নই যে এই ভাষা সংস্কার এবং অনুবাদকর্মের তত্ত্বাবধান করতেন, সেকথা স্পষ্ট হয়ে

ওঠে যখন 'অষ্টাদশ পর্ব অনুবাদের উপসংহারে' কালীপ্রসন্নের নিজের লেখাতেই এই অংশটির দিকে আমরা বিশেষভাবে মনোযোগ দিই, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর "অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন।"

'অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন' কথাটির দুটি অর্থ হতে পারে ঃ—

(১) কালীপ্রসন্ন স্বাধীনভাবে যে সব অংশ অনুবাদ করেছেন, বিদ্যাসাগর সেগুলি অবকাশ অনুসারে দেখে দিয়েছেন, (২) পণ্ডিতদের অনুবাদের পর সম্পাদক হিসাবে কালীপ্রসন্ন যে ভাষাসংস্কার করেছেন, বিদ্যাসাগর অবকাশ মত তা থেকে কিছু কিছু দেখে দিয়েছেন, যেহেতু সমগ্র মহাভারত দেখে দেওয়ার মত বিদ্যাসাগরের অবকাশ ছিল না। আর সময়ে সময়ে কার্যোপলক্ষে কালীপ্রসন্ন কলকাতায় অনুপস্থিত থাকলে বিদ্যাসাগর ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধান করেছেন—একথায় এটাই স্পষ্ট হয় যে কালীপ্রসন্নের অনুপস্থিতির সময়টুকুতে বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধান ছাড়া কালীপ্রসন্ন নিজেই ভারতানুবাদের অবশিষ্ট বৃহত্তর অংশের তত্ত্বাবধান করেছেন। আবার বর্দ্ধমানের মহাভারতের 'রাজবাটীর ভূমিকা'র 'বিজ্ঞাপনে' ঐ মহাভারতের এক একটি পর্ব কে অনুবাদ করেছেন এবং কে সংশোধন করেছেন তা পৃথকভাবে বলা থাকলেও কালীপ্রসন্নের মহাভারতের 'ভূমিকা' বা 'উপসংহারে'র কোথাও কোন একজন বিশেষ পণ্ডিত যে কোন একটি বিশেষ পর্ব অনুবাদ করেছেন, এমন কথা বলা নেই। তা থেকে এটাই মনে হয় যে কালীপ্রসন্নের মহাভারতে কালীপ্রসন্নের সম্পাদনায় ও তত্ত্বাবধানে সদস্য-পণ্ডিতেরা সকলে মিলে অনুবাদ করতেন অথবা বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন অংশ অনুবাদ করার পর অনুবাদগুলি কালীপ্রসন্নের হাতে সম্পাদিত হত ও প্রয়োজনবোধে সেই পণ্ডিতী ভাষার সংস্কার সাধিত হত।

(৩)

এখন বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদের ধারায় কালীপ্রসন্নের স্থান এবং তাঁর সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত এই মহাভারতে মূলানুগত্যের প্রশ্নটি বিশেষভাবে বিবেচ্য। ষোড়শ শতক থেকে বাংলা পদ্যছন্দে মহাভারত অনুবাদ শুরু হলেও এই মহাভারতগুলি মূলানুগ নয়; একদিকে ঠিক

অনুবাদও বলা যায় না, অনেকটা পাঁচালীর ঢঙে কাহিনীসার-সংকলন এবং মাঝে মাঝে মূলের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত স্বকপোলকল্পিত বা কিংবদন্তী-প্রসূত কাহিনী সংযোজনের সাহায্যে মোটামুটিভাবে মহাভারতের গল্প বলাই ছিল এই সব পদ্য-মহাভারতের লক্ষ্য। বাংলাভাষায় এই ধরণের গল্পাশ্রয়ী পদ্য মহাভারত সর্বপ্রথম কে প্রণয়ন করেন তাও আজ নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে যে প্রাচীনতম কবি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায়, তিনি 'পরাগলী মহাভারতে'র কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর। বাংলা সাহিত্যের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক সুলতান হুসেন শাহের অধীনস্থ তৎকালীন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খানের অনুরোধে কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রণীত এই মহাভারতই 'পরাগলী মহাভারত' বা 'পাণ্ডব বিজয় পাঞ্চালিকা'। মহাভারতের অন্য এক প্রাচীন কবি সঞ্জয় সম্বন্ধে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, মনীন্দ্র মোহন বসু প্রমুখ বিদগ্ধজন পরস্পর বিরোধী মন্তব্য করেছেন এবং বর্তমানে অনেকেই সঞ্জয় নামক কোন কবির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তবে এই বাদানুবাদের মধ্যে 'সঞ্জয় মহাভারতে'র একটি হস্তলিখিত পুঁথিতে নিম্নোদ্ধৃত এই বিবৃতিটি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, 'সঞ্জয়' ছদ্মনামে হরিনারায়ণ দেব নামে কোন ব্যক্তি হয়ত এই 'সঞ্জয় মহাভারত' রচনা করেছিলেন :—

হরিনারায়ণ দেব দীন হীন মতি।
সঞ্জয়াভিমানে কৈলা অপূর্ব ভারতী ॥
ব্যাসদেব হৈতে মহাভারত প্রচার।
সঞ্জয় রচিয়া কৈল পাঞ্চালী প্রচার ॥

পরাগল খানের পুত্র ছুটী খানের অনুরোধে শ্রীকর নন্দী জৈমিনি মহাভারত অবলম্বন করে অশ্বমেধ পর্বের উপর বিস্তৃত কাব্য রচনা করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে রামচন্দ্র খান এবং দ্বিজ রঘুনাথও দুখানি বাংলা পদ্য মহাভারত রচনা করেন। কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভাই শুক্লধ্বজের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি অনিরুদ্ধও ভারত পাঁচালী রচনা করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মহাভারত রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ষষ্ঠীবর সেন এবং তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন।

বাংলা পদ্য মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম দাস সপ্তদশ শতকে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে মল্লাবনীনাথ রাধাদামোদর সিংহের রাজত্বকালে অনুলিখিত একটি পুঁথিতে আদি পর্ব-সমাপ্তির কালজ্ঞাপক একটি শ্লোক অবলম্বন করে সিদ্ধান্ত

করেছেন ১৬০২-৩ খৃষ্টাব্দে কাশীরামের আদি পর্ব সমাপ্ত হয়। কাশীরাম দাসের আর একটি পুঁথিতে বিরাট পর্ব সমাপ্তির কাল উল্লিখিত হয়েছে ১৬০৪-৫ খৃষ্টাব্দ। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত এই কাশীদাসী মহাভারত বাংলাদেশে সর্বাধিক পঠিত মহাভারত। কিন্তু এই কাশীদাসী মহাভারতেও মূলের সঙ্গে অনেক অনৈক্য ঘটেছে এবং অনেক স্বকপোলকল্পিত কাহিনী সংযোজিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনিও মহাভারত অনুবাদ করেন নি, মহাভারতের মুখ্য উপাখ্যানভাগ অবলম্বন করে "মহাভারতের কথা" প্রণয়ন করেছেন। তাঁর সময়ে এই মহাভারতের কথা যেভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং কথকদিগের দ্বারা যেভাবে তা ব্যাখ্যাত হত, তিনি তাকেই তাঁর মহাভারতের কথায় বিশেষভাবে অবলম্বন করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর মহাভারতের 'অষ্টাদশ পর্ব অনুবাদের উপসংহারে' লিখেছেন, "কাশীরাম যে কথকদিগের মুখে মহাভারত শ্রবণ করিয়া তাঁহার পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচনাভাব ও মূলের সহিত অনৈক্য দেখিয়া অনেকে অনুভব করিয়া থাকেন এবং কাশীরাম তাঁহার গ্রন্থে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যথা বিরাট পর্বে ;—

মহাভারতের কথা কে বর্ণিতে পারে।
যেন ভেলা বান্ধি চাহে সিন্ধু তরিবারে ॥
শ্রুতিমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
সাধুজন চরণেতে বিনয় আমার ॥"

প্রকৃতপক্ষে কাশীরাম মূলের সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন না করে তাঁর মহাভারতে 'শ্রুতিমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার' করতে গিয়ে অনেক স্থলে ভ্রমে পতিত হয়েছেন। দু'একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক্।

মূল মহাভারতে আছে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় কর্ণ লক্ষ্য ভেদ করতে গেলে দ্রৌপদী 'আমি সূতকে বরণ করব না' এই কথা বলে কর্ণকে লক্ষ্যভেদের চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন—

"দৃষ্ট্বা তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈ
র্জগাদ নাহং বরয়ামি সূতম্।" (মহাঃ ১।১৮৭।২৩)

কিন্তু কাশীরামের মহাভারতে দেখি শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রে ঠেকে কর্ণের বাণ চুরমার হয়ে যাওয়ায় কর্ণ লক্ষ্যভেদ করতে না পেরে দ্রৌপদী লাভে বঞ্চিত হলেন।

"সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল।
তিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল ॥"

এইভাবে কাশীরাম শ্রীকৃষ্ণের অবতার মাহাত্ম্য প্রচারের প্রেরণায় দ্রৌপদীর 'নাহং বরয়ামি সূতম্' এই তেজোদ্দীপ্ত কথার পরিবর্তে কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রে ঠেকে কর্ণের বাণ চূর্ণ হয়ে যাওয়ার যে গল্প তৈরী করেছেন, তাতে একদিকে যেমন ব্যক্তিত্বশালিনী দ্রৌপদীর একটি প্রধান চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে চাপা দেওয়া হয়েছে, তেমনি স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যায় কৃষ্ণ চরিত্রেও একটি অহেতুক পক্ষপাতিত্বের কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে।

আবার বেদব্যাসের মূল মহাভারতের বনপর্বে দেখি, ব্রাহ্মণের অরণিমন্থহারী হরিণের পেছনে ছুটতে ছুটতে পঞ্চপান্ডব অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হলে যুধিষ্ঠির প্রথমে নকুল, তারপর সহদেব, তারপর অর্জুন, তারপর ভীমকে জল আনার জন্য পাঠালেন এবং এঁরা চারজনেই বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জল আনার চেষ্টা করে প্রাণ হারালেন। অবশেষে যুধিষ্ঠির নিজে গিয়ে ঐ বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে চার ভাইকে পুনর্জীবিত করার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কাশীরামের মহাভারতে দেখি, যুধিষ্ঠির প্রথমে ভীম, তারপর অর্জুন, তারপর নকুল, তারপর সহদেবকে পাঠানোর পর শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীকে জল আনতে পাঠালেন। যেখানে ভীমার্জুন জল আনতে ব্যর্থ হলেন, সেখানে অকুস্থলে নিজে গিয়ে বিপদের কারণ অনুসন্ধানের পূর্বে একজন স্ত্রীলোককে জল আনতে পাঠানো যে কতদূর হাস্যকর ও ক্লীবতাব্যঞ্জক তা সহজেই অনুমেয়। মহাভারতের সমাজে বিশেষভাবে দুর্যোধনাদির রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থতার বাসনায় এবং দ্যুতাসক্ত অবস্থায় বুদ্ধিভ্রষ্ট যুধিষ্ঠিরের অবিমৃষ্যকারিতায় সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণের ঘটনা ছাড়া নারীর উচ্চ সম্মান রক্ষার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গেও মূলে মহাভারতে দেখি দ্যুতক্রীড়ায় সর্বরিক্ত যুধিষ্ঠির নিজেকে পণ রাখার পর শকুনির কথায় শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীকে পণ রাখলেও দ্রৌপদীর পণে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়ার জন্য শকুনির দেওয়া প্রস্তাব যুধিষ্ঠির প্রত্যাখ্যান করেছেন। সভায় দ্রৌপদীকে আনবার জন্য দূত প্রেরিত হলে দ্রৌপদী সেই দূতকে বলেন, "হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জন করিয়াছেন? হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এস্থানে আগমনপূর্বক আমাকে লইয়া যাইও, ধর্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন

করিব।" (কা. প্র. সি.)। সভামধ্যে তেজস্বিনী দ্রৌপদীর ধিক্কার ও লজ্জা মিশ্রিত অসহায়তা দর্শনে ক্রুদ্ধ ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, "হে যুধিষ্ঠির দ্যূতপ্রিয় ব্যক্তিরা স্বগৃহস্থিত বেশ্যাগণকেও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে না।" এমনকি দুর্যোধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিকর্ণও দ্রৌপদী পণের বৈধতা বিষয়ে সভাসীন ভূপতিগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার পূর্বে স্বয়ং পরাজিত হইয়া উহাতে স্বত্ববর্জিত হইয়াছেন, এদিকে শকুনি পণার্থী হইয়া কৃষ্ণার নামোল্লেখ করিয়াছেন ; এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।" (কা. প্র সি.) শুধু তাই নয়, দ্রৌপদীর এই অসম্মান মূল মহাভারতে এমন একটি অগ্নিগর্ভ উপাদান যা মহাভারতের ঘটনা পরিণাম নিয়ন্ত্রণকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় শক্তিরূপেও ব্যবহৃত। কিন্তু কাশীরামের সময়ের দুর্বল, ভীরু বাঙালীসমাজ 'আত্মানং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি' নীতিতে বিশ্বাসী। ফলে কাশীরামের মহাভারতে দেখা যায় যুধিষ্ঠির তাঁর চার ভাইকে জল আনতে পাঠানোর পর দ্রৌপদীকেও সেই ভয়ংকর মৃত্যুসম্ভাবনাপূর্ণ সরোবর থেকে জল আনতে পাঠালেন, যদিও মূল মহাভারতে দেখি দ্রৌপদী তখন আশ্রমেই ছিলেন, কেবল পঞ্চপান্ডব হরিণের পেছনে ছুটতে ছুটতে এই রহস্যময় স্থানে এসে পড়েছিলেন—সুতরাং যুধিষ্ঠিরের পক্ষে দ্রৌপদীকে সেই সরোবর থেকে জল আনতে পাঠানোর কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

উদাহরণ দীর্ঘতর করে লাভ নেই—কারণ মূল সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে কাশীরাম দাসের মহাভারতের যে বহু অনৈক্য আছে তা আজ পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত ও সমর্থিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনুবাদই হল বেদব্যাস বিরচিত মূল সংস্কৃত মহাভারতের সর্বপ্রথম মূলানুগ বঙ্গানুবাদ। কালীপ্রসন্ন তাঁর মহাভারতের প্রথম খন্ডের 'ভূমিকা'য় লিখেছেন, "কাশীরাম দাসের গ্রন্থপাঠ, অথবা বেদীস্থিত পৌরাণিকদিগের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মহাভারত যে কি পদার্থ ইহা যথার্থরূপে জানিবার সম্ভাবনা নাই। কাশীরাম দাস স্বরচিত গ্রন্থের সৌন্দর্য্য-সম্পাদন মানসে এবং সর্বসাধারণ লোকের চিত্তরঞ্জন উদ্দেশে ব্যাসপ্রোক্ত মূল গ্রন্থের বহির্ভূত অনেক কথা রচনা করিয়া আপনার কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং মূলের লিখিত অনেক স্থল পরিত্যাগ করিয়া আপনার শ্রম লাঘব করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইদানীন্তন পুরাণ-বক্তা পণ্ডিতমহাশয়েরাও শ্রোতাদিগের শ্রবণ-সুখ সম্পাদনাভিলাষে··· কাশীরাম দাসের অনুকরণ করিয়া মূল গ্রন্থ পরিত্যাগ পূর্বক অনেক প্রকার

নতুন কথার ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রোতাদিগের শ্রবণের অনুপযুক্ত আশংকা করিয়া মূল গ্রন্থের অনেক স্থল পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এদেশীয় সর্ব-সাধারণ লোকের মহাভারতের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উল্লিখিত উভয় পথে যখন উক্ত প্রকার বিষম প্রতিবন্ধক বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন···যাহাতে ভারত-বর্ষের গৌরব স্বরূপ মহাভারতের অবশ্যম্ভব মর্য্যাদা চিরদিন বর্তমান থাকে, তাহার উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশে আমি এই দুঃসাধ্য ও চির সংকল্পিত ব্রতে ব্রতী হইয়াছি।" প্রকৃতপক্ষে যখন বিভিন্ন পুঁথি মিলিয়ে পাঠোদ্ধার ও ভ্রম সংশোধন করে পুস্তক সম্পাদন রীতি এদেশে নূতন, সেইসময় কালীপ্রসন্ন বেদব্যাস বিরচিত মূল সংস্কৃত মহাভারতের বিভিন্ন পুঁথি সংগ্রহ করে এবং সেই পুঁথিগুলি মিলিয়ে পন্ডিতমন্ডলীর সাহায্যে মহাভারতের যথাসম্ভব মূলানুগ অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ সম্বধে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় কৃষ্ণদাস পাল লেখেন—"Buoyed up with a zeal, which never for a moment flagged, and with vast resources at his command, the Baboo has completed within 8 years what might fairly occupy the whole life time of a man. One of the greatest difficulties which stood in his way was that of obtaining accurate texts. He, however, procured texts from the most reliable sources, viz, from the Asiatic Society, from Rajah Radhakanta Bahadoor, and from the libraries of the late Baboo Ashutosh Dev, as well as of Baboo Jateendra Mohun Tagore. He had also an old text in his own house, which his great grand father Dewan Santiram Sing had brought from Benares." এশিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক এবং শোভাবাজারের রাজবাটীর, আশুতোষ দেব ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয়ে সংরক্ষিত এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহের কাশী থেকে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুঁথিগুলি একত্রিত ক'রে ও পাঠ মিলিয়ে যে কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদ হয়, তাঁর মহাভারতের 'অষ্টাদশ পর্ব অনুবাদের উপসংহারে'ও সে তথ্য স্বীকৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি একথাও স্বীকার করেন, "মহাভারতের কোন কোন অংশ এরূপ সুকঠিন ও কূটার্থ পরিপূর্ণ যে, তাহার প্রকৃত মর্ম প্রাপ্ত না হইয়া

অদ্যাপি অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বীয় স্বীয় মতানুসারেই তাহার কথঞ্চিৎ যথাশ্রুত অর্থ করিয়া থাকেন। ইহার অনেক স্থলে এরূপ মত-বৈপরীত্য লক্ষিত হয় যে, তাহার সমন্বয় সাধন করা নিতান্ত সুকঠিন। অনুবাদকালে চেষ্টা দ্বারা ঐ সকল স্থান যতদূর সঙ্গত করিতে পারা যায়, তাহার ত্রুটি হয় নাই।"

কালীপ্রসন্নের মহাভারত প্রকাশিত হলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় বিদ্যায় সুপন্ডিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় লেখেন, "যাঁহারা ভারতের তাৎপর্য জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত কালীপ্রসন্নবাবুর গ্রন্থ উপযুক্ত হইয়াছে, যেহেতু তিনি অতীব সাবধানে সংস্কৃত মূলের অবিকল অর্থ বাংলা অনুবাদেতে রক্ষা করিয়াছেন।" প্রসিদ্ধ 'কলিকাতার ইতিহাস' প্রণেতা রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব কালীপ্রসন্ন সিংহের মূলানুগত্য সম্বন্ধে লেখেন, "Perhaps hardly any Bengali translation has yet appared wich can be compared to Kaliprasanna Singha's edition in point faithfulness and purity and dignity of style. Such men as the late Pandit Iswar Chandra Vidyasagar and several other eminent Pandits and scholars looked after its proper translation and accuracy."

মূল সংস্কৃত মহাভারতের মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুঁথি মিলিয়ে বহু পন্ডিতের সযত্ন সহযোগিতায় কালীপ্রসন্ন যে তাঁর মহাভারতের অনুবাদকে যথাসম্ভব মূলানুগত করার চেষ্টা করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তথাপি মহাভারত অনুবাদের মত বিশাল ব্যাপক কর্মে এবং বিভিন্ন পুঁথির পাঠান্তরের ফলে কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদেও কিছু কিছু খুঁটিনাটি ভুল থেকে গেছে। পন্ডিত বনমালী বেদান্ততীর্থ বেদান্ত রত্ন এ ধরণের কয়েকটি ভ্রান্ত অনুবাদের উদাহরণ দিয়েছেন। কালীপ্রসন্নের মহাভারতের সভাপর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে—"কিয়ৎকাল অতীত হইলে, দানবরাজ কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল।... ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন।" মূলের শ্লোকগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই এই অনুবাদে দুটি গুরুতর ভ্রম ধরা পড়ে—

"কস্যাচিত্ত্বথ কালস্য কংসো নির্মথ্য যাদবান্ ।
বার্হদ্রথসুতে দেব্যৌ উপাগচ্ছদ্বৃথামতিঃ ॥
অস্তি প্রাপ্তিশ্চ নাম্না তে সহদেবানুজেহ বলে ।
ভোজরাজন্যবৃদ্ধৈশ্চ পীড্যমানৈর্দুরাত্মনা ।
জ্ঞাতিত্রাণমভীপ্সদ্ভিরস্মৎ সম্ভাবনা কৃতা ॥" (২/১৩।)

এর শুদ্ধ অনুবাদ হওয়া উচিত—

"কিয়ৎকাল অতীত হইলে, বৃথামতি কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া জরাসন্ধের (বার্হদ্রথের) দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সহদেবের অনুজা এবং তাঁহাদিগের নাম অস্তি ও প্রাপ্তি। দুরাত্মা কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ভোজবৃদ্ধেরা, জ্ঞাতিদিগের পরিত্রাণ কামনায়, আমাকে অনুরোধ করিলেন।"[৭]

কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে ঐ শ্লোকের অনুবাদে প্রথম ভুল 'সহদেবানুজে' কথা থেকে বার্হদ্রথ বা জরাসন্ধের দুই কন্যার নাম সহদেবা বা অনুজা স্থির করা—কারণ কংসের পত্নী ও জরাসন্ধের কন্যাদ্বয়ের নাম সহদেবা ও অনুজা নয়; তাঁরা সহদেবের অনুজা এবং তাঁদের নাম অস্তি ও প্রাপ্তি। জরাসন্ধের পুত্রের নাম যে সহদেব মহাভারতের অন্য একটি শ্লোকেও তার উল্লেখ আছে -

"জরাসন্ধাত্মজশ্চৈব সহদেবো মহামনাঃ ।
নির্যযৌ স্বজনামাত্যঃ পুরস্কৃত্য পুরোহিতম্ ॥" (২/২৪/৪০)

কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে দ্বিতীয় ভুল—ভোজবৃদ্ধগণ জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন, এরূপ বলা। বস্তুতঃ তাদের পরিত্যাগ করার জন্য নয়, কংসের অত্যাচার থেকে তাঁদের পরিত্রাণ করার জন্যই তাঁরা কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিলেন। মনে হয় এরূপ ভ্রমের কারণ কালীপ্রসন্নের পরিদৃষ্ট মূলে 'জ্ঞাতিত্রাণমভীপ্সদ্ভিঃ'-র বদলে 'জ্ঞাতিত্যাগমভীপ্সদ্ভিঃ' এরূপ অপপাঠ ছিল। কিন্তু বঙ্গবাসী সংস্করণ এবং বোম্বাই নির্ণয় সাগর সংস্করণে 'জ্ঞাতিত্রাণমভীপ্সদ্ভিঃ' এরূপ যুক্ততর পাঠ দেখা যায়। বনমালী বেদান্তরত্ন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রে' উদ্ধৃত এই অংশের অনুবাদের সমালোচনা করেও লিখেছেন, "স্বনামধন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় কৃষ্ণচরিত্রের ৩য় খন্ডের ১ম পরিচ্ছেদে কালীসিংহের মহাভারত হইতে উক্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন—এই অনুবাদে আছে 'দানবরাজ কংস'। মূলে তাহা নাই, যথা 'কস্যাচিত্ত্বথ কালস্য কংসো

নির্মথ্য যাদবান্'। সুতরাং 'দানবরাজ' শব্দ তুলিয়া দিয়াছি।

এই ছোট ভুলটিও বঙ্কিমবাবুর চক্ষে পড়িয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পূর্ব-প্রদর্শিত গুরুতর ভ্রম দুইটি তাঁহার তীক্ষ্ম দৃষ্টিকেও প্রতারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।"

বেদান্তরত্ন মহাশয় কালীপ্রসন্নের অনুবাদে আরো কয়েকটি খুঁটিনাটি ভ্রম প্রমাদের আলোচনা করে লিখেছেন, "কালীসিংহের মহাভারতে ভ্রমপ্রমাদ আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কালী সিংহের মহা উদাম অল্প প্রশংসার নহে। যাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করেন, তাঁহারা জানেন যে, এসব কাজে ভ্রম প্রমাদ থাকিবেই থাকিবে। পরবর্তীকালের পণ্ডিতগণ উহার সংশোধন করিবেন। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। ইহাতে পূর্ব মনীষীদিগের অবহেলা করা হয় না, ইহাই তাঁহাদের প্রধান সম্মান।" কালীপ্রসন্নের মহাভারতের শেষ খণ্ড (১৮৬৬) প্রকাশিত হওয়ার তেইশ বছর পরে ১২৯৬ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৮৯) বর্দ্ধমানের মহাভারত সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়; ফলে সঙ্গতভাবেই মনে করা যায় যে, বর্দ্ধমানের অনুবাদক পণ্ডিতগণ কালীপ্রসন্ন সম্পাদিত মহাভারতের অনুবাদ দর্শনের সুযোগ পেয়েছিলেন—কারণ প্রথমদিকে এসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক অবলম্বনে যা কিছু অনূদিত হয়েছিল, পরে পাঁচখানি প্রাচীন পুস্তকের সঙ্গে মিলিয়ে তা যে আবার সংশোধিত হয়েছিল (এই সংশোধনের সময় মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুঁথি মিলিয়ে ইতিপূর্বে সম্পাদিত কালীপ্রসন্নের অনুবাদকর্মের প্রভাব পড়াও অসম্ভব নয়!) একথা বর্দ্ধমানের মহাভারতে 'রাজবাটীর ভূমিকা' অংশের বিজ্ঞাপনেই স্বীকৃত হয়েছে। অতঃপর ১৩৩৮-১৩৬৫ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯৩১-১৯৫৮) সংস্কৃত মহাভারতের শ্লোক, নীলকণ্ঠের টীকা এবং স্বরচিত সংস্কৃত টীকার সঙ্গে বাংলায় মূলানুসারী অনুবাদ শেষ প্রকাশ করেছেন মহামোহপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয়। কিন্তু অনুবাদে মূলানুগত্য পরীক্ষা করার সময় সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ভারতের নানা অঞ্চলে প্রচলিত সংস্কৃতে লেখা মহাভারতের নানা রূপ, নানা ভাষ্যের মধ্যে মহাভারতের বিশুদ্ধ মূল রূপ উদ্ধার করা। বর্তমানে মহাভারতের এই ধরণের প্রামাণ্য মূল রূপ উদ্ধারের বহুস্বীকৃত প্রচেষ্টা হল পুনার ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর আয়োজন। মহাভারতের এই সংস্করণকেই (১৯৩০-৬১) এখন সর্বাধিক প্রামাণ্য সংস্করণ বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তার কোন বাংলা অনুবাদ হয়নি। এই অবস্থায় মহাভারতের এই দুটি প্রামাণ্য সংস্করণের প্রতিটি মূল শ্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে যদি কালী-

প্রসন্নের মহাভারতের মূলানুগত্য পরীক্ষা করতে হয়, তবে তা মূল মহাভারতের চেয়েও বৃহত্তর মহাভারত হয়ে যায়। আমরা তাই হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ও ভান্ডারকারের মহাভারতের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে দুটি সংক্ষিপ্ত অথচ নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদের মূলানুগত্য পরীক্ষার চেষ্টা করব--(ক) পর্ব ও অধ্যায় বিভাগে মূলানুগত্য, (খ) অনুবাদে মূলানুগত্য (মহাভারতের আদিপর্বের প্রারম্ভিক শ্লোক ও প্রত্যেক পর্বের শেষ শ্লোকের অনুবাদে কালীপ্রসন্নের মূলানুগত্য)।

(ক) পর্ব ও অধ্যায় বিভাগে মূলানুগত্য—

মূল সংস্কৃত মহাভারত। (হরিদাস সং ও ভান্ডারকর সং)	কালীপ্রসন্নের মহাভারত
১। আদিপর্ব ২২৭ অধ্যায় (পাঠান্তর ২৩৪ অধ্যায়, ২৩৯ অধ্যায়)—হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ। ২২৫ অধ্যায়—ভান্ডারকর।	১। আদিপর্ব— ২৩৪ অধ্যায়।
২। সভাপর্ব—৭৮ অধ্যায় (পাঠান্তর ৮০, ৮১, ১০৩ অধ্যায়) হ. সি. ৭২ অধ্যায়—ভান্ডারকর।	২। সভা পর্ব— ৭৯ অধ্যায়।
৩। বনপর্ব ২৬৯ অধ্যায় (পাঠান্তর ৩০২, ৩১৪, ৩১৫ অধ্যায়) হ সি. আরণ্যক পর্ব --২৯৯ অধ্যায়—ভান্ডারকর।	৩। বন পর্ব— ৩১৪ অধ্যায়।
৪। বিরাট পর্ব—৬৭ অধ্যায়--হ. সি. ৬৭ অধ্যায়—ভান্ডারকর।	৪। বিরাটপর্ব— ৭২ অধ্যায়।
৫। উদ্যোগ পর্ব---১৮৬ অধ্যায় (পাঠান্তর ১৯৬, ১৯৮ অধ্যায়) হ. সি. ১৯৭ অধ্যায়—ভান্ডারকর।	৫। উদ্যোগ পর্ব ১৯৬ অধ্যায়।
৬। ভীষ্ম পর্ব - ১১৭ অধ্যায় (পাঠান্তর ১২৪, ১২২ অধ্যায়)—হ. সি. ১১৭ অধ্যায়—ভান্ডারকর।	৬। ভীষ্ম পর্ব ১২৪ অধ্যায়।
৭। দ্রোণ পর্ব - ১৭০ অধ্যায় (পাঠান্তর ২০০, ২০১, ২০৩ অধ্যায়)—হ. সি. ১৭৩ অধ্যায় - ভান্ডারকর।	৭। দ্রোণ পর্ব —২০৩ অধ্যায়।

৮। কর্ণ পর্ব—৬৭ অধ্যায় (পাঠান্তর ৯৪, ৯৬ অধ্যায়)—হ. সি. ৬৯ অধ্যায়—ভাস্তারকর।	৮। কর্ণ পর্ব—৯৭ অধ্যায়।
৯। শল্য পর্ব—৫৯ অধ্যায় (পাঠান্তর ৬৩, ৬৪ অধ্যায়) হ. সি. ২৮ অধ্যায়—ভাস্তারকর।	৯। শল্য পর্ব—৬৬ অধ্যায়।
১০। সৌপ্তিক পর্ব ১৮ অধ্যায়—হ. সি. ১৮ অধ্যায়—ভান্ডারকর।	১০। সৌপ্তিক পর্ব ১৮ অধ্যায়।
১১। স্ত্রী পর্ব—২৭ অধ্যায়—হ. সি. ২৭ অধ্যায়—ভান্ডারকর।	১১। স্ত্রী পর্ব—২৭ অধ্যায়।
১২। শান্তি পর্ব ৩৩৯ অধ্যায় (পাঠান্তর ৩৬৫ অধ্যায়)—হ. সি. ৩৫৩ অধ্যায় ভান্ডারকর।	১২। শান্তি পর্ব—৩৬৬ অধ্যায়।
১৩। অনুশাসন পর্ব—১৪৬ অধ্যায় হ. সি.	১৩। অনুশাসন পর্ব ১৬৮ অধ্যায়।
১৪। আশ্বমেধিক পর্ব—১৩০ অধ্যায়—হ. সি. ৯৬ অধ্যায়—ভান্ডারকর।	১৪। আশ্বমেধিক পর্ব—৯২ অধ্যায়
১৫। আশ্রমবাসিক পর্ব—৪২ অধ্যায়—হ. সি. ৪৭ অধ্যায়—ভান্ডারকর।	১৫। আশ্রমবাসিক পর্ব ৩৯ অধ্যায়।
১৬। মৌসল পর্ব—৮ অধ্যায় (পাঠান্তর ৯ অধ্যায়)—হ সি. ৯ অধ্যায়—ভান্ডারকর।	১৬। মৌশল পর্ব—৮ অধ্যায়।
১৭। মহাপ্রস্থানিক পর্ব—৩ অধ্যায়—হ. সি. ৩ অধ্যায়—ভাণ্ডারকর।	১৭। মহাপ্রস্থানিক পর্ব—৩ অধ্যায়
১৮। স্বর্গারোহণ পর্ব—৫ অধ্যায় (পাঠান্তর ৬ অধ্যায়)—হ. সি. ৫ অধ্যায়—ভাণ্ডারকর।	১৮। স্বর্গারোহণ পর্ব ৬ অধ্যায়

*) অনুবাদে মূলানুগতা

আদি পর্বের প্রারম্ভিক শ্লোক।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয় মুদীরয়েৎ ॥

লোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবাঃ সৌতিঃ পৌরাণিকো নৈমিষারণ্যে শৌনকস্য কুলপতের্দ্বাদশবার্ষিকে সত্রে ॥ ১ ॥

সুখাসীনানভ্যগচ্ছদ্ ব্রহ্মর্ষীন্ সংশিতব্রতান্ ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা কদাচিৎ সূতনন্দনঃ ॥ ২ ॥ (যুগ্মকম্) [হ. সি.]

['সমাসীনানভ্যগচ্ছদ্' ইতি পাঠান্তরম্— ভান্ডারকর সং]

নারায়ণ ও নরোত্তম নর এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয়[১] উচ্চারণ করিবে।

কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদা মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্ম সমাধান পূর্বক সকলে সমবেত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে সুখে অধ্যাসীন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে লোমহর্ষণ-পুত্র পৌরাণিক সৌতি অতি বিনীতভাবে তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

১ঃ জয় শব্দের অর্থ জয়গ্রন্থ, 'জয়' শব্দমাত্র নহে। অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত, বিষ্ণুধর্ম ও শিবধর্ম এই সকল জয়গ্রন্থ মধ্যে গণ্য। [কালীপ্রসন্নের মহাভারত।]

আদি পর্বের সমাপ্তি শ্লোক

এবং তৌ সমনুজ্ঞাতৌ পাবকেন মহাত্মনা।
অর্জুনো বাসুদেবশ্চ দানবশ্চ ময়স্তথা ॥ ১৮ ॥
পরিক্রম্য ততঃ সর্বে ত্রয়োঽপি ভরতর্ষভ !।
রমনীয়ে নদীকূলে সহিতাঃ সমুপাবিশন্ ॥ ১৯ ॥ (যুগ্মকম্)
[হ. সি.]

[অপরিবর্তিতম্—ভান্ডারকর সং]

ভগবান হুতাশনের অনুজ্ঞালাভানন্তর কৃষ্ণার্জুন ও ময়দানব তিন জনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে সেই পরম রমনীয় যমুনা নদীর উপকূলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। [কা. প্র. সি.]

সভাপর্বের সমাপ্তি শ্লোক

এবং গাবল্গণে ! ক্ষত্তা ধর্মার্থ সংহিতং বচঃ।
উক্তবান্ ন গৃহীতঞ্চ ময়া পুত্রহিতেপ্সুনা ॥ ৩৫ ॥ [হ. সি.]

[অপরিবর্তিতম্—ভান্ডারকর সং]

হে সঞ্জয়, বিদুর আমাকে এই ধর্মার্থ সংযুক্ত উপদেশ বাক্য কহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি পুত্রগণের হিতচিকীর্ষায় তখন তাঁহার সেই হিত উপদেশ গ্রহণ করিলাম না। [কা. প্র সি.]

বন পর্বের সমাপ্তি শ্লোক

ক্রোশমাত্রমতিক্রম্য তস্মাদ্দেশান্নিমিত্ততঃ।
শ্বোভূতে মনুজব্যাঘ্রাশ্ছন্নবাসার্থমুদ্যতাঃ ॥ ২৮ ॥
পৃথক্ শাস্ত্রবিদঃ সর্বে সর্বে মন্ত্রবিশারদাঃ।
সন্ধিবিগ্রহকালজ্ঞা মন্ত্রায় সমুপাবিশন্ ॥ ২৯ ॥ (যুগ্মকম্)
[হ. সি.]

[অপরিবর্তিতম্ ভান্ডারকর সং]

কোন কারণবশতঃ সেই স্থান হইতে ক্রোশমাত্র গমনপূর্বক পরদিন অবধি অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে বলিয়া তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে পৃথক পৃথক শাস্ত্রবেত্তা, মন্ত্রকুশল ও সন্ধিবিগ্রহ কালজ্ঞ, অতএব মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত তথায় উপবেশন করিলেন। (কা. প্র. সি.)

বিরাট পর্বের সমাপ্তি শ্লোক

তন্মহোৎসব সঙ্কাশং হৃষ্টপুষ্ট জনাকুলম্[১]।
নগরং মৎস্যরাজস্য শুশুভে ভরতর্ষভ ! ॥ ৩৮ ॥ [হ সি]
[[১] জনাবৃতম্' ইতি পাঠান্তরম্ ভান্ডারকর সং]

হৃষ্ট জনাকীর্ণ মৎসনগর মহোৎসবময় হইয়া অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল। [কা. প্র. সি]

উদ্যোগ পর্বের সমাপ্তি শ্লোক

তত্র ভেরী সহস্রাণি শঙ্খানামাযুতানি চ।
ন্যবাদয়ন্ত সংহৃষ্টাঃ সহস্রাযুতশানরাঃ ॥ ৩৬ ॥ [হ. সি,]
[[১] 'বাদয়ন্তি স্ম' ইতি পাঠান্তরম্—ভান্ডারকর সং]

…সহস্র সহস্র ও অযুত অযুত ব্যক্তি প্রফুল্লচিত্তে সহস্র সহস্র ভেরী ও অযুত অযুত শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিল। [কা. প্র. সি.]

ভীষ্ম পর্বের সমাপ্তি শ্লোক

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যুক্তবতি গাঙ্গেয়ে অভিবাদ প্ররুদ্য চ।[১]
রাধেয়ো রথমারুহ্য প্রায়াত্তব সুতং প্রতি ॥ ৩৯ ॥ [হ, সি,]

[[১] 'এবং ব্রুবন্তং গাঙ্গেয়মভিবাদ্য প্রসাদ্যচ' ইতি পাঠান্তরম্—ভান্ডারকর সং] সঞ্জয় কহিলেন, "হে মহারাজ! ভীষ্ম এইরূপ কহিলে পর রাধেয় তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক প্রসন্ন করিয়া দুর্যোধনের নিকট গমন করিলেন। [কা. প্র সি.]

দ্রোণপর্বের সমাপ্তি শ্লোক

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জুনং সংখ্যে পরাশর সুতস্তদা।

জগাম ভরতশ্রেষ্ঠ! যথাগতমরিন্দম। ॥ ১২৩ ॥ [হ. সি]

[অপরিবর্তিতম্—ভাণ্ডারকর সং]

"হে মহারাজ! পরাশরতনয় ব্যাসদেব সংগ্রামস্থলে অর্জুনকে এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।..." [কা. প্র. সি.]

কর্ণ পর্বের সমাপ্তি শ্লোক

কপিলানাং সবৎসানাং বর্ষমেকং নিরন্তরম্।

যো দদ্যাৎ সুকৃতন্তদ্ধি শ্রবণাৎ কর্ণ পর্বণঃ ॥ ৬২ ॥ (হ. সি.)

কিন্তু ভাণ্ডারকরে এইরূপ ঃ—

তথৈবোত্থাপয়ামাসুর্গান্ধারীং রাজযোষিতঃ।

তাভ্যামাশ্বাসিতো রাজা তূষ্ণীমাসীদ্বিচেতনঃ ॥ ৪১ ॥

এক বৎসর নিরন্তর সবৎসা ধেনু প্রদান করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, এই কর্ণপর্ব শ্রবণেও সেই পুণ্য হইয়া থাকে। (কা প্র. সি.)

শল্য পর্বের সমাপ্তি শ্লোক

আগম্য শিবিরং রাত্রৌ সোহভ্যাগচ্ছত পাণ্ডবান্।

তচ্চ তেভ্যঃ সমাখ্যায় সহিতস্তৈঃ সমোহিতাঃ ॥ ৭৭ ॥ (হ. সি.)

কিন্তু ভাণ্ডারকরে এইরূপ ঃ --

যুযুৎসুং সমনুজ্ঞাপ্য প্রাবিবেশ নৃপক্ষয়ম্।

যুযুৎসুরপি তাং রাত্রিং স্বগৃহেন্যবসত্তদা ॥ ৯১ ॥

তখন মহাবীর অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্বক সিংহনাদে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলে রাজা দুর্যোধন রুধিরাক্ত কলেবরে সেই সর্বভূতভয়াবহ ঘোর রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। (কা. প্র সি.)

সৌপ্তিক পর্বের সমাপ্তি শ্লোক

ততস্তে নিহতাঃ সর্বে তব পুত্রা মহারথাঃ।

অন্যে চ বহবঃশূরাঃ পাঞ্চালাঃ সপদানুগাঃ ॥ ২৩ ॥

ন তন্মনাসি কর্তব্যং ন চ তদ্ দ্রৌণিনা কৃতম্ ।
মহাদেব প্রসাদঃ স কুরু কার্য্যমনন্তরম্ ॥ ২৪ ॥ (হ. সি.)
([১] 'পাঞ্চালাশ্চ মহানুগাঃ' ইতি পাঠান্তরম্—ভান্ডারকর সং)

এক্ষণে সেই মহাবীর্য্যশালী ভগবান ভূতনাথ অশ্বত্থামার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই সে আপনার মহারথ পুত্রগণ এবং অনুচর সমেত মহাবলশালী পাঞ্চালগণকে নিহত করিয়াছে। অশ্বত্থামার প্রভাবে কখনই এরূপ ঘটে নাই, কেবল মহাদেব-প্রসাদে এইরূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে কার্য্যান্তর সাধনের চেষ্টা করুন। (কা. প্র সি.)

স্ত্রী পর্বের সমাপ্তি শ্লোক

তত আনয়য়ামাস কর্ণস্য সপরিচ্ছদাঃ ।[১]
স্ত্রিয়ঃ কুরুপতির্ধীমান্ ভ্রাতুঃ প্রেম্ণা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৬ ॥
সতাভিঃ সহ ধর্মাত্মা প্রেতকৃত্যমনন্তরম্ ।
কৃত্বোত্তার গঙ্গায়াঃ সলিলাদাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৭ ॥ (হ. সি.)
([১] 'সপরিচ্ছদম্' ইতি পাঠান্তরম্—ভান্ডারকর সং)

অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন তাঁহার ভার্য্যাদিগকে তথায় আনয়ন করাইলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধান-পূর্বক ব্যাকুলিতচিত্তে ভাগীরথীর সলিল হইতে উত্থিত হইলেন। (কা প্র সি)

শান্তি পর্বের সমাপ্তি শ্লোক

স চ কিল কৃতনিশ্চয়ো দ্বিজো ভুজগপতি প্রতিদেশিতাত্ম কৃত্যঃ ।
যম নিয়ম সহো বনান্তরং[১] পরিগণিতোঞ্ছশিলাসনঃ প্রবিষ্টঃ ॥ ৫৯ ॥ (হ. সি.)
([১] 'যমনিয়মসমাহিতো বনান্তং' ইতি পাঠান্তরম্—ভান্ডারকর সং)

তখন ব্রাহ্মণ ধর্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া সংযম ও নিয়ম অবলম্বনপূর্বক বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। (কা. প্র. সি.)

অনুশাসন পর্বের সমাপ্তি শ্লোক

সৎকৃত্যো তে তাং সরিতং ততঃ কৃষ্ণমুখা নৃপ ।।
অনুজ্ঞ তাস্তয়া সর্বে ন্যবর্তন্ত জনাধিপাঃ ॥ ৩৭ ॥ (হ. সি.)

তখন বাসুদেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। (কা. প্র. সি.)

আশ্বমেধিক পর্বের সমাপ্তি শ্লোক

তচ্ছৃণুষ্ব মহারাজ ! বিষ্ণুপ্রোক্তং কুরূদ্বহ ।
তেন গচ্ছসি নান্যেন তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ২৩ ॥ (হ. সি.)

কিন্তু ভাণ্ডারকরে এইরূপ ঃ—

ধর্মপুত্রমথাক্ষিপ্য সক্তুপ্রস্থেন তেন সঃ ।
মুক্তঃ শাপাত্ততঃ ক্রোধো ধর্মো হ্যাসীদ্যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৪ ॥
এবমেতত্তদা বৃত্তং তস্য যজ্ঞে মহাত্মনঃ ।
পশ্যতাং চাপি নস্তত্র নকুলোন্তর্হিত স্তদা ॥ ১৫ ॥

পরিশেষে সে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়া, 'এই যজ্ঞ উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের সক্তুদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে' বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিয়াছিল। ধর্মরাজ সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ, সুতরাং তাঁহাকে নিন্দা করিবামাত্র উহার শাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়াছে। (কা. প্র. সি.)

আশ্রমবাসিক পর্বের সমাপ্তি শ্লোক

যুধিষ্ঠিরস্তু নৃপতির্নাতি প্রীতমনাস্তদা ।
ধারয়ামাস তদ্রাজ্যং নিহত জ্ঞাতিবান্ধবঃ ॥ ৩৩ ॥ (হ. সি.)
(অপরিবর্তিতম্—ভাণ্ডারকর সং)

ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির মাতা, জ্যেষ্ঠতাত ও অন্যান্য আত্মীয়দিগের নিধন নিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। (কা. প্র. সি.)

মৌসল পর্বের সমাপ্তি শ্লোক

এতদ্বচনমাজ্ঞায় ব্যাসস্যামিততেজসঃ ।
অনুজ্ঞাতো যযৌ পার্থো নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥ ৪১ ॥
প্রবিশ্য চ পুরীং বীরঃ সমাসাদ্য যুধিষ্ঠিরম্ ।
আচষ্ট তৎ যথাবৃত্তং বৃষ্ণ্যন্ধককুলং[১] প্রতি ॥ ৪২ ॥ (হ, সি,)
([১] 'বৃষ্ণ্যন্ধকজনং প্রতি' ইতি পাঠান্তরম্—ভাণ্ডারকর সং)

মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা অর্জুন তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক হস্তিনা নগরে গমন করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দিগের ক্ষয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করিলেন। (কা, প্র, সি,)

মহাপ্রস্থানিক পর্বের সমাপ্তি শ্লোক

তৈর্বিনা নোৎসহে বস্তুমিহ দৈত্যনিবর্হণ ।
গন্তুমিচ্ছামি তত্রাহং যত্র মে ভ্রাতরো গতাঃ ॥ ৩৭ ॥

যত্র সা বৃহতী শ্যামা বুদ্ধিসত্ত্বগুণান্বিতা।
দ্রৌপদী যোষিতাং শ্রেষ্ঠা যত্র চৈব সুতা[১] মম ॥ ৩৮ ॥ (হ, সি,)
([১] 'প্রিয়া' ইতি পাঠান্তরম্— ভান্ডারকর সং)

দেবরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 'সুররাজ। আমার প্রণয়িনী বুদ্ধিমতী দ্রৌপদী ও আমার পরমপ্রিয় ভ্রাতৃগণ যে স্থানে বাস করিতেছে, সেই স্থানেই গমন করিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তাহাদিগের পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।" (কা. প্র. সি.)

স্বর্গারোহণ পর্বের সমাপ্তি শ্লোক

দশাংশশ্চৈব হোমোঽপি কর্তব্যোঽত্র নরাধিপ।।
ইদংময়া তবাগ্রে চ প্রোক্তং সর্বং নরর্ষভ ॥ ১৭৬ ॥
য ইদং শৃণুয়াদ্ ভক্ত্যা মহাভারতমাদিতঃ।
ব্রহ্মহা গুরুতল্পী চ সুরাপঃ স্তেয়কারকঃ।
অপি চান্ডালযোনিশ্চ সোঽপি পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৭৭ ॥
বিধূয় সর্বপাপানি তমাংসীব দিবাকরঃ।
মোদতে বিষ্ণুলোকেঽসৌ বিষ্ণুবন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৭৮ ॥ (হ, সি,)

কিন্তু ভান্ডারকরে এইরূপ ঃ—

মহাভারতমাখ্যানং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
স গচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিমিতি মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
দ্বৈপায়নোষ্ঠপুটনিঃসৃতমপ্রমেয়ং
পুণ্যং পবিত্রমথ পাপহরং শিবং চ।
যো ভারতং সমধিগচ্ছতি বাচ্যমানং
কিং তস্য পুষ্কর জলৈরভিষেচনেন ॥ ৫৪ ॥

যে ব্যক্তি নিরন্তর মহাভারত শ্রবণ করেন অথবা অন্যকে উহা শ্রবণ করান, তিনি সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন এবং তাঁহার ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ ও পুত্রকলত্রের নিষ্কৃতি লাভ হইয়া থাকে। এই পবিত্র ইতিহাসের পাঠকার্য্য সমাপ্ত হইলে দশ সহস্র (মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা এক লক্ষ ; তার দশাংশ — দশ সহস্র) হোম করা নিতান্ত আবশ্যক। হে মহারাজ ? এই আমি আপনার নিকট সমুদয় ভারতোপাখ্যান সবিস্তর কীর্তন করিলাম। (কা. প্র. সি.)

কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদে মূলানুগত্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে মহাভারতের কোন একটি বিশেষ অংশের বিশেষ কতকগুলি শ্লোক নির্বাচন করলে সেই নির্বাচনের মধ্যেও কিছুটা পক্ষপাতিত্ব থাকার সম্ভাবনা থেকে যায় বলে আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে মূল মহাভারতের প্রারম্ভিক শ্লোক এবং প্রতি পর্বের কেবল সমাপ্তি শ্লোকগুলিকেই গ্রহণ করেছি এবং মহাভারতের মূল পাঠ নির্ণয়ে হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশের মূল শ্লোকের সঙ্গে অধুনা মহাভারতের প্রামাণ্য সংস্করণরূপে বহু স্বীকৃত পুণার ভান্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট থেকে প্রকাশিত মহাভারতের সংশোধন-সংযোজনগুলিও উল্লেখ করেছি। এই মূলানুগত্য পরীক্ষায় আমরা লক্ষ্য করব, মহাভারতের আদি পর্বের প্রারম্ভিক শ্লোকে এবং আঠারোটি পর্বের মধ্যে চৌদ্দটি পর্বের সমাপ্তি শ্লোকগুলিতে হরিদাস এবং ভান্ডারকরের মূল শ্লোকের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের সাদৃশ্য অতি ঘনিষ্ঠ। বাকী চারটি পর্বের মধ্যে দুটিতে হরিদাসের সঙ্গে এবং দুটিতে ভান্ডারকরের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের সাদৃশ্য আছে। কর্ণপর্ব এবং স্বর্গারোহণ পর্বের সমাপ্তি শ্লোকে হরিদাসের সঙ্গে এবং শল্যপর্ব ও আশ্বমেধিক পর্বের সমাপ্তি শ্লোকে ভান্ডারকরের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের সাদৃশ্য লক্ষিতব্য। আমরা পূর্বেই বলেছি, কালীপ্রসন্নের মহাভারতে এসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তকের সঙ্গে যে অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথির পাঠ মেলানো হয়েছিল, সেকথা ঐ মহাভারতের ভূমিকা এবং উপসংহারে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। কালীপ্রসন্ন তাঁর মহাভারতে এই মূলানুগত্য রক্ষা বিষয়ে কতখানি সচেতন ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'অষ্টাদশপর্ব অনুবাদের উপসংহারে' এই কথাগুলি থেকে—"অনুবাদিত গ্রন্থ কতদূর সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা গুণাকর পাঠকবৃন্দ ও সহৃদয় সমাজ বিবেচন করিবেন ; তবে সাহস করিয়া এইমাত্র বলিতে পারি যে, অনুবাদ সময়ে মূলে মহাভারতের কোন স্থানই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই সন্নিবেশিত হয় নাই অথচ বাঙ্গালা ভাষার প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সেগুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।"

(৪)

এবার আমাদের বিবেচ্য কালীপ্রসন্নের মহাভারতের ভাষা ও তার প্রয়োগ-সাফল্য। কালীপ্রসন্নের মহাভারত বর্দ্ধমানের মহাভারতের ঊনত্রিশ বছর পূর্বে

থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করলেও কালীপ্রসন্নের মহাভারতের ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্দ্ধমানের মহাভারতের ভাষার মত পন্ডিতি বাংলা নয়; উভয় মহাভারতেই তৎসম বাহুল্য থাকলেও কালীপ্রসন্নের মহাভারতের ভাষা অধিকতর প্রাঞ্জল ও সাবলীল। যেমন—

কালীপ্রসন্নে "মহর্ষি বেদব্যাস এই কথা কহিলে, মহাত্মা অর্জুন তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক হস্তিনা নগরে গমন করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দিগের ক্ষয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্তন করিলেন।"

কিন্তু বর্দ্ধমানে—"বৈশম্পায়ন কহিলেন, বীরবর পৃথানন্দন অমিত তেজস্বী ব্যাসদেবের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত তৎকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া হস্তিনানগরে প্রস্থিত হইলেন এবং পুরমধ্যে প্রবেশ করত ধর্মরাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ যেরূপে বিনষ্ট হইয়াছেন, পূর্বানুক্রমে সেই সমস্ত নিবেদন করিলেন।"

বর্দ্ধমানের মহাভারতের তুলনায় কালীপ্রসন্নের মহাভারতে ভাষার এই সাবলীলতাই কালীপ্রসন্নের মহাভারতকে বাঙালী পাঠক সমাজের কাছে অধিক গ্রহণীয় করে তুলেছিল; ফলে ১২৯৬ বঙ্গাব্দে বর্দ্ধমানের মহাভারতের প্রথম সংস্করণের পর ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯৭৬) প্রথম ভারবি সংস্করণের পূর্বে প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে বর্দ্ধমানের অন্য কোন সংস্করণ পাঠকসমাজে প্রচলিত না হওয়ায় বর্দ্ধমানের মহাভারত দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলেও কালীপ্রসন্নের মহাভারত ১৮৬০-৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার পর একাধিকবার মুদ্রিত হওয়ায় এবং বিশেষভাবে 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' থেকে প্রকাশিত হয়ে দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকায় ও সম্প্রতি সাক্ষরতা প্রকাশন থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়ে সুলভমূল্যে পরিবেশিত হওয়ায় কাশীরাম দাসের স্বল্পায়তন পদ্য-মহাভারতের পরেই কালীপ্রসন্নের মহাভারত বাংলার ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছে।

প্রশ্ন জাগে, উভয় মহাভারতই পন্ডিতদের দ্বারা এবং পণ্ডিতদের সহযোগিতায় করানো হলেও একটিতে পণ্ডিতী বাংলার আধিক্য এবং অন্যটিতে তৎসম শব্দ বাহুল্য সত্ত্বেও ভাষার প্রাঞ্জলতা—এই তারতম্য কেন? এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের দুটি তথ্য সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। ১৮২৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বর্দ্ধমানের মহাভারতে ঐ গ্রন্থের অন্যতম অনুবাদক অঘোরনাথ শর্মার ১২৯১ বঙ্গাব্দের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের লিখিত ভূমিকা থেকে জানা যায়, এক একজন সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত বর্দ্ধমানের মহাভারতের এক একটি পর্ব অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্নের

মহাভারতে সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতদের লেখাগুলি কালীপ্রসন্নের হাতে যে আবার বিশেষভাবে সংশোধিত ও সম্পাদিত হত, সে তথ্য পাই 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় কালীপ্রসন্নের মহাভারত সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস পালের লেখায়—"....although different hands worked there is no discordance. All the volumes attest the touches of the practised hand of the Editor in chief we mean the Baboo himself "[৯] প্রকৃতপক্ষে দক্ষ ভাষাশিল্পী কালীপ্রসন্নের হাতে সম্পাদিত হওয়ার ফলে কালীপ্রসন্নের মহাভারতের ভাষা সাধুগদ্যভাষা হলেও তা বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের মতো প্রাঞ্জলতা অর্জন করতে পেরেছে এবং প্রায় শতবর্ষ পরে হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশের মহাভারতে মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তার টীকা ভাষ্য ইত্যাদি সংযুক্ত হওয়ায় তা আরও বিশাল এবং ব্যাপক কর্ম হয়ে উঠলেও বঙ্গানুবাদের ভাষার দিক থেকে তা কালীপ্রসন্নের মহাভারতের প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতাকে অতিক্রম করতে পারেনি। যেমন—

"কুলপতি শৌনক নৈমিষারণ্যে দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐসময়ে এক দিবস ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্মাবসানে একত্র সমাগত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছেন, এমন সময়ে সূতকুলপ্রসূত লোমহর্ষণ-তনয় পৌরাণিক উগ্রশ্রবাঃ বিনীতভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।" [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনূদিত মহাভারতের উপক্রমণিকা ভাগ।]

"কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদা মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্মসমাধানপূর্বক সকলে সমবেত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে সুখে অধ্যাসীন হইয়া আছেন ইত্যবসরে লোমহর্ষণ পুত্র পৌরাণিক সৌতি অতি বিনীতভাবে তথায় সমুপস্থিত হইলেন।" [কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত।]

"কোন সময়ে লোমহর্ষণের পুত্র পুরাণশাস্ত্রজ্ঞ শ্রুতিধর সৌতি বিনয়ে অবনত হইয়া, নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে ব্রতচারী ব্রহ্মর্ষিগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।" [হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ।]

কালীপ্রসন্ন নিজে তাঁর মহাভারতের উপসংহারে বলেছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষার প্রসাদগুণও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি।"

কালীপ্রসন্নের মহাভারত প্রকাশিত হলে সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাহিত্য সমালোচকদের দ্বারা এই অনুবাদের মূলানুগত্য ও ভাষা বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখলেন,

"....কালীপ্রসন্নবাবু—অতীব সাবধানে সংস্কৃত মূলের অবিকল অর্থ বাঙ্গালা অনুবাদেতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং ঐ অনুবাদও এতাদৃশ সুকোমল ও সুমধুর হইয়াছে যে, তাহার পাঠমাত্রেই পরিতৃপ্ত হইতে হয়।" 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' পন্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন লিখলেন, 'বর্তমানকালে প্রাঞ্জল ও সরল অনুবাদে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতই আদর্শরূপে পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইয়া থাকে।" ১২৬৭ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮৬০) ৫ই বৈশাখ 'সোমপ্রকাশে' লিখিত হয়, "বিশেষতঃ ঐ অনুবাদের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন বিষয়ে পরিশেষ উপযোগিতা আছে।" ১২৭০ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮৬৪) ৩০শে মাঘ 'সংবাদ প্রভাকরে' লেখা হয়, "কালীপ্রসন্নবাবু প্রথমাবধি মূলের সহিত ঐক্য রাখিয়া অতি সুললিত অথচ সুসাধু বঙ্গভাষায় এই মহাভারত অনুবাদ করাতে ইহা বিদ্যামোদী ব্যক্তিদিগের কীদৃশ পরম আদরণীয় হইতেছে, তাহা আমরা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারিনা, এই মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ এই রাজ্য মধ্যে সুপ্রসন্নচিত্ত শ্রীযুক্তবাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের এক অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।" 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় কৃষ্ণদাস পাল লেখেন, "The texts have been faithfully followed and gracefully rendered. The diction is in keeping with the stateliness of the subjects." বর্তমান কালের বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত ও তাঁর 'Literature of Bengal' গ্রন্থে লিখেছেন, "The work had been translated into Bengali by the Pandits of the Maharaja of Burdwan some years before (কালীপ্রসন্নের গ্রন্থ প্রকাশের কয়েকবছর পূর্বে হলেও কালীপ্রসন্নের অনুবাদারম্ভের মাত্র দুমাস পূর্বে যে বর্দ্ধমানের অনুবাদ শুরু হয় তা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি), but Kaliprassanna Singha's translation is simpler and more literal and is more acceptable to the Public." এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত এই মন্তব্যও করেন যে, Kaliprasanna Singha's 'Mahabharata' and Hemchandra Vidyaratna's 'Ramayana' are the best prose translations of these epics in the Bengali Language."

কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদে ভাষার এই প্রয়োগ সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করলে যে বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে চোখে পড়বে, তা হল ভাষাকে বিষয়ানুযায়ী করেও প্রসাদগুণ রক্ষা করার প্রয়াস। এই কারণে, যে কালীপ্রসন্ন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র বানান পদ্ধতির মধ্যেও মৌখিক ভাষার বৈশিষ্ট্য

বজায় রেখে কলকাতার চলতি বুলি ব্যবহারে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন, তিনিই আবার একদিকে মহাভারতের মহাকাব্যিক পরিবেশ রচনার জন্য আগাগোড়া, ক্লাসিক সাধুগদ্যভাষার ব্যবহার করেছেন এবং অন্যদিকে এই সাধুগদ্যের মধ্যেও অতি-উৎকট পাণ্ডিত্য বিস্তারের মোহ অপেক্ষা প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতা সৃষ্টির জন্যও সচেষ্ট হয়েছেন এবং এজন্য বিষয়ের তারতম্যে ভাষার তারতম্য এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে কালীপ্রসন্ন হুতোমের নকশায় মৌখিক বুলি ব্যবহার করলেও মহাভারতের অনুবাদে তৎসম শব্দবহুল গুরুগম্ভীর ভাষা ব্যবহার করেছেন। কালীপ্রসন্নের মহাভারতের এই সাধুগদ্যভাষার পরিচয় প্রসঙ্গে একজন অজ্ঞাতনামা লেখকের লেখা 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' গ্রন্থে (১৮৭৬-৭৭) প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরলোকগত আত্মার মুখে কাল্পনিক ভাষা বসিয়ে সমকালীন সাহিত্যে সাধু শব্দ বনাম ইতর শব্দের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা খুবই কৌতুকাবহ। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ ঃ—একদা 'নীচ বিকলাঙ্গ বঙ্গভাষার শব্দবৃন্দ' দেবী সরস্বতীর কাছে ধর্ণা দিয়ে বলল, "মাতঃ! সাধু কিম্বা নীচ ভাষার শব্দ সকলই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা সকলেই আপনার সন্তান... এবার সাধুসমাজে অধিকার না দেওয়া হইলে আমরা আপনার শ্রীচরণ-প্রান্তে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব।" সরস্বতী এই অনশন ধর্মঘটের ভয়ে ভীত হয়ে বললেন, "বাঙ্গালা দেশে যাও, তথায় ভদ্রসমাজে অধিকার পাইবে।" নীচ শব্দেরা প্রথমে গেল বিদ্যাসাগরের কাছে। তিনি ঈষৎ হাস্য করে বললেন—"আমার পুস্তকে সংস্কৃতের ঔরসপুত্র সাধু শব্দেরই স্থান. তোমরা ব্যভিচার দোষে উৎপন্ন, তোমাদের স্থান নাই। তবে যে দুই একটি ইতর শব্দকে আমার এ স্থানে দেখিতে পাইতেছ, ইহারা কেবল সাধু শব্দদিগের বহনকার্য্যে নিযুক্ত আছে।" তখন তারা গেল তত্ত্ববোধিনী সভায়। সেখানে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী সরোষে তাদের তিরস্কার করলে তারা গেল কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছে। তিনিও তাদের বিদায় দিলে "তাহারা কালীপ্রসন্ন সিংহের পুরাণসংগ্রহ পুস্তকালয়ে উপস্থিত হইয়া মহাভারতে প্রবেশার্থে প্রস্তাব করিল। উক্ত প্রস্তাবে সিংহ সিংহের প্রতাপধারণপূর্ব্বক গভীর গর্জনে কলিকাতা নগর কম্পিত করিয়া কহিলেন,—কি প্রশ্রয়! তোমরা আমার পুরাণ সংগ্রহে স্থান পাইতে আসিয়াছ? এবং সরস্বতী তোমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, বলিতেছ? আমি তোমাদিগের সরস্বতী সহিত কোন সম্বন্ধ রাখি না; তাঁহাকে ভয় কি? আমার চাতুরী তোমরা কি জানিবে? আমি কম পাত্র নহি! জান না এখনই তোমাদিগের

মস্তক মুণ্ডন করিয়া বিদায় দিব। অন্যে পরে কা কথা! ঐ দেখ ভট্টাচার্য্য-দিগের অসংখ্য শিরঃ শিখাশ্রেণীতে আমার গৃহের প্রাচীর সুসজ্জিত হইয়াছে। 'শিখাই ত বটে হে!' এই বলিয়া ইতর শব্দেরা ভয়াকুল হইয়া পলায়নের উপক্রম করিতেছে তবু সিংহের ইঙ্গিতে হেমচন্দ্র, কৃষ্ণধন, অভয়াচরণ প্রভৃতি ভট্টাচার্য্য-গণ সক্রোধে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা ইতর শব্দদিগকে পুস্তকালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।"১০

কৌতুকরসের মধ্য দিয়ে হলেও এখানে কালীপ্রসন্নের মহাভারতের ভাষার যে বৈশিষ্ট্যটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে তা হল, একদিকে ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত-দিগের শিখাকর্তনের সংবাদে অতিউৎকৃষ্ট পাণ্ডিত্যকে প্রশ্রয় না দেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া (যদিও এই ইঙ্গিতটি লেখকের অনিচ্ছাকৃতভাবে ফুটে উঠেছে) এবং অন্যদিকে সাধু শব্দের সঙ্গে ইতর শব্দের সংমিশ্রণ না করা। এখানে অবশ্য 'ইতর শব্দ' যে অভব্য শব্দ অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, ব্যবহৃত হয়েছে চলিত ভাষার শব্দ— এই অর্থে, তা বোঝা যায় যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মুখে শোনা যায়, "তবে যে দুই একটি ইতর শব্দকে আমার এস্থানে দেখিতে পাইতেছ. ইহারা কেবল সাধুশব্দদিগের বহনকার্য্যে নিযুক্ত আছে।" ভাষাশিল্পী কালীপ্রসন্ন তাঁর ভাষাশিল্পের পরীক্ষানিরীক্ষায় একদিকে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় যেমন খাঁটি চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন, তেমনি তাঁর মহাভারতের অনুবাদে খাঁটি সাধুভাষা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু প্রসাদগুণযুক্ত তৎসমবহুল সাধু ভাষার সঙ্গে প্রসাদগুণযুক্ত তৎসমবহুল চলিত ভাষার যে কোন আন্তর পার্থক্য নেই—রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলা ভাষা পরিচয়' প্রবন্ধে সে তথ্যটি বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, "সাধু ভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রধান তফাতটা ক্রিয়াপদের চেহারার তফাৎ নিয়ে। 'হচ্ছে' 'করছে' কে যদি জলচল করে নেওয়া যায়, তাহলে জাতঠেলাঠেলি অনেকটা পরিমাণে ঘোচে। উতংকর গুরুদক্ষিণা আনবার সময় তক্ষক বিঘ্ন ঘটিয়েছিল, এইটে থেকেই সর্পবংশ-ধ্বংসের উৎপত্তিঃ এর ক্রিয়া কটাকে অল্প একটু মোচড় দিয়ে সাধুভাষার ভঙ্গী দিলেই কালীসিংহের মহাভারতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।" তবে ক্রিয়াপদ সাধুই হোক্, আর চলিতই হোক্, ভাষায় গাম্ভীর্য সৃষ্টি করতে হলে যা প্রয়োজন তা হল খুব বেশি ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু বিশেষণ ব্যবহার করা। বাংলা ভাষায় জোর সৃষ্টি করার সমস্যাও তার সমাধান সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করে পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ যে এই ধরণের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামি শিষ্য সংবাদ' গ্রন্থে তা বিধৃত হয়ে আছে :—

"...বাংলা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করব। এখনকার বাঙ্গলা লেখকরা লিখতে গেলেই বেশি ভার্বস্ ইউজ করে, তাতে ভাষার জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে ভার্বএর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বেশি জোর হয়—এখন থেকে ঐরূপ লিখতে চেষ্টা কর্ দিকি।...ভাষার ভিতর ভাবগুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস্? ঐরূপে ভাবের পজ্ বা বিরাম দেওয়া; সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘনঘন নিশ্বাস ফেলার মতো দুর্বলতার চিহ্ন মাত্র।" কিন্তু বেশী ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলে ভাব যেমন ঘনঘন এবং অতিদ্রুত থেমে যায়, তেমনি খুব বেশি বিশেষণ ব্যবহার করলেও ভাষারগতি অত্যন্ত মন্থর হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে প্রসাদগুণযুক্ত ভাষারচনার জন্য ক্রিয়াব্যবহার ও বিশেষণ ব্যবহারের মধ্যে বিশেষভাবে ভারসাম্য রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। কালীপ্রসন্নের মহাভারতের ভাষার প্রসাদগুণের একটি বড় কারণও এইখানেই নিহিত। যেমন—"অনন্তর মহাবল দুর্যোধন মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় ক্রোধে অধীর হইয়া ভ্রাতৃমধ্য হইতে সহসা উত্থিত হইলেন এবং সম্মুখে আসীন ভীমকর্মা ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন, 'হে ভীম! কর্ণের প্রতি এরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করা তোমার সমুচিত নহে।" [আদিপর্বঃ সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়] সাম্প্রতিককালে কতগুলি মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যান অবলম্বনে রচিত সুবোধ ঘোষের 'ভারত প্রেমকথা'র ভাষানির্মিতির দক্ষতা প্রসঙ্গে ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় প্রমথনাথ বিশী যা বলেছেন তা কালীপ্রসন্নের মহাভারতের ভাষা সম্বন্ধেও অনেক পরিমাণে প্রযোজ্য।— "এখানে তাঁহার ভাষাপ্রবাহ মহাভারতের দেশে কালে বিস্তারিত, তাই তাহার জল গভীর, ধ্বনি গম্ভীর এবং কললাবণ্যে উচ্ছিত শীকরকণায় ইন্দ্রধনুর লীলা। এখানে তাঁহার ভাষাপ্রবাহের নির্মল দর্পণে কোথাও বা হিমালয়ের ধবলিমার শুভ্র প্রতিবিম্ব, কোথাও বা প্রাচীন অরণ্যানীর শাখাজটিল অন্ধকারের গূঢ় প্রতিচ্ছায়া, আর কোথাও বা ঐশ্বর্যসুখী রাজরাজন্যগণের বিচিত্রবর্ণ রত্নসৌধ চূড়ার প্রতিচ্ছবি। যে কোন স্থান হইতে উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে—'সেই নিদাঘের মধ্যদিনের আকাশ সেদিন তপ্ত তাম্রের মতো রক্তাভ হয়ে উঠেছিল, বলাকামালার চিহ্ন কোথাও ছিল না। জ্বালাবিগলিত স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ সেই সরোবর সলিলে মীনপংক্তির চাঞ্চল্যও ছিল না। খরসৌর করে তাপিত এক শৈবাল পূর্ণ শিলানিকেতন বহিঃস্পৃষ্ট মরকতস্তূপের মতো সরোবর প্রান্তে যেন শীতল স্পর্শসুখের তৃষ্ণা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মণ্ডূকরাজ আয়ুর প্রাসাদ।'...মহাভারতীয় পরিবেশ রচনা এ ভাষা-রীতি ছাড়া অসম্ভব। বাংলা সাহিত্যে যখনি যিনি ক্লাসিকাল রসসৃষ্টি

করিয়াছেন তখনই এই ভাষারীতিকে গ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন।" কালীপ্রসন্নের মহাভারতে ক্রিয়াপদ সাধুরীতির, ভাষাও তৎসম বহুল; আর 'ভারত প্রেমকথা'র ভাষায় ক্রিয়াপদ চলিতরীতির হলেও ভাষা যে শুধু তৎসম বহুল তাই নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক অপ্রচলিত বা অল্প প্রচলিত আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ এমন এক ধরণের 'দুঃশ্রবত্ব' সৃষ্টি হয়েছে যা সাধারণ অবস্থায় রসপরিণতির বাধা বলে গণ্য হলেও কখনো কখনো আলঙ্কারিক পরিভাষায় ' অত্যন্তং দুশ্রবত্বং গুণো ভবেৎ" হয়ে মহাভারতীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে উঠেছে। ফলে ভারত প্রেমকথা'র ভাষা এবং কালীপ্রসন্নের মহাভারতের ভাষার মধ্যে কিছুটা স্বভাবগত সাদৃশ্য থাকলেও একটা প্রধান পার্থক্য এই যে 'ভারত প্রেমকথা'র ভাষায় চলিত ক্রিয়াপদের আধারে বহু বিশেষ তাৎপর্যবহ তৎসম শব্দের বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সমাবেশে শিল্পিত কারুকার্য সৃষ্টির চেষ্টা অধিক, কিন্তু কালীপ্রসন্নের মহাভারতে সাধুক্রিয়াপদ সমন্বিত সাধু গদ্যরীতির আধারে তৎসমবাহুল্য সত্ত্বেও প্রসন্নতা ও প্রাঞ্জলতা অধিক। এখানে একথাও লক্ষণীয় যে, 'ভারত প্রেমকথা'র মতো গ্রন্থে কিছু নির্বাচিত মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানকে যে আধুনিক ভাষ্য ও আধুনিক পরিচ্ছদ দান করা হয়েছে তাতে ভাষার এই শৈল্পিক প্রকাশ বিশেষ উপযোগী হলেও সমগ্র মহাভারতের অনুবাদের মতো মহাকাব্যিক বিশালতায় ভাষার শৈল্পিক কারুকার্য অপেক্ষা ভাষার প্রসন্ন-গাম্ভীর্য রক্ষাই সর্বাধিক উপযোগী। কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদে ভাষার প্রয়োগসাফল্য তাই মহাকাব্যোচিত এই প্রসন্ন গাম্ভীর্যের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করে। এ গাম্ভীর্য অবশ্য দশাননের বিকটাকার দশমাথা ধারণের গাম্ভীর্য নয়, ধ্যানমগ্ন শিবের প্রসন্ন গাম্ভীর্য যেখানে গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয় কোমলতা। কালীপ্রসন্ন নিজে বলেছিলেন, "প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি।" মহাভারতের মূলানুগ অনুবাদে পণ্ডিতদের পাণ্ডিতী ভাষার গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই লালিত্য ও প্রসাদগুণ সমন্বয়ের প্রচেষ্টাই কালীপ্রসন্নের প্রধান কৃতিত্ব। সাম্প্রতিক কালে বুদ্ধদেব বসুও তাঁর 'মহাভারতের কথা' লিখতে গিয়ে স্বীকার করেছেন, "কোনো বাঙালির মুখেই কালীপ্রসন্নর নিন্দা সাজে না, এবং আমার পক্ষে তা কৃতঘ্নতা হবে—কেন না আমি প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে এই পুস্তকে প্রথম প্রবেশ করেছিলাম, আর আজ পর্যন্ত তার মায়াজাল থেকে বেরোতে পারিনি। সত্য, এখানে কোন-কোন অংশ সংক্ষেপিত বা আচ্ছাদিত ও কোনো-কোনোটি বিস্ফারিত হয়েছে, তবু এও সত্য যে, মহাগ্রন্থটি সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমেত

উপস্থিত, ভাষাব্যবহারে তৎসম শব্দের অবিরল নিবিড়তার জন্য সংস্কৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়, অথচ কোথাও নেই কৃত্রিমতা বা দুরান্বয়, প্রতিটি বাক্যের ধ্বনিকল্লোল মনোহর এবং অনেক স্থলেই মূলের শব্দে সমৃদ্ধ ;—মোটের উপর আমরা বলতে পারি যে একাধারে সুখপাঠ্য ও মূলানুগ সমগ্র অনুবাদ হিসেবে কালীপ্রসন্ন বাংলা সাহিত্যে এখনো অদ্বিতীয়।"[১১]

এইভাবে মূলানুগত্য ও ভাষা—উভয় দিক থেকেই কালীপ্রসন্নের মহাভারত যে বাংলা সাহিত্যের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রতি সুবিচার করতে না পারলেও এই মহাভারতের অনুবাদ সম্বন্ধে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের 'The Calcutta Review' পত্রিকায় লিখেছিলেন, "...... in **particular he is the author of a translation of the Mahabharata, which May be regarded as the greatest literary work of his age**" আবার কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদ হাতের কাছে পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে 'কৃষ্ণচরিত্র' লেখা সহজসাধ্য হয়েছিল বলে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রথমভাগের বিজ্ঞাপনেও বঙ্কিমচন্দ্র কালীপ্রসন্নের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছিলেন, "সর্বাপেক্ষা আমার ঋণ মৃত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট গুরুতর। যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি তাঁহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি।" কালীপ্রসন্ন নিজেও ১৭৮১ শকাব্দ (ইং ১৮৬০) তাঁর মহাভারতের ভূমিকায় এই অনুবাদ-কর্মের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্বন্ধে এই আশা পোষণ করেছিলেন যে "সুদূর-প্রস্থিত প্রশস্ত পন্থাও কালেতে বিলুপ্ত হয়, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকাও সময়ে শুষ্ক হইয়া যায়, অত্যুচ্চ প্রাসাদও কালে ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গিয়া থাকে এবং পরিখা পরিবেষ্টিত দুর্গম দুর্গেরও ক্রমেই নাশ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রগাঢ় জ্ঞানচিহ্ন দেশ হইতে শীঘ্র অপনীত হইবার নহে।"

(৫)

কালীপ্রসন্ন মহাভারতের মূলানুবাদের সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জীবনবৃত্তান্ত সহ মূল মহাভারতের সমালোচনা প্রকাশ করতেও বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। এজন্য তিনি বিশেষ পরিশ্রম সহকারে নানাবিধ সংস্কৃত পুস্তক, এসিয়াটিক রিসার্চ ও ম্যাক্সমূলের-কৃত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি পুস্তকের সারসংকলনও সমন্বয় করেছিলেন[১২] কিন্তু আগে জমি তৈরী ও পরে বীজ বপনের প্রতি লক্ষ্য রেখে মহাভারতের সম্পূর্ণ গদ্যানুবাদ প্রচারের

পূর্বে মহাভারতের সংস্কারমুক্ত ও পক্ষপাতশূন্য সমালোচনা প্রকাশ না করার জন্য কালীপ্রসন্নের দূরদৃষ্টি ও বাস্তববাদিতার পরিচয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যখন তিনি মহাভারতের উপসংহারে বলেন, "ভারত সমালোচনার প্রতিবন্ধক সমুদয়ের মধ্যে একটি গুরুতর প্রতিবন্ধক এই যে, পক্ষপাতশূন্য হইয়া ঐ গ্রন্থ সমালোচন করিলে তদ্দর্শনে কুকংস্কারবিহীন উন্নতচিত্ত সাধুগণ যেরূপ প্রীতিলাভ করিবেন, সম্প্রদায় বিশেষের সেরূপ প্রীতিলাভের সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং আমি যে উদ্দেশ্যে মহাভারতের অনুবাদে এতাদৃশ পরিশ্রম স্বীকার করিলাম, তাহার হানি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।" কিন্তু মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে কালীপ্রসন্নের অকালমৃত্যুর ফলে মহাভারতের পক্ষপাতশূন্য, যুক্তিবাদী সমালোচনা প্রকাশের এই সৎ সংকল্প আর কার্যে পরিণত হতে পারে নি। কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর ষোলবছর পরে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মহাভারত থেকে উপাদান সংগ্রহ করে এবং বিশেষভাবে কালীপ্রসন্নের মহাভারতের সাহায্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে 'কৃষ্ণ চরিত্র' প্রকাশ করেন, তাতেই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম মহাভারতের যুক্তিবাদী সমালোচনার পথ প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই সমালোচনাও সমগ্র মহাভারতের সমালোচনা নয়, কেবল কৃষ্ণ চরিত্রকে কেন্দ্র করে যুক্তিবিচার সমন্বিত মহাভারতের আংশিক সমালোচনা, এবং এই যুক্তিবিচারও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নয়, গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা কৃষ্ণকে নব্যহিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শ-স্বরূপ, সকলগুণের আধার, পূর্ণমানবরূপে প্রতিষ্ঠার বিশেষ উদ্দেশ্য-তাড়িত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ চরিত্রে'র পর বাংলা সাহিত্যে মহাভারত সমালোচনায় বিখ্যাত গ্রন্থ বুদ্ধদেব বসুর 'মহাভারতের কথা'.ও প্রধানতঃ যুধিষ্ঠির চরিত্রকে কেন্দ্র করে মহাভারতের কিছু সুনির্বাচিত অংশের যুক্তিঋদ্ধ সমালোচনা, সমগ্র মহাভারতের সমালোচনা নয় ; এই বইয়ের একটি দ্বিতীয় খণ্ড লেখার যে পরিকল্পনা ছিল তা পুস্তকের মুখবন্ধেই লিখিত হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দ্বিতীয়-খণ্ড লেখার পূর্বে লেখককেই ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হল। সমগ্র মহাভারতের সংস্কারমুক্ত নিরপেক্ষ সমালোচনা আজও তাই ভবিষ্যতের গর্ভে।

মহাভারতের গদ্যানুবাদ ছাড়া কালীপ্রসন্ন স্বতন্ত্রভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতারও বঙ্গানুবাদ করেন। কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকায় গ্রন্থটির এইরূপ বর্ণনা দেখা যায় :—

Srimadbhagavadgita. Kaliprasanna Singha. 3 Dec. 1902. Rl. 32 mo ; 348 , Ist edn.

১৯১১ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বরাহনগর 'শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরি' থেকে সত্যচরণ মিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার এই সংস্করণ প্রকাশ করেন। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১২।

কালীপ্রসন্নের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন অংশে লিখিত হয়েছে :—

"গদ্য মহাভারতের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অনুবাদক পুণ্যশ্লোক ধনকুবের ৺কালী-প্রসন্ন সিংহ এই সংস্করণ যন্ত্রস্থ করিয়া অকালে স্বর্গারোহণ করেন, সুতরাং এতাবৎকাল ইহা আদৌ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। আমরা তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে জীর্ণ শীর্ণ কীটদষ্ট হস্তলিখিত পুঁথির প্রকাশসত্ত্বের ভার গ্রহণ করিয়া মহাত্মার শেষ কীর্তিস্বরূপ এই 'শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা' সাধারণের সুবিধার জন্য সুবৃহৎ পকেট এডিসনে প্রকাশ করিলাম।"

এখানে একটি আশ্চর্য মিল এই যে বঙ্কিমচন্দ্রও স্বতন্ত্রভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করেন এবং তাঁর গ্রন্থও তাঁর জীবনকালে প্রকাশিত না হয়ে তাঁর মৃত্যুর পর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অবশ্য কালীপ্রসন্নের অনেক পরে বঙ্কিমচন্দ্র গীতার ব্যাখ্যা শুরু করেছিলেন এবং ১২৯৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত 'প্রচার'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাত গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছিল; চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক অবধি বাকীটা পাণ্ডুলিপিতে ছিল। সুতরাং দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র গীতার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেন নি এবং যেটুকু করেছিলেন তাও তাঁর জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে (মুদ্রিত ও পাণ্ডুলিপি অংশসহ) বঙ্কিমের অসমাপ্ত গীতার সঙ্গে কালীপ্রসন্নের অনুবাদিত মহাভারতের ভীষ্মপর্ব থেকে বাকী গীতাংশ জুড়ে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদাদি সংস্করণে অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই কেবল বঙ্কিমের অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাই রক্ষিত হয় কারণ যা বঙ্কিমের লেখা নয়, বঙ্কিমের রচনায় তা থাকা উচিত নয়।

যাই হোক্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েরই যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি মৌলিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে—

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গীতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, "গীতার যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ভগবদুক্তি এমন কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে।"

কালীপ্রসন্নও তাঁর শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'উহাতে ভ্রান্তিসংকুল মতও নিবেশিত আছে যথার্থ বটে, কিন্তু উহার মধ্যে যে সকল অমূল্য সত্য অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই ভারতবর্ষীয় আন্বীক্ষিকী ও ত্রয়ী বেত্তাদিগের গৌরবের একমাত্র দৃষ্টান্ত হইতে পারে।"

আমরা পূর্বেই দেখেছি, কালীপ্রসন্ন তাঁর মহাভারতের সংকল্পিত সমালোচনায় যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হতে চেয়েছিলেন। এখানে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা সম্বন্ধেও তাঁর অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেল।

কালীপ্রসন্ন মহাভারত ও শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বঙ্গানুবাদ ছাড়াও আরও কিছু প্রধান প্রধান পুরাণ গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের এক বৃহৎপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। বরাহনগরের যে বাড়ীতে কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদ সম্পন্ন হয় কালীপ্রসন্ন তার নাম দিয়েছিলেন 'পুরাণ সংগ্রহ কার্য্যালয়।' মহাভারতের প্রথম খণ্ডটিও 'পুরাণ সংগ্রহ' নামে প্রকাশিত হয়। এ থেকে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে কালীপ্রসন্ন ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রকাশেরও সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। মহাভারতের 'অষ্টাদশপর্বের উপসংহারে'ই কালীপ্রসন্ন ঘোষণা করেছিলেন, "অষ্টাদশ পর্বের অতিরিক্ত হরিবংশ নামক গ্রন্থকে অনেকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি পর্ব বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন এবং উহাকে আশ্চর্য পর্ব বা ঊনবিংশ পর্ব বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু বস্তুতঃ হরিবংশ ভারতান্তর্গত একটি পর্ব নহে। উহা মূল মহাভারত রচনার বহুকাল পরে পরিশিষ্টরূপে উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।...উত্তরকালে পুরাণ সংগ্রহের দ্বিতীয় কল্পে অপরাপর পুরাণের সহিত উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না।"

কালীপ্রসন্ন মহাভারত অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ অনুবাদেরও যে সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, সে তথ্যের সন্ধান পাই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপন।— মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক পন্ডিত মহাশয়েরা ১লা শ্রাবণ বিদ্যোৎসাহিনী সভায় উপস্থিত হইবেন, ঐ দিনে রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদারম্ভ হইবে। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ। —'সংবাদ প্রভাকর' ১৩ জুলাই, ১৮৫৮। কিন্তু সম্ভবতঃ মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়ে ঐ অনুবাদ কর্মের বিশালতা ও ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে রামায়ণ অনুবাদ একই সঙ্গে শুরু না করে পরিকল্পনাটি ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল।

এছাড়া কালীপ্রসন্ন এক সময় নেপোলিয়ান বোনাপার্টের লেখা জুলিয়াস সীজারের জীবনচরিতও বাংলায় অনুবাদ করার সংকল্প করেছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এ সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়, তা হল :— "Baboo Kiliprassono Sing…, we are told, has applied to Emperor Napoleon for permission to translate into Bengalee his Imperial Majesty's Life of Julius Caesar." কিন্তু সমগ্র মহাভারতের সমালোচনা, রামায়ণ, অন্যান্য পুরাণ ও জুলিয়াস সীজারের জীবনচরিত অনুবাদের সংকল্প পূরণের পূর্বেই অকাল মৃত্যুর ফলে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই মহাত্মা কালীপ্রসন্নের জীবনাবসান হল।

নবম অধ্যায়

প্রাবন্ধিক কালীপ্রসন্ন

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক কালীপ্রসন্নের একটি প্রবন্ধপুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ষোল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'—সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে কালীপ্রসন্ন এই পুস্তিকাখানি রচনা করে সাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। এই পুস্তিকায় একদিকে যেমন অত্যন্ত স্বল্প পরিসরের মধ্যে হরিশচন্দ্রের চরিত্র-চিত্রটি ফুটে উঠেছে, তেমনি অন্যদিকে প্রাবন্ধিক কালীপ্রসন্নের সমাজচেতনা, রাজনীতি-সচেতনতা এবং শিল্পসার্থকতার দিকটিও আভাসিত হয়েছে। এই প্রবন্ধ পুস্তিকা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। সেজন্য যথাসম্ভব উদ্ধৃতি সহযোগে আলোচনা করা প্রয়োজন।

কালীপ্রসন্ন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতা স্বীকারের কারণরূপে প্রথমেই উল্লেখ করেছেন সিপাহী বিদ্রোহের সময় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশচন্দ্রের ভূমিকার কথা। একদিকে সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনা এবং অন্যদিকে ইংরেজদের প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির মধ্যে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' যে সব লেখা প্রকাশ করতেন, সেকথা স্মরণ করে কালীপ্রসন্ন লিখেছিলেন, "যদি সে সময় তিনি না থাকিতেন, যদি সে সময় তাঁহার লেখনী নিরীহ বঙ্গবাসিবর্গের অনুকূলে চালিত না হইত, তাহা হইলে আজি আর বঙ্গদেশের দুর্দশার পরিসীমা থাকিত না।" একথা যে কতদূর সত্য তা বোঝা যায় 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রীর এই মন্তব্য থেকে—"বিদ্রোহজনিত উত্তেজনা-কালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামক সাপ্তাহিক ইংরাজী কাগজ এক মহোপকার সাধন করিল।··· হরিশচন্দ্র একদিকে যেমন গবর্ণমেন্টের সর্ব্বপ্রকার বৈধ শাসনকে সমর্থন করিতেন, তেমনি অপরদিকে ইংরাজগণের সর্ব্বপ্রকার অবৈধ আচরণের প্রতিবাদ করিতেন। সকলে উত্তেজনাতে পড়িয়া স্থিরবুদ্ধি হারাইয়াছিল, কেবল পেট্রিয়ট হারায় নাই; এজন্য রাজপুরুষগণের

নিকট ইহার আদর বাড়িয়া গেল। এরূপ শুনিয়াছি পেট্রিয়ট বাহির হইবার দিন লর্ড ক্যানিং-এর ভৃত্য আসিয়া পেট্রিয়ট অফিসে বসিয়া থাকিত, প্রথম কয়েকখানি কাগজ মুদ্রিত হইলেই লইয়া যাইত। হিন্দু পেট্রিয়টের এই প্রভাব দেখিয়া দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পুলকিত হইয়া উঠিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি নব্যবঙ্গের নেতৃগণ হরিশের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।"[১]

এই প্রবন্ধে কালীপ্রসন্ন হরিশচন্দ্রের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন "তিনি যে শুদ্ধ বিদ্রোহে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন এমত নহে। ইংরাজি ১৮৫৩ সালে যখন পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার প্রদত্ত হয়, সে সময় ভারতবর্ষীয়েরা কোম্পানির রাজ্যশাসন বিপক্ষে পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করেন, ঐ আবেদনপত্র তৎকর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়, উহা তাঁহার স্বহস্তলিখিত এবং ঐ প্রস্তাবে তাঁহার এতদূর গুণ গরিমার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল যে, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা মুক্তকণ্ঠে ঐ আবেদনের শত শত বার প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয়েরা প্রার্থনাধিক ফল লাভ করেন, সেবারে এই নিয়মে পুনর্ব্বার চার্টার প্রদত্ত হইল যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কিঞ্চিন্মাত্র দোষ দেখিলেই কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদিগের হস্ত হইতে ভারতবর্ষের শাসন ভার গ্রহণ করিবেন।" হরিশচন্দ্রের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সঙ্গে ছিল স্পষ্টবাদিতা। ইংরেজ শাসনের যে কোন অপকর্মের বিরুদ্ধে তিনি সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠতে কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। এ সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন তাঁর প্রবন্ধে, "১৮৫৫ সালে লর্ড ডেলহাউসি লক্ষ্ণৌ গ্রহণ করণে মানস প্রকাশ করিলে, তিনি ভিন্ন সকল সম্পাদকই তাঁহার মতে অনুমোদন করিয়াছিল, তিনি অতি যথার্থ যুক্তির সহিত ডেল হাউসির অন্যায় মতের সমালোচনা করিয়াছিলেন। এমনকি, তৎসময়ে তিনি তদ্বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকট করেন, ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগেরও তাহাতে লজ্জিত হইতে হইয়াছিল। তিনি কহিয়াছিলেন, যদি লক্ষ্ণৌ প্রদেশ শুদ্ধ অবিচার দোষে ইংলিস অধিকারভুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে ইঁহারাই যে সুবিচার দ্বারা প্রজারঞ্জন করিতেছেন তাহার প্রমাণ কি। পৃথিবীর সমুদায় প্রদেশেই বহুকাল-পরম্পরায় এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে এবং তাহাই স্বভাবসিদ্ধ যে, দেশের কতক অংশ রাজার পরম মিত্র আর কতকগুলিন বিলক্ষণ বিপক্ষ (।) সুতরাং যদি ইংরেজদিগের বলবান বিপক্ষ নিকটে থাকিত তাহা হইলে ইহাদিগকেই অবিচারক বলিয়া ভারত সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়া লইত।"

ইংরেজ রাজত্বে রাজনৈতিক সমালোচনায় হরিশচন্দ্রের এই নির্ভীক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করে কালীপ্রসন্ন লিখেছেন, "পূর্ব্বে রাজ্য-শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তাহার সমালোচনা করা এবং কি প্রকার নিয়মে হতভাগ্য প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহার সদুপায় নির্দ্দেশ করার রীতি বাঙ্গালিদিগের নিকট নিতান্ত অপরিচিত ছিল; কোন বাঙালিই সাহস করিয়া রাজবিধি বিরুদ্ধে লেখনী চালন করেন নাই এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মের সংশোধনার্থ সদুপায় নির্দ্ধারণে অসমর্থ ছিলেন। কিন্তু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উল্লিখিত বিষয়ে প্রথমে হস্তক্ষেপ করিয়া বাঙ্গালিদিগের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন।" এখানে একথা স্মরণীয় যে হরিশচন্দ্রের পূর্বে রামমোহনের রাজনৈতিক নির্ভীকতা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে বঙ্গবাসী পরিচিত হয়েছে; কিন্তু হরিশচন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র পূর্বে অন্য কোন পত্রিকায় এমন নিয়মিতভাবে এবং এমন স্পষ্ট-বাদিতার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা হয় নি।

রাজনীতি ছাড়াও হরিশচন্দ্র জমিদার-প্রজা সম্পর্ক এবং প্রজা স্বার্থ সম্বন্ধে সবিশেষ চিন্তিত ছিলেন। জমিদারদের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে কিভাবে অসহায় দরিদ্র প্রজাদের রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে হরিশচন্দ্র সাধ্যমত তাঁর চিন্তা ও চেষ্টাকে নিয়োজিত করেছিলেন। এবিষয়ে কালীপ্রসন্ন লিখেছেন, "১৮৫৯ সালের ১০ আইন কেবল তাঁহার একমাত্র পরিশ্রম যত্ন ও অধ্যবসায়ে প্রচলিত হয় (।) তাহার কোন কোন ভাগে বঙ্গবাসী ৩ কোটী লোক স্বাধীন-প্রায় হইয়াছে। জমিদারদিগের প্রজাগণের উপর আর তাদৃশ প্রভুত্ব নাই; জমিদার মনে করিলেই প্রজাবর্গকে তাঁহার কর্ম্মালয়ে আসিতে হইবে, তিনি, শান্তিরক্ষকের (Police-এর) অজ্ঞাতসারে প্রজার ধান্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবম্প্রকার বহুবিধ অনিষ্টকর নিয়ম একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।"

হরিশচন্দ্রের সবচেয়ে বড় গৌরব এবং কৃতিত্ব হল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় যশোহর, নদীয়, পাবনা প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রকাশ করা এবং নীলকর-আন্দোলনকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। কালীপ্রসন্নের ভাষায়—"এখনও হতভাগ্য প্রজাবর্গ নীলকর-হৃত সম্পত্তি হইয়া চতুর্দ্দশ পুরুষাধিকৃত সুখ সংসার পরিহারপূর্ব্বক দীনবেশে ভ্রমণ করিতেছে; ভয়ানক আত্মহত্যা,—ঘৃণাবহ বলাৎকার আজিও রহিত হয় নাই; কিন্তু তন্নি-বারণের সোপান কে আবিষ্কৃত করিল? কেবল সেই হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র লেখনীগুণে সদয় হৃদয় রাজপুরুষেরা করুণ রসপরবশ হইয়া নীলকর-দিগের ভয়ানক অত্যাচার নিবারণার্থ কমিটি নিযুক্ত করিলেন, তৎকর্ত্তৃক

তত্ত্বানুসন্ধানে কত অত্যাচার তোমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না।৩" শিবনাথ শাস্ত্রীও তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে বলেছেন, "নীলকর-অত্যাচার-নিবারণ হরিশের এক অক্ষয় কীর্ত্তি। এই কার্য্যে তিনি দেহ, মন, অর্থ, সামর্থ্য সকলি নিয়োগ করিয়াছিলেন।... অবশেষে প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টাতে গবর্ণমেন্ট এই ১৮৬০ সালেই 'ইন্ডিগো কমিশন' নিযুক্ত করিলেন।"

কালীপ্রসন্নের এই প্রবন্ধে হরিশচন্দ্রের চরিত্রবৈশিষ্ট্য এবং কর্মজীবনের গৌরব প্রকাশের জন্য যেমন যুক্তিশৃংখলার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তেমনি হরিশচন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে গভীরভাবে ব্যথিত হয়ে হরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদনে কালীপ্রসন্ন তাঁর হৃদয়াবেগ মিশ্রিত করে তৎকালীন ধনীসমাজের অসারতা এবং সে তুলনায় দরিদ্র কৃষকসাধারণের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে লিখেছেন ঃ—

"কলিকাতা নগরীয় ঐশ্বর্য্যমত্ত ধনিগণ!...তোমরা স্থির করিয়াছ যে, তোমরা হনুমানের ন্যায় অমর, কখনই মরিবে না-- চিরকাল বালাখানায় বৈঠকখানায়—বাগানে সুখে বিহার করিবে, স্বদেশের শুভ চিন্তায় বিব্রত হওয়া, তাহার শ্রীসাধন কার্য্যে ব্যয় করা মূর্খের কার্য্য; সুতরাং এবিষয়ে তোমাদিগের অপেক্ষা নীলকার্য্যের প্রজাগণে অধিক সাহায্য করিবে—কৃষকের সরল হৃদয় কৃতজ্ঞতা রসে পরিপূর্ণ। আজি যদি সোনাগাজীর খোঁড়া ব্রাহ্মের শ্রাদ্ধ হইত বা পাগলা ছিরুর সপিন্ডন হইত তাহা হইলে তোমরা সাহায্য করিতে পথ পাইতে না; আজ আস্তাবল বা হোটেলরক্ষক কোন ফিরিঙ্গী মরিলে সাধ্যমতে সাহায্য করিতে। তোমরা চালচিত্রের অসুরের মত শুদ্ধ দর্শনীয় নতুবা পদার্থের তৃণ হইতেও নিকৃষ্ট। এক্ষণে উপসংহার সময়ে বঙ্গদেশবাসীদিগের নিকট আমার নিবেদন এই, যে মহাত্মা তোমাদিগের এত উপকার সাধন করিয়াছেন, যদ্দ্বারা অনেক বিষয়ে তোমরা প্রাপ্তকাম ও পূর্ণমনোরথ হইয়াছ; যিনি নিজ ধীশক্তিবলে সান শোধিত মণির ন্যায় মেঘত্যক্ত দিনকরের ন্যায় স্তবকত্যক্ত পুষ্পের ন্যায় বাঙ্গালী সমাজ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহারে চিরস্মরণীয় কর।"

হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত এই প্রবন্ধে হরিশচন্দ্রের স্তুতিবাদে কালীপ্রসন্ন অবশ্য কোথাও কোথাও কিছু অতিশয়োক্তি করেছেন, যেমন—"তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার যত উন্নতিসাধন করিয়াছেন, সতীদাহ নিবারণে রাজা রামমোহন রায়, বিধবা বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন করিতে পারেন নাই।" কিন্তু এই ধরণের দু'একটি বাক্য ছাড়া প্রবন্ধটির

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হৃদয়াবেগের সঙ্গে যুক্তি সংমিশ্রিত হয়েছে এবং যেখানে যেখানে এই সমন্বয় সাধিত হয়েছে সেখানে যেন ভাষার মৃদঙ্গ বেজে উঠেছে।[১] কালীপ্রসন্নের সমকালীন কিশোরীচাঁদ মিত্র তৎসম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রে এই প্রবন্ধ-পুস্তিকাটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :—

"We have received a funeral eulogue by Baboo Kali Prosonno Singh on the late editor of the 'Hindoo Patriot' which has been published at the Pooran Sangraha Press. The language used is chaste and classical but perhaps too refined and elevated for common readers."[২]

এই প্রবন্ধ পুস্তিকা ছাড়া কালীপ্রসন্ন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'য়, নীলদর্পণ মামলার বিচারপতি স্যার মর্ডান্ট ওয়েলসের রূঢ় আচরণের প্রতিবাদ সভায় এবং ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিসভায় বক্তৃতার উদ্দেশ্যে যে সব প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। কালীপ্রসন্নের বাল্যকালে রচিত এবং সম্ভবত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'য় পঠিত কালীপ্রসন্নের প্রথম প্রবন্ধগুলি 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দুই সংখ্যা ছাড়া এই পত্রিকার অন্য সংখ্যাগুলি এখনও সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। এই দুই সংখ্যায় প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের স্বরচিত প্রবন্ধগুলি হল :— 'সভ্যতার বিষয়', 'চাঞ্চল্য' · 'বাল্যবিবাহ', 'কৌলীন্য' এবং 'বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা।' কালীপ্রসন্নের প্রাথমিক রচনা হিসাবে এই প্রবন্ধগুলির সবিশেষ গুরুত্ব আছে। 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখে। সেজন্য এই মাসিক পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যায় কালীপ্রসন্নের যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি হিসাবমত কালীপ্রসন্নের পনেরো বছর বয়সের রচনা। 'সংবাদ প্রভাকরে'র (১০ই জুলাই ১৮৫২) পৃষ্ঠায় প্রকাশিত চৌদ্দ বছর বয়স্ক বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনার পাশে কালীপ্রসন্নের এই প্রথম নিদর্শনগুলি রাখলেই বোঝা যাবে বঙ্কিমের রচনার তুলনায় কালীপ্রসন্নের রচনা বাল্যকালেই কত অধিক প্রাঞ্জলতা ও পরিপক্কতা লাভ করেছিল। শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বাক্ষরে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বঙ্কিম-রচনার প্রাথমিক নিদর্শন হল :— "স্বনাথ শশধর বিরহিনী বিঘোর তমসাম্বরাবৃতা গভীরা নিশীথিনীসঙ্কাশ নিবিড় জলধরমাল গগনমণ্ডলে নিয়ত নিরীক্ষণ করিতেছি। মন্মথোন্মথিত জনরাজী হৃদয় বিদারক ঘোর ঘন নির্ঘোষ নিনাদ শ্রবণে চমকিতচিত্ত চাপল্য প্রাপ্ত

হইতেছে।...." এবার 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের প্রাথমিক রচনা 'সভ্যতার বিষয়' প্রবন্ধটি থেকে কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত করি ঃ—

"সভ্যতার বিষয় ।—অসভ্যাবস্থা দূরীকৃত করিয়া সভ্যতার সোপানারূঢ় হইতে সকলেরই প্রধানোদ্দেশ্য, কিন্তু কি কি উপায়ালম্বন করিলে এতৎ মাঙ্গলিক বিষয়ানুষ্ঠান হইতে পারে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধানের অনুবর্ত্তী প্রায় কাহাকেই দৃষ্টিগোচর হয়না অতএব এই সর্ব্বমঙ্গলপ্রদায়ক বিষয়ের কোন কোন উপায়াবশ্যক করে, তাহা পশ্চাৎভাগে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

বিদ্যাই ইহার প্রধান সোপান স্বরূপ। ভূমিতে হল যোজনাক্রিয়াদি দ্বারা শস্যাদি রোপিত হইলে যেমত ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ মনোমধ্যে বিদ্যাবীজাঙ্কুরিত না হইলে সরলান্তঃকরণ সদ্ভাব উপচিকীর্ষা ন্যায়পরতা ইত্যাদি বৃত্তি দ্বারা মন কখনই বিভূষিত হইতে পারে না।...

জাত্যভিমান, যাহা এতদ্দেশীয় লোকের পক্ষে বিষম শূল স্বরূপ হইয়া অশেষ যন্ত্রণায় জর্জরীভূত করিতেছে। কারণ অধুনা ইউরোপ এবং আমেরিকা খণ্ডে যেরূপ সুপ্রণালীক্রমে বিদ্যানুশীলনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে, আসিয়া খণ্ডে তাহার কিছুমাত্রও নাই। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়। এতদ্দেশীয় লোকেরা অর্ণবযানারোহণ পূর্ব্বক তথায় গমন করিয়া জ্ঞানার্জন পূর্ব্বক, স্বীয় মানবজন্মের সার্থকতালাভে বঞ্চিত হয়েন। যেহেতু তাহার স্বীয় স্বজন বন্ধুবর্গ এবং পরিবারেরা সেই মহাত্মাকে সমুচিত সম্মান করা দূরে থাকুক, তাহাকে জাতিভ্রষ্ট করিয়া পরিত্যাগ করে, ও এতদ্রূপ পরিত্যক্ত হইতে অনেক মহাত্মাকে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এবং এই অনিষ্টকর দেশাচার অস্মদ্দেশে বদ্ধমূল হওয়াতে যে আরও কংশত প্রকার দুর্ঘটনা দিন দিন সংঘটিত হইতেছে তাহা অবচনীয়।..."

কালীপ্রসন্নের বালক বয়সে রচিত এই প্রবন্ধে ভাষার প্রাঞ্জলতা ছাড়াও চিন্তার স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা ও পারম্পর্যরক্ষার দিকটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাছাড়া প্রবন্ধটিতে বালক কালীপ্রসন্নের মানসিক গঠনটিও বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কালীপ্রসন্ন স্বাজাত্যবোধ এবং জাত্যভিমানকে কখনো এক করে দেখেন নি। ইউরোপীয় আচার অনুকরণে কালীপ্রসন্নের প্রচণ্ড অনীহা থাকলেও ইউরোপীয় বিদ্যার প্রতি তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, কারণ একথা তিনি সেই বালক বয়সেই বুঝেছিলেন যে ইউরোপীয় বিদ্যাকে দূরে সরিয়ে রাখার আয়োজন করে তার নিন্দা করতে বালক কালীপ্রসন্ন কুণ্ঠিত হন নি।

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধ-গুলিও এখন দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় সেগুলি থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি।

বাল্যবিবাহ।—বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে যে সকল কুৎসিৎ প্রথা প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া একটি সামান্য কুপ্রথা নহে। পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইলে ইহা নানা অনিষ্টের মূল। দেখ মাতা পিতা পুত্রটির পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই কিরূপে কন্যাসাত করিবেন সর্ব্বদা এই চিন্তাতেই ব্যাকুল থাকেন। কেবল চিন্তিত থাকেন এমত নহেন অতীব যত্ন সহকারে কুলাচার্য্যকে সমাহ্বান করিয়া কন্যা অন্বেষণে নানা দিগ্বিদেশে প্রেরণ করেন।...অপরাপরে পুত্রকন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার উদ্বাহের চেষ্টা করিয়া থাকেন কিন্তু বৈদিক মহাশয়েরা গর্ভে গর্ভেই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন (।) ফলতঃ ইহাতে যে নানাবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে তাঁহারা ভ্রমক্রমেও তাহার অনুধাবন করেন না।

অনিষ্টের বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ ইহা দেখিতে হইবে যে প্রাণিগণের জীবিতকাল অবস্থাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছে যথা বাল্য, যৌবন, এবং বার্দ্ধক্য। 'কোন্ অবস্থায় কি কি কর্ম করিতে হইবে নীতিশাস্ত্রে ইহার নিরূপণ আছে যথা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসাদি যৌবনে ধনোপার্জ্জনাদি বার্দ্ধক্যে পুণ্য সঞ্চয়াদি। যদ্যপিও বাল্যকাল ব্যতীত অন্য সময়ে বিদ্যাভ্যাসাদি হইতে পারে কিন্তু বাল্যকালে মেধা [স্মৃতিশক্তি?] সমধিক থাকে (।) সে সময়ে অনায়াসেই যত শিক্ষা করিতে পারা যায়, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে তত শিখিতে হইলে প্রগাঢ় পরিশ্রম অপেক্ষা করে এবং তাদৃশ সুচারু হইবারও সম্ভাবনা নহে। যোগ্য সময়ে ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে যত শস্য জন্মে অসময়ে কি সেরূপ হয়? অতএব বাল্যকালকেই বিদ্যাভ্যাসের উৎকৃষ্ট সময় বলিতে হইবে (।) কিন্তু আমাদিগের দেশে সকলি ইহার বিপরীত। দেখ বাল্যাবস্থাতে পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়া যখন উত্তরোত্তর স্ত্রীপুরুষের প্রণয় বদ্ধমূল হইয়া উঠে তখন বিদ্যাভ্যাসাদিতে অপেক্ষাকৃত অনেক অযত্ন ও ব্যাঘাত জন্মে তাহার আর সন্দেহ নাই। এই রূপেই অস্মদ্দেশীয় লোকেরা অপেক্ষাকৃত অন্য দেশস্থ লোক হইতে সমধিক রূপে মূর্খতা জালে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অপর, বাল্যকালে বিবাহ হইলে হতবীর্য্যও হইতে হয় তাহার প্রমাণ অস্মদ্দেশীয় লোকেরা প্রায়ই অন্য দেশীয় লোক হইতে দুর্ব্বল হইয়া থাকে (।) সুতরাং দুর্ব্বল হইলে ইহারা যে কোন কালে স্বাধীন হইবে তাহার প্রত্যাশা করাও বৃথা। এই বাল্যবিবাহ এদেশের

দরিদ্রতার এক প্রধান কারণ। দেখ যখন পুত্রের বয়ঃক্রম অল্প তখন সে ভবিষ্যতে বিদ্বান হইবে কি মূর্খ হইবে; সুশীল হইবে কি দঃশীল হইবে; সম্পন্ন হইবে কি দীন হইবে; তাহা জানিতে পারা যায় না। সেই সময় তাহার বিবাহ দিলে যদ্যপিও সে উপার্জ্জন করিতে অশক্ত হয়; তবে তাহাকে পুত্রকলত্রাদির ভরণপোষণ করিতে যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট হয় তাহা বর্ণনাতীত। আহা তাহার স্ত্রীপুত্রাদি পর্য্যাপ্ত অন্নাচ্ছাদনাদির অভাবে নিরন্তর দুঃখে সময়াতিপাত করে। অতএব যখন কৃতবিদ্য হইয়া উপার্জনাদি করিতে পারিবে তখনি মাতাপিতার বিবাহ দেওয়া যথার্থ স্নেহের কর্ম।

আরো স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে পরস্পর অপ্রণয় দৃষ্ট হয় বাল্যবিবাহকে তাহার এক প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করিতে হইবে; কারণ বিবাহকালে শিশু বরকন্যা পরাধীন ও সদসদ্বিবেচকহীন; সুতরাং মাতাপিতা যদ্যপি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া অন্যায় বিবাহ দেন তবে ভবিষ্যতে কিরূপে দম্পতি সুখে কালযাপন করিবে। কিরূপেই বা তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য থাকিতে পারে। আরো বাল্যকালে উদ্বাহ দেওয়ায় এক ভয়ানক ঘটনা হইয়া থাকে। বিজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা কহেন এবং প্রত্যক্ষও করা যাইতেছে যে বাল্যকালে অধিক পীড়াদি ঘটে এবং তাহাতে অনেকেই কালকবলে নিপতিত হয় (।) সুতরাং পতির কাল হইলে বর্ত্তমান নিয়মানুসারে পুনরুদ্বাহ না থাকায় বালিকা বিধবা যাবজ্জীবন দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করে (।) অতএব এই সকল দোষ পর্য্যালোচনা করিয়া অতি অনিষ্টকর বাল্যবিবাহ যাহাতে রহিত হয় তাহাই শীঘ্র করা কর্ত্তব্য।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা
১০ মাঘ ১৭৭৬ শক
শনিবার যোড়াসাঁকো

কৌলীন্য।—আমাদিগের দেশে এক্ষণে যেরূপ কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রচলিত আছে; ইহাকে শত শত অনর্থের বীজস্বরূপ বলিয়া গণনা করিতে হইবে।

ইহা প্রথমত কোন্ অভিপ্রায়ে প্রচলিত হইয়াছিল এবং আপাততঃ কৌলীন্য স্থাপনের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে না পারিয়া কেবল ইহাকে বংশ পরম্পরাগত করায় প্রত্যহ যে রাশি রাশি অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে তদ্বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে; শ্রোতা মহাশয়েরা পক্ষপাতরহিত হইয়া মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখুন ইহা রহিত করা উচিত কিনা? অধিক পূর্ব্বে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রচলিত ছিল না। বৈদ্যবংশোদ্ভব নৃপতি বল্লাল সেনই আপন অধিকারকালে সকলের গুণ দোষাদি পর্য্যালোচনা করিয়া যাঁহারা সদ্গুণান্বিত ধার্ম্মিক ও

সুশীল তাঁহাদিগকেই মর্য্যাদাসূচক কুলীন উপাধি প্রদান করেন।... এই অভিপ্রায়কে অতি উত্তম বলিতে হইবে (।) কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দোষগুণাদি পর্য্যালোচনা করিয়া কেবল কুলীনের পুত্র হইলেই আপন পিতার পদের উত্তরাধিকারী হইবে (,) যদ্যপি সহস্র সহস্র দোষের আধার হয় তথাপি জনসমাজে তাহার পিতার ন্যায় মান ও আদরাতিশয়ে কোন হানি হইবে না—এইরূপে কৌলীন্য মর্য্যাদা কুলক্রমাগত হওয়ায় পূর্ব্বলিখিত কুলীন শ্রেণী স্থাপনকর্ত্তার সদভিপ্রায় বিপরীত হইয়াছে।...

অস্মদ্দেশীয় অসংশোধিতচিত্ত পরম্পরাগত কুসংস্কারবশত লোকেরা অশেষ দোষের আকরস্বরূপ কুলীনের পুত্রকে পাদানত হইয়া ও নানাবিধ অর্থব্যয় পূর্ব্বক কন্যাদান করিয়া "আমি অদ্য কৃতার্থ হইলাম আমা অপেক্ষা আর ভাগ্যশালী লোক ভুবনে পাওয়া ভার অদ্য আমার চতুর্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত স্বর্গে গমন করিল" ইত্যাদি বিবেচনা করিতে থাকেন আর এক ব্যক্তি বিদ্বান সুশীল সুরূপ ধার্ম্মিক মৌলিকাদিকে বিবাহ করিতে হইলে প্রভূত অর্থপ্রয়োজন করে এবং অর্থাভাবে শত শত ব্যক্তিও বিবাহ করিতে পারে না (।) এই সকল অবিচার অন্যায় আচরণ দর্শন করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি না দুঃখিত হইবেন? বর্ত্তমান কৌলীন্য মর্য্যাদা বর্ত্তমান থাকিলে কেবল পূর্ব্বপ্রদর্শিত অবিচার ঘটে এরূপ নহে (,) ইহাতে আর [এক] ভয়ানক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কুলীন মহাশয়েরা অর্থলাভ প্রত্যাশায় অথবা কন্যাকর্ত্তার আগ্রহাতিশয়ে বশীভূত হইয়া এক একজন শতশত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহারা এমত কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই [যে] স্ত্রীর ধর্মরক্ষা ও মনোরক্ষাদি করিবেন্। হয়ত কেহ বিবাহ অবধি আর স্ত্রীর নিকট যান না কেহ বা বার্ষিক কিম্বা মাসিক নিয়মে শ্বশুরালয়ে গমন করেন, কেহ কেহ দশ কিম্বা দ্বাদশ বৎসরের পর শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া যদ্যপি মর্য্যাদার টাকা না পান তবে স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণাদি না করিয়া অবিলম্বে ক্রোধভরে স্থানান্তরে গমন করেন। ইহাতে সেই স্ত্রীসকল যে কি পর্য্যন্ত দুঃখে কাল যাপন করে তাহা বর্ণনাতীত। কোন কোন স্ত্রী দুঃসহ যৌবন যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যাভিচার দোষে দূষিতা হয় এবং এই রূপে ক্রমশ বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে (।) যে কুলীন মহাশয় শত শত স্ত্রীকে বিবাহ করেন তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলে একেবারে তাঁহার সকল পত্নী বৈধব্যদশাগ্রস্তা হয় (।) তখন তাহারা আর যথেচ্ছ উপভোগাদি করিতে পারে না, কেবল প্রাণধারণোপযোগি এক সন্ধ্যা যৎকিঞ্চিৎ ফল মূলাদি আহার করিয়া দিন যাপন করে (,) তিথিবিশেষে জলগণ্ডূষ মাত্রও খাইতে পায় না। আহা! তাঁহাদিগের এই সমস্ত যন্ত্রণা

অবলোকন করিয়াও কেহ পরমকারুণিক জগদীশ্বরের অনভিপ্রেত অতিশয় নিষ্ঠুর কার্য্যের নিরাকরণ বিষয়ে সাহসপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করেন না (।) যদ্যপি এক্ষণে অনেক ব্যক্তির মনোমধ্যে কৌলীন্য প্রথারহিত ; বিধবাদিগের পুনরুদ্বাহদান ; এবং এক স্ত্রী বিদ্যমানে পত্নন্তর পরিগ্রহ নিষেধাদি পরম মঙ্গলাকর কার্য্যসকল কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে কিন্তু তাহারা কেবল লোকনিন্দাভয়ে এতদনুষ্ঠানে সাহসী হইতেছেন না (।) সকলে যাবৎ না সাহস পূর্ব্বক ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া এই সকল বিষয় প্রচলিত করিবেন তাবৎ অস্মদ্দেশের দুরবস্থা সকল নিৰ্ব্বাসিত হইতে পারিবে না ; অতএব সকলেরই হিতকর নিয়ম স্থাপনে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য ইতি।

বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা।—

....মুসলমান রাজারা রাজনীতি অনভিজ্ঞ ছিলেন, প্রজাদিগকে কিরূপ পালন করিতে হয় তাহা না জানাতে পালনস্থলে পীড়ন করিতেন, এবং এই দোষেই তাঁহাদিগের রাজ্য নষ্ট হয়। হিন্দু প্রজারা আর সহ্য করিতে না পারিয়া আপনাদিগের পরিত্রাণ নিমিত্ত ইংরাজদিগকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালারাজ্য অধিকার করিবার সদুপায় করিয়া দিলেন। কিন্তু ব্রিটীশ গবরণমেণ্টও বিজাতীয় পক্ষপাতশূন্য নহেন। মুসলমানদিগের অধীনে পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে পাওয়া যাইত না বলিয়া কেহ পরিশ্রম করিত না। কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা হয় তাঁহাও ভাল ছিল। এক্ষণে অবাধে বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে সকলের মন উজ্জ্বল হইতেছে কিন্তু কি মনস্তাপ! যে ইংরাজদিগের সমকৃতবিদ্য হইলেও তাহারদিগের ন্যায় উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক জন ইংরাজ যে কর্ম্ম করে যদি সেই কর্ম্ম একজন বাঙ্গালি নির্ব্বাহ করেন তাহা হইলেও তাহার বেতন সেই ইংরাজের ন্যায় হইবে না, সমান বেতন পাওয়া দূরে থাকুক অপেক্ষাকৃত পারগ হইলেও সে পদ তাঁহার পাইবার বিষয় কি, ইহাকে কি বিজাতীয় পক্ষপাত বল না। এক্ষণে একবার আকবর বাদসাকে স্মরণ করি, তাহাঁর সময়ে যোগ্য ব্যক্তি হইলেই রাজ্যের গুরুতর কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে পারিত (,) হিন্দু কি মুসলমান তাহার বিচার ছিল না। তাঁহার নিকট বিদ্যাই পূজ্য হইত, যেমন একচন্দ্র গগনমন্ডলে উদয় হইয়া পৃথিবীর সকল অন্ধকার হরে, সেইরূপ তিনি উদয় হইয়া পূর্ব্বমত মুসলমানদিগের, রাজধর্ম অনভিজ্ঞতারূপ যে অন্ধকার ছিল, তাহা হরিয়াছিলেন (।) দেখ ব্যবস্থাপক কৌনসলে এক্ষণে প্রজাদিগের কোন হাত না থাকাতে কত অমঙ্গলের সম্ভাবনা (।) কোন আইন প্রচারকালে প্রজাদিগের মত গ্রহণ হয় না (।) ইহাতে তাহারা কোন নিয়ম অকল্যাণকর জ্ঞান

করিলেও স্তব্ধ থাকে (।) পরন্তু মুসলমানদিগের প্রতি কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে না (।) তাহারা যে কালে রাজা ছিল সে কালে অসভ্যতাই সবল ছিল কিন্তু এইক্ষণে অসভ্যতা দূরে হইয়া সভ্যতার সোপান বর্দ্ধিত হইতেছে। আমারদিগের বৃটীশ গবরণমেণ্ট সভ্য বলিয়া লোক বিখ্যাত আছেন অতএব বিজাতীয় পক্ষপাত থাকিতে ঐ বিষয়ে গবরণমেণ্ট সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে অবশ্যই লজ্জা পাইবেন।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র ফাইলঃ—
প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা।
রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি।

'বাল্য বিবাহ' প্রবন্ধে কালীপ্রসন্ন বাল্যবিবাহরূপ কুপ্রথা লোপের জন্য যে সব শাণিত যুক্তি ব্যবহার করেছেন, তা সেই বালক বয়সের পক্ষে অত্যন্ত বিস্ময়কর। আমাদের মনে হয়, কালীপ্রসন্ন নিজের বাল্যবিবাহের পর বাল্য-বিবাহের দোষ সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন ; আর তারই ফল-স্বরূপ এই 'বাল্যবিবাহ' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিগত জীবনে যোগ্যতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও জাতিগত জীবনে স্বাধীনতাস্পৃহার প্রকাশ। বালক কালীপ্রসন্ন তাই বাল্যবিবাহের ফলে "বিদ্যাভ্যাসাদিতে অপেক্ষাকৃত অনেক অযত্ন ও ব্যাঘাৎ জন্মে" একথা বলার পরেও সখেদে মন্তব্য করেন "বাল্যকালে বিবাহ হইলে হতবীর্য্যও হইতে হয় তাহার প্রমাণ অস্মদ্দেশীয় লোকেরা প্রায়ই অন্যদেশীয় লোক হইতে দুর্ব্বল হইয়া থাকে সুতরাং দুর্ব্বল হইলে ইহারা যে কোন কালে স্বাধীন হইবে তাহার প্রত্যাশা করাও বৃথা।" 'কৌলীন্য' প্রবন্ধে কালীপ্রসন্ন বৈদ্যবংশোদ্ভব নৃপতি বল্লাল সেন স্থাপিত কৌলীন্য প্রথাকে উত্তম অভিপ্রায় বললেও তিনি দেখিয়েছেন এইকৌলীন্য প্রথা গুণদোষাদি পর্য্যালোচনার জন্য ব্যবহৃত না হয়ে ক্রমে কুলক্রমাগত হওয়ায় সমাজের শত শত অনিষ্টের মূলীভূত কারণ হয়ে উঠেছে এবং "যদ্যপি এক্ষণে অনেক ব্যক্তির মনোমধ্যে কৌলীন্য প্রথা রহিত বিধবাদিগের পুনরুদ্বাহদান, এবং এক স্ত্রী বিদ্যমানে পত্ন্যন্তর পরিগ্রহ নিষেধাদি পরম মঙ্গলাকর কার্য্যসকল কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে কিন্তু তাহারা কেবল লোকনিন্দা ভয়ে এতদনুষ্ঠানে সাহসী হইতেছেন না (।) সকলে যাবৎ না সাহসপূর্ব্বক ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া এই সকল বিষয় প্রচলিত করিবেন তাবত অস্মদ্দেশের দুরবস্থা সকল নির্ব্বাসিত হইতে পারিবে না, অতএব সকলেরই হিতকর নিয়ম স্থাপনে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।"

'বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা' প্রবন্ধে কালীপ্রসন্ন নির্ভীকভাবে মুসলমান রাজ্যশাসনের সঙ্গে ব্রিটিশ রাজ্যশাসনের তুলনামূলক আলোচনা করে আকবর বাদশার রাজত্বকে ব্রিটিশ রাজত্বের চেয়ে অনেক বেশি ন্যায়নীতিসম্মত বলেছেন কারণ "তাঁহার সময়ে যোগ্য ব্যক্তি হইলেই রাজ্যের গুরুতর কর্মের ভার গ্রহণ করিতে পারিত হিন্দু কি মুসলমান তাহার বিচার ছিল না।" অন্যান্য মুসলমান রাজারা যদিও সকলে বিজাতীয় পক্ষপাতশূন্য ছিলেন না, তবু কালীপ্রসন্ন সিদ্ধান্ত করেছেন, "পরন্তু মুসলমানদিগের প্রতি কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে না (।) তাহারা যে কালে রাজা ছিল সেকালে অসভ্যতা সবল ছিল কিন্তু এক্ষণে অসভ্যতা দূর হইয়া সভ্যতার সোপান বর্দ্ধিত হইতেছে। আমারদিগের ব্রিটিশ গবরণমেণ্ট সভ্য বলিয়া লোকবিখ্যাত আছেন অতএব বিজাতীয় পক্ষপাত থাকিতে ঐ বিষয়ে গবরণমেণ্ট সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে অবশ্যই লজ্জা পাইবেন।"

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলি ছাড়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' (কার্তিক সংখ্যা ১৭৭৯ শক) কালীপ্রসন্ন কা. প্র. সি. স্বাক্ষরে 'নূতন গ্রন্থের সমালোচন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। প্রবন্ধের শুরুতে সেকালের পুস্তক প্রকাশ ও গ্রন্থ সমালোচনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে :—

"পুলিসের একখানি পত্রপাঠে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে অধুনা কলিকাতায় ৯০টি মুদ্রাযন্ত্র বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কনে নিযুক্ত আছে, এতদ্ভিন্ন চব্বিশ পরগণা শ্রীরামপুর প্রভৃতি কয়েক স্থানে মুদ্রাযন্ত্র বর্তমান আছে। ঐ সকল যন্ত্রে যদ্যপি প্রত্যহ ৫০০ পৃষ্ঠা মুদ্রাঙ্কিত হয়, তাহা হইলে ১.৭০,০০ ০০০ পৃষ্ঠা পুস্তক প্রতি বর্ষে মুদ্রিত হইতে পারে। পরন্তু সব যন্ত্রাধ্যক্ষেরা প্রত্যহ কর্ম প্রাপ্ত হয় না, এবং পর্ব্বাহে অনেকের যন্ত্র স্থগিত থাকে, অতএব সমস্ত যন্ত্রের বার্ষিক ক্রিয়ার সমষ্টি দেড় কোটি পৃষ্ঠা বলিলে বোধ হয় প্রকৃতের ব্যত্যয় হইবেক না। ঐ দেড় কোটি পৃষ্ঠার সকল রচনাই যে উৎকৃষ্ট হইবে ইহা সম্ভাব্য নহে; তন্মধ্যে উত্তম মধ্যম অধম সকল প্রকার রচনাই প্রকটিত হইয়া থাকে। ঐ সকল রচনার মধ্যে উত্তম গুলিনই আমাদিগের পাঠকবর্গ গ্রহণ করেন এই আমাদিগের উদ্দেশ্য এবং তন্নিমিত্তই মধ্যে ২ নূতন গ্রন্থের সমালোচন করিয়া থাকি।......

অপর উত্তম গ্রন্থের পঠনান্তর তাহার প্রশংসা না করিয়া নিরস্ত থাকা ক্লেশকর হয়; এই প্রযুক্তও নূতন গ্রন্থের দোষগুণের বিচার করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে; নতুবা আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত রহিতাম।"

অতঃপর দ্বারকানাথ রায় বিরচিত 'স্ত্রীশিক্ষা বিধান' নামক গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন লিখেছেন—"বঙ্গভাষায় গদ্যরচনাতে তিনি সুপণ্ডিত, বর্তমান গ্রন্থ তাহার এক প্রমাণস্বরূপ বলিলে বলা যায়। ইহার ভাবও যাদৃশ উৎকৃষ্ট, ইহার রচনাচাতুর্য্যও তাদৃশ সুন্দর; ইহার পাঠে অবশ্য সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

অপর তাহার উজ্জ্বল কান্তির প্রতিভায় দুই এক স্থানে কিঞ্চিৎ কলঙ্ক ব্যক্ত হইয়াছে প্রসঙ্গানুরোধে তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। তাহাতে গ্রন্থকার আমাদিগের প্রতি রুষ্ট হইবেন ইহা সম্ভাব্য নহে।...

তিনি আপন পুস্তক তিন খণ্ডে বিভক্ত করেন। তাহার প্রথম খণ্ডের নাম 'স্ত্রীশিক্ষা প্রতিপক্ষগণের আপত্তি খণ্ডন', দ্বিতীয়ের নাম স্ত্রীশিক্ষার ফল বর্ণন', তৃতীয়ের নাম 'উপসংহার'।

বঙ্গভাষায় নির্জীব শব্দ সম্বন্ধীয় বিশেষণে লিঙ্গ পরিবর্ত্তনের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। লেখক বা বক্তার ইচ্ছানুসারে স্ত্রীর বিশেষণ কদাপি স্ত্রী প্রত্যয় প্রাপ্ত হয়, কদাপি পুংবদ্ভাবেই থাকে। পণ্ডিত মহাশয়েরা ঐ সকল বিশেষণ প্রায় স্ত্রীপ্রত্যয়ান্তেই ব্যক্ত করেন, কেবল কৃৎপ্রত্যয়ান্ত হইলে স্থানবিশেষে ঐ প্রত্যয় ত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু পুং বা ক্লীব লিঙ্গ শব্দে স্ত্রীবিশেষণ প্রযুক্তকরণের রীতি কুত্রাপি নাই—আমাদিগের জ্ঞানে কি পণ্ডিত কি বিষয়ী লোক কেহই ঐ রূপে কোন শব্দের ব্যবহার করেন নাই। কেবল শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ই এই নিয়মের অন্যথায় কয়েক স্থানে (২ পৃষ্ঠায়) 'বিদ্যাবতী কামিনীকুল' (৫ পৃষ্ঠায়) 'বিদ্যাবতী বণিতাবর্গ' (৮ পৃষ্ঠায়) 'সুশিক্ষিতা গুণবতী কুলবতীকুল' (১৮ পৃষ্ঠায়) সদ্বীপা ধরিত্রীতল' প্রভৃতি বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই অন্যথাচরণের কারণ কি তাহা স্থির হইতেছে না। সংস্কৃত ব্যাকরণে এই নিয়ম আছে যে দ্বন্দ্ব ও তৎপুরুষ সমাসের বিশেষণ সমাসস্থ পরপদের লিঙ্গ ভজনা করে, অর্থাৎ উক্ত সমাসদ্বয়ের শেষপদের যে লিঙ্গ বিশেষণের সেই লিঙ্গ হইয়া থাকে। কামিনীকুলের কুল শব্দ ক্লীব লিঙ্গ; সুতরাং 'কামিনীকুল' সমাসের বিশেষণ 'সুশিক্ষিতা' 'গুণবতী' 'বিদ্যাবতী' প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ কোনমতে সুপ্রশস্ত বোধ হয় না। 'বণিতাবর্গ' সমাসের বর্গ শব্দ পুংলিঙ্গ, সুতরাং তাহার বিশেষণও পুংলিঙ্গ হইবে। 'ধরিত্রীতলের' তল শব্দ পুং ও ক্লীব এই দুই লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, অতএব তাহার বিশেষণে 'সদ্বীপা' স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। যদ্যপি বিশেষণের সমাস ইচ্ছা করেন

তাহা হইলেও সদ্বীপা না হইয়া সদ্বীপ হইত। যেহেতু সমাসান্তর্গত পদের লিঙ্গ ভেদ হয় না।....” কা. প্র. সি.

এই গ্রন্থসমালোচনামূলক প্রবন্ধে কালীপ্রসন্ন দ্বারকানাথ রায়ের গ্রন্থের ভাবের উৎকর্ষ ও রচনাচাতুর্যের যেমন প্রশংসা করেছেন, তেমনি গ্রন্থটির স্থানে স্থানে বিশেষণ প্রয়োগে ব্যাকরণগত ত্রুটিরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। সেকালে স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ প্রয়োগে যে শিথিলতা ছিল, কালীপ্রসন্ন সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এবং এবিষয়ে কালীপ্রসন্ন যে নিয়মের উল্লেখ করেছেন, পরবর্তীকালের বাংলা গদ্যরচনায় সেই নিয়মই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আবার রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থসংগ্রহে'র সম্পাদক-পদ পরিত্যাগ করার পর বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের ইচ্ছা অনুযায়ী কালীপ্রসন্ন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে (১৭৮৩ শকের বৈশাখ সংখ্যা থেকে) ঐ পত্রের সম্পাদক-পদে বৃত হওয়ার পর ঐ পত্রের আষাঢ় সংখ্যায় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ নাটক' এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' ও 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের সমালোচনা প্রকাশ করেছেন। 'নীলদর্পণ' প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন লিখেছেন :—

"নীলদর্পণ নাটক। এই নাটক ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে রামচন্দ্র ভৌমিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কি প্রকারে নীলকরগণ পাষাণ হৃদয়ে প্রজাবর্গের সর্বস্বাপহরণ করেন ; কিরূপে প্রজার চতুর্দশ পুরুষাধিকৃত ভদ্রাসনে নীল হল কর্ষিত হয় ; কিরূপে পিতামাতার একমাত্র আশাস্বরূপ, পতিপ্রাণা কামিনীর সংসার উদ্যানের অনুত্তম (অত্যুত্তম ?) সুবর্ণ পুষ্পস্বরূপ, অন্ধতমসাচ্ছন্ন হিরণ্যখনির একমাত্র দীপশিখাস্বরূপ কত নবীন যুবক, নীলকরের বিষম নৃশংস অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া অসময়ে আত্মবিনাশে সুস্থ (?) হইয়াছে ; কি প্রকারে কত অচতুরা গৃহস্থবালা নীলকরহস্তে সতীত্বস্বরূপ বিমলসুখে বঞ্চিতা হইয়া থাকে ; কি প্রকারে নীলকরগণ অম্লানবদনে আবালবৃদ্ধবনিতা পরিপূর্ণ গ্রামে অগ্নিপ্রদান করিয়া থাকেন ; নীলকরদিগের কর্ম্মচারীরা কেমন ভদ্রলোক ও নীলকৃষিকার্য্যে বঙ্গদেশে কত অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে ; সর্ব্ব-সাধারণকে তাহা সম্যকরূপে বিদিত করাই নীলদর্পণের উদ্দেশ্য।...

লেখক...বঙ্গদেশের যথার্থ হিতচিকীর্ষু, নিরীহ প্রজাবর্গের বিষম দুর্গতি দর্শন করিয়াই তন্নিরাকরণ মানসে নীলদর্পণ প্রণয়নে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনোরথ বিফল হয় নাই ; তিনি প্রার্থনাধিক ফললাভে কৃতার্থ

হইয়াছেন। নীলদর্পণ বঙ্গদেশের ভাবী ইতিহাসে লেখকদিগের প্রধান উপজীব্য হইয়াছে।…"

অতঃপর 'নীলদর্পণে'র কাহিনী বিশ্লেষণ ক'রে ও সংলাপ উদ্ধৃত ক'রে কালীপ্রসন্ন সংক্ষিপ্ত পরিসরে নাটকটির একটি পরিচ্ছন্ন পরিচয় প্রকাশ করেছেন।

এছাড়া কালীপ্রসন্নই প্রথম 'বিবিধার্থ' সংগ্রহে'র পৃষ্ঠায় মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সমালোচনা প্রকাশ করেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে কেন্দ্র করে সেকালে যে নিন্দা প্রশংসার ঝড় বয়ে যায় সেই বাতাবরণের কথা মনে রাখলে কালীপ্রসন্নের এই উৎসাহব্যঞ্জক প্রথম সমালোচনাটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে।

"মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য। যিনি বাঙ্গালী ভাষারে অভিনব অলংকারে অলংকৃত করিয়া জন্মভূমির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, যিনি নিজ অসীম দৈব শক্তি সাহায্যে সাহিত্য-সংসারে অমিত্রাক্ষরময়ী কবিতা নিচয়ের 'আদি পিতা' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই গুণনিধান শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত উল্লিখিত দুইখানি কাব্য প্রচারিত হইয়াছে।

… … … …. …

দৈবশক্তির এমনি অনির্বচনীয় ক্ষমতা, যে, দত্তজ পতিপরায়ণা প্রমীলার অনন্য আশ্রয় বীর চূড়ামণি মেঘনাদকে যে সকল বীর লক্ষণে ভূষিত করিয়াছেন তাহাতে বাল্মীকির মতে তাহারে পরস্বাপহারী দুর্বৃত্ত রাক্ষসাধম বলিয়া তাহার অকাল মৃত্যুতে আহলাদিত হওয়া নৃশংসেরও কর্ম্ম নহে। মেঘনাদ যে সকল সদ্‌গুণে ভূষিত, দুর্বৃত্ত রাবণের পুত্রত্ব স্বীকার করাও তাহার অনুচিত। তিনি সসাগরা ধরণীমন্ডলীর অধীশ্বর হইলেই শোভা পাইতেন। হায়! পতিপরায়ণা প্রমীলা তাঁহার বিরহভার কিরূপে বহন করিবে!…

'যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরু রাজে।
দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উহারে।
আর কি কহিবে দাসী? অন্তর্যামী তুমি।
তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর রাখিবে?

বাঙ্গালী সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।"

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এই সব প্রবন্ধ ছাড়াও ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর পর বহু বছর ধরে কখনো কালীপ্রসন্নের বাড়ীতে এবং 'কখনো ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে'

যে সাম্বৎসরিক স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতেও কালীপ্রসন্ন অনেকগুলি প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৩] এই সভায় যে সব প্রবন্ধপাঠ হত সেগুলি সাধারণতঃ ইংরেজী ভাষাতেই রচিত হত। অক্ষয়কুমার দত্ত এই সভায় সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় লেখা প্রবন্ধ পাঠ ক'রে কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রশংসা লাভ করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহও এই সভায় যে সব বাংলা প্রবন্ধ পাঠ ক'রে প্রশংসালাভ করেন নীচে তার তালিকা দেওয়া হল ঃ—

১ জুন ১৮৫৬,	১৪ শ	সাম্বৎসরিক সভা	প্রবন্ধ।
১ জুন ১৮৫৭,	১৫ শ	,,	বঙ্গভাষার অনুশীলন সম্বন্ধে প্রবন্ধ।
১ জুন ১৮৫৯,	১৭ শ	,,	বাংলা নাটক।
২ জুন ১৮৬১,	১৯ শ	,,	প্রবন্ধ।
১ জুন ১৮৬৩,	২১ শ	,,	কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ।

এই প্রবন্ধগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য। তবে ১লা জুন ১৮৬৩ তারিখের কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ সম্বন্ধে ঐ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নলিখিত তথ্যটি পাওয়া যায় ঃ—বিবিধ সংবাদ। ১৬ জ্যৈষ্ঠ।— ১লা জুন সোমবার শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে মৃত মহাত্মা ডেবিড হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বৎসরিক সমাজে বঙ্গদেশীয় কৃষিকার্য্যের বর্ত্তমান অবস্থার সমালোচন, কৃষিকার্য্যের উপযোগিতা, কৃষি সমাজ ও কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা এবং কৃষিজাত দ্রব্য ও কৃষিসাধন অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রদর্শনের মহোপকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।—'সোমপ্রকাশ', ১ জুন ১৮৬৩।

বিভিন্ন সময়ে পঠিত ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু অনুসরণ করলে দেখা যাবে, কালীপ্রসন্ন সাহিত্য, সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করে বিবিধ নাতিদীর্ঘ, প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এইসব প্রবন্ধের মুখ্য লক্ষ্য ছিল জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় জীবনধারার উন্নতি ও পরিপোষণ। কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধ রচনার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর ভাষা। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' খাটি চলিত ভাষায় লিখিত হলেও কালীপ্রসন্ন প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে গুরুগম্ভীর সাধুভাষাই ব্যবহার করেছেন এবং সেই সাধুভাষার শব্দবিন্যাস ও ছন্দ-প্রবাহে বিদ্যাসাগরীয় প্রাঞ্জলতা এবং সাবলীলতার আদর্শই বিশেষভাবে অনুসৃত হয়েছে।

কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধ পঞ্জী।

প্রকাশকাল	বিষয়	সভায় পঠিত/পত্রিকায় প্রকাশিত/পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।
১৮৫৫ (এপ্রিল)	সভ্যতার বিষয়।	বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা।
,, ,,	চাঞ্চল্য।	,,
১৮৫৫ (মে)	বাল্যবিবাহ।	,,
,, ,,	কৌলীন্য।	,,
,, ,,	বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা।	,,
১৮৫৫ (আগষ্ট)	বাণিজ্য বিষয়ে কি কি উপকার।	বিদ্যোৎসাহিনী সভায় পঠিত।
১৮৫৬ (মার্চ)	বঙ্গদেশের কুরীতি।	,,
১৮৫৬ (জুন)	প্রবন্ধ।	ডেভিড হেয়ার স্মৃতিসভায় পঠিত।
১৮৫৭ (জুন)	বঙ্গভাষার অনুশীলন সম্বন্ধে প্রবন্ধ।	,,
১৮৫৭ (নভেম্বর)	নূতন গ্রন্থের সমালোচন।	বিবিধার্থ সংগ্রহ (রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত)।
১৮৫৯ (জুন)	বাংলা নাটক।	ডেভিড হেয়ার স্মৃতিসভায় পঠিত।
১৮৬১ (জুন)	প্রবন্ধ।	,,
,, ,,	'নীলদর্পণ' নাটক, 'হাতেম তাই'র অনুবাদ, 'গীতগোবিন্দে'র অনুবাদ, 'জীবরহস্য' দ্বিতীয় ভাগ এবং 'মেঘনাদবধ' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সমালোচনা।	বিবিধার্থ-সংগ্রহ (কালীপ্রসন্ন সম্পাদিত)।
,, ,,	হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশচন্দ্র মখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন।	প্রবন্ধ পুস্তিকা।
১৮৬৩ (জুন)	কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ।	ডেভিড হেয়ার স্মৃতিসভায় পঠিত।

১। শিবনাথ শাস্ত্রী: রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নিউ এজ সং ১৩৬২) পৃ. ১৯৬-৭।

২। মন্মথনাথ ঘোষ: মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৩২২) পৃ. ৩১

৩। Peary Chand Mittra: A Biographical Sketch of David Hare (1817) PP. 94, 99, 101-02.

দশম অধ্যায়

সাময়িক পত্র ও দৈনিক পত্র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় বাংলা গদ্যপুস্তক প্রণয়নে এবং সাময়িক পত্রের প্রতিষ্ঠায়। এই সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে সমাচার দর্পণ, সংবাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা, তত্ত্ববোধিনী, সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতিকয়েকখানি আবার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। কিন্তু ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সমাচার দর্পণ বিলুপ্ত হওয়ার প্রায় কুড়ি বছর পূর্বে সংবাদ কৌমুদী বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সমাচার চন্দ্রিকা-সম্পাদক ভবানীচরণের মৃত্যু হয়েছে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, ঈশ্বরগুপ্ত ও গৌরীশংকর ভট্টাচার্য ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেছেন, আর অক্ষয়কুমার জীবিত থাকলেও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দেই তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনা ছেড়েছেন। সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ ভাস্কর, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় অবশ্য তখনও টি‍ঁকে ছিল, কিন্তু তাদেরও আর সেই পূর্ব-গৌরব বজায় ছিল না। স্বভাবতঃই বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তখন দেখা দিয়েছে এক শূন্যতাবোধ।

এই পরিপ্রেক্ষিতের কথা মনে রেখেই কালীপ্রসন্নের সাময়িকপত্র ও দৈনিকপত্র সম্পাদনা সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমরা দেখি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন তাঁর বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র স্বরূপ 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী নাটকে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "প্রশংসিত বাবুর বয়ঃক্রম ১৭ বৎসরের অধিক হইবেক না। ঐ কালে বালকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে; গ্রন্থরচনায় কেহই পারগ বা উদ্যত হয় না; কিন্তু উল্লিখিত বাবু ঐ কাল মধ্যে নানা গ্রন্থ, সাময়িক পত্র ও বক্তৃতা রচনা করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকট প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন।" মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' গ্রন্থে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করে পাদটীকায় লিখেছেন, "কিন্তু কালীপ্রসন্ন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোন্ সাময়িক পত্র সম্পাদন করিতেন, তাহা জানিতে

পারি নাই।"[১] কিন্তু এখন ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' পত্রিকার সন্ধান পাওয়ায় দেখা গেল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মন্তব্যে কোন ভুল নেই।

যাই হোক্, প্রথমে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র পরিচয় দেওয়া যাক্। (এই পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যা সর্বপ্রথম ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তগত হওয়ায় তিনি ঐ পত্রিকার ঐ দুই সংখ্যার কয়েকটি প্রবন্ধ ১৩৪৩ সালের ৩য় সংখ্যা 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় পুনর্মুদ্রিত করেন।) 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার মলাটের অনুলিপি হল ঃ—

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা।
মাসিক প্রকাশ্য।
শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ দ্বারা বিরচিত।
বাঙ্গাল সুপিরিয়র যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই সংখ্যার বিজ্ঞাপনে কালীপ্রসন্ন লিখেছিলেন :—

"যদিও আমার তাদৃশ বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তথাপি বিদ্যাবন্ত ব্যক্তিব্যূহের উৎসাহে এই কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। এই পত্রিকা যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি যোড়াসাঁকোস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভার কার্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইহার মূল্য /. এক আনা মাত্র।

যোড়াসাঁকোস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভা
১৭৭৭ শক, ৮ বৈশাখ, ১২৬২ সাল } শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ,
সম্পাদক।"

তাছাড়া এই বিজ্ঞাপনে একথাও ঘোষিত হয়—"সভ্যমাত্রেই বিনামূল্যে একখণ্ড করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।"

১২৬২ সালের ৮ই বৈশাখ (এপ্রিল, ১৮৫৫) থেকে কালীপ্রসন্ন যখন এই বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। পত্রিকাটিতে কালীপ্রসন্নের রচিত প্রবন্ধাবলী বিশেষতঃ যে সব প্রবন্ধ তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় পাঠ করতেন, সেগুলি মুদ্রিত হত। পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যায় ১০ পৃষ্ঠা পরিমাণ লেখা থাকত।

প্রথম দুই সংখ্যায় লেখার সূচী এইরূপ —

১ম সংখ্যা ঃ সভ্যতার বিষয়, চাঞ্চল্য (ক্রমশঃ প্রকাশ্য), বিজ্ঞাপন।

২য় সংখ্যা ঃ বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য, চাঞ্চল্য, বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা।

এই সকল প্রবন্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহের স্বরচিত। এগুলি সম্বন্ধে 'প্রাবন্ধিক কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করেছি।

এই পত্রিকাটি যে অন্ততঃ বৎসরাধিক কাল জীবিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই; কারণ ২৮শে মে ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ১২৬৩ সালের "জ্যৈষ্ঠ মাসীয় বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধটি" উদ্ধৃত হয়েছে। আবার এই পত্রিকাটি কলকাতার বাহিরেও বিভিন্ন জেলার বহু গ্রাহকের কাছে যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, সে তথ্য জানতে পাই 'সমাচার সুধাবর্ষণ' (১৬-১৭ আগষ্ট, ১৮৫৫) পত্রিকায় প্রকাশিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার একটি অধিবেশন সম্বন্ধে একজন পত্রলেখকের পত্রে:

"...কানপুর দিনাজপুর বগুড়া বালেশ্বরাদি নানা স্থানীয় গুণগ্রাহক গ্রাহক মহাশয়েরা বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা গ্রহণার্থ পত্র লিখিয়াছেন। শ্রী যুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ঐ সকল পত্র পাঠ করিয়া মূল প্রস্তাব অর্থাৎ বাণিজ্য বিষয়ে কি ২ উপকার, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ ব্যক্ত করিলেন...।"

সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র পর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই (?) মাসে কালীপ্রসন্ন 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' নামে আর একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। পরবর্তী ৬ই আগষ্ট (২৩শে শ্রাবণ ১২৬৩) তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' লেখেন ঃ

"সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' অর্থাৎ প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, ভূগোল বিদ্যা ও শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিক পত্রিকা। ইত্যভিধেয় একখানি নূতন পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি, পত্রিকা প্রকাশক বা প্রকাশকগণ যে যে বিষয় লিখিয়াছেন তাহার প্রায় সমুদায়াংশকেই উত্তম বলিতে হইবেক, যেহেতু তাহাতে সুসাধু সরল বঙ্গভাষায় অতি পরিষ্কাররূপে অভিপ্রায় সকল ব্যক্ত হওয়াতে ঐ পত্রিকা সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী হইয়াছে, বিশেষতঃ 'কুতর্ক দমন' নামক প্রথম প্রস্তাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে....।"

বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক কালীপ্রসন্নই যে 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' প্রকাশ করেছিলেন, 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা' পত্রিকার নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে তা জানা যায়ঃ—

সমাচার।··· বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ('বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা' ১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা, ১২৬৩)। ২৩শে আগস্ট ১৮৫৬ তারিখের 'সংবাদ ভাস্করে' 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' সম্বন্ধে আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পাওয়া যায় ঃ—

"আমরা প্রথম সংখ্যা দৃষ্টে সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকার কিঞ্চিৎ গুণানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ভাস্করে ঐ পত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইতেছে ইহাতেই নগর বাহির সর্ব্বত্র হইতে গ্রাহক মহাশয়েরা আমারদিগের নিকট পত্র পাঠাইতেছেন (।) আমরা পত্রসকল প্রাপ্তিমাত্র শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেই (।) সিংহবাবুর অমনোযোগ বা অন্য কারণ যাহাই হউক নিয়মিতরূপ গ্রাহকদিগের সমীপে সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা যায় না, ইহাতে গ্রাহকেরা বারম্বার পত্র লিখিয়া আমারদিগকে উত্তেজনা করিতেছেন (।)····· সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা এই প্রস্তাব স্মরণ রাখুন, যাঁহার অভিলাষ হয় পত্র দ্বারা সিংহবাবুকে জানাইবেন, কলিকাতা নগরীর যোড়াসাঁকো স্থানে তাঁহার নিবাসভবন, তিনি অপ্রসিদ্ধ মনুষ্য নহেন মহাধনী অতি প্রধান বংশ।

আমারদিগের নিকট আর কেহ পত্র পাঠাইবেন না, যদি পাঠান তবে ফলে বঞ্চিত হইবেন।"

এই সংবাদ পাঠে স্বভাবতঃই মনে হয়, 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' মফঃস্বলের অনেক গ্রাহকের কাছে নিয়মিতভাবে পেঁছাতে পারে নি এবং সেজন্য 'সংবাদ ভাস্কর' ঐ সব গ্রাহকদের সোজাসুজি কালীপ্রসন্ন সিংহের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। পত্রিকাটির এই অনিয়মিত প্রচার বা অনিয়মিত বিতরণই কি তবে পত্রিকাটির বিলোপ-সম্ভাবনার কারণ হয়ে উঠেছিল? অবশ্য পত্রিকার বিলোপ সম্বন্ধে এটা আজ অনুমান সাপেক্ষ বিষয়; তবে পত্রিকাটির গুণগত উৎকর্ষ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় যখন দেখি সমকালীন পত্রিকাগুলির সঙ্গে একটি নূতন পত্রিকার প্রতিযোগিতার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও 'সংবাদ প্রভাকরে' লেখা হয়, "তাহার প্রায় সমুদায়াংশকেই উত্তম বলিতে হইবেক," এবং 'সংবাদ ভাস্করে' লেখা হয়, "আমরা প্রথম সংখ্যা দৃষ্টে সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকার

কিঞ্চিৎ গদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম।" মন্তব্য দুটিতে শুধু 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' পত্রিকার উন্নত মান নয়, 'সংবাদ প্রভাকর' এবং 'সংবাদ ভাস্করে'রও সাংবাদিক সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবিধার্থ-সংগ্রহ।

'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা'র পর আমরা কালীপ্রসন্নকে আর একখানি যে মাসিক পত্র সম্পাদন করতে দেখি, তা হল 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'। ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই পত্রিকার প্রথম ছয় পর্ব সম্পাদন করেন। বিলাতী 'পেনি ম্যাগাজিনে'র আদর্শে এই 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'ই প্রকৃতপক্ষে বাংলায় প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। শৈশবে রবীন্দ্রনাথকেও যে এই পত্রিকাটি মুগ্ধ করেছিল, সে সম্বন্ধে 'জীবন-স্মৃতি'তে এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়:

"রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক পত্র বাহির করিতেন। তাহারি বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুসি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড় চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের উপর চীৎ হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।

এই ধরণের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন?... সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না। বিলাতে চেম্বার্স জার্নাল, কাস্‌লস্‌ ম্যাগাজিন, স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন প্রভৃতি অধিক সংখ্যক পত্রই সর্বসাধারণের সেবায় নিযুক্ত। তাহারা জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সমস্ত দেশকে নিয়মিত মোটা ভাত মোটা কাপড় জোগাইতেছে। এই মোটা ভাত মোটা কাপড়ই বেশির ভাগ লোকের বেশি মাত্রায় কাজে লাগে।"

১৭৭৩ শকের কার্তিক থেকে ১৭৮১ শকের চৈত্র পর্যন্ত কিছুটা অনিয়মিত ভাবে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র ছয় পর্ব প্রকাশিত হওয়ার পর রাজেন্দ্রলাল মিত্র অবসরাভাবে সম্পাদক-পদ পরিত্যাগ করায় জনসাধারণের উপযোগী এরূপ একখানি কাগজ বিলুপ্ত হওয়া অনুচিত বিবেচনায় বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের অনুরোধে কালীপ্রসন্ন 'বিবিধার্থে'র সম্পাদক-পদ গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রে লেখা হয়:—

The Bibidhartto Sangraha, a Bengalee illustrated monthly periodical was stopped for some time···, has been revived under the auspices of Babu Kally Prosonno Sing of Jorasanko. This paper is one of the best of its kind and was at first edited by Babu Rajendralal Mitra.... We trust it will maintain the reputation under the management of Babu Kali Prosonno Sing.—The Indian Field, July 6, 1861.

'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে'রও মাসাধিক কাল পূর্বে ২৭শে মে ১৮৬১ (১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১২৬৮) তারিখে সোমপ্রকাশ' পত্রেও নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয় ঃ

বিজ্ঞাপন।—ইংলণ্ডীয় বিচিত্র চিত্রযুক্ত পুরাবৃত্ত ইতিহাস শিল্পসাহিত্যাদি-দ্যোতক বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্র এতাবৎকাল গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে অনুবাদক সমাজের অধীনে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে বর্তমান সন শাল হইতে অনুবাদক সমাজ তৎপত্রের সম্পাদকীয় ভার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়কে অর্পণ করিয়াছেন।······

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।
বিবিধার্থ সংগ্রহের সহকারী সম্পাদক

এই 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র প্রথম ছয় পর্ব রাজেন্দ্রলাল সম্পাদন করার পর ৭ম পর্ব (১৭৮৩ শক, বৈশাখ-অগ্রহায়ণ) সম্পাদন করেন কালীপ্রসন্ন। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র ৭ম পর্বের আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ছ'টি সংখ্যায় ১৭৮৩ শক মুদ্রিত থাকলেও তৎপূর্ববর্তী বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ১৭৮৩ শকের স্থলে যে ভুলক্রমে "১৭৮২ শক" মুদ্রিত হয়েছে, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাইর 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে'র সংবাদ এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মের 'সোমপ্রকাশে'র বিজ্ঞাপন থেকে পাওয়া তারিখের দ্বারা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় (১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মে বা জুলাই হিসাব মত ১৭৮২ শক হয় না, ১৭৮৩ শক হয়)। কিন্তু পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যায় এই মুদ্রণ প্রমাদ সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর 'Memories of Kali Prosunno Singh' গ্রন্থে লিখেছেন, "Kali Prosunno began to edit the Magazine from Baisakh, 1782 Saka, corresponding to April, 1860." তিনি তাঁর 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' গ্রন্থেও এই একই ভুল করে লিখেছিলেন,

"কালীপ্রসন্ন ১৭৮২ শকাব্দের বৈশাখ মাস হইতে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন।" অবশ্য মন্মথনাথ তাঁর এই উক্তির পরেই স্বীকার করেছেন, "কতদিন তিনি (কালীপ্রসন্ন) উক্ত পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, আমরা তাহা অবগত হইতে পারি নাই। তাঁহার সম্পাদিত সমস্ত সংখ্যাগুলি আমাদের হস্তগত হয় নাই।" মনে হয়, 'সমস্ত সংখ্যাগুলি হস্তগত' না হওয়ায় এবং সমসাময়িক সংবাদপত্রের সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের তারিখের উপর মনোযোগ না দেওয়ায় 'বিবিধার্থ' ৭ম পর্বের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শকাব্দের মুদ্রণ প্রমাদ মন্মথনাথের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি। পরবর্তীকালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র ১ম খণ্ডে অবশ্য এই মুদ্রণ প্রমাদের কথা উল্লেখ করেছেন।

যাই হোক্, 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র ৭ম পর্ব বা শেষ পর্বের সংখ্যাগুলি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হলেও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে 'বিদ্যাসাগর সংগ্রহে'র মধ্যে ৭ম পর্বের বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যাই সংরক্ষিত আছে।

কালীপ্রসন্ন সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেই বিবিধার্থ সংগ্রহ' ৭ম পর্বের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৭৮৩ শক) যে ভূমিকা' লিখেছিলেন তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি :

"১৭৭৬ শকে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং তদবধি ক্রমাগত ছয় বৎসর যথানিয়মে উদিত হইয়া আসিতেছে।[২] কেবল মধ্যে কিয়ৎকাল বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হওয়ায় তাহার অন্যথা হইয়াছিল। বিধিমত প্রকারে বাঙ্গালি ভাষার উন্নতিসাধন ও পুরাবৃত্ত, ভূগোল, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, প্রাণীবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও শিল্পসাহিত্যাদি অপরাপর বিবিধ প্রকার বিদ্যার শিক্ষা প্রদান করাই বিবিধার্থ-সংগ্রহের মুখ্য উদ্দেশ্য; ....বিবিধার্থ কি বিদ্যাবতী রমণীকুল[৩] কি তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত সমাজ, সর্ব্বত্রই তুল্য সম্মানে পরিগৃহীত হইয়াছে; এমন কি বর্ণপরিচয়বিহীন বালকগণও শুদ্ধ চিত্র দর্শনাভিলাষে বিবিধার্থের প্রকাশকাল প্রতীক্ষা করিয়াছে।...বিবিধার্থ এতাবৎকাল যাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রযত্নে পূর্ব্বোল্লিখিত বহুতর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর আন্দোলনে পাঠকবর্গের স্নেহভাজন হইয়াছে—যিনি বাঙ্গালি ভাষারে বিবিধ তত্ত্বালঙ্কারে

অলংকৃত করিয়া স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন— এক্ষণে তিনি এতৎপত্রের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করায় বিবিধার্থ বিলক্ষণ ক্ষতিস্বীকার করিয়াছে। জন্মদাতা হইতে স্বতন্ত্রিত ও সহসা অপরিচিত হস্তে নাস্ত হওয়াতে অনেকে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন; বিশেষত শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পরিবর্ত্তে তৎপদে অপর ব্যক্তির সুশৃঙ্খলে কার্য্য নির্ব্বাহ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। বিবিধার্থ যে প্রকার পত্র, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন; অনুবাদক-সমাজ বিবিধার্থ সহৃদয়-সমাজের স্নেহভাজন ও পাঠকমণ্ডলীর নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে জানিয়াই অগত্যা আমারে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; কিন্তু বিবিধার্থ-সম্পাদন-পদ স্বীকার করিয়া আমি অসমসাহসিকতার কার্য্য করিয়াছি। সাহিত্য-সংসারে আমার নাম অশ্রুত-পূর্ব্ব; সুতরাং এতাদৃশ অসদৃশ গুরুভার মাদৃশ জন দ্বারা অব্যাঘাতে নির্ব্বাহিত হইবে এমত আশা করা যায় না; কেবল ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, ভরসা আছে, আমি সাবধানে সেই পথে তাঁহার অনুসরণ করিলে ক্রমে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইব। সচ্ছিদ্র মণি খণ্ডে সূত্র প্রবেশনের ন্যায় আমার পক্ষে অসুলভ হইবে না। এক্ষণে যে সকল সরল হৃদয় মহাত্মারা প্রথমাবধি বিবিধার্থের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণেও যেন তাহার ন্যূন না করেন।....

শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ।
বিবিধার্থ সংগ্রহ সম্পাদক।"

'বিবিধার্থ যে প্রকার পত্র, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন' ইত্যাদি বাক্যবন্ধে যেমন সুপ্রযুক্ত অনুপ্রাস প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি 'ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন' এবং 'সচ্ছিদ্র মণিখণ্ডে সূত্র প্রবেশনের ন্যায় আমার পক্ষে অসুলভ হইবে না' ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছে কালীপ্রসন্নের বিনয়ের সঙ্গে সম্পাদকীয় দায়িত্ববোধ।

'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ৭ম পর্বের প্রতি সংখ্যার শিরোদেশে এই কথাগুলি লেখা আছে:

বিবিধার্থ-সংগ্রহ

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

কালীপ্রসন্ন সম্পাদিত এই 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' মাসিক পত্রের ৭ম পর্বের বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত বিষয়সূচী হল এইরূপ:

বৈশাখ ঃ মেডাগাস্‌কর দ্বীপ। খাদ্য কি? দিল্লীর মানমন্দির। পশুজাতির বুদ্ধিশক্তি।

জ্যৈষ্ঠ ঃ শিশির, কোয়াসা, তুষার ও মেঘ। ইজিপ্ট রাজ্য। কালিঞ্জর।

আষাঢ় ঃ ধূমকেতু। ইজিপ্ট দেশের বিবরণ। নূতন পুস্তক ও পত্রের সমালোচন ('নীলদর্পণ' নাটক, 'হাতেম তাই'র অনুবাদ, 'গীত গোবিন্দে'র অনুবাদ 'জীবরহস্য' দ্বিতীয়ভাগ' 'মেঘনাদবধ' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সমালোচনা এবং 'ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র', 'সংবাদ সজ্জনরঞ্জন' ও 'পরিদর্শক' পত্রের সমালোচনা)।

শ্রাবণ ঃ চীনদেশীয় লোকদিগের বৃত্তান্ত। ওয়াশিংটনের জীবন বৃত্তান্ত। কন্দর্পদর্পচূর্ণ (প্রথমসর্গ)।

ভাদ্র ঃ মহারাণী এলিজাবেথ। প্রতিভা। কন্দর্পদর্পচূর্ণ (২য় ও ৩য় সর্গ)। কুলিজাতির বিবরণ। অলংকার (অনুপ্রাস, যমক, উপমা, সন্দেহ, রূপক, ভ্রান্তিমান, ব্যাজস্তুতি ও উৎপ্রেক্ষা অলংকারের উদাহরণ সহ আলোচনা)।

আশ্বিন ঃ টিকটিকি। জীবতত্ত্বদর্শন। ব্যবসায় বিশেষে শরীরের অবস্থা। জীবরাজ্যদর্শন। অলংকার (প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা, প্রতিবস্তূপমা স্মরণ, অতিশয়োক্তি, দৃষ্টান্ত, উল্লেখ, অর্থান্তরন্যাস ও দীপক অলংকারের উদাহরণ সহ আলোচনা)। কংসবিনাশ কাব্যের সমালোচন।

কার্তিক ঃ মস্কো। জোয়ানের জীবনবৃত্তান্ত। ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন। অলংকার (অপহ্নুতি, ব্যতিরেক, বিশেষোক্তি, বিভাবনা, অপ্রস্তুত প্রশংসা, পরিণাম ও তুল্যযোগিতা অলংকারের উদাহরণ সহ আলোচনা)। 'আলজিরিয়া'। 'রামবনবাস' গদ্যকাব্যের সমালোচন।

অগ্রহায়ণ ঃ চতুর্থ এডওয়ার্ড। মহারাণী এলিজাবেথ। ড্রুস জাতির বিবরণ। তত্ত্বদর্শন (কৌতূহল, সুখ দুঃখ ইত্যাদি)। অলংকার (স্বভাবোক্তি, বিচিত্র, সমা, সমাসোক্তি ও বিষম অলংকারের উদাহরণ সহ আলোচনা)। ভ্রাতৃদ্বয়ের বুদ্ধিশক্তি।

বিষয়সূচীর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে যেভাবে আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছিল, তাতে সেকালে একমাত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ই ছিল 'বিবিধার্থ-

সংগ্রহে'র সমকক্ষ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থের ঐতিহ্য কালীপ্রসন্নের সম্পাদনায় শুধু যে অক্ষুন্ন ছিল তাই নয়, পূর্বের অনিয়মিত প্রকাশও কালীপ্রসন্নের সম্পাদনায় নিয়মিত হয়ে উঠেছিল। এখানে বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য কালীপ্রসন্ন সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ৭ম পর্বের রচনার কিছু নমুনা উদ্ধার করি :

'বিবিধার্থ' ৭ম পর্ব, বৈশাখ সংখ্যা :

খাদ্য কি ?

...কথিত আছে যে, দক্ষিণ আমেরিকার ওটোমাক্ জাতীয়েরা তাহাদের দেশে বার্ষিক বন্যা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি অর্দ্ধ সের পরিমাণে এক প্রকার কর্দ্দম ভক্ষণ করিয়া দিন যাপন করে। অনেক লোক এ আখ্যানে আস্থা না করিলেও না করিতে পারেন, কিন্তু ভুবনবিখ্যাত তত্ত্ববিদ্যাবিৎ হোম্বোলড্ট্ সাহেব ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। উদ্ভিদ বিদ্যাবিৎ মার্শিয়স্ সাহেব কহেন যে, আমাজন জাতীয়েরা অন্য খাদ্য সত্ত্বেও প্রচুর পরিমাণে এক প্রকার শ্বেতমৃত্তিকা ভক্ষণ করে। মোলিনা সাহেব লিখেন যে, বোলিবিয়ার হট্টে এক প্রকার সুগন্ধি মৃত্তিকা বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহা পিরুবীয়দিগের অতীব প্রিয় খাদ্য। হরেনবর্গ সাহেব ঐ মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া নিরূপিত করিয়াছেন যে তাহা অভ্র ও মৃত্তিকার মিশ্র পদার্থ। গোয়ানা প্রদেশের লোকে গোধুমের সহিত মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া রোটিকা প্রস্তুত করে। জেমেয়িকা দ্বীপে কাফরিরা অন্য খাদ্যের অভাবে মৃত্তিকা সেবনে অনুরক্ত হয়, এবং সিবিরিয়া, কামস্কাট্কা, নূতন কালিডোনিয়া প্রভৃতি দেশেও মৃত্তিকা ভক্ষণের প্রচুর প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে ; তাহার তুলনায় বঙ্গাঙ্গনাদিগের 'পাতখোলার' উল্লেখ করাই বাহুল্য। এই সকল দৃষ্টান্তে মৃত্তিকা বা কর্দ্দমকে খাদ্য বলিলে পাঠকবৃন্দ লেখকের প্রতি শিবাঘৃত ও মকরধ্বজের বিধান করিতে পারেন, অথচ তাহা শরীর পোষণের নিমিত্ত ভুক্ত হইতেছে, এবং সুখাদ্য বলিয়া বহু জনপদে বিক্রীত হইতেছে। পরন্তু আমরা এ কর্দ্দম পরিত্যাগ করিয়া অন্য দ্রব্যের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিলেও দেশভেদে নানা বিভিন্নতা উপলব্ধি করি। ভারতবর্ষে অন্নই প্রধান, এবং তন্নিমিত্ত বেদে খাদ্যমাত্রকে অন্ন শব্দে বিধান করে।... তদ্দৃষ্টে শস্যকেই খাদ্য বলি ? কিন্তু তাহাও নহে। দেখুন দক্ষিণ আমেরিকার পাম্পাস্ প্রদেশে তত্রত্য শিকারীরা কেবলমাত্র মহিষমাংসে জীবনধারণ করে। কদাপি উদ্ভিজ্জের সেবনে অনুরক্ত নহে। গ্রীণলণ্ড দেশে তিমির তৈলই প্রধান খাদ্য, এবং মৎস্য তাহার উপাদান।...সুবিখ্যাত গ্রীকজাতীয়েরা গর্দ্দভ মাংস অতি সুস্বাদু জ্ঞান

করিতেন, অপিতু কুক্কুর মাংস ভোজের প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাঁহাদের নিকট নির্ণীত হইত। এতদ্দৃষ্টে খাদ্যকে উদ্ভিজ্জ ও জীবজ এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলে লবণের দশা কি করা যায়? তাহার অভাবে আমাদিগের খাদ্য কোথায়? এই ভারতবর্ষে পাঁচ কোটি টাকার লবণ প্রতি বৎসর ভুক্ত হইয়া থাকে। দন্তের আবরণ ভিন্ন দেহের সকল ধাতুতে লবণ বর্ত্তমান আছে,...শোণিতের স্থূল পদার্থের শতাংশের ৭৫ অংশ লবণ।... পুরাকালে এক প্রকার দণ্ডবিধান হইত; তাহাতে অপরাধীর প্রতি লবণ খাইবার নিষেধ ছিল। বিনা লবণে প্রচুর আহার করিলেও তাহারা অত্যন্ত কদর্য্য গলিত রোগে প্রপীড়িত হইয়া, অনাহারে যে প্রকারে মৃত্যু হয়, তদ্রূপ নিহত হইত; ফলত প্রচুর আহার সত্ত্বেও লবণাভাবে তাহাদিগের দেহের পুষ্টি হইত না।...

ভাদ্র সংখ্যা:

প্রতিভা।

কেহ কেহ কহেন 'প্রতিভা অথবা ঐশিক শক্তি কেবল কবিগণের কপোল কল্পিত কথা মাত্র। যত্ন দ্বারা সকলে সকল বিষয়েই পটুতা লাভ করিতে পারে।' আমরাও স্বীকার করিতেছি যে, সকল বিষয়েই যত্নজনিত পারগতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তুল্যরূপ নহে। কোনজন যেরূপ যোদ্ধা, সেইরূপ উত্তম গায়ক, তুল্যরূপ কবি, অথচ তদ্রূপ জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ, বোধ করি এরূপ ব্যক্তি কখনই কাহারও নেত্রপথে পতিত হয়েন নাই। যত্ন দ্বারা সকল বিষয়ে তুল্য নৈপুণ্য লাভ করা দূরে থাকুক, এরূপ দেখা গিয়াছে যে, শিক্ষক দ্বারা তাড়িত হইয়া সাতিশয় যত্নে বিদ্যালয়ে গণিত শাস্ত্রের অত্যন্ত সরলাংশ যে বালকের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, সে নিজালয়ে সুমধুর কবিতাচয় অনায়াসে রচনা করিয়াছে। এতদ্বারা প্রতিভার অস্তিত্ব ও বিদ্যাবিশেষের প্রতি তাহার আসক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।... প্রতিভা যদিও ঈশ্বরদত্ত তথাচ উপযোগিনী বিদ্যায় পরিচালিত না হইলে কখনই প্রকাশ পায় না, 'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ' প্রচ্ছন্নভাবেই থাকে।...

অগ্রহায়ণ সংখ্যা:

রাজবন্দী।

পূর্ব্বকালে কালিপ মোস্তাদি নামক একজন সম্রাট বোগদাদ নগরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রধান অমাত্যের নাম মালেক, তিনি যুদ্ধে গ্রীশ সেনাগণকে জয় করিয়া গ্রীশাধিপতিকে বন্দী করেন। গ্রীশাধিপতি বন্দী

হইয়া উক্ত অমাত্যের শিবিরে নীত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি বিজয়ী ব্যক্তির নিকট হইতে কিরূপ ব্যবহার প্রার্থনা করেন? ইহাতে গ্রীশাধিপতি উত্তর করিলেন, মহাশয়! যদি আপনি রাজা হয়েন, তবে আমারে পুনরায় স্বদেশে পাঠাইয়া দিউন, যদি আপনি বাণিজ্যোপজীবী হয়েন, তবে নিষ্ক্রয় লইয়া আমারে নিষ্কৃতি প্রদান করুন, অথবা যদি আপনি কসাই হয়েন, তবে আমার কন্ঠ ছেদন করুন, অমাত্য মালেক গ্রীশাধিপতির এইরূপ বাক্‌চাতুরী শ্রবণে নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে বিনা নিষ্ক্রয়ে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন।

[এখানে দিগ্‌বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের সঙ্গে পাঞ্জাবের বীর রাজা পুরুর সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গটি আমাদের মনে পড়ে।৪]

কালীপ্রসন্ন 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' অনেক সদ্যপ্রকাশিত নূতন গ্রন্থেরও সমালোচনা করেন। এগুলির মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' ও 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের সমালোচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাক্‌ বঙ্কিম যুগে বাংলা সাহিত্যে নূতন গ্রন্থ সমালোচনার আদর্শ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্নের 'বিবিধার্থ' ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র অগ্রজ পত্র। আবার এই সব গ্রন্থ-সমালোচনা ছাড়াও বিবিধার্থে 'ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র' নামে রাজনীতি সংক্রান্ত একটি পাক্ষিক পত্র এবং সংবাদ সজ্জনরঞ্জন' ও 'পরিদর্শকে'র মত সমকালীন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রেরও রুচিসম্মত এবং গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন কালীপ্রসন্ন।

কিন্তু 'বিবিধার্থ সংগ্রহের'র নিয়মিত প্রকাশ এবং উন্নতি সম্বন্ধে এত সব চেষ্টা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ৭ম পর্বের মাত্র বৈশাখ- অগ্রহায়ণ সংখ্যা সম্পাদন করেই কালীপ্রসন্ন অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। 'নীলদর্পণ' নাটক ইংরেজীতে প্রচার করার অভিযোগে পাদরী লঙ্‌ ২৪শে জুলাই ১৮৬১ তারিখে আদালতে দণ্ডিত হবার পর কালীপ্রসন্ন গবর্ণমেন্টের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' (আষাঢ়, ১৭৮৩ শক) 'নীলদর্পণে'র বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশ করায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 'বিবিধার্থ'র প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং পত্রিকাটির অকালমৃত্যু ঘটে। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৬৯ তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র অবলুপ্তি সম্বন্ধে এই সংবাদটুকু আছে ঃ

বিবিধার্থ সংগ্রহ নামে আর একখানি গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত সংবাদপত্র ছিল। কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় তাহার সম্পাদক

হইয়াছিলেন। সম্পাদক বাবু বিবিধার্থে নীলকরদিগের গ্লানি প্রকাশ করায় গবর্ণমেণ্ট যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন,—সেই সূত্রেই বিবিধার্থের বিনাশ হয়।

পরিদর্শক।

কালীপ্রসন্ন একখানি দৈনিক সংবাদপত্রেও কিছুদিন সম্পাদনা করেছিলেন। এই সংবাদ পত্রের নাম 'পরিদর্শক'। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের জুলাই (?) মাসে জগন্মোহন তর্কালংকার ও মদনমোহন গোস্বামীর সম্পাদকত্বে 'পরিদর্শক' প্রথম প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্ন বিবিধার্থ-সংগ্রহে' (১৭৮৩ শক, আষাঢ়) এই দৈনিক পত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :—

"পরিদর্শক। একখানি যথাবিহিত দৈনিকপত্রের নিমিত্ত আমরা বহু দিবসাবধি ক্ষুব্ধ ছিলাম; পরিদর্শক আমাদিগের সে মনোরথ পূর্ণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালি সমাজ পরিদর্শক হইতে যত উপকার লাভে সমর্থ হইবেন, সোমপ্রকাশের প্রকাশ পূর্ব্বে অন্যান্য বহুল সংবাদপত্র হইতে তাহা প্রত্যাশা করা যায় নাই। পরিদর্শকের এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনটন দেখা যায়। আমরা পরিদর্শক হইতে যতদূর প্রত্যাশা করি, তাহার ক্ষুদ্র কলেবর সে ভার সহনে অসমর্থ; তন্নিমিত্ত আমরা পরিদর্শক-সম্পাদকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সাধারণের উপকারার্থ কিন্তু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরিদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি করুন।"

কিন্তু কালীপ্রসন্নের প্রস্তাব মত 'সাধারণের উপকারার্থ কিছু ক্ষতি স্বীকার' করেও সংবাদপত্রটির উন্নতি চেষ্টা করা প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকদ্বয়ের সাধ্যের মধ্যে ছিল না। ফলে এই সংবাদপত্র সম্বন্ধে শুধু মন্তব্য করেই ক্ষান্ত না হয়ে সাধারণের উপকারের জন্য ক্ষতি স্বীকার করা যাঁর অভ্যাস সেই কালীপ্রসন্নই 'পরিদর্শকে'র অভাব দূর করার জন্য অগ্রসর হলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর (১লা অগ্রহায়ণ ১২৬৯) থেকে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং 'পরিদর্শকে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন; সঙ্গে সঙ্গে কালীপ্রসন্নের মূল প্রস্তাব অনুযায়ী 'পরিদর্শকে'র কলেবরও বৃদ্ধি পায়। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' গ্রন্থে এই সংবাদপত্র সম্বন্ধে এইরূপ তথ্য পাওয়া যায় :—

ঐ "বৎসরে ১২৬৭ সালে) 'পরিদর্শক' পত্র প্রচার হয়। পণ্ডিতবর জগন্মোহন তর্কালংকার ও মদন গোপাল গোস্বামী ইহার প্রথম সৃষ্টি করেন। ১২৬৯ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে মৃত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় উহার

সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে পরিদর্শক দীর্ঘ কলেবর ধারণ করে। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পত্রের সহকারী ছিলেন।"

সংবাদপত্রটির সম্পাদনা ও পরিচালনা ব্যাপারে এই নূতন ব্যবস্থায় আনন্দিত হয়ে 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর (১০ই অগ্রহায়ণ ১২৬৯) তারিখে 'পরিদর্শক' সম্বন্ধে লেখেন:

"পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত(ন?)ও কলেবর বৃদ্ধি।—এই অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনাবধি পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত্ত(ন?)ও কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এ দুটীই আমাদিগের আনন্দের হেতু হইয়াছে। পরিদর্শক দৈনিক পত্র। পাঠকগণ দৈনিক পত্র দ্বারা বহু বিষয় অবগত হইবার বাসনা করেন। কিন্তু এত দিন উহার যেরূপ ক্ষুদ্র অবয়ব ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন উহার আকার বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় উহাতে সমাবেশিত হইবে। দ্বিতীয় আহলাদের বিষয় এই. শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদকতাভার গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ও যত্ন আছে। তিনি লাভার্থী নহেন। পরিদর্শকের আয়ের ন্যূনতা দর্শন করিলে তিনি যে ভগ্নোৎসাহ হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই। বৃহদাকার পত্রের নিত্য কার্য্য সমাধান স্বল্পব্যয় সাধ্য নয়, জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার তৎসম্পাদন সামর্থ্যও আছে। আমরা প্রথমাবধি কয়েকখানি পরিদর্শক অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম। যে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, প্রায় তাহার সমুদয়গুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সম্বাদাদির বিষয়ে আমরা কিছু অপরিতৃপ্ত আছি। এবিষয়ে সাপ্তাহিক পত্রের ন্যায় পরিদর্শক যে পরোচ্ছিষ্টগ্রাহী হন, ইহা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। সম্পাদক মফস্বলে ও হাইকোর্ট প্রভৃতি স্থানে সম্বাদ সংগ্রহার্থ লোক নিয়োজিত করুন এই আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ।"

সম্ভবতঃ কালীপ্রসন্ন-সম্পাদিত এই দৈনিক সংবাদপত্রকে লক্ষ্য করেই কৃষ্ণদাস পাল লিখেছিলেন, "He also started a first class vernacular daily news paper, the like of which we have not yet seen."[৬]

এই নবপর্যায়ের 'পরিদর্শকে'র প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রস্তাবটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপে কালীপ্রসন্নের দায়িত্ববোধ এবং সাংবাদিকতা বিষয়ে বাস্তব সচেতনতা ও সুচিন্তিত অভিমতের সাক্ষ্য বহন করে। সেজন্য কালীপ্রসন্ন-সম্পাদিত 'পরিদর্শকের'র এই প্রথম প্রস্তাবটি একটু দীর্ঘ হলেও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।—

"অস্মদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক সংবাদপত্রের তাদৃশ সমাদর করেন না, অনেকে ইহার ফলোপধায়কতার বিষয়ও অবগত নহেন। যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সংবাদপত্র পাঠে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইংরাজী পত্রপাঠেই তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ঔৎসুক্য নিবৃত্তি হয়।....ফলতঃ ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম, কারণ বাঙ্গালিদিগের রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার সমুদায়ই ইংরাজ জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইংরাজেরা কোন বস্তু বা ব্যাপারকে নিতান্ত দূষণীয় অথবা আদরণীয় বিবেচনা করেন, হয়ত আমরা দেশও অবস্থাভেদে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বিবেচনা করিয়া থাকি। বিশেষতঃ অমুক জাহাজ অমুক স্থানে আসিয়াছে, অমুক দিন অমুক জাহাজ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিবে, ইংরাজী পত্রে এই সমস্ত পাঠ করিয়া ইংরাজের উপকার হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালির কি উপকার হইতে পারে? ফলতঃ বাঙ্গালা পত্রে বাঙ্গালির উপযোগী যত উত্তম বিষয় প্রকাশিত হয়, ইংরাজি পত্রে ততদূর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। ইংরাজেরা বাঙ্গালিদিগের ন্যায় বাঙ্গালার রীতিনীতি ও প্রকৃতি অবগত নহেন, সুতরাং দেশ হিতৈষী বাঙ্গালি সম্পাদক বাঙ্গালিদিগের মন যত শীঘ্র আবর্জ্জিত করিয়া সৎ পথে স্থাপিত করিতে পারেন, ইংরাজেরা তত শীঘ্র পারিয়া উঠেন না। বিশেষতঃ যে ভাষা সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে সেই ভাষাতেই সংবাদপত্র প্রচার করা উচিত, কারণ কোন একটী হিতকর প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সাধারণে তাহা অবিলম্বে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দোষগুণ বিচার করিতে পারেন। অধুনা বঙ্গদেশে যে কয়েকখানি বাঙ্গালা পত্র প্রচার হইতেছে প্রায় তৎসমুদায়েরই অবয়ব ক্ষুদ্র, সুতরাং তাহাতে সংবাদ-পত্রের উপযোগী সমুদায় বিষয় প্রকাশিত হওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এই কারণে আমরা এই পরিদর্শকের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম। বাঙ্গালিদিগের উপযোগী যে সকল কারণে বাঙ্গালা পত্রে সাধারণের অনাস্থা জন্মিয়াছে, যাহাতে সেই সকল কারণ সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব। আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, জ্ঞানপূর্ব্বক সত্যপথ হইতে বিচলিত হইব না, যাহাতে কোন বিষয়ের অতিবর্ণন না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব, যদিও পৃথিবীর কোন মনুষ্যই পক্ষপাতের হাত এড়াইতে পারেন না, তথাপি আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, জ্ঞানপূর্ব্বক কখন পক্ষপাত দোষে লিপ্ত হইব না যাহাতে দেশের কুসংস্কার রাশি নিরাকৃত হয়, তদ্বিষয়ে নিয়ত নিযুক্ত থাকিব.......
এক্ষণে এইমাত্র প্রত্যাশা করা যাইতে পারে যে, যদ্যপি দেশহিতৈষী মহাশয়গণ

আমাদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে অধিককাল বিলম্ব হইবে না।"

কালীপ্রসন্নের এই প্রস্তাবে তিনটি কথা 'আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, জ্ঞান-পূর্ব্বক সত্যপথ হইতে বিচলিত হইব না; যাহাতে কোন বিষয়ের অতি বর্ণন না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব', এবং 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, জ্ঞান-পূর্ব্বক কখন পক্ষপাতদোষে লিপ্ত হইব না'— সংবাদপত্রের প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত সংখ্যক গ্রাহক সৃষ্টি না হওয়ায় ক্ষতির বোঝা যখন দিন দিন বাড়তে লাগল, তখন কয়েক মাসের পর কালীপ্রসন্ন 'পরিদর্শক' বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। এই ঘটনায় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সোমপ্রকাশে' দুঃখ প্রকাশ করে লেখা হয়ঃ

"আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, পরিদর্শক অকালে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও উৎকৃষ্ট দৈনিক সম্বাদপত্র নাই। পরিদর্শককে দেখিয়া আমাদিগের কথঞ্চিৎ এই আশা জন্মিয়াছিল যে ইহা ক্রমে সেই ক্ষোভ দূর করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তাহাও উন্মূলিত হইল, সম্পাদক বিরক্ত হইয়া পরিদর্শক উঠাইয়া দিলেন। তিনি বিরাগের যে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গ্রাহকগণের অনাদর উহার অন্যতর বলিয়া উপন্যস্ত হইয়াছে। ইংরাজী সমাচার পত্রাদির ন্যায় সমাচার পত্র পাঠের মর্ম্মজ্ঞ ও তৎপাঠে অনুরক্ত লোক বাঙ্গালিদিগের মধ্যে আজিও অধিক হন নাই।...ফলতঃ...বাঙ্গালা সমাচার পত্রের উন্নতির সমধিক প্রতিবন্ধকতা করিতেছে।...তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বাঙ্গালি সমাজের এরূপ অবস্থা থাকিতে তিনি আর বাঙ্গালিদিগের উপকার করিবেন না। তাঁহার সদৃশ দেশহিতৈষী—উদারস্বভাব ব্যক্তিরা যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, তবে কাহা হইতে সমাজের অবস্থা সংশোধিত হইবে?"

'পরিদর্শকে'র মত দৈনিক সংবাদপত্র বিলুপ্ত হওয়ায় 'সোমপ্রকাশে'র দুঃখপ্রকাশ খুব সঙ্গত এবং স্বাভাবিক হলেও প্রসঙ্গত একথাও স্মরণীয় যে সেকালে বাংলা সংবাদপত্রের শুধু যে খুব বেশি গ্রাহক ছিল না তাই নয়, যে সব গ্রাহক সংবাদপত্র পড়তেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকেই আবার সংবাদপত্রের দাম দেওয়া অবশ্য-কর্তব্য বলে বিবেচনা করতেন না। সংবাদপত্র পাঠ করে তাঁরা 'তৃপ্ত হতেন, উদ্দীপ্ত হতেন এবং কখনো বা উত্তেজিত' হতেন। কিন্তু সংবাদপত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আর্থিক দায়িত্ববোধ তাঁদের ছিল না। দৈনিক পত্র

'পরিদর্শকে'র মত সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' এবং 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদককেও এজন্য আক্ষেপ করতে হয়েছে একাধিকবার। এমনকি কালীপ্রসন্নও 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র ৭ম পর্ব আষাঢ় সংখ্যায় 'ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্রে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন--'উদ্দেশ্য যেরূপ হউক না কেন, সংবাদপত্র বিনাব্যয়ে বিতরণপ্রথা কোন সভ্য দেশেই দৃষ্ট হয় না; সুতরাং এবম্বিধ অদৃষ্টচর ব্যাপারে সাহায্যদাতাগণ ও সম্পাদক যে কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা নির্দ্দেশ করা বাহুল্য" প্রকৃতপক্ষে 'ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র' সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কিছুদিন পরে 'পরিদর্শক' পত্র সম্বন্ধেও তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠল।

যাই হোক্, কালীপ্রসন্ন নিজেই যে শুধু সংবাদপত্রও সাময়িক পত্রের সম্পাদনা করেছেন তাই নয়, সমাজের উন্নতির জন্য একাধিক বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু সংবাদপত্র প্রকাশেও প্রভূত অর্থসাহায্য করেছেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র মত দেশহিতকর পত্রের বিলোপ-সম্ভাবনা দেখা গেলে এবং হরিশচন্দ্রের পরিবারবর্গ আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়লে কালীপ্রসন্ন হরিশচন্দ্রের পরিবারবর্গকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ঐ পত্রিকার মুদ্রাযন্ত্র এবং সর্বস্বত্ব কিনে নেন এবং পত্রিকাটির প্রকাশ অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করেন। কালীপ্রসন্ন তাঁর বন্ধু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপর পত্রিকাটির পরিচালন ভার এবং 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র জন্মদাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের উপর সম্পাদন ভার অর্পণ করেন। 'Selections from the Writings of Girish Chander Ghosh' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে, "The Patriot will henceforth be conducted in Calcutta. The paper has reverted to those hands that first started it." কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। শম্ভুচন্দ্র কালীপ্রসন্নের বাড়ীতে থাকতেন এবং কালীপ্রসন্নের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ হৃদ্যতাও ছিল। কিন্তু 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সহকারী সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের কাছে এই ব্যবস্থা বিশেষ মনঃপূত হয়নি, কারণ পত্রিকাটির সম্পূর্ণ পরিচালনভার পাওয়ার জন্য তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর চেষ্টায় এই সময় এমন একটা কথা ওঠে যে, কালীপ্রসন্ন যে সৎকার্যে অকাতরে অপরিমিত দান করে অর্থের "অপব্যয়" করছেন, তা শম্ভুচন্দ্রেরই ইঙ্গিতে এবং প্ররোচনায়। শম্ভুচন্দ্রের কানে একথা ওঠায় তিনি কালীপ্রসন্নের সঙ্গে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক অক্ষুন্ন রেখেও কালীপ্রসন্নের গৃহ এবং

সংস্রব ত্যাগ করেন।[৭] কালীপ্রসন্নের বিশেষ অনুরোধেও শম্ভুচন্দ্র আর 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র পরিচালনা ব্যাপারে নিজেকে কোনভাবেই জড়িত রাখতে রাজি না হওয়ায় এবং শম্ভুচন্দ্রের অনুসরণে (নভেম্বর ১৮৬১) গিরিশচন্দ্রও 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদন ভার ত্যাগ করায় এবিষয়ে কর্তব্য স্থির করার জন্য কালীপ্রসন্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর প্রথমে কিছুদিন কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদন-ভার দেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাও তেমন সন্তোষজনক না হওয়ায় বিদ্যাসাগর এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অনুরোধে মধুসূদন 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। ঐ সময় মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লেখেন, "By the by—from the beginning of this month Jatindra and Vidyasagar have burdened me with the Patriot. I would recommend your reading next monday's issue. I am pretty certain you will recognise my fist."[৮] কিন্তু তখন 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল না হওয়ায় যথাসময়ে পারিশ্রমিক না পেয়ে কয়েক সংখ্যার পর মধুসূদন পত্রিকাটির সংস্রব ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ২৭শে মার্চ ১৮৬২ তারিখের যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁকে লেখেন—"I regret to hear that you have received no remuneration from the 'Patriot' Fund upto this time. I have spoken strongly on the subject to kristo Dass and I dare say a remittance of at least a portion of the amount due will soon be made to you. Besides···I would take leave to request you not to cut off your connection with it all in a hurry; for I know that some new arrangements are being made very shortly which, it is expected, will place the 'Patriot' finances in a much healthier condition."[৯]

কিন্তু মধুসূদনের মতো আবেগবান মানুষের পক্ষে দীর্ঘদিন নিয়মিত ভাবে কোন পত্রিকা সম্পাদনার কাজ চালানো সম্ভব ছিল না। মধুসূদনের পর বিদ্যাসাগর দ্বারকানাথ মিত্রের হাতে পত্রিকাটির সম্পাদন-ভার অর্পণ করেন। কিন্তু কয়েক সংখ্যা সম্পাদনের পর বিদ্যাসাগর দেখলেন যে, পত্রিকা-পরিচালনে অনভ্যস্ত ব্যক্তির দ্বারা 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পরিচালিত হওয়ায় পত্রিকাটির আর পূর্ব

গৌরব বজায় থাকছে না। তখন তিনি নবীনকৃষ্ণ বসু, কৈলাসচন্দ্র বসু এবং কৃষ্ণদাস পালের উপর 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদন-ভার দেন। অবশেষে একমাত্র কৃষ্ণদাস পালের ওপরেই 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদন ভার এসে পড়ে। কৃষ্ণদাস এই সময় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়ট'কে বিদ্যাসাগরের পরিচালনায় না রেখে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পরিচালনাধীনে আনতে চাইলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার কয়েকজন প্রধান সভ্যের দ্বারা ভেতরে ভেতরে কৃষ্ণদাস কালীপ্রসন্নকে এই মর্মে অনুরোধ জানালেন যে, পত্রিকাটির পরিচালন ভার বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে নিয়ে তাঁদের ওপরে অর্পণ করা হোক্। কৃষ্ণদাস পালের জীবনীকার রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন—"কৃষ্ণদাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে থাকিয়া হিন্দু পেট্রিয়ট চালাইতে বোধ হয় ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই তিনি তলায়-তলায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সভ্যদিগকে উক্ত কাগজের স্বত্বাধিকারী হইবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব হইতে লাগিল যে, হিন্দুপেট্রিয়ট বিদ্যাসাগরের অধীনে না রাখিয়া উহা কতিপয় ট্রাস্টির হস্তে সমর্পিত হউক। কিন্তু ঐ প্রস্তাব বিদ্যাসাগরের নিকট কে করিবে, এই বিষম সমস্যা প্রস্তাবকারীদিগের মনে উদিত হইল। এই কথা চালাচালি হইতে হইতে বিদ্যাসাগর সময় পরিশেষে জানিতে পারিলেন যে, কালীপ্রসন্নবাবুর নিকট এই প্রস্তাব হইতেছে। তেজস্বী ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর এইরূপ লুকাচুরীর মধ্যে থাকিবার লোক নহেন। তিনি অবিলম্বে হিন্দু পেট্রিয়টের কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই সুযোগে হিন্দু পেট্রিয়টের ট্রষ্ট ডিড্ কালীপ্রসন্ন বাবুর নিকট হইতে লেখাইয়া লইলেন। এইরূপে হরিশের সাধের হিন্দু পেট্রিয়ট ট্রষ্ট সম্পত্তি বলিয়া রাজদ্বারে চিহ্নিত হইল। কি গুপ্ত অভিপ্রায়ে কৃষ্ণদাস এই কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই।"[১০]

কালীপ্রসন্ন প্রথমে এই দেশহিতকর স্বাধীনতাবলম্বী সংবাদপত্রটিকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের জমিদার সভার মুখপত্রে পরিণত করতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু কালীপ্রসন্নের অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষ কৃষ্ণদাসকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে কালীপ্রসন্ন কয়েকজন ট্রষ্টীর উপর পত্রিকাটির পরিচালনভার অর্পণ করতে সম্মত হলেও দলিলে কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালনের শর্ত স্থাপন করেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমানাথ ঠাকুর,

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে ট্রাষ্টী নিযুক্ত করে কালীপ্রসন্ন এই দলিলে লেখেন যে, অতঃপর তিনি বা তাঁর কোন উত্তরাধিকারী এই কাগজের স্বত্ব বা উপস্বত্বের উপরে কোন দাবী রাখবেন না। কিন্তু ট্রাষ্টীদের হাতে থাকা কালে ঐ কাগজের বিগত সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিজড়িত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নাম কখনোই পরিবর্তন করা যাবে না। তাছাড়া ট্রাষ্টীদের হাতে ঐ 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজ বা তার গুড্ উইল বিক্রয় করার ক্ষমতা থাকবে না। তবে ঐ কাগজ বা তার গুড্ উইল দেশের উপকারার্থে যদি কেউ কখনো প্রার্থনা করেন, তবে উপযুক্ত বিবেচনা করলে তাঁরা তা দান করতে পারবেন। আর ঐ পত্রিকার "অক্ষর মায় লওয়া জমা" বিক্রয় করার ক্ষমতা ট্রাষ্টীদের হাতে থাকলেও ঐ টাকা তাঁরা নিজেরা ভোগ না করে প্রেসের দেনা শোধ বাদে হরিশ মেমোরিয়াল ফাণ্ডে অর্পণ করবেন।

এই দলিল ও তার নিয়মাবলী পাঠ করলে বোঝা যায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট'কে ঘিরে একটি সম্ভাব্য দলাদলি থেকে কালীপ্রসন্ন কত নীরবে তাঁর স্বার্থত্যাগ করেছিলেন এবং এই সমাজহিতৈষী পত্রিকাটির উন্নতির জন্য কিরূপ গভীরভাবে চিন্তিত ছিলেন।

আবার 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ছাড়াও কালীপ্রসন্ন একাধিক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের উন্নতির জন্য সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করেছিলেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রচেষ্টায় যে 'সর্বশুভকরী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দেই বন্ধ হয়ে যায়[১১], তা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের অর্থানুকূল্যে ও বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় পুনরায় প্রকাশিত হয়।[১২]

সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে জানা যায় যে, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তারকচন্দ্র চূড়ামণির সম্পাদকত্বে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষীয় সম্বাদ পত্র' নামে রাজনীতি সংক্রান্ত একটি পাক্ষিক সমাচার পত্রকে কালীপ্রসন্ন পাঁচশত টাকা দান করেন।[১৩] ১৭৮৩ শকের আষাঢ় সংখ্যায় (জুন ১৮৬১) কালীপ্রসন্ন সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' এই 'ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রে'র দোষগুণের সমালোচনা করে লেখা হয়, "আমাদিগের ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রের সহিত যে সম্পর্ক, তাহাতে তাহার উন্নতিকল্পে সাধ্যানুসারে কায়মনে যত্ন করাই আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং তদনুরোধেই আমরা তাহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; ভরসা করি,

ভবিষ্যতে চূড়ামণি-সম্পাদক ভারতবর্ষীয় পত্র সাবধানে সম্পাদন করিবেন এবং সে সময় যেন দেশ, কাল, পাত্র ও নিজপদের প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে ক্রমে ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র সহৃদয় সমাজে সমাদরে পরিগৃহীত হইবে এবং তিনিও চরিতার্থতা লাভ করিবেন।"

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন 'সোমপ্রকাশে'র উন্নতির জন্য যে দুইশত টাকা দান করেন সে কথা স্বীকার করে 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক ১৩ই অক্টোবর তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কালীপ্রসন্ন 'তত্ত্ববোধিনী সভা'কেও একটি মুদ্রাযন্ত্র দান করেছিলেন বলে জানা যায়। ১৮৪২ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "কালীপ্রসন্ন নিজে একটি প্রেস কিনিয়া তত্ত্ববোধিনী সভাকে দান করেন।" আবার ১৭৭৮ শকের ফাল্গুন সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থেকে জানা যায়, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভার অধীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মুদ্রাযন্ত্রের কার্যের তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি অন্যতম 'যন্ত্রাধ্যক্ষ'ও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কালীপ্রসন্ন শুধু যে বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করেছিলেন তা নয়, পূর্বালোচিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা ছাড়াও অন্ততঃ আরও দুখানি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ইংরেজী পত্রিকার প্রতি তিনি তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'Mookerjee's Magazine' প্রকাশের জন্য কালীপ্রসন্ন একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করে দেন। কিছুদিন পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'Bengalee' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশে সহায়তা করার জন্য কালীপ্রসন্ন ঐ মুদ্রাযন্ত্রটি দান করেন।

শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর মুসলমান বন্ধু নবাব আবদুল লতিফ খান বাহাদুরের অনুরোধে 'দূরবীণ' নামে একটি উর্দু সংবাদপত্রেরও স্বত্ব ক্রয় করে তার পরিচালনায় সহায়তা করেছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এ সম্বন্ধে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' লেখা হয়, "His patronage of the press was Catholic, for.the extended it even to that Urdu newspaper, the Doorbin, the proprietary right in which he bought at the instance of a Mahomedan friend (Nawab Abdul Latif Khan Bahadur)।"

সংবাদপত্র প্রচারের ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্নের এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের উপযুক্ত মূল্যায়ণ করতে গেলে রাজা রামমোহনের ফার্সী সংবাদপত্র 'মীরাৎ উল্ আখবার' পরিচালনার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। রামমোহনের সংস্কৃতি-চেতনা ও ধর্মীয় উপলব্ধি একদিকে পারস্যভাষা এবং কোরাণ শিক্ষা এবং অন্যদিকে সংস্কৃত শিক্ষা এবং বেদান্ত চর্চার মধ্য দিয়ে এক সুষম ও বলিষ্ঠ পরিণতি লাভ করে এবং তাঁর একেশ্বরবাদে বিশ্বাসকে হীরকের মত দ্যুতিময় করে তোলে। একথা স্বভাবতঃই মনে হয়, সন্তানের রক্তে পিতামাতার উভয়েরই অবদানের মত রামমোহনের আত্মিক সত্তাও যেন কোরাণ ও উপনিষদের অবদানে সমন্বিত। কালীপ্রসন্ন কিন্তু পুরোপুরি খাঁটি হিন্দু (অবশ্য কুসংস্কার মুক্ত) হয়েও যখন নিজের সম্পাদিত এবং অন্যের সম্পাদিত বাংলা এবং ইংরাজী পত্রিকা-সমূহের পিছনে অজস্র শ্রম এবং অর্থ ব্যয় করার পরে উর্দু পত্রিকা দূরবীণে'র পরিচালনায় নবাব লতিফখান বাহাদুরের মত সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিকেও সহায়তা করার জন্য আর্থিক সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেন, তখন সাময়িকপত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মহাত্মা কালীপ্রসন্নকে মনে হয় মহাত্মা রামমোহনেরই সার্থক উত্তর সাধক।

১। মন্মথনাথ ঘোষ ঃ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৩২২) পৃ. ২২

২। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ছয় খণ্ড রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল ঠিকই ; কিন্তু ১৭৭৬ শকে নয়, ১৭৭৩ শকাব্দের কার্তিক মাসে তা প্রথম প্রকাশিত হয়। মধ্যে ১৭৭৪ শকের কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ, ১৭৭৫ শকের পৌষ থেকে ফাল্গুন এবং ১৭৭৬ শকের চৈত্র থেকে ১৭৭৮ শকের চৈত্র পর্যন্ত পত্রিকাটি বন্ধ ছিল।

৩। 'বিদ্যাবতী রমণীকুলে'র মত 'বিদ্যাবতী কামিনীকুল' পদগুচ্ছটির ব্যাকরণ-গত ত্রুটি সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন যদিও নিজেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহের ১৭৭৯ শকের কার্তিক সংখ্যায় দ্বারকানাথ রায়ের 'স্ত্রী শিক্ষা বিধান' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, তবু অনবধানতাবশে তিনিও এখানে অনুরূপ পদের প্রয়োগ করেছেন।

৪। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের (এবং তাঁদের অনুসরণে দেশীয় ঐতিহাসিকদের) বিবরণ অনুযায়ী আলেকজাণ্ডারের কাছে পুরুর পরাজয় স্বীকারের প্রচলিত কাহিনীর সত্যতা আবার নূতনভাবে পরীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন মনে করি একাধিক কারণে—

(ক) পারস্যে প্রাপ্ত শিলালিপি, সনন্দ ও দলিলপত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঝিলাম নদীর তীরে এক ভীষণ যুদ্ধে পুরুর নিকট আলেকজাণ্ডারের পরাজয় ঘটে।

(খ) প্লুটার্কের লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়—যুদ্ধ আরম্ভ হলে পুরুর বিশাল হস্তী বাহিনী গ্রীক সৈনাদের শূন্যে তুলে আছাড় মারতে থাকায় গ্রীকসেনা দারুণভাবে হতাহত ও পরাস্ত হয়ে পলায়ন করতে থাকে। তখন আলেকজাণ্ডার তাঁর দুই সেনাপতি হাফেসিয়ান ও সেলুকস সহ নৌকায় ঝিলাম নদী পার হয়ে পলায়ন করেন। অতঃপর কর্তব্য স্থির করার জন্য আলেকজাণ্ডার এক পরামর্শ সভা আহ্বান করলে প্রধান সেনাপতি হাফেসিয়ান, সহকারী সেনাপতি সেলুকস এবং তৃতীয় সেনাপতি ক্র্যাটেরস একবাক্যে বলেন যে শত্রুর গজ সৈন্যের ভয়ে গ্রীকসৈন্য নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে; গ্রীকসৈন্য এর পূর্বে আর কোন যুদ্ধে এরূপ ভীত হয়নি। এরপরও যুদ্ধ করার জন্য পীড়াপীড়ি করা হলে সৈন্যদল বিদ্রোহ করবে। তখন আলেকজাণ্ডার দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(গ) প্রাচীন ঐতিহাসিক কার্টিরস লিখেছেন—"হস্তীসৈন্য দর্শনেই গ্রীকসৈন্য ভীত হয়ে পড়েছিল।...সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রীকসৈন্য কোনো প্রকারে যুদ্ধ করেছিল।"

(ঘ) অপর ঐতিহাসিক এরিয়ন লিখেছেন—"দিনের শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেও জয়ের আশা নেই দেখে আলেকজাণ্ডার পুরুর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করে প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করেন।"

(ঙ) পাণিনির ব্যাকরণের একটি দৃষ্টান্তে পাওয়া যায়—"যে সময় মদ্রদেশ (মধ্যপাঞ্জাব) এক বড় সাম্রাজ্য ছিল, সেই সময় গ্রীকগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে এসে দারুণ দুর্গতি ভোগ করে।"

[দ্রঃ দর্শনশাস্ত্রী অধ্যাপক শ্রী সনাতন চক্রবর্তী: আদর্শ রাষ্ট্রের বুনিয়াদ—পৃঃ ১৯১-৯২]

৫। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়: বঙ্গভাষার ইতিহাস, পৃঃ ৮৬।

৬। মন্মথনাথ ঘোষ: মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃঃ ৬৩।

৭। তদেব, পৃ: ৩৭।

৮। নগেন্দ্রনাথ সোম : মধুস্মৃতি, পৃঃ ৭৭৫।

৯। তদেব, পৃঃ ৩৪৪-৪৫।

১০। রামগোপাল সান্যাল : কৃষ্ণদাস পালের জীবনী, পৃঃ ৩০-৩১।

১১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাময়িকপত্র (৪র্থ সং)' পৃঃ ১১৪-১৫।

১২। মধুসূদন রচনাবলী (হরফ প্রকাশনী) পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩৯৭।

১৩। সোমপ্রকাশ, ১লা জুলাই, ১৮৬১।

একাদশ অধ্যায়

কালীপ্রসন্নের গদ্যরীতি

রামমোহনের পূর্বে বাংলা গদ্যের জন্মসূত্রে জড়িত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত বাংলা গদ্যরচনা সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু মন্তব্য করেছিলেন, "উল্লিখিত গ্রন্থসকল এমন অপকৃষ্ট বাংলা ভাষায় লিখিত যে, রামমোহন রায়কে বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে অন্যায় হয় না।" আবার এই পণ্ডিতগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় পুরুষ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের সবচেয়ে স্মরণীয় গদ্যগ্রন্থ 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র ভাষা সম্বন্ধে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' লেখেন—'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভাষা "সংস্কৃতাশ্রয়ী, কিন্তু নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও নীরস।" ডক্টর সুশীল কুমার দে মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা এই 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র ভাষাকে বলেছেন, "Wholly devoid of all artistic instincts of proportion or arrangement," এবং এই বইয়ে প্রধানতঃ সংস্কৃতানুগ ভাষার মাঝে মাঝে কোনো কোনো স্তবকে যে মৌখিক ভাষারীতির প্রয়োগ আছে তাকে বলেছেন "sudden and ludicrous."[১]

অথচ প্রমথ চৌধুরী মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরীতি সম্বন্ধে এর ঠিক বিপরীত মতবাদ প্রচার করে লেখেন—"তিনি একদিকে যেমন সাধুভাষার আদি লেখক, অপর দিকে তিনি তেমনি চলিত ভাষারও আদর্শ লেখক।' মনে হয় প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যের জন্মলগ্ন থেকেই সাধুভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রয়োগ দেখাবার কিছুটা উদ্দেশ্যতাড়িত হয়েই এরূপ মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনার সূত্র ধরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস শুধু যে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্যের সঙ্গে একমত হন তাই নয়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় মৃতুঞ্জয় বিদ্যালংকার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "তিনিই বাংলা গদ্যের সর্বপ্রথম কনশাস আর্টিস্ট।" সজনীকান্ত আবার 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভাষারীতি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভাষায় মৌখিক রীতি, সাধু বা সাহিত্যিক রীতি এবং সংস্কৃত রীতি এই তিন রীতির নিদর্শন থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মৌখিক রীতির

প্রতিই মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবণতা ছিল। পরবর্তীকালে অধিকাংশ গবেষক এবং সাহিত্য-সমালোচক মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের মতকেই বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের স্থান' নিবন্ধে দেখিয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসনে'র মধ্যে কোথাও মৌখিক ভাষার প্রতি লেখকের প্রবণতা দেখা যায় না : তাঁর 'হিতোপদেশে'র ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী, কোথাও কোথাও সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদ ; 'রাজাবলি'র সর্বত্র এক ভাষারীতি অনুসরণ করা হয়নি : 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র ভাষা এতই উৎকট সংস্কৃতাশ্রয়ী যে, যে রামমোহনের ভাষা আধুনিক পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য, তিনিও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না জানিয়ে পারেন নি ; লেখকের শেষ প্রকাশিত বই 'প্রবোধচন্দ্রিকা'ও মূলত সাধুভাষা বা সংস্কৃতানুগ ভাষায় লেখা এবং যদিও এর কোনো কোনো অংশে মৌখিক রীতির প্রয়োগ দেখা যায়, তাহলেও এই ছাত্রপাঠ্য বইটি লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল লিখিত ও কথ্য বাংলার বিভিন্ন রূপের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নবাগত বিদেশী ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। উইলিয়ম কেরী সম্পাদিত 'কথোপকথন'ও লেখা হয়েছিল অনেকটা এই আদর্শে। সুতরাং মৃত্যুঞ্জয় সচেতনভাবে বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন—এ দাবী অযৌক্তিক। মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা সর্বত্রই দুর্বোধ্য, অপাঠ্য বা হাস্যকর পূর্ববর্তী কোন কোন সমালোচকের এ অভিযোগ যেমন ভিত্তিহীন, তেমনি তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি সম্বন্ধে সচেতনভাবে পরীক্ষা করেছিলেন—এ দাবীও ভিত্তিহীন। প্রমথ চৌধুরী বা সজনীকান্তের মত অনুযায়ী তাঁর যদি প্রকৃতই মৌখিক রীতির প্রতি আগ্রহ বা প্রবণতা থাকত, তাহলে তিনি আগাগোড়া মৌখিক ভাষায় অন্ততঃ একখানা বইও লিখতেন, অথবা তাঁর বিভিন্ন বইয়ের বেশ কিছু জায়গায় মৌখিক ভাষার ব্যবহার পাওয়া যেতো ; কিন্তু তা না হয়ে যখন দেখা যায় যে তাঁর একখানি মাত্র বইয়ের সামান্য কয়েকটি অনুচ্ছেদে 'সাধু ও চলিত ভাষার এক বিচিত্র ও বিসদৃশ সংমিশ্রণ' ঘটেছে, তখন সেই পরিকল্পনাহীন সংমিশ্রণকে মৌখিক ভাষার প্রতি প্রবণতা বা বিভিন্ন গদ্যরীতি সম্বন্ধে সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার আখ্যা দেওয়া চলে না। তবে মৌখিক ভাষার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দাবী মেনে নিতে না পারলেও তাঁর 'বত্রিশ সিংহাসন' 'রাজাবলি' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা,র সাধু গদ্য (অবশ্য 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র অতি-উৎকট পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাধু গদ্য নয়) রামমোহনের ডায়েলেকটিক্ গদ্যের তুলনায় অনেক বেশি শিল্পলক্ষণাক্রান্ত এবং সেদিক

থেকে রামমোহনের বিচার-বিতর্কমূলক অমসৃণ গদ্য নয়, মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসনের'র গদ্যই যে বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র গদ্যে পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করেছে—"হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্ত মাংস মল মূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয়"—ইত্যাদি 'বত্রিশ সিংহাসনে'র অনুচ্ছেদ পড়লে সেকথা বোধ হয় অস্বীকার করার উপায় নেই। বিদ্যাসাগরও অবশ্য 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বা 'সীতার বনবাসে'র মত সাহিত্যিক গদ্যগ্রন্থ ছাড়াও 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' ইত্যাদি বিচার-বিতর্কমূলক পুস্তিকা রচনা করেছেন। কিন্তু সেখানেও তিনি ভাষার কাঠিন্য ও রুক্ষতার চেয়ে প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্যের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়েছেন এবং ঐ বিচার বিতর্কমূলক গদ্যেও কেবলমাত্র বুদ্ধির উপর নির্ভর না করে বুদ্ধির সঙ্গে কিছুটা হৃদয়াবেগকেও মিশ্রিত করেছেন।

আর সেইজন্যই রামমোহনের গদ্য বাংলা গদ্যকে প্রথম দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলেও সেই গদ্য ক্রমবিকাশের পথে *বিদ্যাসাগরীয় গদ্যে উত্তীর্ণ হল না। রামমোহনের গদ্য পরিণতি লাভ করল অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ভূদেব* মুখোপাধ্যায়ের বিচারণামূলক গদ্যে। অক্ষয়কুমারের গদ্য অবশ্য প্রথমদিকে দেবেন্দ্রনাথ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বারা কিছুটা সংশোধিত হয়েছে,[১] কিন্তু তার ফলে তাঁর নিজস্ব গদ্যভঙ্গি আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি—এই দুই গদ্যশিল্পীর প্রভাবে অক্ষয়কুমারের গদ্যে রামমোহনের গদ্যের অমসৃণতা কিছুটা দূর হলেও মূল মেজাজটি থেকে গেছে রামমোহনের যুক্তি নির্ভর বিচারণামূলক গদ্যের। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের এই পর্বে বাংলা গদ্য দুটি ভিন্ন খাতে বিভক্ত হয়েছিল— ক) সৃষ্টিধর্মী গদ্য এবং (খ) বিচারধর্মী গদ্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রভাবে বাংলা গদ্য তার শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে তখন কৈশোরে প্রবেশলাভ করেছে। কিন্তু সেই সময়ে, যে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে আরও পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যের যৌবন মুক্তি সম্ভাবিত হয়েছে, তাঁর গদ্যরচনা যে কিরূপ অপাঠ্য ও ভয়ঙ্কর ছিল, 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

"যে লপনেন্দু শত ২ শশধর সঙ্কাশ শোভা পাইতেছে, সে বদন কর্দ্দম মণ্ডিত হওত মৃন্মণ্ডলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অনুরেণু অসি অনুমান

হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক। যে রসনা প্রমদাধর রসনা পান করিয়া অন্য রস পান করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ট্রভক্ষণে কষ্ট পাইবেক।”

এখানে স্মরণীয় যে 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা গদ্যরচনায় নিপুণ না হ'লেও তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, “ [বঙ্কিম]···রচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাবগুলীন্ প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিম ভাষা ব্যবহার না করেন।” একটু অবহিত হলেই লক্ষ্য করা যায় যে, 'যে লপনেন্দু শত ২ শশধর সংকাশ শোভা পাইতেছে' বা 'সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ট্রভক্ষণে কষ্ট পাইবেক' ইত্যাদি বাক্যবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যরচনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুপ্রাস-প্রিয়তাকেই অনুকরণ করেছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম পর্যায়ের গদ্য-রচনার ক্ষেত্রে সে অনুকরণও হয়ে উঠেছিল ভীতিদায়ক। প্রকৃতপক্ষে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের যৎসামান্য গদ্য লেখায় বঙ্কিম-প্রতিভার কোন স্বাক্ষরই ছিল না।

কিন্তু এই সময় বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে, এই সময়ে বাংলা গদ্যের অঙ্গনে সাধুরীতি ছাড়া ও সাহিত্যসৃষ্টির অন্যতর প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে প্রবর্তিত হয়েছে কথ্যরীতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র কোন কোন অংশে বা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কেরী সম্পাদিত 'কথোপকথনে' বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'র কোন কোন অনচ্ছেদে সাধু ক্রিয়াপদ সমন্বিত মৌখিক ভাষার কিছু প্রয়োগ হলেও সে সবই হয়েছে কথোপকথনের উদাহরণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বা বিদেশী ছাত্রদের এদেশীয় মৌখিক ভাষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। সাহিত্যের প্রয়োজনে কথ্যরীতির সর্বপ্রথম প্রয়োগ হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রচিত এই নাটকের স্ত্রীচরিত্রগুলির সংলাপে এবং কোথাও কোথাও শিশু বা স্ত্রীচরিত্রের সঙ্গে পুরুষ চরিত্রের সংলাপে রামনারায়ণ চলিত ক্রিয়াপদযুক্ত যে কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন, এমন কি বানান পদ্ধতির মধ্যেও যে কথ্য ঢঙটি তুলে ধরেছেন তা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত চলিত ভাষার প্রবর্তক রূপে অতি-কথিত 'আলালের ঘরের দুলালে'র চেয়ে অনেক বেশি চলিতধর্মী। তবে একথাও এখানে বলা প্রয়োজন যে 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকের কথ্যভাষা আলালের চেয়েও খাঁটি চলিতরীতির হলেও তা

নাটকের সামান্য কিছু অংশে সীমাবদ্ধ থেকেছে; আর 'আলালের ঘরের দুলালে'র কথ্যভাষা (যদিও তা খাঁটি চলিত রীতির নয়) সর্বপ্রথম প্রায় সমস্ত গ্রন্থ জুড়ে একটি সাহিত্যিক প্রকাশ মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

এই পটভূমিকায় কালীপ্রসন্নের গদ্যরীতি বিশেষভাবে বিচার্য। তাই একদিকে গদ্য মহাভারত, নাটকের গদ্যসংলাপ ও বিভিন্ন সভায় পঠিত ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও আখ্যায়িকার সাধু গদ্য এবং অন্যদিকে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র খাঁটি চলিত গদ্য এই উভয় দিক থেকে বাংলা গদ্যে কালী-প্রসন্নের অবদানের বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রথমে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের পনেরো বছর বয়সের রচনা এবং এযাবৎ প্রাপ্ত কালীপ্রসন্নের প্রথম মুদ্রিত রচনা 'সভ্যতার বিষয়' প্রবন্ধ থেকে কালীপ্রসন্নের গদ্যরীতির পরিচয় উদ্ধার করি ঃ—

"সভ্যতার বিষয়।—অসভ্যাবস্থা দূরীকৃত করিয়া সভ্যতার সোপানারূঢ় হইতে সকলেরই প্রধানোদ্দেশ্য, কিন্তু কি কি উপায়াবলম্বন করিলে এতৎমাঙ্গলিক বিষয়ানুষ্ঠান হইতে পারে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধানের অনুবর্ত্তী প্রায় কাহাকেই দৃষ্টিগোচর হয় না (।) অতএব এই সর্ব্বমঙ্গলপ্রদায়ক বিষয়ের কোন কোন উপায়াবশ্যক করে, তাহা পশ্চাৎভাগে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

বিদ্যাই ইহার প্রধান সোপান স্বরূপ। ভূমিতে হল যোজনা ক্রিয়াদি দ্বারা শস্যাদি রোপিত হইলে যেমত ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ মনোমধ্যে বিদ্যাবীজাঙ্কুরিত না হইলে সরলান্তঃকরণ সদ্ভাব উপচিকীর্ষা ন্যায়পরতা ইত্যাদি বৃত্তি দ্বারা মন কখনই বিভূষিত হইতে পারে না।...."

এখানে লক্ষণীয় যে, কালীপ্রসন্নের এই পনেরো বছর বয়সের ভাষারচনায় 'উপায়াবলম্বন' 'উপায়াবশ্যক' 'বিদ্যাবীজাঙ্কুরিত' ইত্যাদি পদে কিছু অহেতুক সন্ধিস্থাপনার প্রবণতা দেখা গেলেও কালীপ্রসন্নের এই বাল্যরচনা যে তাঁর চেয়ে বয়সে দু বছরের বড় বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে প্রকাশিত গদ্যরচনার চেয়ে অনেক বেশি প্রাঞ্জল সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। বস্তুতঃ যে বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার-দেবেন্দ্রনাথ অনুশীলিত গদ্যসম্পদ এবং গদ্যরচনারীতি অনায়ত্ত থেকে গেছে, প্রায় সেই বয়সেই কালীপ্রসন্নের গদ্যে দেখা দিতে শুরু করেছে বিদ্যাসাগরীয় গদ্য এবং অক্ষয়কুমার দত্তের গদ্যের

একটি সমন্বয় প্রচেষ্টা ; অবশ্য বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং উপস্থাপনারীতিতেই কোথাও কোথাও অক্ষয়কুমারের মেজাজ লক্ষ্য করা গেলেও শব্দ নির্বাচন, পদান্বয় ও বাক্যগঠন রীতিতে বিদ্যাসাগরীয় প্রাঞ্জলতা রক্ষার দিকেই কালীপ্রসন্নের গদ্যরীতির সমধিক আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে, প্রধানতঃ বিদ্যাসাগরীয় গদ্যই কালীপ্রসন্নের গদ্যের আদর্শ হলেও কালীপ্রসন্নের গদ্য প্রথমাবধি 'হইবেক' 'যাইবেক' ইত্যাদি বিদ্যাসাগরীয় ক্রিয়াপদের দুর্বলতা থেকে (সামান্য দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) প্রায়শঃই মুক্ত থাকতে পেরেছে। যতিচিহ্ন স্থাপন এবং অনুচ্ছেদ রচনায় কালীপ্রসন্নের বাল্যরচনা থেকেই যে যাথার্থ্য রক্ষার প্রচেষ্টা দেখা যায় তাও উত্তরোত্তর পরিণতি লাভ ক'রে কালীপ্রসন্নের গদ্যরীতির উন্নত মান সৃষ্টিতে সহায়ক হয়ে উঠেছে।

এবার ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক প্রবন্ধ পুস্তিকা থেকে আর একটু পরিণত বয়সের প্রাবন্ধিক কালীপ্রসন্নের গদ্যরীতির পরিচয় উদ্ধার করলে আমরা দেখব যে, ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং মাধুর্যরক্ষার চেষ্টা আরও ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে বিদ্যাসাগরীয় যতির মত সেকালের পক্ষে বিস্ময়কর এবং যথার্থ শিল্পীসুলভ যতি ব্যবহারই ছিল কালীপ্রসন্নের গদ্যরীতির সবিশেষ কৃতিত্ব। যেমন—"কলিকাতা নগরীয় ঐশ্বর্য্যমত্ত ধনিগণ! একবার স্বদেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি রোপণ কর। গৃহপতি মদ্যপ ও লম্পট হইলে সংসারের যেরূপ বিশৃঙ্খলা হয় —তোমাদিগের ঐশ্বর্য্যমত্ততায় তদনুরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে। সাধারণ হিতকারী কার্য্যে যদি তোমরা কায়মনে সাধ্যানুসারে সাহায্য না করিবে যদি তোমরা শ্রেষ্ঠত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া দুরবস্থা মোচনে সচেষ্ট না হইবে তাহা হইলে চিরদিনেও ভারতের সুখ সৌভাগ্যের উন্নতি হইবে না। তোমরা অতুল ধন প্রাপ্ত হইয়াছ তৎসকলই সাধারণ হিতকার্য্যে ব্যয় কর আমার এরূপ প্রার্থনা নহে ; যদি তোমাদিগের স্মরণ মাত্র থাকে যে, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে অযত্ন করা,—সমাজের উন্নতিতে উপহাস ও মঙ্গলময় কার্য্যে ব্যয় না করা, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট পদার্থ মনুষ্যনামধারীর উচিত নহে— তাহা হইলে বিজ্ঞান বিহীন বন্য মর্কটে ও ঐ ধনীতে বিশেষ কি ; তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবেক।......"

কালীপ্রসন্নের এই গদ্যরীতিতে ;—।।' প্রভৃতি বিরামচিহ্নই যে শুধু অত্যন্ত শৃংখলার সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে তাই নয়, শব্দ নির্বাচন এবং পদ সমন্বয়ের মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ধ্বনিসুষমাও ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে আমরা এও লক্ষ্য করব, এই গদ্যরচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি বা স্টাইলের যে দীপ্তি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মূল কারণ হল বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়াবেগের এক স্পৃহনীয় সমন্বয়।

কালীপ্রসন্নের গদ্যরীতির আর একটি দিক উন্মোচিত হয়েছে তাঁর নাটকীয় গদ্যসংলাপের মধ্যে। কালীপ্রসন্নের চৌদ্দ বছর বয়সে রচিত, অধুনালুপ্ত 'বাবু নাটকে'র (১৮৫৪) কথা ছেড়ে দিলেও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বিক্রমোর্বশী' '১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সাবিত্রীসত্যবান' এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মালতী মাধব' নাটক তিন খানির গদ্যরীতির বিচার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এই নাটক তিন খানিতে কালীপ্রসন্নের গদ্যরীতির ক্রমবিকাশের ধারা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিধৃত হয়ে আছে।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত জি, সি, গুপ্তের [যোগেন্দ্রচন্দ্র নয়, সম্ভবতঃ গোবিন্দ চন্দ্র] 'কীর্তিবিলাস' নাটকের গদ্যসংলাপে যখন "কথ্যভাষা দূরে থাক্, সাধুলিখ্য ভাষার কথা টংটুকুও ফোটেনি"[৩] তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' প্রধানতঃ পয়ারজাতীয় পদ্যে রচিত, হরচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' "এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞানবৃদ্ধ্যর্থ রচিত[৪]" এমনকি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষের দ্বিতীয় নাটক 'কৌরব বিয়োগে'র ভাষাও সংস্কৃত শব্দবাহুল্য ও অন্বয়রীতির ভারে নিষ্প্রাণ ও আড়ষ্ট, তখন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের ভাষার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মন্তব্যের প্রতি আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—".. রচনা চাতুর্য্য দৃষ্টে প্রতীত হইতেছে যে ইদানীন্তনের বিষয়ী গ্রন্থকারদিগের ন্যায় প্রশংসিত সিংহ মহাশয় ভট্টাচার্য্যদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, যেহেতু নস্যেরগন্ধ মাত্র বোধ হয় না।" প্রকৃতপক্ষে 'বিক্রমোর্বশী'র ভাষা তৎসমবহুল হলেও তা ঠিক সংস্কৃত গন্ধী ছিল না। কিন্তু ডঃ সুশীল কুমার দে তাঁর 'নাট্যকার কালীপ্রসন্ন সিংহ' প্রবন্ধে লিখেছেন —"গ্রন্থকার মূলের অবিকল অনুবাদ করিতে গিয়া নাটকের ভাষা ও ভঙ্গিকে সরস করিতে পারেন নাই....। পণ্ডিতী ভাষা না হইলেও ইহার ভাষা সংস্কৃতগন্ধী ও কৃত্রিম। চতুর্থ অঙ্কে পুরূরবার উন্মাদ দৃশ্যের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে ইহার রচনার নমুনা পাওয়া যাইবে :—

রাজা। (ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া) কে আমাকে অনুশাসন করেন, (দেখিয়া) একি পিতামহ শশলাঞ্ছন, ভগবান তারাপতি, এই অনুশাসনে আমাকে নিতান্ত অনুগ্রহ করিলেন।··· (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) কেন হে এই লতা, কুসুমবিহীনা হইলেও ইহার দর্শনে আমার অনুরাগ জন্মিতেছে।...” [দীর্ঘ স্বগতোক্তি]

আমি 'নাটকে কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়ে দেখিয়েছি ডঃ সুশীল কুমার দে 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের কেবলমাত্র চতুর্থ অংকের পুরূরবার উন্মাদ দৃশ্য থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে নাটকের ভাষা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পাওয়ায় কিছুটা ভ্রমে পতিত হয়েছেন, কারণ কালিদাসের মূলে 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের প্রায় সমগ্র চতুর্থ অংকটিই প্রেমোন্মত্ত রাজার স্বগতোক্তি হওয়ায় অংকটি কাব্যাংশে অতুলনীয় হলেও নাটকীয়তার বিচারে কৃত্রিম, সুতরাং মূলেই যেখানে কৃত্রিমতা আছে, সেখানে নাটকীয় সংলাপ বিচারে কেবলমাত্র সেই অংশ থেকেই উদাহরণ সংগ্রহ করে অনুবাদকের উপরে কৃত্রিমতার দোষ চাপানো হলে একদেশদর্শিতারই পরিচয় দেওয়া হবে। 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের অন্যান্য অংক থেকে যদি যথেচ্ছ উদাহরণ নেওয়া যায়, যেমন সখী চিত্রলেখা যখন রাজাকে বলেন—“তা আমার প্রিয়সখী যাহাতে স্বর্গের নিমিত্ত উৎসুক না হয়, তাহা আপনি দেখিবেন,” তখন বিদূষক বলেন—“স্বর্গস্মরণে কি ফল, তথায় পানভোজন কিছুই নাই, কেবল অনিমিষ নয়ন হইয়া মৎস্যবৎ অবস্থিতি করিতে হয়,” ইত্যাদি তাহলে দেখা যায় এই নাটকের সংলাপে তৎসম শব্দের প্রয়োগ থাকলেও পূর্ববর্তী নাটকগুলির তুলনায় শব্দব্যবহারে একটা সহজ সাবলীলতা এসেছে এবং সংলাপ সাধুভাষায় রচিত হয়েও কোথাও কোথাও একটি কথ্য ঢং এর জন্য অনেকটা পরিমাণে নাটকীয় সংলাপের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই নাটকটি 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' অভিনীত হয়ে তৎকালীন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসা-ধন্য হয়েছে। তাছাড়া আমাদের একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটকের প্রকৃতির ভিন্নতা অনুযায়ী সংলাপও ভিন্নতর হওয়া স্বাভাবিক। সামাজিক নাটকের সংলাপে যে সহজ নিত্য-ব্যবহার্যতা থাকে, পৌরাণিক বা সংস্কৃত অনুবাদ নাটকের সংলাপে তা আশা করা যায় না। এই সঙ্গে যদি কালীপ্রসন্নের নাটকের রচনাকাল এবং যুগ পরিবেশের কথা মনে রাখা যায়, তাহলে রামনারায়ণ তর্করত্নের সামাজিক নকশা নাটক 'কুলীনকুল সর্বস্ব'কে ব্যতিক্রম হিসাবে ধরে নিলে পূর্ববর্তী 'কীর্তিবিলাস' 'ভদ্রার্জুন' 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' বা 'কৌরব বিয়োগে'র নাট্য-

সংলাপের তুলনায় 'বিক্রমোর্বশী'র নাটকীয় গদ্যসংলাপকে যথেষ্ট বিস্ময়কর মনে হবে যদিও এই পর্বের অন্যান্য নাটকের মত কালীপ্রসন্নের নাটকেও ক্রিয়াপদে সাধুরীতির ব্যবহার ছিল একটি সাধারণ দুর্বলতা।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকে নায়ক সত্যবানের মুখে মাঝে মাঝে দীর্ঘ উচ্ছ্বাসময় সংলাপে কিছুটা কৃত্রিমতা দেখা গেলেও, এবং অন্যত্র সাধু গদ্যরীতি সত্ত্বেও ভাষায় বিশেষ আড়ষ্টতা সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল এই যে, এই নাটকের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধু গদ্যরীতির সংলাপ রচিত হলেও সাবিত্রী ও তার সখীদের সঙ্গে সংলাপে কালীপ্রসন্ন যেন কিছুটা পরীক্ষামূলকভাবে চলিত রীতি ব্যবহার করেছেন।—

সাবিত্রী। সখী, কি সুমঙ্গল সমাচার তোমরা আমাকে বলবে না!

উভয়ে। বল্‌ব না কেন সখি, উপযুক্ত পুরস্কার পেলে অবশ্যই বল্‌ব।

সাবিত্রী। বলই না কেন।

উভয়ে। বল, কি পুরস্কার দেবে?

এখানে একথা বলা প্রয়োজন যে, কালীপ্রসন্নের এই চলিত ক্রিয়াপদযুক্ত চলিত রীতির ব্যবহার এবং বানান পদ্ধতির মধ্যেও কথ্য ঢঙটিকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল সর্বস্বে'র সামান্য কিছু অংশ ছাড়া ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখা যায় নি।

আবার ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের সামান্য একটু অংশে যা সীমাবদ্ধ ছিল, তা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মালতী মাধব' নাটকের প্রায় সর্বত্র ব্যাপ্তি লাভ করেছে। নাটকের 'বিজ্ঞাপনে' কালীপ্রসন্ন লিখেছেন, "মদ্রচিত মৎপ্রণীত ও মদনুবাদিত অন্য অন্য নাটক হইতে মালতী মাধবের ভাষারও প্রভেদ হইয়াছে।" প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসন্ন এই নাটকের আগাগোড়া সকল চরিত্রের সংলাপ রচনায় ক্রিয়াপদে চলিতরীতি ব্যবহার করেছেন-এবং রামনারায়ণ তর্করত্ন এবং দীনবন্ধু মিত্রের মত প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারও যেখানে কিছু স্ত্রীচরিত্র এবং নিম্নজাতীয় চরিত্রের ক্ষেত্রে চলিত ক্রিয়া এবং চলিত রীতি এবং ভদ্র চরিত্রের সংলাপে লেখ্য ক্রিয়া এবং তৎসম শব্দপ্রধান সাধুগদ্য ব্যবহার করে নাটকীয় সংলাপরচনার ঔচিত্য রক্ষায় দুর্বলতা দেখিয়েছেন, সেখানে কালীপ্রসন্ন ভদ্রাভদ্র সমস্ত চরিত্রের সংলাপে চলিত ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করে এই ত্রুটি থেকে মুক্ত থেকেছেন। তবে কালীপ্রসন্নের এই নাটকে কখনো কখনো অনবধানতাবশে চলিতরীতির ক্রিয়াপদের মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটি লেখ্য ক্রিয়ারূপ থেকে গেছে। যেমন—

মাধব। (স্বগত) একি! কি নিমিত্ত আমার মনের এতাদৃশী গতি হলো, কোনক্রমেই যে স্ববশে আস্তে পাচ্চি না, ক্রমে লজ্জা যাচ্চে, মান যাচ্চে, ধৈর্য্য যাচ্চে, বুদ্ধির ভ্রম হচ্চে, একি আমার ষড়রিপু একত্রিত হয়ে চন্দ্রবদনীর পক্ষে পক্ষপাত কত্তে লাগিল।

এখানে সবগুলিই চলিত ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করা হলেও একটি মাত্র 'লাগিল' যেন পূর্ববর্তী অভ্যাসের শেষ চিহ্নরূপে থেকে গেছে যদিও এধরণের ব্যতিক্রম নাটকের মধ্যে খুব সামান্যই আছে। তাছাড়া নাটকটি সংস্কৃত অনুবাদ নাটক হওয়ার ফলে 'এতাদৃশী'র মতো কিছু কিছু বিশিষ্ট সংস্কৃতানুসারী শব্দের প্রয়োগ নাটকের চলিত রীতির সংলাপকে কিছুটা পরিমাণে ব্যাহত করে তুলেছে। তবু এই নাটকের সংলাপের কথ্য ক্রিয়াপদ এবং বিশেষভাবে তার বানানভঙ্গির দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে এখান থেকেই 'হুতোম প'্যাচার নক্‌শা'র ভাষার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এবং অনুবাদ নাটকে মাঝে মাঝে কঠিন তৎসম শব্দ প্রয়োগের ফলে খাঁটি চলিত রীতির দিক থেকে যে ত্রুটি দেখা দিয়েছে সমাজ পরিবেশ থেকে উদ্ভূত কালীপ্রসন্নের সামাজিক নক্‌শায় সে ত্রুটি অন্তর্হিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় (১৮৬১-৬৩) খাঁটি চলিত রীতির ভাষার ওপর যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে বাংলা সাহিত্যের ভাষার ইতিহাসে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

যে সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার বিরুদ্ধে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে' আংশিক ভাবে এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় পুরোপুরিভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সেই সংস্কৃত বিদ্যাভিমানী ভাষার বিরুদ্ধে 'বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' নিবন্ধে লিখেছেন, "আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। ... পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বলা বাহুল্য।"

এই পণ্ডিতী বাংলা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছুটা সংস্কারপ্রাপ্ত হলেও অক্ষয়কুমার দত্তের সংস্কৃতানুসারী ভাষার দুরূহতা সাধারণ শিক্ষিত সমাজে কিরূপ পরিহাসের বিষয় ছিল, শিবনাথ শাস্ত্রী, তার পরিচয় দিয়েছেন—"অক্ষয়বাবু যখন সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়া 'জিগীষা'

'জিজীবিষা' প্রভৃতি শব্দ প্রণয়ন করিলেন, তখন আমরা কলিকাতার যে কোন শিক্ষিত লোকের বাটীতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম, 'জিগীষা' 'জিজীবিষা' প্রভৃতি শব্দের সহিত 'চিচ্চীমিষা' শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইতেছে।" বস্তুতঃ বিদ্যাসাগরের সাধুগদ্যে লালিত্য এবং অক্ষয়কুমারের সাধুগদ্যে কিছুটা কাঠিন্য যুক্ত বলিষ্ঠতা অর্জিত হলেও কেবল মাত্র সংস্কৃতের আনুগত্য থেকে বাংলা গদ্যকে মুক্ত করার প্রচেষ্টার জন্য 'আলালের ঘরের দুলালে'র কৃতিত্ব অনস্বীকার্য এবং সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র 'আলালের ঘরের দুলাল'কে একটি বিশিষ্ট মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে' (১৮৫৮) সর্বপ্রথম একটি সমস্ত গ্রন্থ জুড়ে বেশ কিছু তদ্ভব ও দেশী শব্দের প্রয়োগ এবং স্থানে স্থানে কিছু আরবী ফার্সী শব্দ, সচরাচর ব্যবহৃত কিছু প্রবাদ প্রবচন এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দপ্রয়োগের কৃতিত্ব থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার সূত্র ধরে প্যারীচাঁদ বাংলাসাহিত্যে কথ্যরীতির প্রবর্তকরূপে এপর্যন্ত অতিমূল্যায়িত হয়ে এসেছেন। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতানুসারী ভাষার কঠিন গাম্ভীর্যের পরিবর্তে একটা সহজ আটপৌরে ভঙ্গি আনার কৃতিত্ব 'আলালে' থাকলেও ভাষা বিচারে আর একটু মনোযোগী হলে, দেখা যাবে, সাধু গদ্যরীতির আধারে কিছু লঘু চলিত শব্দ ব্যবহারই আলালী ভাষার বৈশিষ্ট্য। যেমন—"বাবুরাম বাবুর মনে নানা কথা—নানা ভাব—নানা কৌশল— নানা উপায় উদয় হইতে লাগিল ঘরে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, প্রভাত না হইতে ২ ঠকচাচা প্রভৃতিকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন।" প্যারীচাঁদ এই সাধুক্রিয়াপদের মাঝে মাঝে হয়ত কোথাও কোথাও একটি চলিত ক্রিয়াপদ অসংলগ্নভাবে ব্যবহার করেছেন, যেমন "রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে, বলদেরা গরু লইয়া চলিয়াছে—ধোপার গাধা থপাস্ ২ করিয়া যাইতেছে।" আবার কোথাও একই সঙ্গে সাধু ও চলিত ক্রিয়ারূপ মিশ্রিত করে লেখা হয়েছে "খেয়ে আইল" "চোক্ টিপ্তে লাগিলেন" ইত্যাদি। স্পষ্টতঃই দেখা যায় প্যারীচাঁদের অধিকাংশ সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহারের মধ্যে মধ্যে পরিকল্পনাহীন ভাবে কয়েকটি মাত্র চলিত ক্রিয়ার প্রয়োগে খাঁটি চলিত রীতির নিদর্শন নেই। এর পাশে 'হুতোমী' ভাষার একটু উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে, 'আলালের ঘরের দুলালে' নয়, 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'-তেই প্রথম ব্যাপকভাবে খাঁটি চলিত রীতির প্রবর্তন হয়। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র যে কোন জায়গা থেকে একটু উদাহরণ তুলে ধরলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

"আমাদের এই প্রকার অধঃপতন হবে না কেন? আমরা হামা দিতে আরম্ভ করেই ঝুমঝুমি, চুষীও সোলার পাখিতে বর্ণপরিচয় করে থাকি, কিন্তু পরে ঘুড়ি, লাটিম, লুকোচুরি ও বৌ বৌ খেলাই আমাদের যুবত্বের এনট্রান্স কোর্স হয়, শেষে তাস, পাশা ও বড়ে টিপে মাৎ করে ডিগ্রী নিয়ে বেরুই।"
['রামলীলা]

হুতোমের ভাষা বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যাবে, তৎকাল প্রচলিত কলকাতার কথ্য ভাষাকে প্রধান ভাবে অবলম্বন করে তৎসম-তদ্ভব-অর্দ্ধতৎসম-দেশী-বিদেশী শব্দের কথ্যরীতি সম্মত পদ সমন্বয়ে, ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের চলিত রূপ প্রয়োগে, বাচন ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে, এমনকি বানান পদ্ধতির মধ্যেও চলিত রূপ বজায় রাখার প্রচেষ্টায় চলিত ভাষা তার স্বকীয় স্বভাব বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। সমগ্র 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় সেকালের কলকাতায় প্রচলিত কিছু উগ্র মৌখিক শব্দ এবং আধুনিক রুচি-বোধের দৃষ্টিতে সামান্য কিছু অশ্লীল শব্দকে উপেক্ষা করতে পারলে হুতোমের ভাষাকে আজ শতাধিক বৎসর পরেও আধুনিক কথ্য ভাষা বলেই মনে হবে। আবার চলিত ভাষার উদ্ভবলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ধারায় চলিত ভাষার যে দুটি রূপরীতি প্রচলিত হয়েছে (ক) সামান্য কিছু অনিবার্য তৎসম শব্দের সঙ্গে তদ্ভব, অর্দ্ধতৎসম ও দেশী-বিদেশী শব্দের প্রাধান্য এবং (খ) চলিত সর্বনাম ও ক্রিয়া-পদের আধারে তৎসম শব্দের প্রাধান্য—যে দুটিকে নাম দেওয়া যেতে পারে খাঁটি চলিত রীতি এবং সাহিত্যিক চলিত রীতি—সেই দুটি রীতির মধ্যে 'হুতোম পঁ্যাচার নক্শা'য় প্রথম শ্রেণীর খাঁটি চলিত রীতির ব্যাপক প্রয়োগ হলেও কালী-প্রসন্ন তাঁর বক্তব্যের মধ্যে নক্শার উপযোগী ব্যঙ্গাত্মক মেজাজ বজায় রেখে অল্প কিছু ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর আলঙ্কারিক চলিত রীতিরও যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন তার উদাহরণ পাই :— "কর্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কত্তে সাধুরা কোন বাধাই মানেন না বলেই যেন দিনমণি কমলিনীর মনোব্যথায় উপেক্ষা করে অস্তে গ্যালেন। সন্ধ্যাবধূ শাঁক ঘণ্টা ও ঝিঁঝিঁপোকার মঙ্গল শব্দের সঙ্গে স্বামীর অপেক্ষা কত্তে লাগলেন। প্রিয়সখী প্রদোষ দূতীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিশানাথকে সম্বাদ দিতে গেলেন।..."

'হুতোম পঁ্যাচার নক্শা' প্রচারিত হওয়ার পর যদিও অনেকে মনে করেন যে হুতোমি ভাষা রঙ্গব্যঙ্গের উপযুক্ত হলেও চিন্তাশীল সিরিয়াস ধরণের গদ্য-রচনার উপযোগী নয়, (এধরণের ধারণা আজও কোন কোন মহলে প্রচলিত আছে)

তাঁদের সে ধারণা যে সম্পূর্ণ ঠিক নয়, তার প্রমাণও 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় আছে ঃ

"হায়! যাদের জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূরে হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষরাই সমস্ত ভয়াবহ দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে।..."

প্রকৃতপক্ষে কি শাণিত ব্যঙ্গরচনায়, কি গভীর গম্ভীর বিষয়ের উপস্থাপনায় হুতোমি ভাষার চলিত রীতির প্রয়োগের আশ্চর্য দক্ষতা দেখে একে বিদ্যাসাগর বা অক্ষয় দত্তের যুগের, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র নিকটবর্তী কালের (অবশ্য তখনও 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত হয় নি) ভাষা বলে কল্পনা করতে বিস্ময় বোধ হয়। তবুও যখন এই হুতোমি ভাষার বিরুদ্ধে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রাজ্ঞ সমালোচককেও "হুতোমীভাষায় গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত নয়" বলে আক্রমণ করতে দেখা যায়, তখন আরও পরবর্তীকালে সাহিত্যে চলিত ভাষা প্রচলনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ, প্রমথ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথের সংগ্রামের কথা আমাদের মনে পড়ে যায়।

আবার মধুসূদন যেমন একই সঙ্গে প্রহসন এবং মহাকাব্যরচনায় লিপ্ত ছিলেন কালীপ্রসন্ন তেমনি একই সঙ্গে নক্শা ও মহাভারতের গদ্যানুবাদে ব্যাপৃত ছিলেন। একই প্রতিভার মধ্যে একই সঙ্গে এই গম্ভীর ও হালকা মেজাজের বিপরীতধর্মিতা আমাদের বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত করে। এখন ১৮৫৮ থেকে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অনূদিত এবং ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের গদ্য মহাভারতের ভাষারীতি থেকে কালীপ্রসন্নের গদ্যরীতির কি পরিচয় পাওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। অবশ্য সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে আমাদের বলা প্রয়োজন যে কালীপ্রসন্ন সম্পাদিত এই গদ্য মহাভারত প্রধানতঃ পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা অনূদিত হলেও বিভিন্ন পণ্ডিতদের দ্বারা বিভিন্ন অংশ অনুবাদ করার পর অনুবাদগুলি যে কালীপ্রসন্নের হাতে সম্পাদিত হত ও প্রয়োজনবোধে সেই পণ্ডিতীভাষার সংস্কারসাধিত হত এবং মহাভারতের কিছু কিছু অংশের অত্যুৎকৃষ্ট অনুবাদ যে স্বয়ং কালীপ্রসন্নের লেখনী থেকেই বেরিয়েছিল ("Some of the finest specimens of Bengali in the translation of the Mahabharata were from his pen") সে তথ্য উপযুক্ত প্রমাণ সহযোগে 'অনুবাদ সাহিত্য

ও কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়ে দিয়েছি। তবে ঠিক কোন্ কোন্ অংশ যে কালীপ্রসন্নের নিজস্ব রচনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হতে না পারায় মহাভারতের ভাষায় কালীপ্রসন্নের সম্পাদনা বা প্রয়োজনবোধে ভাষাসংস্কারের প্রসঙ্গের উপরেই আমাদের সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে ("All the volumes attest the touches of the practised hand of the Editor in chief, We mean the Baboo himself.")। 'অনুবাদ সাহিত্য ও কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়ে আমরা বলেছি যে, সম্ভবতঃ এই কারণেই বর্দ্ধমানের মহাভারত এবং কালীপ্রসন্নের মহাভারত উভয়ই পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা অনূদিত হলেও কালীপ্রসন্নের গদ্য-মহাভারতের ভাষা বর্দ্ধমানের গদ্যমহাভারতের ভাষার চেয়ে অনেক বেশী সাবলীল ও প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। কালীপ্রসন্ন নিজেও তৎসম্পাদিত মহাভারতের 'ভূমিকা'য় বলেছেন, "লালিত্য পরিরক্ষানার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি।" আধুনিক কালে সুবোধ ঘোষ যে 'ভারত প্রেমকথা' রচনা করেছেন তার ভাষার সঙ্গে কালীপ্রসন্নের গদ্যমহাভারতের ভাষার কৌতূহলোদ্দীপক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য-মূলক বিচারে দেখা যাবে যে উভয়ক্ষেত্রেই মহাভারতীয় পরিবেশ রক্ষা করার চেষ্টা হলেও 'ভারত প্রেমকথা'র ভাষায় চলিত ক্রিয়াপদের আধারে বহু বৈদগ্ধ্য-পূর্ণ তৎসম শব্দের সমাবেশে শিল্পিত কারুকার্য সৃষ্টির চেষ্টা অধিক, অন্যদিকে কালীপ্রসন্নের মহাভারতে সাধুক্রিয়াপদ-সমন্বিত সাধুগদ্যরীতির আধারে তৎসম বাহুল্য সত্ত্বেও প্রাঞ্জলতা রক্ষার প্রয়াস অধিক। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ভাষ্য-সম্বলিত মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানমূলক 'ভারত প্রেমকথা'য় ভাষার এই শৈল্পিক প্রকাশ বিশেষ উপযোগী হলেও সমগ্র মহাভারতের অনুবাদের মতো মহাকাব্যিক বিশালতায় ভাষার শৈল্পিক কারুকার্য অপেক্ষা ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতাই সমধিক উপযোগী। সাম্প্রতিক কালে বুদ্ধদেব বসুও তাঁর 'মহাভারতের কথা' লিখতে গিয়ে কালীপ্রসন্নের মহাভারতের গদ্যভাষা সম্বন্ধে তাঁর সশ্রদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, "ভাষা ব্যবহারে তৎসম শব্দের অবিরল নিবিড়তার জন্য সংস্কৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়, অথচ কোথাও নেই কৃত্রিমতা বা দূরান্বয়, প্রতিটি বাক্যের ধ্বনিকল্লোল মনোহর এবং অনেক স্থলেই মূলের শব্দে সম্বন্ধ— মোটের উপর বলতে পারি যে একাধারে সুখপাঠ্য ও মূলানুগ সমগ্র অনুবাদ হিসেবে কালীপ্রসন্ন বাংলা সাহিত্যে এখনো অদ্বিতীয়।"

এবার সাময়িক পত্রসম্পাদক কালীপ্রসন্নের গদ্যরীতির কিছু পরিচয় দিয়ে বাংলা গদ্যে কালীপ্রসন্নের বিচিত্র ও বহুমুখী অবদানের প্রসঙ্গটি শেষ করব।

'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা', 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা', রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরবর্তী 'বিবিধার্থসংগ্রহ' এবং দৈনিক পত্র 'পরিদর্শকে'র সম্পাদনা ও পরিচালনা প্রসঙ্গে সাময়িক পত্র ও দৈনিক পত্র সম্পাদক কালীপ্রসন্নের বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছি ঐ নামাঙ্কিত অধ্যায়ে।

এখানে তাঁর সাময়িক পত্রে গদ্যরীতির পরিচয় প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরবর্তী 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র ভূমিকা থেকে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র সম্পাদনাভার গ্রহণ করার কারণ হিসাবে উল্লিখিত কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করি :—

"জন্মদাতা হইতে স্বতন্ত্রিত ও সহসা অপরিচিত হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে অনেকে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন; বিশেষত শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পরিবর্তে তৎপদে অপর ব্যক্তির সুশৃংখলে কার্য্য নির্ব্বাহ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। বিবিধার্থ যে প্রকার পত্র, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন, অনুবাদক-সমাজ বিবিধার্থ সহৃদয়-সমাজের স্নেহভাজন ও পাঠকমণ্ডলীর নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে জানিয়াই অগত্যা আমারে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন;…"

সাময়িক পত্র ও দৈনিক পত্রে কালীপ্রসন্নের রচনার প্রতিনিধিত্বমূলক এই ক'টি বাক্য থেকেই বোঝা যাবে (পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের রচনার নিদর্শন পাওয়া যাবে সামগ্রিকভাবে সাময়িক পত্র ও দৈনিক পত্রে কালীপ্রসন্নের গদ্যভঙ্গি কত সরল ও বলিষ্ঠ ছিল।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করি। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র ৭ম পর্বের শ্রাবণ সংখ্যায় কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' অবলম্বনে 'কন্দর্পদর্পচূর্ণ" নামে যে আখ্যায়িকার প্রথম সর্গ এবং ভাদ্র সংখ্যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গ প্রকাশিত হয়েছে, লেখক হিসাবে তার কোন নাম নেই; ভাষা বিচার ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণ দৃষ্টে আখ্যায়িকাটি 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের অনুবাদক এবং 'বিবিধার্থ" ৭ম পর্বের পত্রিকা সম্পাদক স্বয়ং কালীপ্রসন্নেরই রচিত বলে মনে হয়। এই 'কন্দর্পদর্পচূর্ণ' আখ্যায়িকার গদ্যরীতির পরিচয় দেওয়ার জন্য তা থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করি :—

"কন্দর্প দূর হইতে তেজোরাশির ন্যায় ত্রিলোচনকে নয়ন গোচর করিয়া ভয়ে এরূপ অবসন্ন হইলেন যে, তাঁহার হস্ত হইতে ধনুঃশর স্রস্ত হইয়া পড়িল, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না। এমন সময়ে গিরিরাজকন্যা লোহিত

বসন পরিধান পূর্ব্বক সৌন্দর্য্যগুণে কামদেবের নির্ব্বাণ প্রায় তেজ উদ্দীপিত করিয়া পদ্মরাগ মণির ন্যায় অশোক, সুবর্ণ সদৃশ কর্ণিকার ও মুক্তাফলতুল্য সিন্ধুবার প্রভৃতি বসন্তপুষ্পের আভরণে অলংকৃত ও স্তনভারেই যেন কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া দুটি বনদেবতাকে সঙ্গিনী করিয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন ; বোধ হইল যেন কিশলয়-শোভিনী লতা প্রচুর পুষ্পভরে ঈষৎ অবনত হইয়া সেই স্থানে সঞ্চরণ করিতেছে ।..."

এবার বাংলা গদ্যের সেই গঠমানতার যুগে কালীপ্রসন্নের ভাষার সৌকর্য ও গাঢ়বন্ধতা কত উচ্চগ্রামে উঠেছিল তার একটি তুলনামূলক স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য আরও অনেক পরবর্তীকালে (১৩১৪ সালে প্রকাশিত) রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধের কিছু সদৃশ বাক্য উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি :— "চারিদিকে অকাল বসন্তের অজস্র সমারোহ, তাহারই মাঝখানে গিরিরাজনন্দিনী কী মোহনবেশেই না দেখা দিলেন ! অশোক কর্ণিকারের পুষ্পভূষণে তিনি সজ্জিতা, অঙ্গে বালারুণ বর্ণের বসন, কেসরমালার কাঞ্চী পুনঃ পুনঃ স্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, আর তিনি ভয়চঞ্চল লোচনে ক্ষণে ক্ষণে লীলাপদ্ম সঞ্চালন করিয়া দুরন্ত ভ্রমরগণকে নিবারণ করিতেছেন ।....পর্যাপ্ত যৌবনপুঞ্জে অবনমিতা উমা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় আসিয়া গিরিশের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন, তাঁহার কর্ণ হইতে পল্লব এবং অলক হইতে নবকর্ণিকার বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল ।"

এখানে স্মরণীয় যে পূর্বোদ্ধৃত 'কন্দর্পদর্পচূর্ণ' আখ্যায়িকার অংশ এবং রবীন্দ্রনাথের 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধের সদৃশ অংশ কোনটিই কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে'র পুরোপুরি আক্ষরিক অনুবাদ নয় ; তথাপি অর্দ্ধশতাব্দী বৎসরের ব্যবধানে এই দুই প্রতিভাবানের রচনার কোন একটি অংশে গদ্যভঙ্গির এই অপরূপ প্রসাদগুণ সম্পন্ন সাদৃশ্য আমাদের বিস্ময় চকিত করে ।

এবার প্রবন্ধ, নাটক, নক্শা, মহাভারত এবং সাময়িক পত্রে ব্যবহৃত কালীপ্রসন্নের প্রতিনিধিত্বমূলক গদ্য থেকে কিছু অংশ তুলে ঐসব অংশের শব্দসজ্জা বা শব্দ ব্যবহারের গোত্র নির্ণয় ক'রে ঐ শব্দ প্রবাহে বিশেষ বিশেষ গোত্রের শব্দের আনুপাতিক হার নির্ণয় ক'রে এবং বক্তব্য বিষয়ের পরিবর্তনে ঐ অনুপাতের যদি কোন পরিবর্তন হয়ে থাকে তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আমরা বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব ।

(ক) প্রবন্ধ :—

বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে যে সকল কুৎসিত প্রথা প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া একটি সামান্য কুপ্রথা নহে। পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইলে ইহা নানা অনিষ্টের মূল। দেখ মাতা পিতা পুত্রটির পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই কিরূপে কন্যাসাত করিবেন সর্ব্বদা এই চিন্তাতেই ব্যাকুল থাকেন। কেবল চিন্তিত থাকেন এমন নহেন অতীব যত্ন সহকারে কুলাচার্য্যকে সমাহবান করিয়া কন্যা অন্বেষণে নানা দিগ্দেশে প্রেরণ করেন। ('বাল্যবিবাহ')

(খ) নাটক :—

মালতী। কেন সখি আমি কিসে অপরাধী হলেম।

লবঙ্গিকা। সখি তোমার নিরুপম সৌন্দর্য্য ও অপাঙ্গভঙ্গিতে তিনি এমন মোহিত হয়েছিলেন যে মালার শেষ ভাগটী ভাল করে গাঁত্তেও পাল্লেন্ না। ('মালতী মাধব')

(গ) নক্শা :—

সহরে ঢি ঢি পড়ে গ্যাচে আজ রাত্তিরে অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পুজোয় হাফ আখড়াই হবে। কি ইয়ার গোচের স্কুল বয়, কি বাহাত্তুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল!

(ঘ) মহাভারত :

অনন্তর মহাবল দুর্য্যোধন মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া ভ্রাতৃমধ্য হইতে সহসা উত্থিত হইলেন এবং সম্মুখে আসীন ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন, 'হে ভীম! কর্ণের প্রতি এরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করা তোমার সমুচিত নহে।'

(ঙ) সাময়িক পত্র :—

ইজিপ্ট অত্যন্ত প্রাচীন রাজ্য, ইহা যে কত প্রাচীন তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করা এত কঠিন যে কোন গ্রন্থকারই ইহার আদিম অবস্থার কাল নিরূপণ করিতে পারেন নাই। ইহার প্রাচীন নাম মিসর। জোসেফ্স্ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার নির্দেশ করেন যে, পূর্ব্বকালে নূহের বংশোদ্ভব মিসরেম ঐ রাজ্যের আরম্ভ করাতে হিব্রু ভাষায় উহার নাম 'মিসরেম' বলিয়া উক্ত হয় এবং সেই অনুসারে আরবেরা উহাকে মিসর বলিয়া উল্লেখ করে। ('বিবিধার্থ সংগ্রহ' ৭ম পর্ব)

শব্দের গোত্র অনুযায়ী শব্দগুলিকে তৎসম, তদ্ভব, অর্দ্ধতৎসম, দেশী, বিদেশী ও মিশ্র—এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করলে উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ গুলিতে ব্যবহৃত শব্দগুলির নিম্নলিখিত বিন্যাস রূপ পাই :—

শব্দের গোত্র	(ক) (প্রবন্ধ)	(খ) (নাটক)	গ (নকশা)	ঘ (মহাভারত)	ঙ (সাময়িক পত্র)
তৎসম	৬২%	৩৫%	১২%	৭২%	৪৫%
তদ্ভব	৩৮%	৫৭%	৩২%	২৮%	৩৯%
অর্দ্ধতৎসম	0%	৮%	১২%	০%	০%
দেশী	0%	0%	৮%	০%	০%
বিদেশী	0%	0%	২৪%	০%	১৬%
মিশ্র	0%	0%	১২%	০%	0%

বক্তব্য বিষয়ের পরিবর্তনে কালীপ্রসন্নের শব্দ ব্যবহারে যে তারতম্য ঘটেছে তা উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে শব্দব্যবহারের শতকরা হারের তারতম্য থেকে খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। সাহিত্যে ভাষার প্রকৃতিভেদ সম্বন্ধে বোনামিডব্রি মন্তব্য করেছিলেন—"Men do not always speak with the same voice.. We may expect a man's style to vary when the object in writing is different." কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধ রচনার প্রতিনিধিত্বমূলক অনুচ্ছেদটিতে আছে তৎসম ৬২%, তদ্ভব ৩৮% এবং অর্দ্ধতৎসম, দেশী, বিদেশী ও মিশ্র শব্দ 0%। আর এই তৎসম প্রাধান্য স্বাভাবিক ভাবেই সর্বাধিক রূপ নিয়েছে মহাভারতের ভাষায়—সেখানে তৎসম ৭২% এবং তদ্ভব ২৮%; অর্দ্ধতৎসম, দেশী, বিদেশী ও মিশ্র শব্দ 0%। কালীপ্রসন্নের নাটকগুলির মধ্যে থেকে বিশেষভাবে 'মালতী মাধবে'র সংলাপ সংকলন করেছি এই কারণে যে এই নাটকেই বাংলা গদ্যে প্রথম সচেতনভাবে আগাগোড়া চলিত রীতি ব্যবহার

করেন। তবু নাটকটি ভবভূতির সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বলে এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র পূর্বে কালীপ্রসন্ন এই নাটকেই চলিত রীতির প্রয়োগ ব্যাপারে প্রথম আগাগোড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন বলে শব্দ ব্যবহারে দ্বিধার ভাবটি সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এখানে অবশ্য তৎসম শব্দের হার কমে গিয়ে ৩৫% এবং তদ্ভব শব্দের হার বেড়ে গিয়ে ৫৭% হয়েছে; সেই সঙ্গে অর্দ্ধতৎসম শব্দের হার হয়েছে ৮%। তবু আমাদের স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এই সংস্কৃত থেকে অনুবাদ নাটকে কিছু তৎসম শব্দ যেমন অনিবার্যভাবে এসেছে, তেমনি চলিত রীতির এই নাট্যসংলাপে আবার কিছু তৎসম শব্দ অনধিকার প্রবেশ করেছে এবং যে পরিমাণে তা করেছে, সেই পরিমাণেই তা নাটকের ভাষাকে কৃত্রিম করেছে। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় এসে চলিতরীতি এই কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত হয়েছে এবং তার স্বাধীন স্বভাববৈশিষ্ট্য এতখানি অর্জন করেছে যে এ ভাষাকে অজ্র শতাধিক বৎসরের ব্যবধানেও আধুনিক কথ্যভাষা বলতে আমাদের দ্বিধা হয় না। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে এই নক্শার ভাষা সমাজ পরিবেশ থেকে উদ্ভূত হওয়ায় এবং কলকাতার কথ্যভাষাকে প্রধানভাবে অবলম্বন করায় একটি আদর্শ সাহিত্যিক চলিত ভাষায় যতটা তৎসম শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে সে তুলনায় এই নক্শার মধ্যে তৎসম শব্দ ব্যবহারের অনুপাত হয়ত কিছুটা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তৎসম ১২%, তদ্ভব ৩২%, অর্দ্ধতৎসম ১২%, দেশী ৮%, বিদেশী ২৪% এবং মিশ্র ১২%; তবু নক্শার বক্তব্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখলে বোঝা যাবে তৎসম শব্দের তুলনায় তদ্ভব, অর্দ্ধতৎসম, দেশী, বিদেশী এবং মিশ্র শব্দের এই আধিক্য ছিল অপরিহার্য। 'ঢি ঢি' 'বারোইয়ারি' 'হাফ আখড়াই' 'ইয়ার গোচর স্কুল বয়' বা 'বাহাদুরে ইনডেভিডে'র বদলে যদি কোন তৎসম শব্দ ব্যবহার করা হত তাহলে ভাষার মধ্যে শব্দনির্বাচনের যা প্রধানতম গুণ শব্দের সেই প্রকাশশীলতাই আহত হত এবং একটি বিশিষ্ট ভাষা-রীতির যে বিশিষ্ট স্টাইল বা দীপ্তি সেইটিই বিনষ্ট হত। কালীপ্রসন্নের সাময়িক পত্রের ভাষা সাধু গদ্যরীতিতে রচিত হলেও এই ভাষা মহাভারতীয় গাম্ভীর্য এবং নক্শার চাপল্যের যেন ঠিক মাঝখানে স্থাপিত হয়েছে—মহাভারতের ভাষায় তৎসম শব্দ যেখানে ৭২% এবং নক্শায় ১২% সেখানে সাময়িক পত্রের ভাষায় তৎসম ৪৫%, তদ্ভব ৩৯% এবং বিদেশী ১৬%। আসলে তৎসমই হোক্ বা তদ্ভবই হোক্, ভাষার শব্দসম্পদে যদি কলানৈপুণ্য থাকে এবং বক্তব্য বিষয়ের বিভিন্নতা অনুযায়ী যদি ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের শব্দব্যবহারে থাকে মাত্রাচেতনা বা পরিমিতিবোধ তাহলে সে ভাষায় আড়ষ্টতা থাকে না,

বিষয়বৈচিত্র্যের সঙ্গে শব্দবৈচিত্র্যের আকাঙ্ক্ষিত সমন্বয়ে যে ভাষা হয়ে ওঠে যথার্থই আস্বাদ্যমান।

১। S. K. De: History of Bengali Literature in the Nineteenth Century (Calcutta 1919) p. 219.

২। রাজনারায়ণ বসু : বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা—পৃঃ ২৫।

৩। ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দ্বিতীয় পর্যায় (২য় সং) পৃঃ ১৮৩।

৪। হরচন্দ্র ঘোষ : ভানুমতী চিত্তবিলাস : ভূমিকা।

দ্বাদশ অধ্যায়

কালীপ্রসন্ন ও সমকালীন সাহিত্যিক

(১)

কালীপ্রসন্ন ও তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে যে সাযুজ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে প্রথমেই ধরা যাক্ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা। রবীন্দ্রনাথ একদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্র এবং অন্যদিকে সাধারণ বাঙালীর চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে 'বিদ্যাসাগর চরিতে' বলেছেন, "বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটিতে প্রকাশিত সাধারণ সত্যের মধ্যে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০) জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের সকলরকম উদারনৈতিক কাজে সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহযোগী, কিন্তু অকালমৃত্যুর ফলে যাঁকে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইহলোক থেকে চলে যেতে হল। বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) প্রলম্বিত আয়ুষ্কালেও দেখি ১৮৫০ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত তাঁর কর্মজীবনের মধ্যাহ্নকাল। তারপরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কাশীতে বিদ্যাসাগরের মাতার মৃত্যু থেকে শুরু করে একে একে ঘটে গেছে বড়ো বড়ো আশাভঙ্গ, জীবনে নেমে এসেছে অপরাহ্নের দীর্ঘ ছায়া; ১৮৭৫ থেকে তিনি নিজেই ভগ্নস্বাস্থ্য, জীবন-সায়াহ্নের সেই আলো-আঁধারির খেলা চলেছে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই অসাধারণ মানুষটির সম্পূর্ণ অন্তগমন পর্যন্ত।

ব্যক্তিগত জীবনচর্চায় ছিল বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন ক'রে এবং কার্কপেট্রিক সাহেবের কাছে ইংরেজি শিক্ষায় বিশেষভাবে শিক্ষিত হয়েও ধনী জমিদারের একমাত্র পুত্র কালীপ্রসন্ন চিরজীবন মোটা চাদর এবং চটি জুতো পরতেই ভালোবাসতেন। কালীপ্রসন্ন এবং বিদ্যাসাগর উভয়েই তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় না দিয়ে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভালো

দিকগুলিকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হননি, কিন্তু তাঁরা বুঝেছিলেন যে এই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবং সভ্যতা পাশ্চাত্ত্য পোশাকের গুণ নয়, আর সেজন্য ইয়ংবেঙ্গল দলরূপে পরিচিত হিন্দু কলেজের অন্যান্য অনেক ইংরেজি-মুগ্ধ ছাত্রের মত কালীপ্রসন্ন পাশ্চাত্ত্য পোষাক-পরিচ্ছদের অন্ধ অনুকরণ করেননি। চটি-চাদরের মত জাতীয় পোষাক বিদ্যাসাগরের মত কালীপ্রসন্নের কাছেও ছিল আত্মমর্যাদা ও জাতীয় মর্যাদাবোধের প্রতীক।

শুধু পোষাক-পরিচ্ছদেই নয়, চরিত্রের দিক থেকেও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের কতখানি সাদৃশ্য ছিল তা বোঝা যায় কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে ১২৭৭ সালের ১০ই শ্রাবণ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত একটি সংবাদে: "তিনি দয়ার সাগর ও বদান্যতার আকর ছিলেন।...তিনি কপটতা ও আড়ম্বরের অতিশয় বিপক্ষ ছিলেন।... তাঁহার পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে লেশমাত্র আড়ম্বর ছিল না।...মাতৃভক্তি, দয়া ও দানশীলতা সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন সিংহ আদর্শস্বরূপ ছিলেন।"

বিদ্যাসাগর তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে ১২৭৭ সালের ৩১শে শ্রাবণ তারিখে সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি, এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্তস্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।" এই বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের সময় যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিনী সভা এবং কলকাতার ধর্মসভা বিদ্যাসাগরের মতকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে। কিন্তু কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে প্রবলভাবে সমর্থন জানায়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ব্যবস্থাপক সভায় যখন বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের বিচার-বিবেচনা চলছিল, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভা বহুলোকের স্বাক্ষরযুক্ত একটি আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণের ব্যবস্থা করে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই আইন বিধিবদ্ধ হলে কালীপ্রসন্ন 'সংবাদ প্রভাকরে' (২২শে নভেম্বর ১৮৫৬) ঘোষণা করেন যে বিধবা বিবাহেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা এক সহস্র টাকা পুরস্কার দিতে স্বীকৃত আছেন।

বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ছাড়া বহু বিবাহ নিবর্তন এবং কৌলীন্য প্রথা রহিত করার আন্দোলনেও কালীপ্রসন্ন ছিলেন বিদ্যাসাগরের সহযোগী।

আবার শুধু সমাজ সংস্কার নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও কালীপ্রসন্নের চিন্তা এবং চেষ্টা ছিল বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অভিন্ন।

সংস্কৃত কলেজের হাতে লেখা অপ্রকাশিত নথিপত্রের মধ্যে "Notes on the Sanscrit College" শিরোনামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে লেখা সুদীর্ঘ ২৬ প্যারা সম্বলিত যে রচনাটি পাওয়া গেছে তার মধ্যে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের এমন সামগ্রিক রূপটি ফুটে উঠেছে যা অন্যত্র দুর্লভ। এই রচনার প্রথম প্যারাটি হল :—

১। বাংলা দেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর ব্যালেন্টাইনের রিপোর্টের সমালোচনা করে শিক্ষা পরিষদের সেক্রেটারী ময়েট সাহেবের কাছে লিখিত একটি পত্রে লিখেছিলেন, "...জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার—এই এখন আমাদের প্রধান প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাঙলা স্কুল স্থাপন করতে হবে, এই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করতে পারে এমন একদল কর্মী সৃষ্টি করতে হবে—তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে।" আবার বিদ্যাসাগরের যে মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে বাংলার ছোটলাট ফ্রেডারিক হ্যালিডে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর বড়লাটের কাছে যে শিক্ষাসংক্রান্ত মিনিটটি পাঠান তারও প্রথম অনুচ্ছেদ হল :—

২। সুবিস্তৃত এবং সুব্যবস্থিত বাংলা শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয় ; কেন না, মাত্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব।

এই সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পূর্বোল্লিখিত "Notes on the Sanscrit College"এর আর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত হল :—

যাঁরা ইউরোপীয় জ্ঞানভান্ডার থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ করতে সক্ষম নন, এবং সেগুলিকে পরিচ্ছন্ন ও প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম তাঁরা (সুসমৃদ্ধ বাংলা) সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সুসমৃদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষা সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতদেরও ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

এরপর বিদ্যাসাগর জানান—

অতএব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজী সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে একমাত্র তারাই সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি যে কালীপ্রসন্ন ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বংশবাটী গ্রামের বঙ্গীয় বিদ্যালয়ে মাসিক একশত টাকা দান স্বীকার ক'রে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন ইংরেজী শিক্ষক এবং সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন সংস্কৃত পন্ডিত নিযুক্ত করেন এবং তাঁর বিদ্যোৎসাহিনী পাঠশালা সমেত ৭টি অবৈতনিক বিদ্যালয় দেশের বিভিন্নস্থানে স্থাপন করেন এবং ভারত সরকার সমগ্র বাংলা দেশে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত মাত্র ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহনে অক্ষমতা প্রকাশ করায় বালিকা বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে কালীপ্রসন্ন সেই বালিকা বিদ্যালয়ের অনেকগুলিতে নিয়মিত আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া কালীপ্রসন্ন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের বাংলা রচনায় উৎসাহিত করার জন্য সময়ে সময়ে পুরস্কার ও পদক বিতরণ করতেন। ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর চারজন ছাত্রকে বাংলা বিষয়ে উত্তম লেখার জন্য কালীপ্রসন্ন যে পদক প্রদান করেছিলেন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখের 'হিন্দুরত্ন কমলাকরে' প্রকাশিত এক সংবাদে সে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্রদের উৎসাহিত করা ছাড়াও কালীপ্রসন্ন জনসাধারণের মধ্য থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছেন এবং অনেক নূতন গ্রন্থকারের গ্রন্থ প্রকাশেও সাহায্য দান করেছেন। এইভাবে কালীপ্রসন্ন বাংলা শিক্ষা ও বাংলা সাহিত্য প্রচারে দেশবাসীকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির জন্য ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষার সমন্বয় সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি যে সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যখন দেখি স্বয়ং বিদ্যাসাগরকেই নিজের চেষ্টায় ইংরেজী শিখতে হয়েছে এবং মধুসূদনকে নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত শিখতে হয়েছে এবং কালীপ্রসন্ন এবং বঙ্কিমের শিক্ষায় ইংরেজী এবং সংস্কৃতের সমন্বয় সাধিত হয়েছে। আজকের দিনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিজস্ব রূপরীতি নির্মিত হওয়ার পর এই সমন্বয় সাধনের যতটা প্রয়োজন, বাংলা সাহিত্যের গঠমানতার যুগে যে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। এবং শুধু লেখক সৃষ্টি নয়, সেকালে এই নূতন ধরণের সাহিত্য সম্ভোগের জন্য উপযুক্ত পাঠকশ্রেণীর সৃষ্টিতেও

এই সমন্বয়ের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বিদ্যাসাগরের একটি বড় কৃতিত্ব এই যে তিনি তৎকালীন বাংলাদেশের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষানীতিতে একটি আদর্শ পথের সন্ধান দিয়েছিলেন এবং সেই নীতির রূপায়ণে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার সঙ্গে একই পথে মিলিত হয়েছিল কালীপ্রসন্নের প্রচেষ্টা।

কালীপ্রসন্ন এবং বিদ্যাসাগরের বিশেষ কর্মক্ষেত্র ছিল শিক্ষা, সমাজ এবং সাহিত্য। কিন্তু একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থায় একটি রাজনৈতিক আন্দোলনেও এঁরা দুজনে মিলিত হয়েছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মর্ডান্ট ওয়েল্‌স্‌ শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির জালিয়াতী অপরাধের বিচারের সময়[1] এবং নীলদর্পণ মামলার বাঙালী সাক্ষীদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে[2] যখন সমগ্র বাঙালী জাতিকে মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত বলে নিন্দা করেন, তখন জাতীয় সম্মান রক্ষার প্রশ্নে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাট মন্দিরে আয়োজিত বিরাট সভায় রাধাকান্ত দেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং কালীপ্রসন্নও মিলিত হন। এই সভায় বাঙালীর জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে ওয়েলসের অশিষ্ট উক্তির প্রতিবাদে কালীপ্রসন্ন রাজরোষ উপেক্ষা করে যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন, তা উচ্চ প্রশংসিত হয়। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বহু সহস্র বাঙালীর[3] স্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদপত্র গভর্নর জেনারেলের মারফতে পার্লামেন্টে পাঠানো হয় এবং ওয়েল্‌স বিলাতে তৎকালীন সেক্রেটারী অফ স্টেট স্যার চার্লস উডের তীব্র ভর্ৎসনা লাভ করেন। প্রসঙ্গতঃ একথাও স্মরণীয় যে এই ভর্ৎসনা ও সদুপদেশ লাভের পর ওয়েল্‌স্‌ তাঁর আচরণ পরিবর্তন করে এত বেশী লোকরঞ্জক হয়েছিলেন যে তাঁর বিদায়গ্রহণকালে এদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁকে ব্যথিতচিত্তে বিদায় অভিনন্দন দেন এবং উল্লেখ্য যে সেই বিদায় অভিনন্দনের সভাতেও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কালীপ্রসন্নও উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের আর একটি চরিত্রগত মিল দেখি — দুজনের মধ্যে কেউই তৎকালীন ধর্মান্দোলনের কোলাহলে নিজেকে যুক্ত করেননি। এরা দুজনেই হয়তো ভেবেছিলেন, ধর্মান্দোলনের চোরাগলির পথ থেকে যদি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রশস্ত পথের দিকে সমাজের গতি ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলতে আর খুব বেশি বিলম্ব হবে না। ধর্ম এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে এক গোঁড়ামির মূলোচ্ছেদ করতে গিয়ে পাছে আর এক গোঁড়ামির গোড়াপত্তন হয়, এই ভয়ে এ ব্যাপারে

বিদ্যাসাগর প্রায়শঃই নীরব থাকতেন এবং এ বিষয়ে মতামত প্রকাশের জন্য খুব বেশী পীড়াপীড়ি করলে অনেক সময়েই মূল প্রশ্ন এঁড়িয়ে গিয়ে রসিকতা করে বলতেন, 'মরে পরের জন্য বেত খেতে পারব না।'[৪] কারণ বিদ্যাসাগরের কথায় কে কী বিশ্বাস করে বসবে, আর যদি পরকাল থাকে, যমদূত এসে বলবে, 'দোষ ওর নয়, দোষ ঐ বিদ্যাসাগরটার, তাকেই শাস্তি পেতে হবে।' তাছাড়া ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর লেশমাত্র কপটতাও সহ্য করতে পারতেন না বলে রামতনু লাহিড়ীর মত সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী মানুষও যখন গৃহিনীর অনুরোধে ব্রাহ্মণ পাচক খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, তখন তিনি পরিহাস না করে পারেন নি 'কেন হে, আবার বামুনের দরকার কি? বাবুর্চি খানসামা হলেই ত চলে।' রামতনু উত্তর করলেন, 'হাঁ. আমার কোন আপত্তি নাই বটে, কিন্তু বাড়ির ভেতর যে বামুন ছাড়া চলবে না।' একথা শুনে বিদ্যাসাগর হেসে বললেন 'বাপের কথায় পৈতাগাছটি রাখতে পারলে না; এখন পরিবারের কথায় বামুন খুঁজতে বেরিয়েছ!'[৫]

আমরা দেখি কালীপ্রসন্নও ধর্মান্দোলনে কোনপ্রকার কপটতাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন নি। এইসব আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আন্তরিকতা সত্ত্বেও তলায় তলায় দলভুক্ত ব্যক্তিদের যে কপটতা প্রসার লাভ করছিল, তাকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করে কালীপ্রসন্ন তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় লিখেছেন—'আজকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়াকান্না কাঁদতেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুঝতে পারবেন না - আড্‌ডা থেকে না ডাকলে শুনতে পাবেন না, ক্রমে কৃশ্চানী ও ব্রাহ্মধর্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।" শুধু ব্রাহ্মধর্ম নয়, বৈষ্ণব, শাক্ত নির্বিশেষে হিন্দুধর্ম এবং খৃষ্টধর্মের মধ্যেও যেখানে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি এবং ভন্ডামি দেখছেন সেখানেই কালীপ্রসন্ন তাঁর তীক্ষ্ম পরিহাস ও বিদ্রুপের শরবর্ষণ করেছেন। এই সমালোচনায় কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগরের মতই গির্জা, মন্দির, মসজিদ, ব্রাহ্ম উপাসনা—সকল বিষয়েই সমান নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পেরেছেন, তবে ধর্ম ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের নিষ্ক্রিয়তার তুলনায় কালীপ্রসন্ন এইসব ধর্মীয় কপটতার বিরুদ্ধে কিছুটা প্রগলভ এবং আক্রমণমুখী হয়ে উঠেছেন। অবশ্য সমাজকে প্রগতিশীল রাখার জন্য কালীপ্রসন্নের এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু উনবিংশ শতাব্দী না, বিংশ শতাব্দীতেও কতখানি প্রয়োজন তার যৌক্তিকতা বিচার করতে গেলে ডঃ

অ্যালেক্স্ আর্নসন লিখিত 'রোলাঁ এন্ড টেগোর' বইয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোলাঁর আলোচনার সময় রবীন্দ্রনাথের অভিমতটি মনে পড়ে—"বাস্তবিক পক্ষে একটি সুস্থ অসহিষ্ণুতার অভাবে আজ আমাদের ধর্মজীবন প্রগতিশীল বা সৃজ্যমান হতে পারছে না। বরং এক ধরণের অনীশ্বরতাবাদ ভারতের পক্ষে কল্যাণজনক হতে পারে। কারণ আমি জানি যে, আমাদের দেশ এই অনীশ্বরতাবাদকে কখনই চিরকালের জন্য গ্রহণ করবে না। এই সুস্থ বলিষ্ঠ মতবাদ ধর্মারণ্যের অবাঞ্ছিত আবর্জনারাশি উচ্ছেদ করবে এবং মহীরুহরাই অক্ষত থেকে যাবে।" (অমিতাভ চৌধুরী, 'কবি ও সন্ন্যাসী'।)

সাহিত্য-সংস্কৃতির বিস্তৃত অঙ্গনেও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের সাযুজ্য এবং সাধর্ম্য দেখা দিয়েছে একাধিক ক্ষেত্রে। কালীপ্রসন্ন মহাভারত অনুবাদের ভার নেওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাভারতের উপক্রমণিকা ভাগের প্রথম বাষট্টি অধ্যায় পর্যন্ত অনুবাদ করে অনুবাদের কাজ ছেড়ে দেন এবং কালী-প্রসন্নকে এ বিষয়ে শুধু যে উৎসাহিত করেন তাই নয়, কোন কার্যোপলক্ষে কালীপ্রসন্ন কলকাতায় অনুপস্থিত থাকলে বিদ্যাসাগর নিজে এসে মাঝে মাঝে মহাভারত অনুবাদের তত্ত্বাবধান করেছেন এবং কালীপ্রসন্নের নিজস্ব অনুবাদের অংশ বা পণ্ডিতদের অনুবাদের পর কালীপ্রসন্নের ভাষা সংস্কারের কিছু কিছু অংশও সময়ে সময়ে দেখে দিতেন।[৬]

কালীপ্রসন্ন তাঁর মহাভারত অনুবাদে যেমন গভীর গম্ভীর এবং 'হুতোম প্যাঁচার' নক্শায় পরিহাসমুখর, বিদ্যাসাগর তেমনি একদিকে 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা' ইত্যাদিতে তৎসমবহুল সাধু গদ্যের জনক রূপে খ্যাত হলেও ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' এবং 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য' ছদ্মনামে 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল,' 'ব্রজবিলাস' এবং 'রত্নপরীক্ষায়' লঘুরীতির রচনায় হাস্যকর ও তীক্ষ্ন শ্লেষের ব্যবহারে অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

কালীপ্রসন্ন এবং বিদ্যাসাগর দুজনেই অনেকগুলি পত্র-পত্রিকার পরি-চালনাতেও বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত পত্রিকাটি হল 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' (১৮৫০)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পরিচালকমণ্ডলীর ('পেপার কমিটি'র) সদস্যপদের দায়িত্বও বিদ্যাসাগর দীর্ঘদিন গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' নামে সাপ্তাহিক পত্র বিদ্যাসাগর প্রথম প্রকাশ করেন এবং পরে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের হাতে

এর সম্পাদনভার অর্পণ করেন। কালীপ্রসন্নও শুধু যে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' এবং 'পরিদর্শক' পত্রের সম্পাদনা করেন তাই নয়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করার পর বিখ্যাত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র ৭ম পর্বেরও সম্পাদনা করেন। তাছাড়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে কালীপ্রসন্ন পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পত্রিকার সর্বস্বত্ব কিনে নেন এবং বিদ্যাসাগরকে এই পত্রিকা পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। বিদ্যাসাগর তখন যুবক কৃষ্ণদাস পালকে পেট্রিয়ট সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত করেন।

বিদ্যাসাগরের আপোষহীন প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের জন্য 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' 'সুহৃদ সমিতি' প্রভৃতি তৎকালীন অধিকাংশ সভা-সমিতির সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ না থাকলেও কালীপ্রসন্নের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং এই সম্পর্কের মূলে ছিল কালীপ্রসন্নের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক[১]। কালীপ্রসন্নের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক কালীপ্রসন্নের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় ছিল।

বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের সঙ্গেও কালীপ্রসন্নের শেষ জীবনের কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়, যদিও কালীপ্রসন্নের শেষজীবনের সামগ্রিক চিত্রটি পেতে হলে বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের সঙ্গে মধুসূদনের শেষ জীবনের কিছু অংশকেও মিশ্রিত করতে হয়। মানুষের প্রতারণায় এমনকি আত্মীয় সুহৃদ-দেরও প্রবঞ্চনায় ক্লান্ত, পীড়িত বিদ্যাসাগর তথাকথিত ভদ্র সমাজ থেকে দূরে সরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কার্মাটাড়ে কপটতাহীন সাঁওতালদের সাহচর্যে শান্তিলাভের চেষ্টা করেছেন। মানবপ্রেমিক ও দানবীর কালীপ্রসন্নও শেষ জীবনে কয়েকজন বিশ্বস্ত আত্মীয়-বন্ধু কর্তৃক প্রতারিত হয়ে অবশেষে অধিকাংশ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন; কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত কোন শান্তির আশ্রয় খুঁজে না পেয়ে মধুসূদনের শেষজীবনের মত অতিরিক্ত মদ্যপান করে তিনি যেন মানুষের প্রতি অভিমানে অকালে অতিদ্রুত নিজের হাতেই নিজের জীবন ফুরিয়ে ফেলেছেন।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের এই ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য ও সাধর্ম্যের মধ্যে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যেখানে আশ্চর্যরকমভাবে নীরব, সেখানে কালীপ্রসন্ন হয়েছেন একক পথের যাত্রী। সেকালের সমাজে যা ছিল সবচেয়ে প্রধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সেই জমিদারি প্রথা ও কৃষক স্বার্থের

ব্যাপারে বহু অসঙ্গতি ও উৎপীড়ন দেখেও বিদ্যাসাগর নিজেকে অন্তুতভাবে গুটিয়ে রেখেছিলেন যদিও সেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন ছিলেন তা বোঝা যায় যখন দেখি বর্দ্ধমানের মহারাজা বীরসিংহ গ্রাম ও তার সংলগ্ন অঞ্চল তাঁকে তালুক হিসাবে দিতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, "আমার যখন এমন অবস্থা হবে যে, প্রজার খাজনা আমি নিজে দিতে পারব, তখন আপনার তালুক গ্রহণ করব।"[৮] তবু একথার সত্যতা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বাংলা দেশের সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজ উন্নয়নের যা মূল দাবী সেদিকে বিদ্যাসাগর কোন উদ্যোগ দেখান নি। এইখানে বহুধা বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের মধ্যেও বিদ্যাসাগরের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার কথা মানতে হবে। অন্যদিকে কালীপ্রসন্নকে দেখি মাত্র তেইশ বছর বয়সে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বৎসরিক সভায় তিনি বঙ্গদেশীয় কৃষিকার্যের বর্তমান অবস্থার সমালোচনা, কৃষিকার্যের উপযোগিতা, কৃষি সমাজ ও কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা এবং কৃষিজাত দ্রব্য ও কৃষিসাধন অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রদর্শনের মহোপকারিতা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেছেন।[৯] এবং শুধু তাই নয়, তিনি নিজে জমিদার হয়েও দেশের শতকরা আশীভাগ কৃষকের স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন সময়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজা-বিক্ষোভে প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর ১২৭৭ সালের ১০ই শ্রাবণ 'সোমপ্রকাশে' এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখা হয়, "সাধারণের কল্যাণকর কার্যে তাঁহার বিলক্ষণ যত্ন ছিল।...এই নিমিত্ত জমিদার হইয়াও প্রজার পক্ষ অবলম্বন করেন।" এখানে একটি কথা, কৃষক স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে বিদ্যাসাগর নিজে উদ্যোগী না হলেও এ বিষয়ে যে তাঁর সহানুভূতির কোন অভাব ছিল না তা বোধহয় অনুমান করা চলে। সম্ভবত অন্যান্য গুণের সঙ্গে এই কৃষক-দরদী গুণের জন্যও কালীপ্রসন্নের সঙ্গে সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরের (যিনি বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতাসুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি) চিরদিন সৌহার্দ্যের সম্পর্ক অক্ষুন্ন ছিল। উনিশ শতকের এই দুই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হয়েও যে সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিলেন তা হল অখন্ড মানবতাবোধ যেখানে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়াবেগের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। 'বিদ্যাসাগর চরিতে'র উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বয়ওয়েল

(ইংলন্ডের বিখ্যাত ব্যক্তি জনসনের প্রসিদ্ধ জীবনচরিতকার) কেহ ছিল না।" এ আক্ষেপ বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যতটা প্রযোজ্য, তার চেয়েও অনেক বেশি প্রযোজ্য মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্বন্ধে—কারণ বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত তাঁর পরবর্তীদের কাছে যতটুকু উদ্ঘাটিত হয়েছে কালীপ্রসন্নের তাও হয়নি কিংবা এ পর্যন্ত তা করার বিশেষ কোন চেষ্টাও হয়নি।

(২)

এবার আমরা আলোচনা করব কালীপ্রসন্নের (১৮৪০-৭০) সঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের (১৮২৪-৭৩) সম্পর্কের কথা, কারণ কালীপ্রসন্নের সঙ্গে মধুসূদনেরও গড়ে উঠেছিল একটি বিশেষ আত্মিক সংযোগ। এই দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত সম্বন্ধে যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতে' লিখেছেন, "মধুসূদন যখন পুলিশ আদালতে কার্য করিতেন, কালীপ্রসন্ন বাবুকে তখন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট রূপে মধ্যে মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে হইত। সেই হইতে তাঁহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল।" কিন্তু এ সংবাদ তথ্যগত দিক থেকে অভ্রান্ত নয়। মধুসূদন যখন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাতে ছিলেন, সেই সময় কালীপ্রসন্ন প্রথম অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট হন। ৪ঠা মে ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' লিখিত হয়, "আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ অনরারী মেজিস্ট্রেট হইয়াছেন।" প্রকৃতপক্ষে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার দুবছর পূর্বে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র ১ম খন্ড প্রকাশিত হলে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য এই নূতন কাব্যের রচয়িতা মধুসূদনকে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কালীপ্রসন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'য় সম্বর্ধিত করার আয়োজন করেন।

কালীপ্রসন্ন সাহিত্যিক মধুসূদনের গুণগ্রহণে কুণ্ঠিত না হলেও চরিত্রাংশে উভয়ের মধ্যে খুব বেশী সাদৃশ্য ছিল না। মধুসূদন ছিলেন ধনী, বিলাসী, অমিতব্যয়ী পিতার বিলাসী, অমিতব্যয়ী আদুরে পুত্র। মধুসূদনের অন্তরঙ্গ বন্ধু গৌরদাস বসাক মধুসূদনের বাল্যজীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে এক পত্রে লিখেছেন, "Old Rajnarain Dutta was smoking Albola (hooka). He passed the snake over to Madhu; This staggered me not a little,"[১০] মধুসূদনের বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতা তো প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে কালীপ্রসন্ন ধনী

জমিদারের পুত্র হলেও বেশিদিন পিতৃস্নেহ লাভ করতে পারেন নি ; মাত্র ছ'বছর বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন। শুধু তাই নয়, পিতা নন্দলাল সিংহ অত্যন্ত সৌখীন প্রকৃতির মানুষ হলেও কালীপ্রসন্ন আদৌ সৌখীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, "তাঁহার পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে আড়ম্বরের লেশমাত্র ছিল না।" মোটা চাদর এবং চটি জুতাই ছিল কালীপ্রসন্নের নিত্যসঙ্গী। তাছাড়া কালীপ্রসন্ন কোনদিন অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত না হলেও তাঁকে কোনমতে অমিতব্যয়ী বলা চলে না। কালীপ্রসন্নের সমকালীন বিখ্যাত ব্যক্তি আচার্য কৃষ্ণকমল তাঁর অর্থব্যয় প্রসঙ্গে বলেছেন, "তিনি যেমন তাঁহার Purse-এর সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন, তেমন আর কেহই জানিত না।"[১১] উভয়ের এই চারিত্রিক বৈসাদৃশ্যের মধ্যে চরিত্রগত এ কটি মৌলিক সাদৃশ্যও ছিল। এই সাদৃশ্যের কেন্দ্রবিন্দুটির সন্ধান পাই রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিতে' মধুসূদনের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে একটি উক্তি প্রত্যুক্তিতে। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, "আমি এই দীর্ঘ কথোপকথনের সময় বলিলাম যে, 'আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মতন হইলেও তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু।' তিনি বলিলেন, 'তুমি ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হিন্দু ; কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁসিয়া না থাকিলে চলে না এই জন্য খৃষ্টীয় সমাজে আছি।"[১২] এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, ধর্ম যেমন অনেকের জীবনে কেবল কতকগুলি আচার-আচরণ মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় একটি বাহ্য পোষাকের মতন থাকে, কালীপ্রসন্ন বা মধুসূদন কেউই সে অর্থে হিন্দু ছিলেন না। কালীপ্রসন্ন ধর্মীয় আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং মধুসূদন ধর্মীয় আচার পালনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন। তবু যা সত্য তা হল, মধুসূদন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পরেও এবং কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করেও হিন্দু ঐতিহ্যের উপাসক ছিলেন তাঁদের অন্তর-চেতনায়। কালীপ্রসন্নের সঙ্গে মধুসূদনের চরিত্রগত সাদৃশ্যের আর একটি পরিচয় পাই মধুসূদন প্রসঙ্গে গৌরদাস বসাকের আর একটি মন্তব্যে—"He was never morose or moody, but always cheerful and lively, humorous and jocular. He was charitable to a fault."

ব্যক্তিজীবন থেকে যখন সাহিত্য জীবনের দিকে তাকানো যায় তখন দেখা

যার উভয়েই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছেন নাটকের দ্বারপথ দিয়ে। মধুসূদন তাঁর ইংরেজী সাহিত্য রচনার স্বপ্নবিলাস ত্যাগ করে বাংলা মহাকাব্য রচনার পূর্বে 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) এবং 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) নাটক রচনা করেন এবং এই নাটক রচনার মধ্য দিয়েই তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্য-জীবনের পথ প্রস্তুত হয়। কালীপ্রসন্নও মহাভারত অনুবাদের বিশাল ব্যাপক কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে (বাল্য রচনা 'বাবু নাটকে'র কথা ছেড়ে দিলেও) 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭), 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮) এবং 'মালতী মাধব' (১৮৫৯) নাটক তিনখানির মধ্য দিয়েই । সাহিত্যজীবন শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে আর একটি স্মরণীয় তথ্য হল—১৮৬১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের (১লা বৈশাখ ১২৬৮) 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যায়, কালীপ্রসন্ন "টড সাহেবের রাজস্থান নামক পুস্তক হইতে উদয়পুরের রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারীর বিচিত্র চরিত্র বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ"-এর জন্য পারিতোষিক ঘোষণা করেছিলেন ত্রিশ টাকা এবং এই "কৃষ্ণকুমারীর বিচিত্র চরিত্র বর্ণন" যে দুজন অনুবাদ করে পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু গোঁসাই দাসগুপ্তের লেখা পরীক্ষকদিগের বিবেচনায় উত্তম হওয়ায় তাঁকে ঘোষণা অনুযায়ী পারিতোষিকও দেওয়া হয়েছিল। যাই হোক আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মধুসূদনের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয় কালীপ্রসন্নের স্বপ্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'য় মধুসূদনকে সম্বর্দ্ধনা জানানোর মধ্য দিয়ে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে মধুসূদনের বন্ধুগণ ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর প্রতিভার সম্মান করলেও কালীপ্রসন্নই বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে অভিনন্দিত করে তাঁকে প্রথম প্রকাশ্যভাবে সম্মানিত করেন। কালীপ্রসন্নের আয়োজিত ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখের এই সম্বর্দ্ধনা সভা প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় মন্তব্য করেছেন, "বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইবার সৌভাগ্য বোধ হয়, মধুসূদনের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে।" এই সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কালীপ্রসন্ন তৎকালীন বহু গণ্যমান্য লোককে আমন্ত্রণ করেন এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, রাজা দিগম্বর মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, গৌরদাস বসাক, কিশোরী চাঁদ মিত্র, যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, রেভারেন্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট দিনে সভায় উপস্থিত

হন। এই সম্বর্দ্ধনা সভায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে মধুসূদনকে একটি মূল্যবান রজত পাত্রের সঙ্গে যে মানপত্র দেওয়া হয়, তাতে লিখিত হয়—"...'আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবির্ভূত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি।... বঙ্গবাসিগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না।" এই মানপত্রের উত্তরে মধুসূদন বাংলায় যে বক্তৃতা করেন, তাতে তিনি বলেন—"বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।...বিদ্যা বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জল প্রাপ্তে যাদৃশী উর্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।"

এই সম্বর্দ্ধনা প্রসঙ্গে মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন—
You will be pleased to hear that not very long ago the বিদ্যোৎসাহিনী সভা and the President Kali Prasanna Singh of Jorasanko, presented me with a splendid silver claret jug. There was a great meeting and an address in Bengali. Probably you have read both address and reply in the vernacular papers. Fancy! I was expected to speechify in Bengali!

কালীপ্রসন্ন মধুসূদনের প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর অমর কাব্য 'মেঘনাদবধে' বিদেশী ভাব ও রীতির প্রাচুর্য এবং বাল্মীকি রামায়ণের বিষয়-বস্তুর রূপান্তর দেখে রক্ষণশীল পণ্ডিত সমাজ থেকে যখন অজস্র বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হচ্ছিল, তখন একুশ বছরের যুবক কালীপ্রসন্ন ১৭৮৩ শকের (১৮৬১ খৃ) আষাঢ় সংখ্যার 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রথম 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রকৃত মূল্য প্রচারে অগ্রসর হন। তিনি লেখেন—

"বাঙ্গালা সাহিত্যে এবম্প্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না।

'— শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবর রব নব পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !'

হায় ! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই প্রিয়বস্তুর নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্‌গুণরাজির পরিচয় প্রদান করে ; তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি। অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জরিত করে, তখন তাহারে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তজ জীবিত থাকিয়া যতদিন কাব্য রচনা করিবেন, তাহাই বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধিজল হইতে রত্ন উদ্ধার পূর্বক বহুমানে অলংকারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্নলাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই ; কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদিগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লজ্জিত হইব।"

আর একটি প্রবন্ধে কালীপ্রসন্ন বাঙালী পাঠকের কাছে মাইকেলের কাব্যকে হোমার, ভার্জিল ও মিল্টনের কাব্যের চেয়েও আদরণীয় বলে প্রচার করলে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যরসে বিভোর লালবিহারী দে শিষ্টাচার অতিক্রম করে 'Indian Reformer' পত্রে লেখেন—"The Editors of the Vividartha Sangraha, in their blind admiration of Mr. Dutt, prefer his poetry to that of Homer, Virgle and Milton. We can only account for this singular perversity of taste by supposing that the gentlemen, who have set themselves up as Judges on the Bengali republic of letters have never read intelligently a line of the Greek or Latin or English Bard."

এই সমালোচনার উত্তরে 'Hindoo Patriot' পত্রিকায় লিখিত হয়—

"The fact is the poetry of each nation has distinctive natural features and the writer who can retain those distinctive features in his poetry, is sure to be the darling of his nation and may exultingly say, 'non omnis moriar'. We freely confess that it is not our object to fight for Mr. Dutt, and as for the Editors of the Vividartha they know how to return scorn for scorn and blow for blow. But we cannot refrain from saying that we; ancy the 'Reformer' has not read Mr. Dutt's poetry with the attention it has a right to expect from educated Bengalees, and that if he has (read), he has forgotten those days when he sat on his mother's lap, and heard those beautiful legends that shed a halo of glory around our country and people..."[১৩]

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে কালীপ্রসন্নই সর্বপ্রথম মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনুসরণ করে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের গোড়ায় দুটি কবিতা রচনা করেন এবং মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরে প্রতি পংক্তিতে চোদ্দ অক্ষরের যে বন্ধন ছিল, তাকেও অতিক্রম করে পরবর্তীকালের গৈরিশ ছন্দের সূচনা করেন।

আবার মধুসূদনের যেমন একদিকে 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং অন্যদিকে 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', কালীপ্রসন্নেরও তেমনি একদিকে মহাভারত এবং অন্যদিকে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'। মহাকাব্য আর প্রহসন যেমন মধুসূদনের প্রতিভার এপিঠ ওপিঠ, তেমনি মহাভারত আর নকশা কালীপ্রসন্নের প্রতিভার এপিঠ ওপিঠ। আরো বিস্ময়ের বিষয়, মধুসূদন যেমন একই সময়ে একই সঙ্গে মহাকাব্য ও প্রহসন রচনায় হাত দিয়েছিলেন, কালীপ্রসন্নও তেমনি একই সময়ে মহাভারত অনুবাদের সঙ্গে হুতোম প্যাঁচার নকশা রচনায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন। একই সময়ে একই সঙ্গে ভাষায়-ভাবে সম্পূর্ণ পৃথক স্বাদের সাহিত্য সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করার মধ্যে যে বৈপরীত্য-জনিত বিস্ময় সে

বিষয়ে সচেতন হয়ে মধুসূদন সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটি পত্রে রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন, "It is a wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama". এখানে প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে মধুসূদন তাঁর মহাকাব্য রচনায় পণ্ডিতদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন এবং মহাভারত অনুবাদে পণ্ডিত মণ্ডলীর অনেক বেশী সহযোগিতা থাকলেও এই অনুবাদে কালীপ্রসন্নের নিজস্ব অবদানও যে যথেষ্ট পরিমাণ ছিল, 'অনুবাদ সাহিত্য ও কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়ে সে তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। আবার মধুসূদনের প্রহসন এবং কালীপ্রসন্নের নকশার মধ্যে আরো একটি বড় সাদৃশ্য এই যে, এই প্রহসন এবং নকশা উভয়েরই ভিত্তি ছিল একেবারে সজীব এবং বাস্তব। মধুসূদনের সমসাময়িক ব্যক্তি রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'একেই কি বলে সভ্যতা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন "ইয়ং বেঙ্গল অভিধেয় নববাবুদিগের দোষোদ্ঘোষণই বর্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় তৎসমুদায়ই কোন না কোন নববাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।" 'হুতোম প্যাচার নকশা'-তেও সজীব এবং বাস্তব উপাদান ব্যবহার করে কালীপ্রসন্নও 'ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথায় এই আশা ব্যক্ত করেছেন যে, "দর্পণে আপনার মুখ কদর্য্য দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না, বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন।" প্রকৃত পক্ষে কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাচার নকশা' ভাষা, রীতি ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুখানির দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত বলেই মনে হয়। তবু ডঃ সুকুমার সেন যখন অনুমান করেন যে মধুসূদনের সুপরিচিত চতুর্দশপদী কবিতা 'চাঁড়ালের হাতে দিয়া পোড়াও পুস্তকে' হুতোম প্যাচার নকশা'-কে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছিল, তখন তাঁর সে অনুমান মেনে নিতে স্বভাবতঃই দ্বিধা বোধ হয়। কালীপ্রসন্ন মধুসূদনের বন্ধু স্থানীয় কোন ব্যক্তিকে এই নকশায় ব্যঙ্গ করেছেন বলে মধুসূদন হুতোম সম্বন্ধে এরূপ কঠোর হয়েছিলেন এ সম্ভাবনাও মেনে নেওয়া যায় না এই কারণে যে স্বয়ং মধুসূদনই তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ইয়ং বেঙ্গলদের চরিত্র-বিকৃতিকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন যার মধ্যে কোথাও কোথাও তাঁর নিজ জীবনের ছায়াও

দুর্লক্ষ্য নয় এবং কোন কোন প্রভাবশালী ইয়ং বেঙ্গলের অনুরোধে তাঁর প্রহসন দুখানি পাইকপাড়ার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হওয়ার ফলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ঐ রঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছিলেন, "Mind you, you all broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese!"

আবার 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের গোড়ায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কবিতা দুটিকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্যারডি বলে ধরে নিয়ে মধুসূদন 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'কে আক্রমণ করে এই চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছিলেন এ ধারণাও সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না একাধিক কারণে— প্রথমতঃ, যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মধুসূদনের আজীবন সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল সেই বিদ্যাসাগরই প্রথমদিকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ঠিকমত পছন্দ করতেন না বলে ঐ ছন্দকে প্রত্যক্ষ আক্রমণ করে বলতেন, 'তিলোত্তমা বলে ওহে শুন দেবরাজ / তোমার সঙ্গেতে আমি কোথায় যাইব।'[১৪] দ্বিতীয়তঃ মধুসূদন নিজেই তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বন্ধু রাজনারায়ণকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "I am not one of those touchy fools who do not like to have their faults pointed out to them." এবং কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে লেখা পত্রেও তিনি প্রায় ঐ একই কথা লিখেছিলেন, "I am the last man to feel hurt when my faults are pointed out to me, either by friend or foe." তৃতীয়তঃ 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কবিতা দুটিতে আদৌ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশিত হয় নি, বরং প্রথম অনুকরণের দ্বারা এই ছন্দের প্রতি শ্রদ্ধাই প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের মনে এই ধারণা দৃঢ় হওয়ার কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় এই কবিতা রচনার সামান্য পূর্বে কালীপ্রসন্ন বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কর্তা মধুসূদনকে বিদ্যোৎসাহিনী সভায় একটি মূল্যবান রজতপাত্র ও মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনা করতে গিয়ে 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মধুসূদনও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র জন্য কালীপ্রসন্নের দ্বারা প্রথম প্রকাশ্যভাবে অভিনন্দিত

হয়েছিলেন বলে অভিনন্দন সভাতেই বলেছিলেন, "বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর প্রকাশ ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।" মধুসূদনের চরিত্রে আর যে গুণের অভাব থাক্, কৃতজ্ঞতা গুণের কোন অভাব ছিল না। শুধু তাই নয়, তাঁর চরিত্রের আবেগপ্রবণতা এই সহজ কৃতজ্ঞতা-স্বীকার প্রবৃত্তিকে অন্য কোন সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী করে তুলেছিল। এইসব দিক বিবেচনা করলে মধুসূদন কালীপ্রসন্নকে আক্রমণ করে চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেছিলেন, এ অনুমান সত্য বলে বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়, যখন দেখি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন মহাভারতের 'অষ্টাদশ পর্ব' অনুবাদের উপসংহারে' লেখেন, "·· সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুবাদিত ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকারে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমাদের বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।" এখানে উল্লেখ্য যে হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র প্রথম খন্ড ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খন্ড ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সুতরাং মধুসূদন কালীপ্রসন্নের নক্‌শাকে আক্রমণ করে চতুর্দশপদী কবিতা লিখে থাকলে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মহাভারত অনুবাদের উপসংহারকাল পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে এ সৌহার্দ্য থাকত না। তথাপি মধুসূদনের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের এই সম্প্রীতির সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ডঃ সুকুমার সেনের মতের অনুবর্তন করে জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ('দেশ' ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬) মধুসূদনের 'কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া' চতুর্দশপদী কবিতাটির মধ্যে 'চাঁড়ালের হাতে দিয়া পোড়াও পুস্তকে' ইত্যাদি পংক্তির প্রসঙ্গ এনে বলেছেন, যদিও সজনীকান্ত দাস বলেছেন, মধুসূদনের লক্ষ্য ছিল ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ,' তথাপি তা সত্য হতে পারে না এই যুক্তিতে যে "মাইকেল কি ব্রাহ্মণ সন্তানকে 'চাঁড়াল নন্দঘোষ' বলেছেন, সেদিক থেকে মনে হয় কোন কায়স্থই মাইকেলের লক্ষ্য ছিল।" কিন্তু এখানে আমাদের মনে হয়, সজনীকান্ত দাসের বক্তব্যই সঠিক, কারণ আমাদের মনে রাখা দরকার প্রথমতঃ মাইকেলের ব্রাহ্মণ ভক্তি(!)-কে এক্ষেত্রে সমাধানের সূত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ ঐ কবিতায় আক্রান্ত ব্যক্তির উপমান হিসাবে ব্যবহৃত নন্দ ঘোষও কায়স্থ নয়, গোয়ালা। তাছাড়া চতুর্দশপদী ঐ কবিতায় 'নন্দ ঘোষ' রূপক মাত্র, কোন জাত বিচারের লক্ষ্য

নয় এবং সেজন্য আমাদের মনে হয়, 'কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া' কবিতায় বঙ্গভাষারূপী রাধাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নন্দ ঘোষকে (অর্থাৎ কালীপ্রসন্নকে ব্ল্যাকমেলিং করার ভূমিকা সম্বলিত 'আপনার মুখ আপনি দেখ' পুস্তকের রচয়িতা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়কে) বিদূরিত করে শ্যামকে (মধুসূদনের অভিনন্দনদাতা কালীপ্রসন্নকে) ভজনা করার জন্য। সুতরাং 'কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া' কবিতায় মধুসূদন কায়স্থ কালীপ্রসন্নকে ব্যঙ্গ করেছেন বলে সমালোচক যে অনুমান করেছেন, তা কতটা যুক্তিহীন তা সহজেই অনুমেয়।

প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসন্ন এবং মধুসূদন এঁদের মধ্যে কেউই একে অপরের দোষ দর্শনে ব্যস্ত ছিলেন না, বরং একজন প্রাচ্যভাব-সংরক্ষণে অত্যন্ত যত্নশীল এবং অন্যজন পাশ্চাত্ত্যভাবে বিভোর হলেও উভয়ে উভয়ের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন, তা হল একজন যথার্থ শিল্পীর প্রতি আর একজন যথার্থ শিল্পীর শ্রদ্ধা।

মধুসূদনের মৃত্যু হয়েছে কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর মাত্র তিন বছর পরে। ব্যক্তি মধুসূদনের সঙ্গে ব্যক্তি কালীপ্রসন্নের জীবনচর্যাগত অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও এবং কর্মজীবনে ব্যারিস্টার মধুসূদনের চেয়ে বিচারক কালীপ্রসন্ন অনেক বেশি কর্মদক্ষতা ও বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিলেও চরিত্রগত যে দুটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উভয়ের মধ্যে বিশেষ কার্যকরী ছিল তা হল চরিত্রের উদারতা এবং আবেগ প্রবণতা। আবেগপ্রবণ মধুসূদন প্রথম থেকেই মদ্যাসক্তিতে অভ্যস্ত হলেও শেষ জীবনের মানসিক অবসাদ ও উদ্বেগ দূরে করার জন্য শেষ পর্যন্ত দ্রুত স্বেচ্ছামৃত্যুর উপায়রূপেই মদিরাকে বিশেষভাবে অবলম্বন করেছেন। আর আত্মীয় বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হয়ে এবং অধিকাংশ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে নৈরাশ্যপীড়িত কালীপ্রসন্ন ইতিপূর্বে অত্যন্ত আড়ম্বরহীন, সংযত চরিত্রের মানুষ হয়েও শেষজীবনে মনের জ্বালা জুড়াবার উপায়রূপে সাহিত্য এবং সুরার মধ্যে ডুবে গিয়েছেন এবং এই সুরাই শেষ পর্যন্ত এই উদার হৃদয়, আবেগপ্রবণ মানুষটির জীবনদীপ নির্বাপণের কারণ হয়ে উঠেছে।

(৩)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) সঙ্গেও কালীপ্রসন্নের (১৮৪০-৭০) গড়ে উঠেছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পুরাতন পত্র-পত্রিকায় এবং প্রবন্ধাদিতে এই সম্পর্কের কিছু কিছু সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে। কালীপ্রসন্ন দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'কে একটি মুদ্রাযন্ত্র দান করেছিলেন

এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। ১৮৪২ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "কালীপ্রসন্ন নিজে একটি প্রেস কিনিয়া তত্ত্ববোধিনী সভাকে দান করেন। তাহা আজও আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে লাগিতে রহিয়াছে।" তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ঐ সময়ে মিশিয়াছিলেন। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি ঝাড় দিয়াছিলেন। সেটী রূপান্তরিত হইয়া আজও সমাজের ত্রিতলে বিরাজমান। মাঘোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায়দানের আংশিক ভারও তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন।" এছাড়া ১৭৭৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থেকে জানা যায়, কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিতভাবে অর্থদানও করেছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভার মুদ্রাযন্ত্রের কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি অন্যতম যন্ত্রাধ্যক্ষও নির্বাচিত হয়েছিলেন। আবার ১৩১৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি' নামক প্রবন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—"একবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খুব দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজে একটা সভা হয়। সেই সভায় পিতৃদেব বেদী হইতে যেরূপ মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন তাহা আমি কখন ভুলিব না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকেরা এমনি মুগ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, যাহার কাছে যাহা কিছু ছিল, তৎক্ষণাৎ সে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ দান করিল। কেহ আঙ্গুল হইতে আংটি খুলিয়া দিল, কেহ ঘড়ি ও ঘড়ির চেন খুলিয়া দিল। আমার স্মরণ হয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহুমূল্য উত্তরীয় বস্ত্র (বোধ হয় শাল) তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন।" উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ঐ দুর্ভিক্ষ হয় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এবং ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় ঐ দুর্ভিক্ষে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলের জনসংখ্যার প্রায় এক-দশমাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কালীপ্রসন্ন ঐ দুর্ভিক্ষের সময় ঐ সভাতেই যে কেবল আবেগতাড়িত হয়ে দান করেছিলেন তা নয়, দুর্ভিক্ষ ত্রাণ-তহবিলেও তিনি মুক্তহস্তে দান করেন এবং 'মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব কোথায়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রে এবং তা বিনামূল্যে বিতরণ ক'রে দেশবাসীকেও দুর্ভিক্ষ দমনে সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

(৪)

কালীপ্রসন্নের (১৮৪০-৭০) সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-৯৪) জীবন ও সাহিত্যের পারস্পরিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যমূলক সংযোগ সম্পর্কটিও বিশেষ

কৌতূহলোদ্দীপক। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের দু'বছর পরে জন্মগ্রহণ করে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাবের বহু পূর্বেই কালীপ্রসন্ন অস্তমিত হয়েছেন। উনিশ শতকের এই দুই প্রতিভাবান সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রস্তুতিপর্বের সন্ধান নিতে গেলে প্রথমে বঙ্কিম সম্পর্কে বঙ্কিমের নিজের কথায় যা জানতে পাই তা হল—"আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হতে কোনো শিক্ষকের কাছে কিছু শিখি নি। ক্লাসে কখন থাকিতাম না। ক্লাসের পড়াশুনো ভালো লাগিত না—বড় অসহ্য বোধ হইত। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ থাকতেন বিদেশে, মা সেকালের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা হয় নি।"[৫০] কালী-প্রসন্নেরও শিক্ষা লাভ হয়েছে প্রধানতঃ আপন গৃহে আপন চেষ্টায়। হিন্দু কলেজে কিছুদিন অধ্যয়ন করলেও তাঁর ক্লাশের পড়াশুনো বিশেষ ভালো লাগত না। কিন্তু গৃহশিক্ষক কার্কপেট্রিক সাহেবের কাছে ইংরেজি এবং সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শিক্ষায় কালীপ্রসন্ন বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। আর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মায়ের কাছে কিছু শিক্ষালাভ না করলেও কালীপ্রসন্ন স্বীকার করেছেন ছেলেবেলা থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে প্রধানতঃ মা ও ঠাকুরমার কাছ থেকে। আবার জীবনের শেষ কয়েকটি বছরে আত্মীয় বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হয়ে কালীপ্রসন্ন অতিরিক্ত মদ্যপান করেছেন, কিন্তু কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হওয়ায় সম্ভবতঃ বঙ্কিম ঐ সময়েই মদ্যপানে অভ্যস্ত হন এবং অনেকের কাছে বিস্ময়ের বিষয় হলেও প্রকৃত সত্য হল এই যে, বঙ্কিম পরবর্তী জীবনেও মদ্যপান ছাড়তে পারেন নি; তবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখের মুহূর্তেও কখনোই আবেগের বশীভূত হয়ে মধুসূদন বা কালীপ্রসন্নের শেষজীবনের মতো সুরাপানকে আত্মনাশের উপায় রূপে গ্রহণ করেন নি।

এখানে বলা প্রয়োজন যে বর্তমান প্রসঙ্গে বঙ্কিমজীবনী আমাদের আলোচ্য নয়, বঙ্কিম জীবনের এমন দু-একটি প্রধান তথ্যের দিকে কেবল আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যার সঙ্গে প্রতিতুলনাগত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম ও কালীপ্রসন্ন উভয়েরই জীবন ও সাহিত্য স্ফুটতর করে তোলার কিছু অতিরিক্ত সুযোগ লাভ করা যাবে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন উভয়েই সাহিত্যসাধনা শুরু করেছেন চৌদ্দ বছর বয়স থেকে। কিন্তু চৌদ্দ বছর বয়স থেকে লিখতে শুরু করলেও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সাতাশ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'

প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বঙ্কিম প্রতিভার কোন স্বাক্ষর নাই। এই চৌদ্দ থেকে সাতাশ বছর সময়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখেছেন, তা হল ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত কয়েকটি ঋতুবর্ণনা এবং উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক কবিতা, দু-এক টুকরো গদ্য রচনা (১৮৫২-৫৬), 'ললিতা ও মানস' নামে অত্যন্ত জড়তাগ্রস্ত একটি কাব্য (১৮৫৬) এবং Rajmohan's wife নামে একটি ইংরাজী উপন্যাস (১৮৬৪)। এই সময়ে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের সামান্য কিছু গদ্য যে কি ভয়ংকর ছিল একটু উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হবে—"গগন মণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পা সংকাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহঃরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে।" এ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলে চেনাই দুষ্কর। অথচ এ রচনা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে "শ্রী ব. চ চ" স্বাক্ষরে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' "শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" স্বাক্ষরেও অনুরূপ রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে। সম্ভবতঃ এ ধরনের বাংলা রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই সন্তুষ্ট না হয়ে ইংরেজী উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। অতঃপর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ছাব্বিশ বছর বয়সে Rajmohan's wife-এর প্রথম সাত অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদ করতে করতে বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের মতোই ইংরেজী সাহিত্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্বক্ষেত্রে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হন 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) উপন্যাসে। অন্যদিকে কালীপ্রসন্ন চৌদ্দ বছর বয়সে যে 'বাবু নাটক' রচনা করেন তা এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে জানা যায় যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ প্রকাশের কাল থেকে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশের সময়ের মধ্যে গ্রন্থটির প্রায় সমস্ত কপি নিঃশেষিত হওয়ায় অনেকে "চারি মুদ্রা স্বীকার করিয়াও" গ্রন্থটি কিনতে পারেন নি; ফলে গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হওয়ায় গ্রাহক মূল্য নির্দিষ্ট হয়েছে আট আনা, এবং 'বিনা স্বাক্ষরকারী' বার আনা মাত্র। এরপর ১৮৫৭-৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কালীপ্রসন্ন 'বিক্রমোর্বশী', 'সাবিত্রী সত্যবান' ও 'মালতী মাধব' নামে যে তিনখানি নাটক রচনা করেন সেগুলি 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' অভিনীত হয়ে উচ্চ প্রশংসিত হয়। কালীপ্রসন্নের নাটকগুলি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় নাটকগুলির এ পর্যন্ত বিশেষ কোন আলোচনাই হয়নি। কিন্তু বহু অনুসন্ধানের

পর নাটকগুলি আমার হস্তগত হওয়ায় 'নাটকে কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছি।] নাটকের পর নকশা। ১৮৬২-৬৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয় কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। ইতিমধ্যে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে যে মহাভারত অনুবাদ শুরু হয়েছিল (পন্ডিতমন্ডলীর সহযোগিতার সঙ্গে মহাভারত অনুবাদে কালীপ্রসন্নের নিজস্ব অবদানও যে যথেষ্ট পরিমাণ ছিল তা 'অনুবাদ সাহিত্য ও কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়ে প্রমাণ করেছি) তার শেষ খন্ডটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে। এছাড়া কালীপ্রসন্নের বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বঙ্গানুবাদ, Calcutta Police Act নামে ইংরেজীতে একটি আইন বিষয়ক গ্রন্থ রচনা, একাধিক সাময়িক পত্র ও একটি দৈনিক পত্র সম্পাদনাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এইসব কাজের প্রায় সবগুলিই হয়েছে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। অর্থাৎ ছাব্বিশ বছর বয়সে কালীপ্রসন্ন বাংলা সাহিত্যে তাঁর করণীয় কাজগুলি করে যখন প্রস্থানমুখী হয়েছেন, তখন সাতাশ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে প্রবেশের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। এরপর আত্মীয়-বন্ধুর দ্বারা প্রতারণা-পীড়িত কালীপ্রসন্ন তাঁর জীবনের অন্তিম পর্ব প্রায় নিঃশব্দে অতিবাহিত করেছেন আর মৃত্যুর পূর্বে রেখে গেছেন তাঁর অসমাপ্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বঙ্গেশ বিজয়'। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনের' প্রকাশ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের যখন মধ্যাহ্নদীপ্ত শুরু হয়েছে তার দুবছর পূর্বে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন বাংলা দেশ ও বাংলা সাহিত্যকে চিরকালের মত ত্যাগ করে চলে গেছেন।

একথা সত্য যে বাংলা সাহিত্যের যৌবনমুক্তি শুরু হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা, কিন্তু সেই মুক্তিপথ রচিত হয়েছে যে দুটি পথের সমন্বয়ে তার একটির আবিষ্কর্তা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অন্যটির একই সঙ্গে প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন কিন্তু বিস্ময়ের কথা, বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও বিদ্যাসাগর এবং কালীপ্রসন্নের সাহিত্যিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে সুবিচার করতে পারেন নি। বিশেষতঃ যে 'সীতার বনবাসে' বিদ্যাসাগরের ভাষা সবচেয়ে অলংকৃত, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে বলেছেন 'কান্নার জোলাপ' এবং যে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র জন্য কালীপ্রসন্ন সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন সেই নকশা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮১ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শনে' কিছুটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে আক্রমণাত্মক উষ্মা প্রকাশ করেছেন। আবার মজার কথা হল এই যে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রের শুধু উদ্যোগপর্বের নয়, মধ্য-

পর্বের রচনার স্টাইল সম্বন্ধেও বিশেষ আপত্তি জানিয়েছেন, কিন্তু কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র সবিশেষ প্রশংসা করেছেন। 'পুরাতন প্রসঙ্গে' আচার্য কৃষ্ণকমল ব্যাপারটিকে বড় লেখকদের অবচেতন মনের অন্ধকারে অবস্থিত literary jealousy রূপে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "যাঁহারা বিশিষ্ট বড়লোক, তাঁহারা নিজেদের ভাবভঙ্গি লইয়া এতই বিভোর হইয়া পড়েন যে, অন্য ধরনের ভাবভঙ্গি [বিশেষতঃ সমসাময়িক] উৎকৃষ্ট হইলেও উহা appreciate করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের থাকে না।" বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কৃষ্ণকমলের উক্তি --He could not bear a brother near the throne—একথা যদি সত্য হয়, তবে একথাও সত্য যে বঙ্কিমচন্দ্রও সাহিত্য-জগতে তাঁর অব্যবহিত পূর্বসূরী বিদ্যাসাগর এবং কালীপ্রসন্নের গদ্যভঙ্গিকে সহ্য করতে পারেননি। আমরা দেখেছি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক কবি ও নাট্যকারদের প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত হন নি, কারণ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-জীবনে কখনো কবি বা নাট্যকার হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন নি। কিন্তু সমকালীন প্রতিভাবান গদ্য লেখকদের অনেকের ওপরেই যে তিনি অবিচার করে গেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ করা যেতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' অনেক তুচ্ছ গদ্যগ্রন্থের সমালোচনাও মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' বাংলা সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং প্রথম সার্থক গার্হস্থ্য উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাসটির কোন সমালোচনাই 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে'র বীজটি 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র 'হঠাৎ অবতারে'র পদ্মলোচনের বৃত্তান্তের মধ্যে নিহিত থাকলেও [দ্রঃ 'কালীপ্রসন্নের সামাজিক নক্শা' অধ্যায়], এবং 'আলালের ঘরের দুলালে'র সাধু গদ্য রীতির আধারে কিছু লঘু চলিত শব্দ মিশ্রণের তুলনায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র ভাষা আরো পরিণত এবং খাঁটি চলিত রীতির হওয়া সত্ত্বেও 'আলালে'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় এবং 'হুতোমে'র প্রতি তীব্র আক্রমণে একই সঙ্গে বিদ্যাসাগর এবং কালীপ্রসন্নের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের কিছুটা সাহিত্যিক ঈর্ষা প্রকাশিত হয়েছে বলেই মনে হয়।

অবশ্য কালীপ্রসন্নের মৌলিক গদ্যগ্রন্থ 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র প্রতি সুবিচার করতে না পারলেও যেখানে অবচেতন মনে প্রতিযোগিতার মনোভাব নেই সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র কালীপ্রসন্নের প্রতি সশ্রদ্ধ হয়েছেন। এখানে স্মরণীয় যে বঙ্কিমচন্দ্র কালীপ্রসন্নের মহাভারত অনুবাদের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা

স্বীকার করেছেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কৃষ্ণ চরিত্রে'র প্রথমভাগের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "সর্বাপেক্ষা আমার ঋণ মৃত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট গুরুতর। যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি তাঁহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি।" শুধু তাই নয়, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে The Calcutta Review পত্রিকায় 'Bengali Literature' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কালীপ্রসন্নের এই মহাভারত অনুবাদ সম্বন্ধে আরো সশ্রদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করে লিখেছিলেন, "...in particular he is the author of a translation of the Mahabharata, which may be regarded as the greatest literary work of his age." তবু যদি সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ খুঁজতে হয়, তবে তা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ চরিত্রে' বা কালীপ্রসন্নের মহাভারতে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এবং কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য়। বাংলা সাহিত্যের এই দুই স্মরণীয় গ্রন্থ তার সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও স্মরণীয় হয়ে থাকবে এই কারণে যে, যদি কেউ কোন একখানি গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রকে পেতে চান, তবে তাঁকে পড়তে হবে 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং কোন একখানি গ্রন্থে কালীপ্রসন্নকে পেতে চান, তবে তাঁকে পড়তে হবে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'। আবার গ্রন্থ দুটি শুধু শিল্পী যুগলের আত্মপ্রকাশের বাহন নয়, দুখানি মায়াদর্পণ—রসের মোড়কটি খুলে ফেললেই সেখানে প্রতিবিম্বিত হয় সমাজ ইতিহাসের এমন সব চিত্র যেগুলি ঠিকমত সাজিয়ে নিলে পাওয়া যায় বাংলাদেশ ও সমাজের সাল-তারিখ কন্টকিত ইতিহাসের চেয়ে অনেক বেশি সত্য ইতিহাস। তবে গ্রন্থদুটির রচনারীতিতে একটা বড় পার্থক্যও আছে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' প্রৌঢ় কমলাকান্তের হাসির অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিগত অপমান-লাঞ্ছনার জ্বালার সঙ্গে মিশিয়ে আছে বেদনার অশ্রু ('পলিটিক্স', 'বিড়াল', 'বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব' ইত্যাদি)। আর তরুণ হুতোমের ব্যঙ্গধর্মী নক্শায় এই জাতিগত অপমান-লাঞ্ছনার জ্বালা আরও তীব্র, আরও মর্মদাহী হয়ে উঠলেও তাতে বেদনা, বিষাদ বা বৈরাগ্যের সুর নেই, আগাগোড়া তা এমন একটি শাণিত তরবারি, অশ্রুর বাষ্পে যা কোথাও ঝাপসা হয় নি। হাসি ও কান্নার মিশ্রণে 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়; তীব্র আঘাত-প্রবণ ঝকঝকে হাসির নক্শা রচনায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'ও বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজভাবনা ও সাহিত্যকর্মের আর একটি দিক আছে যেখানে বিদ্যাসাগর অগ্রসর না হলেও কালীপ্রসন্নের প্রয়াস ও প্রযত্নের সাক্ষ্য

আছে। ১৮৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে নীলবিপ্লব এবং তার পরবর্তী সময়ে জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে পাবনা, রঙপুর, ফরিদপুর, যশোহর প্রভৃতি জেলায় যে কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেই পরিমণ্ডলে কালীপ্রসন্ন ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 'কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধ' রচনা করেছেন এবং নিজে জমিদার হয়েও কৃষক স্বার্থ সংরক্ষণে কৃষকদের পক্ষাবলম্বন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে বয়সে দুবছরের ছোট কালীপ্রসন্নের অকালমৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র এই কৃষকশ্রেণী ও কৃষকস্বার্থ সম্বন্ধে লিখতে শুরু করেন এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'সাম্য' ইত্যাদি প্রবন্ধে সমগ্র জাতির সামনে বাংলাদেশের কৃষকদের দুরবস্থার কথা আরও বিশদভাবে প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কালীপ্রসন্ন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মানসগঠনে আর একটি সাধর্ম্য দেখা যায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে সমাজে সকল কিছুতেই ইংরেজী সভ্যতার অনুকরণ-মোহের ঘনান্ধকারভেদী নবোন্মেষিত জাতীয়তাবোধে। তখন সমাজে ইংরেজী শিক্ষিত এবং ইংরেজী অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে স্পষ্টতঃই একটি নূতন ধরণের জাতিভেদ গড়ে উঠেছিল। ইয়ংবেঙ্গলদলের অনেক গুণের মধ্যেও একটি প্রধান দুর্বলতা ছিল এই যে, তাঁরাই এই নূতন জাতিভেদ সৃষ্টির পুরোভাগে ছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কালীপ্রসন্ন ও বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয়তাবোধ নির্মাণে আমৃত্যু ব্রতী হয়েছিলেন তার মূল বক্তব্যটি হল- "আমরা যত ইংরাজি পড়ি যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিনকোটী সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিলটী পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয়।" কিন্তু 'খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয়' একথা জানালেও কালীপ্রসন্ন এবং বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই যে জাতীয়তাবোধের জাগরণে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তা ছিল প্রধানতঃ হিন্দু জাতীয়তাবোধ – বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি ও হিন্দু জাতীয়তা তো প্রায় মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল; অবশ্য এঁরা নিজেরাই হিন্দু ছিলেন বলে এবং আরবী পারসী সংস্কৃতির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকার ফলে স্বাভাবিক ভাবে হিন্দুসংস্কৃতির দিকেই এঁদের দৃষ্টি পড়েছে এবং তাকে অবলম্বন করে হিন্দুঐতিহ্যের পুনর্জাগরণই এঁদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই সূত্র ধরে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লেখকের শ্রদ্ধা-সম্প্রীতিতে অভিষিক্ত কেবল অল্প কয়েকটি মুসলমান চরিত্রের উপস্থিতি দেখে এবং উপন্যাসের কোন কোন পাত্র-পাত্রীর মুখে 'যবন', 'ম্লেচ্ছ' প্রভৃতি কয়েকটি ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় অনেকে

যখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার দোষ চাপাতে চান তখন তা মেনে নেওয়া যায় না। কোন লেখকের উপন্যাস থেকে লেখকের মতামত সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন নয় এই কারণে যে উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব মতামত খুব অল্পই প্রতিফলিত হয়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এই দৃষ্টিতে বিচার করলে তা ভুলই করা হবে। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত এবং চিন্তাধারার সঠিক পরিচয় পেতে হলে তাঁর প্রবন্ধগুলিই বিশেষভাবে অনুসরণ করতে হবে। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' (বঙ্গদর্শন ১২৮০ ভাদ্র) প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই বলেছেন যে, জাতি বা ধর্ম যাই হোক্‌না কেন কোন রাজ্য পরজাতিপীড়ন শূণ্য হলে তাকে স্বাধীন বলা যেতে পারে এবং স্বজাতির দ্বারা শাসিত হয়েও এর বিপরীত হলে তাকে পরাধীন বলা উচিত। এজন্য তিনি নর্মানদের সময়ের ইংলণ্ডকে পরাধীন ও পরতন্ত্র এবং আকবরের দ্বারা শাসিত ভারতবর্ষকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র বলেছেন। আবার সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে তিনি যখন শুধু বাংলা দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন তখনও তাঁর চিন্তাধারা সম্পূর্ন উদারনৈতিক এবং মৌলিক খাতে প্রবাহিত হয়েছে। ১২৮১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে দুর্দশা ঘটে নাই।; রাজা ভিন্ন-জাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না।...পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে, পরাধীন জাতির মানবিক স্ফূর্তি নিবিয়া যায়। পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল।" এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম তাঁর এই মৌলিক মত প্রচার করেছেন যে, "অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে আকবরকে আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানির আরম্ভ। মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের অধিক সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠানই আমাদের মিত্র।.. বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় হিন্দুর অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন পাওয়া যায়।...কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলের কোন কীর্ত্তি কেহ দেখিয়াছে?" বঙ্কিমচন্দ্রের এই মনোভাবকে নিশ্চয়ই হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা বিশেষিত করা যায় না। 'হিন্দু জাতীয়তা' এবং 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা' কথা দুটি খুব শিথিলভাবে ব্যবহার করার ফলেই আধুনিক কালে অনেক সমালোচকই

বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়নে একটি মারাত্মক চোরাগলিতে প্রবেশ করেছেন। একথা সত্য যে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর জাতীয় গৌরব প্রকাশে যথাসাধ্য যত্ন করেছেন, কিন্তু তাঁর এই 'হিন্দু জাতীয়তা' যে 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা' বা পরোক্ষ মুসলমান-বিদ্বেষনয়, তার তারও স্পষ্ট প্রমাণ পাই মীর মশাররফ হোসেনের 'গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু' নামক কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনপত্রিকায় (১২৮০ পৌষ) বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিতে, "তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না।.. বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ, একা হিন্দুর দেশ নহে। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে, হিন্দু মুসলমানের ঐক্য জন্মে।" কালীপ্রসন্ন তাঁর হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় সকল ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে সকল ধর্মেরই ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং কপটতার উপর তীব্র কশাঘাত করেছেন। তবু কোন বিশেষ ধর্মের উপর তিনি বিশেষ দুর্বলতা না দেখালেও তিনি যখন মহাভারত অনুবাদ ও বিতরণের জন্য প্রায় সর্বস্ব ব্যয় করেন এবং তার পরেও তিনি পৃথকভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদ করেন (তাঁর মৃত্যুর পর তা প্রকাশিত হয়) তখন তাঁকেও হিন্দু জাতীয়তাবাদের একজন পুরোহিত বলে অভিহিত করতে হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মত তাঁর এই হিন্দু-জাতীয়তাতেও যে কোন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবোধ ছিল না সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় যখন দেখি যে, মাত্র পনেরো বছর বয়সে কালীপ্রসন্ন স্বসম্পাদিত 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় (মে, ১৮৫৫) 'বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা' প্রবন্ধে মুসলমান শাসনের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের তুলনা করে সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে লেখেন, "...ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিজাতীয় পক্ষপাতশূন্য নহেন।.. একজন ইংরাজ যে কর্ম্ম করে যদি সেই কর্ম্ম একজন বাঙ্গালি নির্ব্বাহ করেন তাহা হইলেও তাহার বেতন সেই ইংরাজের ন্যায় হইবে না, সমান বেতন পাওয়া দূরে থাকুক অপেক্ষাকৃত পারগ হইলেও সে পদ তাঁহার পাইবার বিষয় কি, ইহাকে কি বিজাতীয় পক্ষপাত বল না। এক্ষণে একবার আকবর বাদসাকে স্মরণ করি, তাঁহার সময়ে যোগ্য ব্যক্তি হইলেই রাজ্যের গুরুতর কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে পারিত, হিন্দু কি মুসলমান তাহার বিচার ছিল না। তাহার বিদ্যাই পূজ্য হইত, যেমন একচন্দ্র গগনমণ্ডলে উদয় হইয়া পৃথিবীর সকল অন্ধকার হরে, সেইরূপ তিনি উদয় হইয়া পূর্ব্বমত মুসলমানদিগের রাজধর্ম্ম অনভিজ্ঞতা রূপ যে অন্ধকার ছিল, তাহা হরিয়াছিলেন।.. আমারদিগের ব্রিটীশ গবরণমেণ্ট সভ্য বলিয়া লোক বিখ্যাত আছেন অতএব বিজাতীয় পক্ষপাত থাকিতে ঐ বিষয়ে

গবরণমেন্ট সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে অবশ্যই লজ্জা পাইবেন।" এছাড়া অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে তিনি তাঁর মুসলমান বন্ধু আবদুল লতিফ খান বাহাদুরকে 'দূরবীন' নামক একখানি উর্দু সংবাদপত্র পরিচালনে সহায়তা করার জন্য নিজ ব্যয়ে ঐ সংবাদপত্রের সম্পূর্ণ স্বত্ব ক্রয় করে দেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে এ সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা হল—His patronage of the press was Catholic, for he extended it even to that urdu newspaper, the Doorbin, the proprietary right in which he bought at the instance of a Mohamedan friend (Nawab Abdul Latif Khan Bahadur). হিন্দুধর্ম বা মুসলমান ধর্ম নয়, হিন্দু সংস্কৃতির পাশাপাশি মুসলমান সংস্কৃতির প্রসারের জন্য রামমোহনের পর বাংলার অগ্রণী সাহিত্যিকদের মধ্যে কালীপ্রসন্নই প্রথম একাধিক বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উর্দু সংবাদ পত্র প্রকাশের জন্যও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

(৫)

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩) কালীপ্রসন্নের চেয়ে বয়সে অনেক বড় হয়েও কালীপ্রসন্নের মাত্র তের বছর বয়সে প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। দুজনের মধ্যে বয়সের এই বিরাট ব্যবধান যে কারণে ভোলা সম্ভব হয়েছিল তা হল প্রতিভার সম্মান। উভয়ের কর্মজীবনেও দেখি একটি অদ্ভুত ঘটনাগত মিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ৪৯ বছর বয়স্ক প্যারীচাঁদ মিত্র যখন মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন এবং অল্পদিন পরেই অনারারি জাস্টিসের পদ লাভ করেন, তখন ৪ঠা মে ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত সংবাদ থেকে এই তথ্য পাওয়া যায় যে ঐ একই সময়ে ২৩ বছর বয়স্ক কালীপ্রসন্নও অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং জাস্টিস্ অব্ দি পীস নিযুক্ত হন।

আবার প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন দুজনেই নগরবাসী হয়েও দুজনেরই ছিল কৃষি বিষয়ে একান্ত আন্তরিক আগ্রহ। ১লা জুন ১৮৬৩ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয় যে ১লা জুন কালীপ্রসন্ন সিংহ ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে মৃত মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সাম্বৎসরিক সভায় বঙ্গদেশীয় কৃষিকার্যের বর্তমান অবস্থার সমালোচন, কৃষিকার্যের উপযোগিতা, কৃষিসমাজ (কৃষকদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি ?) ও কৃষি-

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা ইত্যাদি বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করবেন। তার প্রায় ছ'মাস পরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ছোট লাট স্যার সিসিল বীডনের যত্নে বেলভেডিয়ারে যে বিরাট কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়, তাতে প্যারীচাঁদের সঙ্গে কালীপ্রসন্নও একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

তবে সাহিত্যের অঙ্গনেই প্যারীচাঁদের পাশে কালীপ্রসন্নের স্থান অতি ঘনিষ্ঠ। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে' ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে বাংলা সাহিত্যকে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশাল ও সুপ্রাচীন ছায়াতল থেকে সরিয়ে এনে তাকে তার নিজস্ব কাদামাটি জলে বর্দ্ধিত করার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়, ১৮৬১-৬৩ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় তার আরও পরিণত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে। বিশেষতঃ ভাষার দিক থেকে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাধু ক্রিয়ারীতির আধারে কিছু লঘু চলিত শব্দ বসিয়ে প্যারীচাঁদ 'আলালে' যে চলিত ভাষার সূত্রপাত করেছিলেন 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় অন্যান্য চলিত শব্দের সঙ্গে ক্রিয়াপদকেও চলিত ক'রে কালীপ্রসন্ন সেই চলিতরীতিকেই পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আবার বিষয়বস্তুর দিক থেকে সংস্কৃত-প্রভাবমুক্ত প্রথম বাংলা গদ্যসাহিত্য রূপে 'আলাল' এবং 'হুতোম' দুটোই আদরণীয় হলেও প্যারীচাঁদ সাহিত্যে বাস্তবতা আনার চেষ্টা করেও তাঁর রুচি ও নীতিবোধের প্রাবল্যের ফলে কোথাও কোথাও বাস্তব চরিত্রকে খণ্ডিত করে শিল্পসৃষ্টির চেয়ে নীতিশিক্ষাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন আর কালীপ্রসন্ন কখনো কখনো এর বিপরীত প্রান্তের চরম সীমায় উপনীত হয়ে অতি-বাস্তবতাকে অধিকতর মূল্য দিয়ে শিল্পসম্ভাবনাকে ক্ষুন্ন করে ফেলেছেন। বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রবণতার ঝোঁক থেকে 'আলাল' এবং অতি-বাস্তবতার ঝোঁক থেকে 'হুতোম' মুক্ত হতে পারলে বাংলা গদ্যসাহিত্য জন্মলগ্নেই এই দুটি গ্রন্থের জন্য অধিকতর গৌরবান্বিত হতে পারত।

(৬)

দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩১-৭৩) সঙ্গে কালীপ্রসন্নের (১৮৪০-৭০) ঘনিষ্ঠতার সূচনা হয় একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনার মধ্য দিয়ে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হবার পর নাটকটির মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃত (এডওয়ার্ড স্টুয়ার্টের ছাত্র রামচন্দ্র কৃত ?) ইংরেজী অনুবাদ রেভারেণ্ড লঙ্ প্রকাশ করলে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যখন লঙ্ আদালতে এক মাস কারাদণ্ড ও এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন, তখন কালীপ্রসন্ন

আদালতেই ঐ সহস্র মুদ্রা অর্পণ ক'রে লঙ্‌কে অর্থদণ্ডের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করেন। শুধু তাই নয় দীনবন্ধু মিত্রের তৃতীয় পুত্র ললিত চন্দ্র মিত্রের বিবৃতি থেকে জানা যায়, লঙের বিচারকালে যখন দীনবন্ধু মিত্রও অভিযুক্ত হবার আশংকা দেখা দেয়, তখন কালীপ্রসন্ন তাঁকেও এই আশ্বাস দেন যে যদি অর্থের দ্বারা তাঁকে রক্ষা করা সম্ভব হয়, তাহলে তিনি এবিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।[১৮] আবার পণ্ডিত দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত পুরাতন 'সোমপ্রকাশ' পত্র থেকে জানা যায় যে 'নীলদর্পণ' নাটকের দ্বারা দেশে নীল বিপ্লবের সূচনা হওয়ায় যখন 'নীলদর্পনে'র অত্যন্ত জনপ্রিয়তা হেতু অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়, তখন কালীপ্রসন্ন তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে বিনামূল্যে সাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। আবার নীলকর চাষীদের অকৃত্রিম বন্ধু 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে (মৃত্যুঃ ১৪ জুন ১৮৬১) দীনবন্ধু মিত্র কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে ১১ই আগষ্ট ১৮৬২ তারিখে তাঁর স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে আলোচনা করার জন্য যখন এক বিরাটসভার আয়োজন করেন এবং বক্তৃতা দেন, তার কিছু পূর্বে ১৭৮২ শকাব্দে (ইং ১৮৬১) কালীপ্রসন্ন বরাহনগরের 'সারস্বতাশ্রম' থেকে 'হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক একটি ষোল পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধপুস্তিকা প্রকাশ করে জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে এই যে শ্রদ্ধা-প্রীতি অনুরঞ্জিত সম্পর্কটি গড়ে উঠেছিল তার মূল সূত্রটি ছিল বাংলার অত্যাচারিত নীল চাষীদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি।

কালীপ্রসন্ন এবং দীনবন্ধু সাহিত্য ক্ষেত্রেও পরস্পরের কাছাকাছি হয়েছেন তাঁদের নক্‌শা ও প্রহসন রচনায়। এই দুই শিল্পী কেউই তাঁদের নক্‌শা এবং প্রহসন রচনায় হাসির উপর প্যারীচাঁদের মত নীতি ও রুচির শুল্ক বসান নি। ফলে কালীপ্রসন্নের নক্‌শা এবং দীনবন্ধুর প্রহসনগুলির সাহিত্যিক গুরুত্ব স্বীকার করেও কোন কোন নীতিবাগীশ সমালোচক এগুলিকে অশ্লীলতার অভিযোগেও অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন সচেতন ভাবে নীচ প্রকৃত্তির উত্তেজনা সৃষ্টিই যখন লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তখন তাকে অশ্লীল বলা যায়, শিল্পীর নির্বিকার দৃষ্টিতে জীবনের বাস্তবতা যথাযথভাবে চিত্রিত হলে তাকে অশ্লীলতা বলা যায় না। এই আধুনিক দৃষ্টিতে দীনবন্ধুর পুনর্মূল্যায়ন শুরু হয়েছে, কালীপ্রসন্নেরও হওয়া উচিত।

অবশ্য হাস্যরসের এই অকুণ্ঠিত প্রাণোচ্ছল প্রকাশভঙ্গির সাদৃশ্য ছাড়া কালীপ্রসন্ন ও দীনবন্ধুতে একটা প্রধান বৈসাদৃশ্যও আছে— তা হল সমাজের অন্যায়, অসঙ্গতি ও বিকৃতির উপর কালীপ্রসন্ন যেখানে ক্ষমাহীনভাবে নিষ্করুণ, সেখানে দীনবন্ধু প্রথমে ব্যঙ্গের শরবর্ষণ করতে শুরু করেও শেষ পর্যন্ত সেই অসঙ্গতি ও বিকৃতির প্রতিও সহানুভূতিতে বিগলিত হয়েছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্নের সামগ্রিক মূল্যায়ন।

উনিশ শতকের বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর অসামান্য প্রতিভাবলে এক অবিনশ্বর কীর্তির অধিকারী। প্রকৃতপক্ষে একাধারে এরূপ সর্বগুণান্বিত লোক বাংলাদেশে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। অতি অল্প বয়সে "বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য" 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' স্থাপন, বাংলা নাটক ও অভিনয়ে উৎসাহদানের জন্য 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' স্থাপন, মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই বাংলা সাহিত্যসৃষ্টিতে মনোনিবেশ নানারূপ উদারনৈতিক সমাজসংস্কারে আত্মনিয়োগ, একাধিক সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র সম্পাদনা ও পরিচালনা এবং অতুলনীয় দানশীলতা ও স্বদেশ প্রেমের জন্য তিনি সেকালে প্রায় সকলেরই প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। কালীপ্রসন্নের সমকালীন ব্যক্তি আচার্য কৃষ্ণকমল 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বিপিন বিহারী গুপ্তের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন—"কালীপ্রসন্ন সিংহের কথা মনে পড়ে। তোমাদের সাহিত্য-পরিষদের মন্দিরে তাঁহার যে সুন্দর প্রতিকৃতিখানি বঙ্কিমবাবুর প্রতিকৃতির পার্শ্বে বসাইয়াছ, তাহা দেখিয়া আমার মনে বড় আহ্লাদ হয়। বিচিত্র বিলাস-ব্যসনের মধ্যে লালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াও তিনি যেরূপে আপনার মনুষ্যত্ব রাখিয়া মহীয়ান হইয়াছিলেন; তাহা যে তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে?"[১] কালীপ্রসন্ন বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ নিবর্তন ও কৌলীন্য প্রথা রহিতকরণ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হলে কালীপ্রসন্ন 'সংবাদ প্রভাকরে' (২২শে নভেম্বর, ১৮৫৬) প্রত্যেক বিধবা-বিবাহেচ্ছু ব্যক্তিকে সেকালের বাজারে এক সহস্র টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। আবার শুধু নারীসমাজ নয়, বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান সহায় কৃষক সমাজের জন্যও কালীপ্রসন্নের চিন্তা ও চেষ্টা নিয়োজিত হয়েছিল। বঙ্গদেশীয় কৃষিকার্যের

বর্তমান অবস্থার সমালোচনা, কৃষিকার্যের উপযোগিতা, কৃষিকার্যের উপযোগিতা, কৃষিসমাজ (কৃষকদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি? ও কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে শুধু প্রবন্ধ রচনা করেছেন তাই নয়, নীলকর আন্দোলন এবং জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে কৃষক আন্দোলনে তিনি নিজে জমিদার হয়েও কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রেও কালীপ্রসন্নের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। দেশের স্থানে স্থানে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন দুঃস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহায্যদান, ছাত্রদের বাংলা রচনায় উৎসাহিত করার জন্য সময়ে সময়ে পুরস্কার ও পদক বিতরণ দঃস্থ ছাত্রদের শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ—কালীপ্রসন্নের এই ধরণের বহুবিধ কাজ তৎকালীন সংবাদপত্রে ভূয়সী প্রশংসিত হয়েছে। সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য তিনি সাহিত্য ও সংবাদপত্রের উন্নয়নেও অকাতরে দান করেছেন। লেখকদের উৎসাহদানের জন্য তিনি যে শুধু প্রতিযোগিতামূলক প্রবন্ধ আহ্বান করে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন তাই নয়, অনেক নূতন লেখকের নূতন গ্রন্থ প্রকাশে আর্থিক সাহায্য দান করেও তিনি লেখকদের উৎসাহিত করেছেন। তাছাড়া 'ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্র' নামে রাজনীতি সংক্রান্ত পাক্ষিক সমাচারপত্র প্রকাশে সহায়তা, প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'সোমপ্রকাশে' আর্থিক সাহায্য, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের জন্য ব্রাহ্মসমাজকে মুদ্রাযন্ত্র দান, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজী সমাচার পত্র Mookerjee's Magazine প্রকাশের জন্য মুদ্রাযন্ত্র দান, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'Hindoo Patriot' এর মত বিখ্যাত দেশহিতকর পত্রিকার অবলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিলে পত্রিকাটির মুদ্রাযন্ত্র এবং সর্বস্বত্ব ক্রয় করে পত্রিকাটির প্রকাশ অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা, নবাব আবদুল লতিফ খান বাহাদুরের অনুরোধে 'দূরবীন' নামে একটি উর্দু সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করে তার পরিচালনে সহায়তা করার ঘটনাগুলির কথা স্মরণ করলে সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রের ইতিহাসে কালীপ্রসন্নের অবদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। আবার এই সব পত্র-পত্রিকায় সাহায্য দান করেও কালীপ্রসন্ন তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি, তিনি নিজে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরবর্তী 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র ৭ম পর্ব—এই ক'খানি সাময়িক পত্র এবং 'পরিদর্শক' নামে এক খানি দৈনিক পত্রেরও সম্পাদনা করেছেন। আবার শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্রের উন্নতিকল্পে দান ছাড়াও 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করার অপরাধে দণ্ডিত রেভারেণ্ড লঙের এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড দান, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষে অকৃপণ হস্তে দান, দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা, সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য, কলকাতায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য দুই সহস্র টাকা ব্যয়ে ধারাযন্ত্র স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে দানের মধ্যেও কালীপ্রসন্নের বদান্যতা ও গভীর দেশাত্মবোধের সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে। কালীপ্রসন্নের সমকালীন আচার্য কৃষ্ণকমল 'পুরাতন প্রসঙ্গে' যথার্থই বলেছেন, "তিনি যেমন তাঁহার purse এর সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন, তেমন আর কেহই জানিত না।" এইভাবে অর্থ ও সামর্থ্যের দ্বৈত মিলনে কালীপ্রসন্ন সেই অল্প বয়সেই বাংলার সমাজও সংস্কৃতির ইতিহাসে যে অনামান্য কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন তা আজ আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রেক করে।

শুধু সমাজ-সংস্কৃতি নয়, সাহিত্যের ইতিহাসেও কালীপ্রসন্ন সিংহ একটি স্মরণীয় নাম। সেকালের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রখ্যাত দেশনেতা কৃষ্ণদাস পাল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় লেখেন—"When the history of the rise and progress of Bengali literature will come to be written Baboo Kaliprossunno Sing will undoubtedly occupy a high place in the gallery of the literary characters of the present period." কলকাতার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরও বাংলা সাহিত্যে কালীপ্রসন্নের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—"It is impossible to withhold high praise for the efforts of the Late Baboo Kaliprasanna Singha of Jorasanko in the field of Bengali language and literature··· ...It is difficult to estimate the never-to-be-forgotten services which this noble-spirited gentleman rendered to the Bengali language. Unfortunately the Bengali language is yet a sealed book to western 'savants', otherwise it is certain that his labours would have met with due recognition. To serve the Bengali language in those days required an amount of patriotism and dis-interested self-sacrifice which few are capable of. He is therefore entitled to the deep gratitude of his countrymen."

সাহিত্যজগতে কালীপ্রসন্নর এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যখন মধুসূদন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এবং বঙ্কিমচন্দ্র সাতাশ বছর বয়সে ইংরেজী সাহিত্যসৃষ্টির স্বপ্ন-মোহ ত্যাগ করে বাংলা সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেছেন, তখন কালীপ্রসন্ন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে 'বাবু নাটক' নামে যে প্রথম সামাজিক প্রহসন রচনা করেছেন তা জনপ্রিয়তার জন্য ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়েছে এবং অনেকে "চারি মুদ্রা স্বীকার করিয়াও" সেই গ্রন্থের একখানা কপি সংগ্রহ করতে পারেন নি। আবার বাংলা নাটকের গঠনমানতার যুগে যখন সংস্কৃত থেকে অনুবাদ নাটকের ধারায় দুটি মাত্র উল্লেখযোগ্য অনুবাদ নাটক (নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' ১৮৫৫ এবং রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার' ১৮৫৬ প্রকাশিত হয়েছে, তখন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন এই ধারার তৃতীয় উল্লেখযোগ্য নাটক 'বিক্রমোর্বশী' রচনা করেছেন এবং বহু সম্ভ্রান্ত দেশীয় ও ইউরোপীয় দর্শকের সামনে নাটকটি অভিনীত হয়ে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। অতঃপর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 'সাবিত্রী সত্যবান' নামে একখানি মৌলিক নাটক এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 'মালতী মাধব' নামে অনুবাদ নাটক রচনা করে কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে নাটক দুটির যে বাদ্য-গীত সহযোগে 'আভিনয়িক পাঠে'র ব্যবস্থা করেন তাতে তিনি নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে এমন একটি নূতন পথের সন্ধান দেন যা পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের হাতে আরও পরিণত ও সংহত রূপ লাভ করে রবীন্দ্র গীতিনাট্য ও ঋতুনাট্য অবলম্বনে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে কালীপ্রসন্নের আরও বড় কৃতিত্ব হল তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (প্রথম ভাগ ১৮৬২ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে ১৮৬৪)। সে যুগের সাহিত্যে ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন দুজন — মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিতায়, কালীপ্রসন্ন গদ্যে। এ প্রসঙ্গে টেকচাঁদের 'আলালে'র কথাও অনেকের মনে পড়তে পারে। কিন্তু 'আলালে' সাধু ক্রিয়াপদের আধারে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে কিছু লঘু চলিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র, খাঁটি চলিত রীতির প্রথম সার্থক প্রতিষ্ঠা হয়েছে কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য়। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ওপর যেমন নিন্দা-প্রশংসার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত পণ্ডিত ব্যক্তিও প্রথমদিকে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে সুনজরে দেখতে পারেন নি, তেমনি হুতোমী ভাষার ওপরেও নিন্দা-প্রশংসার ঝড় বয়ে গিয়েছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রাজ্ঞ সাহিত্যিকও

হুতোমি ভাষার প্রতি তাঁর তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। তবু বঙ্কিম-প্রশংসিত 'আলালে'র সাধুক্রিয়াপদের আধারে লঘু চলিত শব্দ ব্যবহারের রীতি নয়, 'হুতোমে'র খাঁটি চলিত ভাষা ব্যবহারের রীতিই বিবেকানন্দ, প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের হাত ঘুরে আজ বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব ক্ষেত্রেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। আর শুধু ভাষা নয়, আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বাংলা সাহিত্যের আরও একটি দিক বিশেষভাবে উন্মোচিত করল—গ্রন্থদুখানি প্রকাশিত হওয়ার পর বাঙালী লেখক এবং পাঠক সম্প্রদায় বিশেষভাবে সচেতন হলেন যে বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির বিষয়বস্তুর জন্য আর কেবল ইংরেজী এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকার প্রয়োজন নেই, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে। এবিষয়ে কালীপ্রসন্ন আবার প্যারীচাঁদের চেয়েও একধাপ এগিয়ে গেলেন। প্যারীচাঁদ সাহিত্যে বাস্তবতা সৃষ্টি করতে গিয়েও তাঁর শিল্পীসত্তার চেয়ে নীতিবাগীশ সত্তাকে অধিক প্রাধান্য দেওয়ার ফলে 'আলালের ঘরের দুলাল'কে শেষ পর্যন্ত নীতিশিক্ষার পাঠমালায় রূপান্তরিত করেছেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় যতখানি রিয়্যালিস্ট প্রায় ঠিক ততখানিই স্যাটায়ারিস্ট হয়ে উঠেছেন। শুধু তাই নয়, হুতোম প্রসঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে, কালীপ্রসন্ন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের গোড়ায় মধুসূদনের সদ্যপ্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণে যে দুটি কবিতা রচনা করেন সেগুলি প্রতি পংক্তিতে চৌদ্দ অক্ষরের বন্ধনটুকু থেকেও মুক্ত হওয়ার ফলে ঐ কবিতাদুটির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েই যে গৈরিশছন্দের সৃষ্টি হয়, সেকথা গিরিশচন্দ্র গোপন রাখার চেষ্টা করেন নি। প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে নকশা রচনার নূতন আঙ্গিক প্রবর্তন, খাঁটি চলিত ভাষার ব্যবহার, পরবর্তীকালের গৈরিশছন্দের সূচনা, সমাজ-বাস্তবতা চিত্রণনৈপুণ্য, শাণিত বাক্‌পটুতা ও তীক্ষ্ণধার হাস্যরসসৃষ্টি—বহু দিক থেকেই 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ গ্রন্থ।

এছাড়া ১৮৫৮ থেকে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বৎসর সময়ে ও প্রভূত অর্থব্যয়ে বহু পণ্ডিতের সহযোগিতায় অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ ও বিনামূল্যে প্রত্যেক খণ্ডের তিন হাজার কপি বিতরণ কালীপ্রসন্নের এক অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ। এই মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ ও বিনামূল্যে প্রচারের

জন্য কালীপ্রসন্নের সেকালের বাজারেই প্রায় আড়াই লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয় এবং উড়িষ্যার বিস্তৃত জমিদারী হস্তান্তরিত হয়। আবার এই বিরাট ব্যয়সাধ্য ও শ্রমসাধ্য কাজে কালীপ্রসন্নের শুধু সদিচ্ছা, অর্থব্যয় ও অধ্যবসায় নয়, মহাভারত অনুবাদের সাহিত্যিক কৃতিত্বে পণ্ডিতদের সহযোগিতার সঙ্গে কালীপ্রসন্নের নিজস্ব অবদানও যে যথেষ্ট ছিল সে তথ্য পাই কালীপ্রসন্নের সমকালীন বিখ্যাত ব্যক্তি কৃষ্ণদাস পালের লেখায়—"All the volumes attest the touches of the practised hand of the Editor in chief, We mean the Baboo himself."

কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রতি সুবিচার করতে না পারলেও বঙ্কিমচন্দ্র 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় কালীপ্রসন্নের এই মহাভারত অনুবাদ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন — "In particular he is the author of a translation of the Mahabharata, Which may be regarded as the greatest literary work of his age." আর বঙ্কিমচন্দ্রের কালে শুধু বঙ্কিমচন্দ্রই যে এরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তাই নয়, আরও পরবর্তীকালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কালীপ্রসন্নের এই মহাভারত সম্বন্ধে লিখেছেন, "তরুণ যুবক কালীপ্রসন্নের অমর কীর্ত্তি মহাভারত। এই একখানি গ্রন্থে তাঁহার নাম বঙ্গবাসীর চিরস্মরণীয় রহিবে। এই অপূর্ব্ব জিনিস আজ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে শোভা পাইতেছে। রাশি রাশি বাঙ্গলা পুস্তক পাঠ করিয়া যে জ্ঞানলাভ না হয়, একমাত্র সিংহ মহাশয়ের 'মহাভারত' পাঠ করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানলাভ করা যায় ইহা আমি স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি।" শতাব্দীকালের সীমা পেরিয়ে আসার পরেও কালীপ্রসন্নের গদ্য মহাভারতের এই অকুণ্ঠিত সমাদর ও প্রশংসার মূল কারণ প্রধানতঃ দুটি—এদেশে যখন বিভিন্ন পুঁথি মিলিয়ে পাঠোদ্ধার ও ভ্রম সংশোধন করে পুস্তক সম্পাদন রীতি সম্পূর্ণ নূতন, সেই সময় বেদব্যাস বিরচিত সংস্কৃত মহাভারতের এশিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত সংস্করণ, শোভাবাজার রাজবাটীর, আশুতোষ দেব ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয়ে সংরক্ষিত এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহের বারাণসী থেকে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুঁথিগুলির পাঠ বিচার করে বহু পণ্ডিতের সহযোগিতায় অনুবাদে যথাসম্ভব মূলানুগত্য রক্ষার চেষ্টা এবং সমগ্র মহাভারতের অনুবাদে সেকালের পক্ষে বিস্ময়কর প্রসাদগুণ সম্পন্ন মহাকাব্যোচিত ভাষা।

নকশা এবং মহাভারতের জন্যই বাঙালী পাঠকের কাছে কালীপ্রসন্ন সুপরিচিত হলেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে কালীপ্রসন্নের অনেকগুলি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' কা. প্র. সি. স্বাক্ষরে মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনা ও দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটকের সমালোচনা সহ আরও অনেকগুলি গ্রন্থ-সমালোচনাও ছিল। এছাড়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কালী-প্রসন্ন — 'হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক ষোল পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি প্রবন্ধ পুস্তিকা প্রকাশ করে দেশবাসীর মধ্যে বিতরণ করেন। এপ্রসঙ্গে সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা হল এই যে, কালীপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের দুবছর পরে জন্মগ্রহণ করলেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রকাশিত হবার পূর্বেই কালীপ্রসন্নের এই সব সাহিত্যকর্ম প্রায় শেষ হয়ে গেছে। মৃত্যুর মাত্র দুবছর পূর্বে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন 'বঙ্গেশ বিজয়' নামে একখানা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন এবং তার দু ফর্মা ছাপাও হয়েছিল, কিন্তু এটিকে তিনি শেষ পর্যন্ত শেষ করে যেতে পারেন নি। কালীপ্রসন্ন 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র একটি স্বতন্ত্র অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু সেটি তিনি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ করে যেতে না পারায় তাঁর মৃত্যুর পরে দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকার পর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যে তা প্রকাশিত হয়েছিল, বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকা থেকে সে তথ্য পাওয়া যায়। এইভাবে নাটকে, নকশায়, মহাভারতে, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অনুবাদে, প্রবন্ধ রচনায়, উপন্যাসের সূত্রপাতে, এমনকি Calcutta Police Act নামে ইংরেজীতে একখানি আইনবিষয়ক গ্রন্থ সম্পাদনায় কালীপ্রসন্নের প্রতিভা তার মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই যে কত বিচিত্র পথে সঞ্চারিত হয়েছিল সেকথা ভাবলে আজ আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না। আর শুধু সাহিত্য নয়, সমাজ-সংস্কৃতির অঙ্গনও যে কালীপ্রসন্নের প্রতিভার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয় নি তা আমরা পূর্বেই বলেছি। প্রকৃত পক্ষে, মাত্র তের বছর বয়সে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' প্রতিষ্ঠা, ষোল বছর বয়সে 'বিদ্যোৎ-সাহিনী রঙ্গমঞ্চ' প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সকলপ্রকার উদারনৈতিক সমাজ-সংস্কার কর্মে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা, কৃষি বিষয়ে সচেতনতা, শিক্ষাবিস্তার, সাহিত্য ও সংবাদপত্রের উন্নতিকল্পে দান, নানাবিধ জনহিতকর কার্যে দান, দেশাত্মবোধ, 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' সহ একাধিক পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা,

নাট্যরচনা ও অভিনয় শিল্পে নূতন আঙ্গিক প্রবর্তন, সাহিত্যে সমাজবাস্তবতা ও খাঁটি চলিত ভাষার প্রতিষ্ঠা, মহাভারত ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ— একাধারে এত বিচিত্র গুণের সমন্বয়ে দেশবাসী বিস্ময়চকিত হয়েই বোধ হয় হাতের কাছে আর কোন বিশেষণ খুঁজে না পেয়ে শেষপর্যন্ত তাঁকে 'মহাত্মা' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কিন্তু মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে এই অসামান্য প্রতিভাবান কালীপ্রসন্নের জীবনে অকস্মাৎ যবনিকা নেমে আসায় আজও আমাদের কানে বাজতে থাকে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত কৃষ্ণদাস পালের সেই বিলাপবাণী—"We cannot adequately express our regret that a career begun under such glowing promises should have come to such an abrupt and unfortunate close."

———

পরিশিষ্ট (ক)

কালীপ্রসন্নের অসমাপ্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস

বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সূত্রপাত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' [১৮০১]। এটি আবার বাঙালীর লেখা বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। অবশ্য এর ভাষা অপরিণত এবং এতে ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কল্পনার খেলা এত কম যে একে ঠিক পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে না। তবু ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিণত বৃক্ষ বলে গণ্য না হলেও বাংলা সাহিত্যের এই প্রথম গদ্য-গ্রন্থটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম অঙ্কুর রূপে চিহ্নিত হতে পারে।

অতঃপর বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার চেষ্টায় দ্বিতীয় ব্যক্তি ভূদেব মুখোপাধ্যায় কন্টারের 'রোমান্স্ অব্ ইণ্ডিয়ান্ হিস্টরি' অবলম্বনে 'সফল স্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' লিখে একসঙ্গে প্রকাশ করলেন 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামে [১৮৫৭]। 'সফল স্বপ্ন' নিতান্ত ছোট একটি ঐতিহাসিক গল্প মাত্র হলেও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' দীর্ঘতর এবং অনেক অংশে ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। শিবাজীর হস্তে বন্দিনী হয়ে ঔরংজেব-কন্যা রোসিনারার শিবাজীর প্রতি প্রণয়াসক্তা হয়ে ওঠার কাহিনী হল 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র বিষয়বস্তু।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ষ্টুয়ার্ট-হান্টার-ইলিয়টের ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বঙ্কিমচন্দ্র যে স্থানীয় গড়মান্দারণ দুর্গের ইতিবৃত্তমূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস 'দুর্গেশ নন্দিনী' প্রকাশ করলেন, তাতে স্কটের 'আইভানহো'র প্রভাবের চেয়ে যে অনেক বেশি প্রভাব পড়েছে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'দুর্গেশনন্দিনী'র নবাবজাদী আয়েষার উপর 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র শাহাজাদী রোসিনারার, জগৎসিংহের উপর শিবাজীর এবং অভিরাম স্বামীর উপর রামদাস স্বামীর প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

'দুর্গেশনন্দিনী' ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র আরও কতকগুলি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস লিখলেও তিনি নিজে যে উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেই 'রাজসিংহ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এবং এর পরিবর্ধিত, পুনর্লিখিত ও পূর্ণাঙ্গপ্রাপ্ত চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'রাজসিংহ' উপন্যাসের রচনা ও প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ও পূর্বে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন 'বঙ্গেশ বিজয়' নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উপন্যাসটির দু ফর্মা ছাপাও হয়েছিল। কিন্তু এই উপন্যাস সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই কালীপ্রসন্ন লোকান্তরিত হন।

এ প্রসঙ্গে একটি চিত্তাকর্ষক প্রাসঙ্গিক তথ্য উদ্ধার করা প্রয়োজন মনে করি। তৎকালীন এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষ প্রতাপচন্দ্র ঘোষ 'বঙ্গেশ বিজয়' নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাপাবার জন্য প্রেসে দিয়ে যখন শোনেন যে ঐ প্রেসেই ঐ নামে কালীপ্রসন্ন সিংহের একটি উপন্যাসের দু'ফর্মা ছাপা হয়েছে, তখন তিনি বঙ্গেশ বিজয়ে'র পরিবর্তে তাঁর উপন্যাসের নাম রাখেন 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি উপন্যাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন এবং গ্রন্থটি কালীপ্রসন্ন সিংহকে উৎসর্গ করে ভূমিকায় লেখেনঃ—"গ্রন্থের নাম 'বঙ্গেশ বিজয়' দিয়া মুদ্রাঙ্কনার্থে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত জগন্মোহন তর্কালংকার ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট আমার বন্ধু দ্বারা পাঠাইলে শুনিলাম যে, উক্তাভিধেয় শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় রচিত একখানি গ্রন্থের দুই ফরমা ভট্টাচার্য্য যন্ত্রে ছাপা হইয়াছে, এ কারণ তর্কালংকার মহাশয়ের তথা শ্রীযুক্ত সিংহ মহোদয়ের ও আমার মধ্যস্থ আত্মীয়ের অনুরোধে 'বঙ্গেশ বিজয়' নামের পরিবর্ত্তে এই গ্রন্থের নাম 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' দিলাম····" (২ আশ্বিন ১২৭৫)। 'বঙ্গেশ বিজয়' বা 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র কাহিনী সুপ্রসিদ্ধ যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের কাহিনী। আমরা পূর্বেই বলেছি, বাংলা গদ্যগ্রন্থে প্রতাপাদিত্য কাহিনীর প্রথম সূত্রপাত রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (প্রথম খন্ড ১৮৬৯, দ্বিতীয় খন্ড ১৮৮৪) উনিশ শতকের একটি সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস। লালবিহারী দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনায় বইটিকে বঙ্কিমের রচনার উপরে স্থান দিলেও প্রতাপচন্দ্রের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মত শিল্পসার্থকতা লাভ করতে পারে নি। এ বিষয়ে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র অপ্রচলিত, আভিধানিক শব্দবহুল নীরস এবং অমসৃণ ভাষা।

কালীপ্রসন্নের অসমাপ্ত উপন্যাস 'বঙ্গেশ বিজয়ে'র ভাষাও তৎসম বহুল এবং গুরুগম্ভীর। প্রখ্যাত সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "সিরিয়াস

ধরণের গদ্যেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতা, 'বঙ্গেশ বিজয়' নামে অসমাপ্ত উপন্যাস, গীতার অনুবাদ প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি একটু সংস্কৃত ঘেঁষা গুরুভার রচনারীতি ব্যবহার করেছেন।"[১] কিন্তু কালীপ্রসন্নের ভাষার সঙ্গে প্রতাপচন্দ্রের ভাষার প্রধান পার্থক্য হল কালীপ্রসন্নের এই সংস্কৃত ঘেঁষা ভাষাও প্রাঞ্জলতার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় নি, অন্যদিকে প্রতাপচন্দ্রের ভাষা পারিভাষিক ও অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দপ্রয়োগে অতিমাত্রায় দুরূহ হয়ে উঠেছে, যেমন—"সূর্য্যকুমার পর্য্যাণ লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে ছিল, কাঞ্চীতে অশ্বুকটী দৃঢ় বন্ধন করিল। খলীন লইয়া অশ্ববক্ত্রে দিয়া বল্গা যোজনা করিল।" ডঃ আদিত্য প্রসাদ মজুমদার তাঁর 'চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও ও বিবেকানন্দ' গ্রন্থে চলিতভাষা প্রসঙ্গে আলোচনা কালে কালীপ্রসন্নের 'বঙ্গেশ বিজয়' উপন্যাসে হুতোমী ভাষা না থাকায় অভিযোগ করেছেন, লঘু-গুরু বিষয়বস্তু নির্বিশেষে চলিতভাষা প্রয়োগ প্রয়াসের কোন সুনির্দিষ্ট প্রত্যয়-নির্ভর পরিকল্পনা কালীপ্রসন্নের ছিল না।[২] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও যখন বিষয়বস্তু নির্বিশেষে চলিতভাষা প্রযুক্ত হয়নি, তখন চলিতভাষার প্রথম পথিকৃৎ-এর কাছে এতটা আশা করাও বোধ হয় সঙ্গত নয়। আর আমাদের এখানে একথাও মনে রাখা দরকার যে, বিষয়বস্তু নির্বিশেষে চলিতভাষা প্রয়োগ না করলেও কালীপ্রসন্ন বিষয়ভেদে কোথাও চলিতভাষা, কোথাও সাধুভাষা প্রয়োগ করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং সে সাধুভাষায় প্রতাপচন্দ্র ঘোষের মত "খলীন লইয়া অশ্ববক্ত্রে" দেওয়ার চেষ্টা না করে ভাষার প্রাঞ্জলতা রক্ষার জন্য সবিশেষ যত্নবান ছিলেন।

---

১ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।

২ আদিত্য প্রসাদ মজুমদার ঃ চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ।

পরিশিষ্ট (খ)

কালীপ্রসন্নের ইংরেজী রচনা

দুষ্প্রাপ্য হলেও কালীপ্রসন্নের ইংরেজী রচনারও কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'মেঘনাদ বধ কাব্য' প্রকাশের জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্তকে অভিনন্দিত করার উদ্দেশে কালীপ্রসন্ন স্বপ্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎ-সাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করেন। ঐ সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কালীপ্রসন্ন বহু গণ্যমান্য লোককে ইংরেজীতে যে আমন্ত্রণপত্রটি পাঠান তা এইরূপ :—

My dear Sir,

Intending to present Mr. Michael M.S. Dutt with a silver trifle as a mite of encouragement for having introduced with success the Blank verse into our language, I have been advised to call a meeting of those who might take a lively interest in the matter at my house on the occasion of the Presentation, in order to impart as much of solemnity as it is capable of receiving, while retaining its private character and therefore to serve perhaps its purpose better ; I shall therefore be obliged and I have no doubt all will be pleased by your kind presence at mine on Tuesday next, the 12th instant at 7 P.M.

Yours truly,
Kaly Prussunno Singh
Calcutta the 9th February 1861.

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে তাঁর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশে যে কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়, তার কাজের কিছুমাত্র অগ্রগতি না হওয়ায় ঐ সমিতির অন্যতম সদস্য কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর তারিখে হরিশচন্দ্র স্মৃতি

রক্ষার জন্য একটি বিস্মৃত পরিকল্পনা এবং হরিশ্চন্দ্র স্মৃতিমন্দির নির্মাণের জন্য তাঁর সুকীয়া বাগান স্ট্রীটের ওপর দু বিঘা জমি দান করার প্রস্তাব করে কার্য-নির্বাহক সমিতির কাছে ইংরেজীতে একখানি পত্র লেখেন। নীচে পত্রটির হুবহু প্রতিলিপি দেওয়া হল :—

To

BABOO KRISTO DOSS PAUL,

SECRETARY, HURRISH MEMORIAL COMMITTEE.

Sir,

As the form of the Memorial to the memory of the late Baboo Hurish Chunder Mookerjee has not been definitely settled, I believe it would be in consonance with the views and wishes of many of the subscribers, if the funds were applied to the erection, of a building for public use, to be called after his name, instead of being employed in the establishment of one or two scholarships as originally contemplated. I for one decidedly am for such a memorial Building, and if my colleagues in the Committee approve of the proposition I will feel it a pride to dedicate to this purpose a portion of my land, say 2 beeghas or there about, situated in Sukeas street, commonly called Badoor Bagan. The site which I have selected with the approval of some of my friends and colleagues in the committee, faces the Upper Circular Road in the East and Sukeas street in the North, and as it is comparatively free from the bustle of the town, while at the same time quite contiguous to the most populous part of the Native Quarter I trust it will answer our object very well. The sum which has been already subscribed and partly realized amounts, I believe, to ten thousand Ruppees, and I have no doubt that when this plan of Memorial Building is announced there will be no lack of funds to carry it out. There are many friends and

admirers of the late "Hindoo Patriot" who have not yet subscribed, and I can state with confidence that it is the feeling of some of the leading subscribers to the fund, that if there be a small deficiency at the end they will be glad to be reassessed for the purpose of making up the deficiency.

If the Memorial Building such as I suggest can be erected you can open there Reading and Assembly Rooms, establish a conversazione, have lectures, music, dramatic performances and diverse other enlightened recreations and amusements, such as make life agreeable and society enjoyable. A public building of this description has long been a desideratum, and we would but ill serve the public interests did we miss the opportunity of supplying it. I need hardly add that nothing could be a more fitting testimonial to the memory of the lamented deceased than this, who, be it remembered, was a staunch and earnest friend to the promotion of worthy intellectual and social intercourse among our country men.

Should my colleagues in the committee approve of the proposition I shall be glad to execute a deed of conveyance for the above-mentioned land in favour of such Trustees as they appoint.

I have & c.

(Sd) Kaliprussunna Singh

P. S.—I enclose herewith a rough sketch of the ground.

হরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য কালীপ্রসন্নের এই প্রস্তাব ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হলেও কার্যনির্বাহক সমিতির ঔদাসীন্যে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। হরিশচন্দ্র স্মৃতি তহবিলে যে ১০, ৫০০ টাকা সংগৃহীত হয়, হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পনেরো বৎসর পরে তা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সভার গৃহনির্মাণকল্পে ব্যয়িত হয় এবং ঐ গৃহের নিম্নতলে একটি মাত্র কক্ষকে "হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরী" রূপে চিহ্নিত করা হয়।

পরিশিষ্ট—৬

কালীপ্রসন্নের ইংরেজী রচনার আরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায় 'The Calcutta Police Act' নামক পুস্তকে। বিচারক হিসাবে আদালতে বসে কালীপ্রসন্ন নিজেই যে শুধু আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ করতেন তাই নয়, অন্য সকলেও যাতে আইনের যথাযথ প্রয়োগের নির্দেশ সহজে পেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি 'The Calcutta Police Act' নামে ১০৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী একখানা আইনের বই প্রকাশ করেন। বইটির আখ্যাপত্র এইরূপ :—

The

Calcutta Police Act

Containing Act No. IV of 1866 B. C. [অনবধানতা বশতঃ A. D. স্থলে B. C. বসেছে] together with the sections of the Indian Penal Code referred to therein, an abstract of the offences and the penalties attached thereto, and an alphabetical index, & c, &c.

With the Amended Act

Compiled

by

KALI PRUSUNNO SINGH

Honorary Magistrate and Justice of Peace for the town of Calcutta, one of the Municipal Commissioners for the suburbs of Calcutta with the powers of a Magistrate.

Calcutta.

Printed and published for Babu Shil Chunder Bose at J. G. Chattarjee & Co's Press. No 68, Pottuldunga, College Street. 1866.

To be had at the Calcutta Police Court.

Price one Rupee.

এই পুস্তকের ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন যা লিখেছিলেন, তার ইংরেজী রচনার নিদর্শনস্বরূপ তা এখানে উদ্ধৃত হল :—

PREFACE

In editing the new Police Act I beg to inform the public that I have inserted all the sections of the Indian Penal Code referred to in the clauses of the section XXVI of this Act, have prepared an abstract statement of all the offence and penalties attached thereto, and have introduced the limits of the Port and Town of Calcutta, and the Amended Act.

If my brother Honorary Magistrates find facilities in dispensing justice with accuracy by the aid of these few pages, thus laid before them, I shall feel my labour amply rewarded.

In conclusion I cannot refrain from acknowledging my best thanks to my friend, BABOO PRANKISSEN GHOSH, Interpreter to the magistrate of the northern Division of Calcutta, for the valuable assistance he has rendered me in compiling this work.

Calcutta, Police Court.
The 7th June. 1866.

KALI PRUSUNNO SINGH

এই গ্রন্থে 'The Limits of the Town of Calcutta' অংশে The Northern Boundary, The Eastern Boundary, The Southern Boundary এবং The Western Boundary-র যে বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাতে তৎকালীন নগর-কলকাতার সীমা-চৌহদ্দিটি জানা যায়। এছাড়া 'The Limits of the Port of Calcutta' অংশে কলকাতা বন্দরের সীমারেখাটিও চিহ্নিত হয়েছে।

[মূল গ্রন্থটি কালীপ্রসন্ন সিংহের দত্তকপুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহের একমাত্র পুত্র সঞ্জীবচন্দ্র সিংহের ব্যক্তিগত সংগ্রহে সংরক্ষিত আছে।]

THE

CALCUTTA POLICE ACT.

CONTAINING ACT No. IV, OF 1866 B. C. TOGETHER WITH THE SECTIONS OF THE INDIAN PENAL CODE REFERRED TO THEREIN, AN ABSTRACT STATEMENT OF THE OFFENCES AND THE PENALTIES ATTACHED THERETO, AND AN ALPHABETICAL INDEX, &c, &c.

WITH THE AMENDED ACT.

COMPILED

BY

KALI PRUSUNNO SINGH.

Honorary Magistrate and Justice of the Peace for the town of Calcutta. One of the Municipal Commissioners for the Suburbs of Calcutta with the powers of a magistrate.

Calcutta:

PRINTED AND PUBLISHED FOR BABU SHIB CHUNDER BOSE
AT J. G. CHATTERJEA & Co's PRESS.
No. 68, POTTULDUNGA, COLLEGE STREET.

1866.

☞ *To be had at the Calcutta Police Court.*

কালীপ্রসন্ন সম্পাদিত Calcutta Police Act-এর আখ্যাপত্র। চিত্র—১৮

Notice

An ~~your~~ arrangement will soon be made for the better conducting of the Hindu Patriot, it is hereby requested that ~~from this date~~ until further Notice all communications will be addressed, drafts in Hoondies &c ~~will be addressed to~~ made payable to

Kali Prosunno Singh

20th Nov. 1861
Hindu Patriot Prop.
~~[illegible]~~
Cal, [illegible]

will be signed

The letter acknowle
~~shall be~~ signed

কালীপ্রসন্ন সিংহের স্বাক্ষর সম্বলিত নোটিশের খসড়া
(তাং ২০শে নভেম্বর, ১৮৬১)

চিত্র—১৯

পরিশিষ্ট (গ)

শান্তিরাম সিংহের পুত্র (কালীপ্রসন্নের পিতামহ) জয়কৃষ্ণ সিংহের মৃত্যুকালীন বিষয়তালিকা ঃ—

১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর জয়কৃষ্ণ সিংহ যখন মারা যান তখন তাঁর বিষয় তালিকার মধ্যে ছিল—

কলকাতায় ২০ খানা বাড়ি এবং শালকিয়া, মানিককলা এবং চিৎপুরে (এগুলিকে তৎকালীন কলকাতার বাইরের সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে) প্রচুর ভূসম্পত্তি।

কোম্পানির কাগজ, শেয়ার, বন্ড এবং নগদ—১৮, ৮১, ৫১১ টাকা, কলকাতায় স্থাবর সম্পত্তি—৭, ৪০, ৪৩০ টাকা, কলকাতার বাইরে স্থাবর সম্পত্তি-২, ৪১, ৩৮৪ টাকা, কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে নিষ্কর সম্পত্তি ৮৯, ৯৫০ টাকা—

লণ্ঠন, বেলোয়ারি ঝাড় ইত্যাদি ৭০০০ টাকা, গরম কাপড় এবং শাল ৫০০০ টাকা, কাপড় ৫০০০ টাকা গাড়ি ৩০০০ টাকা, ইংরাজি, বাংলা ও ফার্সি বই ৩০০০ টাকা, ছবি আয়না ইত্যাদি ২০০০ টাকা, পর্দা তাঁবু, সামিয়ানা ইত্যাদি ১৫০০ টাকা।

মদনমোহন বসুর অফিসের বাক্সে ১, ৫৫৮ টাকা।
জয়কৃষ্ণ সিংহের বাক্সে—৪, ৮৪৫ টাকা।
এছাড়া তখন বিভিন্ন লোকের কাছে প্রাপ্য হিসাবে ছিল, ৩, ১৮, ৩৮২ টাকা।

[অবশ্য মনে রাখতে হবে জয়কৃষ্ণ সিংহের মৃত্যুকালীন এই বিষয়-সম্পত্তির মূল্য ধরা হয়েছে সেই সময়কার মূল্যসূচীতে যখন ধানের মণ ছিল একটাকা থেকে দু'টাকার মধ্যে।]

পরিশিষ্ট (ঘ)

[বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' উপন্যাসে কালীপ্রসন্ন ও সিংহ পরিবারের ঐতিহাসিক বিকৃতি ও তার তথ্যাশ্রয়ী প্রতিবাদ। এ সম্বন্ধে বর্তমান গ্রন্থে বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে তথ্যগুলি দিয়েছি, এখানে সেগুলি একত্রিত হল।]

কালীপ্রসন্নের জন্ম হয় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আর সেই সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি 'ক্যালকাটা কুরীয়ার' পত্রে।

এখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল এই যে, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের জন্মের সময় তাঁর পিতা নন্দলাল সিংহের বয়স যে মাত্র ১৯ বছর (এবং ফলে কালীপ্রসন্নের জন্ম যে ১৯ বছরের পিতা ও ১৪/১৫ বছর বয়সের মাতার প্রথম সন্তান জন্ম দেওয়ার খুব স্বাভাবিক দাম্পত্য ব্যাপার), নন্দলাল সিংহের মৃত্যুকালীন বয়স থেকে একটু হিসাব করলেই সে তথ্য পাই, কারণ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখের ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া'য় লিখিত হয়—"Baboo Nandolal Sing the grandson of Santiram Sing·· died at the end of last week after a short illness (Cholera). He was only twentyfive years of the age but was held in universal esteem by his fellow countrymen for his liberality and affability."

সুতরাং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' উপন্যাসে ছদ্মনামের আড়ালে নবীনকুমারের (কালীপ্রসন্নের) জন্মের সময় রামকমল সিংহের "বয়েস এখন সাতচল্লিশ" কিংবা দীর্ঘকাল বহু রমণীর গর্ভে বীর্যনিষেক করেও তিনি সন্তানোৎপাদনে অক্ষম ছিলেন বলে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে, তা যে কতখানি অমূলক তা সহজেই অনুমেয়।

আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়েছেন রামকমল সিংহ (নন্দলাল সিংহ) ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান যদিও তিনি যে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান সে তথ্য সেকালের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকেই পাওয়া যায়, (ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া'—৯ই এপ্রিল ১৮৪৬)।

আবার দীর্ঘকাল অপুত্রক থাকার জন্য রামকমল সিংহ (নন্দলাল সিংহ) দত্তক পুত্র নিয়েছিলেন, এ তথ্যও ঠিক নয়, কারণ আমরা পূর্বেই দেখেছি, মাত্র ১৯ বছর বয়সেই তিনি পুত্রসন্তান লাভ করেন এবং তাঁর সেই প্রথম সন্তান—কালীপ্রসন্নের জন্ম উপলক্ষ্যে তাঁর স্বগৃহে এক বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়—

"Last night a series of nautches commenced at the residence of Baboo Nundolaul Sing, at Jorasanko, in celebration of the birth of his first child, a boy, which took place lately." ('ক্যালকাটা কুরীয়ার' ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৪০ ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কৌতুককর কথা বলি। 'সেই সময়' উপন্যাসে রামকমল সিংহের দত্তকপুত্র রূপে যে গঙ্গানারায়ণকে দেখানো হয়েছে, সিংহ বংশে সেই নামের প্রকৃতই একজন ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গঙ্গানারায়ণ কালীপ্রসন্নের দাদা নয়, দাদু (পিতামহ)—শান্তিরাম সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামরামের তিন পুত্র নরনারায়ণ, বোধ নারায়ণ ও গঙ্গানারায়ণের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল গঙ্গানারায়ণ। সুতরাং গঙ্গানারায়ণ নন্দলাল (রামকমল) সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র বা দত্তকপুত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন নন্দলাল সিংহের পিতৃব্য এবং তিনি নন্দলাল সিংহের নিকট জোড়াসাঁকোতে প্রতিপালিত হন নি, তাঁর অপর দুই ভাই নরনারায়ণ ও বোধনারায়ণের সঙ্গে হুগলী জেলার বাক্‌সা গ্রামে বাস করতেন। (বসন্তকুমার বসু প্রণীত 'কায়স্থ পরিচয়' কলিকাতা খণ্ড ১ম সং ১৩২৮ সাল অবলম্বনে এবং বাক্‌সা গ্রামে সিংহ বংশের পুরাতন কুলপঞ্জী অবলম্বনে এই গ্রন্থের 'বংশপঞ্জী' অংশে জোড়াসাঁকোর সিংহ বংশের আমি যে প্রামাণ্য বংশপঞ্জী সংযোজন করেছি, তা দেখলেই প্রকৃত সত্য নির্ণীত হবে।)

তাছাড়া কালীপ্রসন্নের (নবীনকুমারের) অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষের ছায়ায় যে বিধুশেখর মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র কল্পিত হয়েছে, তা যেমন অনৈতিহাসিক, তেমনি হরচন্দ্র ঘোষের চরিত্রের সঙ্গেও ঐ কল্পিত বিধুশেখর মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রগত কোন মিল ও নেই। প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসন্নের পিতা নন্দলাল সিংহের মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্নের বয়স যখন ছ'বছর তখন তাঁর প্রতিবেশী বিচারক হরচন্দ্র ঘোষ তাঁর বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। এখানে আমাদের অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই হরচন্দ্র ঘোষ নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষ (জন্ম ১৮১৭, মৃত্যু ১৮৮৪) নন, বিচারক হরচন্দ্র ঘোষ (জন্ম ১৮০৮, মৃত্যু ১৮৬৮)। কিন্তু 'সেই সময়' উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হরচন্দ্র ঘোষের ছায়াবলম্বনে বিধুশেখর মুখোপাধ্যায়ের কাল্পনিক চরিত্র আঁকতে গিয়ে তাঁকে 'দক্ষ উকিল' হিসাবে উল্লেখ করলেও তাঁকে বিচারক হিসাবে দেখান নি এবং সম্ভবতঃ ভুলক্রমে বিচারক হরচন্দ্র ঘোষের আয়ুষ্কালের স্থলে নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষের আয়ুষ্কালকেই গ্রহণ করেছেন কারণ যদিও প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসন্নের অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর দু'বছর পূর্বে লোকান্তরিত হয়েছেন, তথাপি 'সেই সময়' উপন্যাসের ২য় খন্ডে দেখি বিধুশেখর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের মৃত্যুদৃশ্য দেখছেন। কিন্তু কালীপ্রসন্নের অভিভাবক বিচারক হরচন্দ্র ঘোষ যে কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পূর্বেই লোকান্তরিত হয়েছেন সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়, কারণ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর সময় 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত একটি নিবন্ধে জানা যায় "মৃত জজবাবু হরচন্দ্র ঘোষ তাঁহার সম্পত্তির রক্ষক হইয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন তিনি পিতৃবিয়োগের কষ্ট বড় জানিতে পারেন নাই। হরচন্দ্রের যত্নে তাঁহার সম্পত্তির অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল"। এখানে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'— এর মত প্রামাণ্য গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী এই হরচন্দ্র ঘোষের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে কয়েকটি বিশেষ তথ্যের উপর আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যাতে সহজেই বোঝা যাবে তাঁর চরিত্রবল কিরূপ ছিল এবং কালীপ্রসন্নের জীবন গঠনে ও প্রতিভার বিকাশে তাঁর অভিভাবকত্ব কতদূর কার্যকরী হয়েছিল :- ইনি ডিরোজিও বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল এবং রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন সুহৃদ্‌গণের মধ্যে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন। চিরদিনই তাঁর প্রকৃতিতে একপ্রকার ধীরচিত্ততা ও স্থিতিশীলতা ছিল। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্যদক্ষতার জন্য গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। যে সময়ে লোকে উৎকোচ গ্রহণকে পাপ বলে মনে করত না, সেই সময়ে বাঁকুড়ার মুন্সেফ হয়ে হরচন্দ্র এমন ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন যে সেখানে তাঁর একশ' টাকা বেতনে কুলোত না বলে কলকাতা থেকে তাঁর খরচের জন্য মধ্যে মধ্যে টাকা নিতে হত। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে শিক্ষা ভিন্ন এদেশের দুর্গতি দূর হবার উপায় নেই ; সেজন্য তিনি নিজ ব্যয়ে একটি ইংরাজী স্কুলও স্থাপন করেছিলেন। কলকাতায় অবস্থান কালে তিনি দেশের সর্ববিধ উন্নতির সহায়তা করতেন। মহাত্মা বেথুন যখন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি তাতেও বিশেষভাবে সহায়তা করেন। তাছাড়া ১৮৪২ সালের ১লা জুন ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হলে ঐ সালের ১৭ই জুন ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি মর্মরমূর্তি স্থাপনের

উদ্দেশ্যে যে কমিটি গঠিত হয়, তাতে কালীপ্রসন্নের পিতা নন্দলাল সিংহ, পিতৃব্য শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সঙ্গে হরচন্দ্র ঘোষেরও নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। পরে তিনি ঐ কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে ঐ কাজ সমাধা করেন।

এই হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হলে (৩রা ডিসেম্বর ১৮৬৮) ২৩শে অগ্রহায়ণ ১২৭৫ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' পত্রে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয়ঃ—

"বাবু হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু।

আমাদের দেশের গণনীয় লোকগুলি ক্রমে ক্রমে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। বঙ্গদেশ এক একটি করিয়া ভূষণহারা হইতেছেন। কলিকাতায় ছোট আদালতের তৃতীয় জজবাবু হরচন্দ্র ঘোষ বৃহস্পতিবার রাত্রি দশটার সময় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে মুন্সেফ হন। তৎপরে নানা কাজ করিয়া কলিকাতায় দ্বিতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও তৎপরে ছোট আদালতে জজ হইয়াছিলেন। সকল বিষয়েই সতত তাঁহার সুখ্যাতি শুনা যাইত। কি ইউরোপীয় কি এদেশীয় সকলেই তাঁহার সদ্‌বিচারে সন্তুষ্ট হইতেন। এ পর্যন্ত তাঁহার চরিত্রদোষ আমাদিগের শ্রুতিগোচর হয় নাই। সকলের সহিত অমায়িক ব্যবহার, শিষ্টাচার, অতিথি সৎকার প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটি বিশেষ গুণ ছিল। তিনি এমন লোকপ্রিয় ছিলেন, শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুর পর তাঁহার উপরে অনেকের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। এ প্রকার লোকের মৃত্যু সাতিশয় শোচনীয় সন্দেহ নাই। তাঁহার স্মরণার্থ গতকল্য ছোট আদালত বন্ধ হইয়াছিল।"

হরচন্দ্র ৬০ বছর বয়সে যখন দেহত্যাগ করেন তখন কালীপ্রসন্নের বয়স ২৮ বছর। এঁর মৃত্যুর দু'বছর পরেই (১৮৭০-এ) কালীপ্রসন্ন দেহত্যাগ করেন যদিও 'সেই সময়' উপন্যাসে দেখি বিধুশেখর (হরচন্দ্র) কালীপ্রসন্নের মৃত্যু দেখছেন।

আবার কালীপ্রসন্নের বিবাহ প্রসঙ্গে প্রকৃত তথ্য এই যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৪ বছর বয়সে কালীপ্রসন্নের প্রথম বিবাহ হয় বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত লোকনাথ বসু বাহাদুরের ভ্রাতৃকন্যার (শ্রীযুক্ত বেণী মাধব বসুর কন্যার) সহিত। কিন্তু বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যেই কালীপ্রসন্নের বালিকাপত্নী (বাগবাজারের বসুবাড়ীর কন্যা) লোকান্তরিতা হন। তার কিছুকাল পরে কালীপ্রসন্ন রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবের দৌহিত্রী আনরপুর নিবাসী চন্দ্রনাথ বসুর

কন্যাকে বিবাহ করেন। কালীপ্রসন্নের এই দ্বিতীয়া পত্নী কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। কালীপ্রসন্নের প্রথমা পত্নীর নাম ছিল ভুবনমোহিনী দাসী ও দ্বিতীয়া পত্নীর নাম শরৎকুমারী দাসী এবং কালীপ্রসন্নের মায়ের নাম ছিল ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসী। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' উপন্যাসে এ প্রসঙ্গে দুটি গুরুতর ত্রুটি দেখা যায়। প্রথমতঃ তিনি নন্দলাল (রামকমল) সিংহের দত্তক পুত্র (যিনি আসলে নন্দলালের পিতৃব্য) গঙ্গানারায়ণের সঙ্গে বাগবাজারের বসুবাড়ীর কন্যার বিবাহ দেখিয়েছেন (যদিও গঙ্গানারায়ণ নয়, কালীপ্রসন্নেরই প্রথম বিবাহ হয়েছে বাগবাজারের বসুবাড়ীর কন্যার সঙ্গে) এবং কালীপ্রসন্নের মা ত্রৈলোক্যমোহিনীকে (বিম্ববতীকে) নিরক্ষর হিসেবে দেখিয়েছেন যদিও ত্রৈলোক্যমোহিনী নিরক্ষর ছিলেন না এবং এপ্রসঙ্গে বলি যে কালীপ্রসন্নের মায়ের ছবি ও হস্তাক্ষর দেখার আমার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছে যার আলোকচিত্র বর্তমান গ্রন্থে 'জোড়সাঁকোর সিংহ পরিবার ও কালীপ্রসন্ন' অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আবার কালীপ্রসন্নের মা ত্রৈলোক্যমোহিনীর মৃত্যু হয়েছে কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে, যদিও 'সেই সময়' উপন্যাসে নবীনকুমারের (কালীপ্রসন্নের) মৃত্যুর পূর্বেই হরিদ্বারে তাঁর মা বিম্ববতীর মৃত্যু দেখানো হয়েছে। কালীপ্রসন্নের মৃত্যু সম্বন্ধেও সঠিক তথ্য পাওয়া যায় ২৯শে জুলাই, ১৮৭০ তারিখের **'The Indian Mirror'** পত্রিকায়—"**··Last Sunday at about 8 O' clock P. M. he died of a disorder of the liver brought on by his excesses!'** অন্যদিকে 'সেই সময়' উপন্যাসে কালীপ্রসন্নের (নবীনকুমারের) মৃত্যু হয়েছে এক পাগল নাকি হঠাৎ বুকের থেকে এক খাবল মাংস কামড়ে নেওয়ার ফলে। কিন্তু তা যে সত্য নয়, সে তথ্য পাওয়া গেল তৎকালীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে।

সাহিত্যে যেহেতু সত্যপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অনেক বড়ো, সেজন্য সেই সত্য প্রকাশের খাতিরে 'সেই সময়' উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিকৃতিগুলি দেখাতে বাধ্য হলাম। একথা ঠিক যে ঐতিহাসিক উপন্যাসে বা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে কিছু কল্পনার স্থান আছে, কিন্তু তা যে কোন সাধারণ উপন্যাসের মত অবাধ ও যথেচ্ছ-বিহারী হতে পারে না। কেবলমাত্র কোন ঐতিহাসিক সত্যকে বর্ণবহুল করার জন্য, কিংবা যেখানে কোন ঐতিহাসিক তথ্য নেই, সেখানে অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে একটি

ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কিছু কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু সে কল্পনা কখনো এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যকে বিকৃত করতে পারে না। যদি তা হয়, তবে তা আর যাই হোক্, ঐতিহাসিক উপন্যাস বা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস হয় না। সুতরাং দিবাকর, রাইমোহন, থাকোমনি প্রভৃতি চরিত্রে ঔপন্যাসিকের কল্পনার স্বাধীনতা থাকলেও কালীপ্রসন্নের মত ঐতিহাসিক চরিত্রে এরকম গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের বিকৃতি ঘটলে তা সাহিত্যিক অপরাধের পর্যায়ে পড়ে।

[অবশ্য 'সেই সময়' উপন্যাসে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি লেখকের অনিচ্ছাকৃত হওয়াও সম্ভব কারণ এই উপন্যাসে 'লেখকের কথা'য় লেখক তাঁর নিজের ধারণা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে—"স্বেচ্ছায় কোনো ভুল তথ্য আমি দিইনি" এবং "যাঁকে অবলম্বন করে নবীনকুমারকে গড়া হয়েছে তাঁর কয়েকটি কীর্তিচিহ্ন ছাড়া ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না. এতদিন পর আর জানবার উপায়ও নেই।"—যদিও আর একটু অনুসন্ধিৎসু হলেই এ সম্বন্ধে যে সঠিক তথ্যগুলি জানা যেত, এই গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যগুলি দেখলেই তা স্পষ্ট হবে।]